তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত

ড. বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা—৭০০ ০০৬

পিতামহ বলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

পিতামহী ইন্দুরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়-সূচী

সংকেত-সূচী

রা.মা.	রামায়ণ
ম.ভা.	মহাভারত
উ.রা.চ.	উত্তররামচরিত
বি.পু.	বিষ্ণুপুরাণ
অ.পু.	অগ্নিপুরাণ
ঐ.ব্রা	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
আ.বা.প.	আনন্দবাজার পত্রিকা
ব্র.বৈ.পু.	ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ
সা.সং	সাময়িক সংস্করণ
বা.পু.	বায়ুপুরাণ
ব্র.পু.	ব্রহ্মপুরাণ
খি.হ.বং.	খিল হরিবংশপুরাণ
ভা.পু.	ভাগবতপুরাণ
পদ্ম.পু.	পদ্মপুরাণ
জৈ.ব্রা.	জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ
ষড়.বিং.ব্রা.	ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ
তৈত্তি.আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈত্ত. সং.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
গীতা প্রে.	গীতা প্রেস সংস্করণ

লেখকের নিবেদন

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের অমূল্য ধন। ভারতের শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতার গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি সমান অনুরাগ। ভারতের কালিদাস রবীন্দ্রনাথ এবং বিদেশের মিল্টন বা শেক্‌সপিয়রের রচনা যতই উন্নতমানের বা ভাবগম্ভীর হোক-না-কেন তা রামায়ণ ও মহাভারতের মতো ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে নি। আদিকবি বাল্মীকি ও মহর্ষি বেদব্যাস -রচিত এই মহাগ্রন্থদুটিকে আশ্রয় করে দেশী ও বিদেশী বহু মনীষী অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আলোচ্য মহাকাব্যদ্বয়ে নিহিত রচনা-পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, সমাজ-জীবন প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিভিন্ন মহাদেশের পণ্ডিতগণ একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে এই অধ্যয়ন আজও সমুজ্জ্বল এবং আগামী দিনেও তা অম্লান থাকবে।

এ পর্যন্ত উভয় মহাকাব্যেরই বহু গবেষণাধর্মী আলোচনা হয়েছে। তবু কালোত্তীর্ণ গ্রন্থদুটির সকল দিকের আলোচনা পূর্ণতা লাভ করেছে বলা যায় না। বস্তুত রচনাদুটির আবেদনও কালাতীত। পুস্তকদুটিতে যেমন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সমাজ-জীবন, যুদ্ধপ্রণালী, রাজধর্ম প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে তেমনি সকল যুগের সকল মানুষের অন্তর্জাত মর্মবাণীও ধ্বনিত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ-জীবনের পটচিত্রে যেন ভারতবাসীর চিরকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি শিক্ষা-দীক্ষা বাণীমূর্তি লাভ করেছে দুই মহাকাব্যে।

বর্তমান গ্রন্থে উভয় মহাকাব্যের একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থদুটির যা ব্যাপকতা বা বিষয় বৈচিত্র্য তাতে উভয়গ্রন্থের সকল দিকের আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে বোধকরি অসম্ভব। গ্রন্থের পরিধিকে সীমায়িত রাখার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই কয়েকটি নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে।

সাতটি অধ্যায়-সমন্বিত এই গ্রন্থের প্রারম্ভে আলোচিত গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থদুটিকে 'এপিক' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করলেও এই উপাধিদ্বারা উভয়ের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় কি না, গ্রন্থদুটির বিষয়বস্তু, মুখ্য চরিত্র, প্রধান রস, প্রভৃতি এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে মহাভারতে উল্লিখিত রামায়ণের কথা-পুরুষ ও যুদ্ধের প্রসঙ্গ

আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতের প্রায় সাতটি পর্বে রামায়ণের দশরথ, জনক, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, হনুমান প্রভৃতি কথা-পুরুষ উদাহরণ মুখে বার বার উল্লিখিত হয়েছেন। কোনো স্থলে যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য দশরথের নাম, কোনো সময় স্বামী-ভক্তির তুলনা প্রসঙ্গে সীতার পাতিব্রত্যের উল্লেখ, কখনো বিদুর-কর্তৃক ধর্মপ্রাণ ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রশংসাবসরে অথবা অর্জুনের বীরত্বের তুলনা প্রসঙ্গে রামের কথা, আবার কোনো সময় দক্ষিণ দিকের প্রসিদ্ধি প্রসঙ্গে রাবণের কথা এসেছে। রামায়ণ-খ্যাত বৃদ্ধ হনুমান তো মহাভারতের বনপর্বের কদলী বনে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। এইভাবে সমগ্র মহাভারতের একাধিক পর্বে ইতস্তত উল্লিখিত রামায়ণের চরিত্রগুলি সপ্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

শুধুমাত্র রামায়ণের কথা-পুরুষই নয় মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে রামায়ণের সংঘটিত যুদ্ধেরও উল্লেখ মেলে। মহাভারতে ভারত যুদ্ধের বর্ণনা কবির লেখনীমুখে সম্যক্‌রূপে বিন্যস্ত হয়েছে। ভারতযুদ্ধে যোগদানকারী বহু প্রসিদ্ধ বীরের রোমহর্ষক যুদ্ধ এখানে বর্ণিত হয়েছে। কবি এই ভয়ংকর যুদ্ধগুলির সঙ্গে প্রায়ই বাল্মীকি-রামায়ণে চিত্রিত যুদ্ধগুলির তুলনা করেছেন। এই অধ্যায়ে বেদব্যাস-ব্যবহৃত রামায়ণ-যুদ্ধগুলি প্রসঙ্গসহ আলোচনা করা হয়েছে।

এই আলোচনার মাধ্যমে উভয় মহাকাব্যের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তা দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহাভারতের উপর রামায়ণের প্রভাব কতখানি তার গ্রন্থভিত্তিক প্রমাণও এই দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় মহাকাব্যদ্বয়ের শ্লোকগত সাম্য। রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতই সর্বদা ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহনে অগ্রণী। আবার রামায়ণের প্রকৃতি কাব্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকলেও আদিকবি বাল্মীকি এ বিষয়ে সর্বদা উদাসীন থেকেছেন তা বলা যায় না। কিছু কিছু উপাখ্যান ও কথা-পুরুষগণের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতির অনেক তথ্য এই মহাকাব্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বভাবত রক্ষণশীল দেশ। রক্ষণশীলতার আবহাওয়া এ দেশের আকাশে বাতাসে। উভয় মহাকাব্যের কবিদ্বয়ও একান্তভাবে ভারত-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যুগ যুগ ধরে মানবজীবনের বহু অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য ভারতবাসী কখনো আপন স্মৃতিতে এবং পরে শিষ্যপরম্পরায় শ্লোকাকারে বাঁচিয়ে রেখেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানাবিধ আড়ম্বরেও ভারতীয় জনজীবনে সেগুলি থেকেছে অবিকৃত। আমাদের রাম-কথা ও ভারত-কথার রূপকার বাল্মীকি-ব্যাসের দৃষ্টিও এইসকল প্রবাদ থেকে দূরে সরে যায় নি। তাই অবলীলাক্রমে

উভয় মহাকাব্যের কথা পুরুষগণের মুখে উচ্চারিত হয়েছে এইসকল সত্য বাক্য। বাক্যগুলি কালের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে রেহাই পেতে যেন কবিদ্বয়ের মাধ্যমে মহাকাব্যে স্থান করে নিয়েছে। রাজধর্ম, সমাজনীতি, অর্থনীতি, মানবিক বিদ্যা সবই স্থান পেয়েছে এই বাক্যগুলিতে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত শততম সর্গে বর্ণিত ভরতের উদ্দেশ্যে রাম-কথিত রাজনীতি বিষয়ক উপদেশগুলির সঙ্গে মহাভারতের সভাপর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে নারদ-কথিত প্রশ্নমুখী উপদেশাবলীর সাদৃশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে সমগ্র রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয় মুনি-কথিত রামোপাখ্যানের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। উভয় গ্রন্থের সামীক্ষিক সংস্করণই এই আলোচনার ভিত্তি। রামায়ণের কাহিনী বাল্মীকি-লিখিত আখ্যান। কারণ এটি মহাকবির মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু। মহাভারতে বেদব্যাসের লেখনীতে তা পরিণত হয়েছে উপাখ্যানে। কারণ ভারতকবি আপন কথা-বস্তুকে দৃঢ়ীকরণের জন্য উদাহরণ মুখে রাম-কথা আপন কাব্যে সম্পৃক্ত করেছেন। এখানে দ্রৌপদী ও অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে বনবাস-জীবনে দুঃখিত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদানের জন্য মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে রাম-কথা বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে বাল্মীকি-লিখিত রামায়ণ ও মার্কণ্ডেয় মুনি -কথিত রাম-কথার কাহিনীগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। মার্কণ্ডেয় মুনি -কথিত রামোপাখ্যান সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানমাত্র তাই স্বাভাবিকভাবে অনেক মুখ্য ঘটনা তাঁর বর্ণনায় অনুপস্থিত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটির অনেক শ্লোক, শ্লোকার্ধ শ্লোকাংশ উভয় গ্রন্থে এক। এখানে এরূপ বিষয়গুলিকে পাশাপাশি রেখে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত রাম-কথার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। অনেক সময় বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে গ্রন্থদ্বয়ের সামঞ্জস্য নেই অথচ শ্লোকাংশ ও শ্লোকার্ধের সাম্য বর্তমান— এরূপ দৃষ্টান্তগুলিও এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। মহাভারতের রামোপাখ্যানটি যে রামায়ণের আধারে রচিত তাও যুক্তিসহ প্রতিপন্ন করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই রামোপাখ্যানটি ছাড়াও মহাভারতের বনপর্বে (১৪৭।২৪-৩৮) একটি এবং দ্রোণপর্বে* উদ্ধৃত আরও একটি রামোপাখ্যান এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় উভয় মহাকাব্যে উপলব্ধ উপাখ্যান সমূহের সাম্য ও বৈষম্য। বাল্মীকি এবং বেদব্যাস উভয় মহাকবিই মহাকাব্যের মূল আখ্যান বর্ণনাবসরে কথা-পুরুষগণের মুখে স্থানে স্থানে অসংখ্য উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। বর্ণিত উপাখ্যানগুলি কখনো কখনো মূল কথা-বস্তুর বক্তব্যকে

---

* 7 APP 8 440 pr 480 (Critical Ed.)

দৃঢ় করেছে। কখনো বা কোনো প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই ধরনের একই উপাখ্যান অনেক সময় উভয় মহাকাব্যেই স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই সম-প্রকৃতির উপাখ্যানগুলির মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই যে শুধুমাত্র সাম্যের দিকটিই পরিস্ফুট হয়েছে তা নয়, বৈষম্যও যথেষ্ট প্রকটিত। উদাহরণস্বরূপ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র উপাখ্যান ও যযাতি উপাখ্যানের নাম করা যেতে পারে। কখনো এক মহাকাব্যে কোনো উপাখ্যানের উল্লেখ নতুবা বীজাকারে সেটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় আবার অপর মহাকাব্যে তার বিস্তৃত রূপ মেলে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় উভয় মহাকাব্যে প্রাপ্ত প্রায় বাইশটি সম-প্রকৃতির উপাখ্যান স্থান পেয়েছে। এইসকল উপাখ্যানগুলির উৎস সন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে যে বৈদিক সাহিত্য কিংবা তৎপরবর্তী মানব-জীবনের শিক্ষা সংস্কৃতি অথবা ধর্মবিশ্বাসই এগুলির জন্মভূমি। লোক-পরম্পরায় সাধারণ মানুষের কথোপকথনের মাধ্যমেই এগুলি শৈশব ও কৈশোরের অপূর্ণতা কাটিয়ে যৌবন লাভ করেছে। পরবর্তীকালে রামায়ণ এবং বিশেষ করে মহাভারতরূপী মহাসাগরে এগুলি স্বমহিমায় স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছে। তবে উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত প্রত্যেকটি উপাখ্যানের মূল অন্বেষণ আজ প্রায় অসম্ভব। সম্ভবত এই ধরনের উপাখ্যানগুলি প্রথমে কোনো সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কিন্তু পরবর্তীকালে যুগে যুগে লোকমুখে সেগুলির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এইভাবে লোকমুখে রূপান্তরিত কাহিনীগুলিকে পণ্ডিতগণ 'মিথ' বলে ব্যাখ্যা করেন। আবার লোকমুখে রূপান্তরিত অলিখিত কাহিনীগুলি যখন লিখিত রূপ লাভ করে তখনই সেগুলি উপাখ্যান বলে পরিচিত হয়। কাহিনীগুলি এই পরিবর্তনের স্রোতে প্রায়ই হারিয়ে ফেলে স্বীয় অন্তর্নিহিত সত্যতা। কালের দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের তারতম্য হেতু উপাখ্যানগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কালিক ব্যবধান হেতু সেগুলি অসম্ভব বলেই প্রতিভাত হয়। এ প্রসঙ্গে উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত অহল্যা উপাখ্যানটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যেও অহল্যার কথা আছে। রামায়ণ মহাকাব্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুবার ও মহাভারতে একবার এই উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে পুরাণ সাহিত্যেও এর সন্ধান মেলে। বিভিন্ন মনীষী এই উপাখ্যানের তাৎপর্যকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

বর্তমান অধ্যায়ে উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত এই ধরনের উপাখ্যানগুলির যথাসম্ভব উৎস, মহাকাব্যে উপস্থাপনার ক্ষেত্র, বিন্যাস, প্রকৃতিগত পার্থক্য, উপযোগিতা, পরবর্তী পুরাণসাহিত্যে সেগুলির উপস্থিতি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে উভয় মহাকাব্যের পৌর্বাপর্য বিষয়ক গ্রন্থভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মহাকাব্যদ্বয়ের পৌর্বাপর্য নিয়ে বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ বর্তমান। কোনো পণ্ডিত সম্প্রদায় রামায়ণকে মহাভারতের তুলনায় প্রাচীন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার কোনো পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত মহাভারতই প্রাচীনকালের, রামায়ণ তার পরবর্তীকালের রচনা। উভয় সিদ্ধান্তের সপক্ষেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ একাধিক যুক্তি নিয়ে গঠিত হয়েছে। কিন্তু উভয় সিদ্ধান্তের সপক্ষে সর্বদা গ্রন্থভিত্তিক দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হয়েছে তা বলা যায় না। কখনো কোনো পক্ষ আধার গ্রন্থদ্বয় থেকে আপন সিদ্ধান্তের সপক্ষে দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা করলেও সর্বথা তা পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না।

এই অধ্যায়ের আলোচনায় প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত উভয় গ্রন্থ থেকে আহরণ করে মহাকাব্যদ্বয়ের পৌর্বাপর্য বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ মতবাদ পরিস্ফুট করা হয়েছে। মহাভারতের প্রায় সর্কল পর্বেই রামায়ণের কথা-পুরুষ অথবা যুদ্ধের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের মূল কাহিনীও সংক্ষিপ্তাকারে একাধিক বার মহাভারতে স্থান পেয়েছে। আবার রামায়ণেও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বাসুদেব শব্দ, জনমেজয়ের কথা, বুদ্ধের নাম প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, যেগুলির দ্বারা কোনো কোনো পণ্ডিত রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা অর্বাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেন।

এখানে এইসকল আপাত-বিরুদ্ধ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। কোনো সিদ্ধান্তই কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয়ে গৃহীত হয়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মহাকাব্যদ্বয়ে উপলব্ধ সমাজ-জীবনের পারস্পরিক তুলনা। উভয় মহাকাব্যের সভ্যতাই বেদানুসারী। তবে যুগের ব্যবধান হেতু উভয় মহাকাব্যের সামাজিক আচার-আচরণ রীতি-নীতিতে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে কোনো ছোটখাটো পরিবর্তন তার স্বরূপকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। যখন কোনো জাতি তার আপন সংস্কৃতির প্রবাহে প্রবহমান থাকে তখন সময়ের ব্যবধানে কখনো সেই জাতির সংস্কৃতি ও বিশ্বাসে বাইরের কোনো রীতি-নীতি ও বিশ্বাস সম্পৃক্ত হয় আবার নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভাবনের মাধ্যমেও কিছু পরিবর্তন ঘটে।

মহাভারতকার তৎকালীন সমাজ-জীবন সম্বন্ধে ছিলেন অতিশয় সচেতন। সে যুগের এমন কোনো সামাজিক রীতি-নীতি নেই যা মহাভারতের পরিধির মধ্যে আসে নি। পক্ষান্তরে রামায়ণে তৎকালীন যুগের সামাজিক রীতি-নীতি মহাভারতের ন্যায় সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত না হলেও মূল কথাবস্তুর ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের সাক্ষাৎ মেলে। উভয় সমাজই

ছিল বর্ণাশ্রমধর্মের পরিপোষক। তবে রামায়ণের সমাজ যেভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়মানুসারে চালিত হত মহাভারতের সমাজ ঠিক ততখানি তা মেনে চলেনি। বেদে সত্যকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে রামায়ণেও তা উজ্জ্বল। কিন্তু মহাভারতে তা বিকৃত হয়েছে। রামায়ণে সত্য ছাড়া কিছু নেই কিন্তু মহাভারতে সত্য কখনো পালনীয় কখনো তা পালনীয় নয়। কিন্তু কখনো আদর্শ কখনো বা রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয়ের মধ্যে সাম্যই পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় সমাজ-জীবনে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত আচার-আচরণ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী মহাকাব্যদুটি তার উজ্জ্বল সাক্ষী। ভারতীয় জীবনের মূল তত্ত্বগুলি উভয় মহাকাব্যে অবিকৃত। উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত সমাজ-জীবনের বিভিন্ন রীতি-নীতি আচার-আচরণ এবং ধর্মবিশ্বাসের সাম্যের দিকটি এখানে আলোচিত হয়েছে। যেমন— উভয় মহাকাব্যে বিবাহ, বর্ণাশ্রম, চতুরাশ্রম, নারী, রাজ্যাধিকার, রাজধর্ম, শিক্ষাপদ্ধতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আহার-আহার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্পর্কে উভয় মহাকাব্যে যে-সকল বর্ণনা মেলে এই অধ্যায়ে সেগুলির একটি সাম্যমূলক আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বাসের দিক থেকে উভয় মহাকাব্যের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তাও বিশ্লেষিত হয়েছে।

গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়ের বিষয় ভারতীয় জন-জীবনে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব। অধ্যায়টি চারটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে ভারতীয় সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতে উভয় মহাকাব্যের প্রভাব দেখানো হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতারই ধারক ও বাহক। মহাকাব্যদুটিতে চিত্রিত ভারতীয় সভ্যতাও তার ব্যতিক্রম নয়। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের লেখনীতে তাই স্বাভাবিক ভাবেই বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, ঋষি, নৃপতির বর্ণাঢ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। রামায়ণে হনুমান পবন-পুত্ররূপে পরিচিত। মহাভারতে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি বৈদিক দেবতার ঔরসে জাত পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ সন্তান বলে প্রসিদ্ধ। মহাকাব্যযুগের পরবর্তী পুরাণসাহিত্যে কোথাও উভয় মহাকাব্যের প্রত্যক্ষ আখ্যান, কোথাও কথা-পুরুষের কীর্তি আবার কোথাও গ্রন্থোক্ত উপাখ্যান সম্পৃক্ত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিভাগেই মহাকাব্যের প্রভাব অপরিসীম। শুধু তাই নয়, উভয় মহাগ্রন্থের প্রভাব বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের আঙিনা পেরিয়ে অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার কবিমানসে। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের কবিই উভয় মহাকাব্যের অমৃত-কথা বিতরণে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, কানাড়া,

গুজরাটী, মারাঠী, তেলুগু, মালয়ালম, অসমীয়া, মৈথিলী, পাঞ্জাবী, নেপালী প্রভৃতি ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষাতেই রাম-কথা ও ভারত-কথার অবাধ সঞ্চরণ। এইসকল ভাষার কবিকীর্তিতে কোথাও মহাকাব্যদ্বয়ের আখ্যান বা উপাখ্যান সরাসরি কবির বর্ণনা-মাধুর্যে আরও সুন্দর হয়েছে, কোথাও আবার কবিপ্রতিভার দীপ্তিতে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে পাঠকের মানসলোকে নতুন স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি করেছে।

মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কথকরা। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের নানা অঞ্চলের মানুষ কথকদের কাছে নানা প্রাচীন উপাখ্যান শুনে আনন্দ পেয়ে আসছে। কথকদের পরিবেশন বৈচিত্র্যের জাদুস্পর্শে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রাচীন আখ্যান-উপাখ্যানের রসাস্বাদন করে আসছে। এইসকল কথকদের কথকতায় রাম-কথা ও ভারত-কথা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। উভয় মহাকাব্যের মানবিক আবেদনে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আপ্লুত। পুতুল নাচ, শিল্পকলা প্রভৃতিতে মহাকাব্যদ্বয়ের অবাধ গতি। অধ্যায়ের এই স্তরে যথাসম্ভব উদাহরণ যোগে ভারতীয় সাহিত্য, লোকাচার ও শিল্পকলায় মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাব দেখানো হয়েছে।

অধ্যায়ের দ্বিতীয় স্তরে নৈষ্ঠিক হিন্দুর প্রাত্যহিক ও আভ্যুদায়িক অনুষ্ঠানে উভয় মহাকাব্যের প্রভাব দেখানো হয়েছে। ভারতীয় হিন্দুর প্রায় সকল অনুষ্ঠানই বেদানুসৃত। বেশিরভাগ মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুরাণ ও মহাকাব্যের অগণিত আখ্যান ও উপাখ্যানকে সজীব রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নৈষ্ঠিক হিন্দুর জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রত্যেক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানই মহাকাব্যদ্বয়ের আখ্যান-উপাখ্যান, শ্লোক, শ্লোকাংশের ব্যবহারগুলি সপ্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে এই অংশে।

অধ্যায়ের তৃতীয় স্তরে আলোচিত হয়েছে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে রামায়ণ মহাভারতের কিছু শিক্ষা। রামায়ণে প্রধানত দশরথের পরিবারকে কেন্দ্র করে হিন্দু-গার্হস্থ্যের কথা আর মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদের রাজ্যাধিকারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজ-জীবনের নানা শুভ ও অশুভ আদর্শের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। উভয় মহাকাব্যের বিভিন্ন স্থানে কথা-পুরুষদের মুখে কথিত হয়েছে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অভিজ্ঞতালব্ধ একাধিক বাক্য। এই অংশে উভয় মহাকাব্য থেকে এরূপ কিছু বাক্য চয়ন করে দেখানো হয়েছে সমাজবদ্ধ মানবেতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক।

অধ্যায়ের চতুর্থস্তরে বা অন্তিম অংশে স্থান পেয়েছে ভারতীয় জন-জীবনে

মহাকাব্যদ্বয়ের কিছু আদর্শ কথা-পুরুষের চারিত্রিক প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। ভারতবাসী উভয় মহাকাব্যের আখ্যান ও উপাখ্যানের দ্বারা যেমন যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত হয়ে আসছে তেমনি মহাকাব্যদ্বয়ের কিছু চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেছে। রামায়ণের রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, হনুমান এবং মহাভারতের ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্রের আদর্শ ও শুভকীর্তি ভারতবাসীর নিকট উদাহরণস্বরূপ হয়ে আছে। এখানে এই সত্যেরই উল্লেখ করা হয়েছে ঐ সকল আদর্শ চরিত্রের মুখ্যগুণগুলি অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

বর্তমান গ্রন্থ রচনায় গোরখপুরের গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত মূল রামায়ণ এবং রামনারায়ণ দত্ত শাস্ত্রী-কৃত হিন্দী অনুবাদসহ মহাভারত ও কালীপ্রসন্ন সিংহ - কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, বিশ্ববাণী প্রকাশিত মহাভারত এবং আর্যশাস্ত্র প্রকাশিত মূল রামায়ণ ও তার অনুবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে প্রয়োজনবোধে উভয় গ্রন্থেরই পুণা এবং বরোদা থেকে প্রকাশিত সামীক্ষিক সংস্করণ (critical edition) ব্যবহৃত হয়েছে।

আমার পরম সৌভাগ্য যে বর্তমান ভারতবর্ষের অন্যতম পণ্ডিত ও জ্ঞানপিপাসু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রী অনন্তলাল ঠাকুর মহাশয়ের পাদমূলে বসে এই গবেষণা-গ্রন্থ সমাপ্ত করতে পেরেছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনিই আমাকে এ বিষয়ে গবেষণায় ব্রতী হতে উৎসাহ দেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণী থেকেই এই জ্ঞানতপস্বীর সাহচর্য ও নিরন্তর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় আমি গ্রন্থ না পড়েই মহাকাব্যদ্বয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই এবং এম.এ. পরীক্ষা সমাপ্ত করেই তাঁর পরামর্শমতো উভয় মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনার জন্য অধ্যয়ন আরম্ভ করি। বর্তমান গ্রন্থটি সেই পরিকল্পনারই বাস্তব রূপায়ণ। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটিয়ে আমাকে আরও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ঈশ্বরের নিকট তাঁর আনন্দোজ্জ্বল সুদীর্ঘ পরমায়ু কামনা করি।

বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে তাঁর স্বাভাবিক উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয় প্রস্তুত গ্রন্থ সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর রচনাটি নিঃসন্দেহে গ্রন্থ গৌরব ঘটিয়েছে। সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ও আমার আচার্য অধ্যাপক ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ববিধ উৎসাহ ও সহায়তাদানে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধিতে এই আচার্যদ্বয়ের ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের নীরোগ

দেহ ও দীর্ঘ আয়ু কামনা করি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. গোপালনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ও ড. বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রথম থেকেই বিভিন্ন মূল্যবান বই ও বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ ও উপদেশ পেয়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। উভয়ের সহায়তার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক ও আমার পরম শুভানুধ্যায়ী বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপক ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় গ্রন্থের 'কথামুখ' রচনা করে গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঈশ্বরের নিকট তাঁর সর্ববিধ কল্যাণ কামনা করি।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত পণ্ডিত সুখময় সপ্তৃতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। যখনই তাঁর কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তখনই সযত্নে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে নানা দুর্লভ প্রবন্ধ ও পুস্তকের সন্ধান তাঁর কাছে পেয়েছি। তাঁর এই স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তার কথাও ভোলার নয়।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গেও বর্তমান গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ ঘটেছে। তাঁর সদাশয়তাও এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্-কালে স্বর্গত অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বার বার মনে পড়ছে। আমার সমগ্র গ্রন্থেব পাণ্ডুলিপি অতি সযত্নে পড়ে লিখিতভাবে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নির্দেশগুলি আমি পালন করি এবং গ্রন্থ মধ্যে সংযোজন করি। সেই পুণ্যাত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করি স্বনামধন্যা অধ্যাপিকা সুলেখিকা গৌরী ধর্মপাল মহাশয়াকে যিনি বয়সের ক্লেশ সহ্য করে আমার পাণ্ডুলিপিটি পড়ে একটি অতি মূল্যবান সারগর্ভ বক্তব্য 'প্রাগভাষ' লিখে উপকার করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন ও প্রসিদ্ধ আয়ুর্বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন সময়ে উভয় গ্রন্থের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে আমাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সাহায্যও এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

গবেষণার কাজে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, গোলপার্ক

ইন্‌স্টিটিউট্‌ অব কালচারের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, বর্ধমান অরবিন্দ ভবন ও রামকৃষ্ণ আশ্রমের গ্রন্থাগার থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে কর্মরত শ্রী মদন মণ্ডল ও শ্রী দেবদাস চৌধুরী মহাশয়ের সদাজাগ্রত সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহযোগিতায় যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। উপরোক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ও কর্মীবৃন্দের মঙ্গল কামনা করি।

গ্রন্থটির লিপি সংস্থাপন করেছেন শ্রীমতী ললিতা সিন্‌হা এবং আনন্দ পাবলিশার্স-এর সঙ্গে যুক্ত শ্রদ্ধেয় শ্রী সুবিমল লাহিড়ি মহাশয় গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। উভয়ের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের অভ্যুদয় প্রার্থনা করি। অল্প সময়ে নির্দেশিকা তৈরিতে আমি সাহায্য পেয়েছি বন্ধুবর শ্রীমান গোলক মহাপাত্রের (এম.এ.বি.লিব্‌) নিকট, তাঁর সহযোগিতাও ভোলার নয়।

এছাড়া আমি বিশেষভাবে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার অনুজপ্রতিম ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে যাঁর হার্দিক প্রচেষ্টায় আমার এই গ্রন্থ বিদ্বৎজনের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর এর সঙ্গে আমি যাঁর কথা না বললে অনেক কিছুই অনুক্ত থেকে যায় তিনি হলেন সহৃদয় ও বিদ্যানুরাগী সংস্কৃত বুক ডিপোর কর্ণধার অভয়বর্মন মহাশয় যিনি গ্রন্থটি প্রকাশের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় চিন্তামুক্ত করেছেন। তাঁর মহানুভবতা প্রশংসার্হ।

এখন নিবেদন এই যে, রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে কাজ করার জন্য শ্লোকের সংখ্যা নির্দেশের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং প্রুফ দেখায় যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠক আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি গ্রন্থটিকে শোভনতর করে তুলতে সুধীজনের মতামত সাদরে গ্রহণীয়। পরিশেষে সবিনয় নিবেদন এই যে, গ্রন্থটি পাঠ করে যদি ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক-গবেষিকা ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকা সামান্যতমও উপকৃত হন তবেই আমার সামান্য পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করতে পারি।

ভূমিকা

রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাগ্রন্থই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের আকর রূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এমন একখানিও গ্রন্থ নাই যাহাকে মহত্ত্ব, গুরুত্ব ও বিশালতার বিচারে ইহাদের সঙ্গে একাসনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। রামায়ণ আদিকবি বাল্মীকি ও মহাভারত মহর্ষি বেদব্যাসের রচিত বলিয়া ভারতবাসী চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যেও উভয় মহাকবির নাম গ্রন্থকর্তা রূপে স্ব স্ব রচনায় উল্লিখিত হইয়াছে।[১]

তবে বাল্মীকি ও ব্যাস উভয়েই সংকলক। তাঁহারা উভয়েই ব্যাস। বিষ্ণুপুরাণ বাল্মীকিকেও ব্যাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাসের ধারণা যখন জন্মলাভ করে তখন বেদই ছিল। বেদের সংকলন করিয়াছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তিনিই আদি ব্যাস। বিষ্ণুপুরাণে ঊনত্রিশজন ব্যাসের কথা বলা হইয়াছে। ব্যাসের কাজ জাতীয় জীবনে যাহা কিছু শুভকর বা মূল্যবান সেইগুলিকে সংকলন করিয়া সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। রামায়ণের ব্যাস বা সংকলক বাল্মীকি ভারতবর্ষের যাহা কিছু মহনীয়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত, খণ্ড খণ্ড ইতিহাস, লোক-গাথা, যেগুলি প্রাচীন সমাজজীবনের মৌখিক ঐতিহ্যের প্রবহমান সম্পদ তাহা অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহপূর্বক শ্লোকবদ্ধ রূপে মানুষের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ছন্দবদ্ধ সুললিত লৌকিক শ্লোক প্রথম তাঁহারই প্রতিভা-প্রসূত। ক্রৌঞ্চীর বিরহ-যন্ত্রণা যাহার প্রধান উৎস। তাঁহারই লেখনী-মুখে লৌকিকছন্দ প্রথম আত্ম-প্রকাশ করিয়া করুণ রসাত্মক রামায়ণকাব্য গড়িয়া ওঠে। তাই একাধারে বাল্মীকি যেমন আদিকবি তেমনি তাঁহার রামায়ণকাব্য মানুষের আদিকাব্য। তিনি দেবতাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া মানুষকে দেবতার কক্ষে উন্নীত করিয়াছেন। বৈদিক যুগে দেবতার মহত্ত্ব বর্ণনা করিবার যে রীতি-নীতির প্রচলন ছিল বাল্মীকি তাহার পরিবর্তন ঘটাইয়া তাঁহার কাব্যে মানুষের জয়গান গাহিয়াছেন।

তাই কেবলমাত্র এক বা কয়েকটি গুণ নহে মর্যাদা-পুরুষের যাবতীয় গুণে গুণান্বিত সকল মানবিক ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত মানুষকেই তাঁহার রামায়ণ কাব্যের নায়ক করিতে চাহিয়াছেন।[২] দেবর্ষি নারদ আদিকবি বাল্মীকিকে এবম্বিধ মানুষেরই সন্ধান দিয়াছেন।

"নারদ কহিলা ধীরে, অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

---

১. আদিকাব্যমিদং ত্বার্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ রামা. ৭।১১।১৬

২. এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্॥ ১।১।৫

রামায়ণকার বাল্মীকি নারদ নির্দিষ্ট দশরথ-পুত্র রামের জীবন গাথাই রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত এই রাম-কথার অঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন, আদর্শ, ন্যায়-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি যুক্ত হইয়াছে। সেইজন্য অযোধ্যার রাজপরিবারের কাহিনী তাহার নিজস্ব সীমা অতিক্রম করিয়া তৎকালীন ভারতবাসীর জীবন-চর্চার অনেক বিষয়ই আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার রামায়ণ মহাকাব্য রাজবাড়ির পারিবারিক গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত মহাকাব্যের সংকলক। সংকলন গ্রন্থ বলিয়া ইহা সংহিতা নামে পরিচিত। 'শতসাহস্রি সংহিতায়াং'। ভারতযুদ্ধের পল্লবিত রূপই শত সাহস্রি সংহিতা। চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত 'জয়' নামক ভারত ইতিহাস। মহাভারত নামক মহাগ্রন্থের আদি বা প্রাচীন রূপ। এই জয় নামক মহাভারতকে পঞ্চম বেদও বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালে বৈশম্পায়ণ ও উগ্রশ্রবা সৌতির মুখে উহা পল্লবিত হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই বেদব্যাস-সম্মত। বেদব্যাস একটি সম্প্রদায়ের নাম এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই এই সম্প্রদায়ের প্রধান।

মহর্ষি বেদব্যাস শান্তি ও অনুশাসন পর্ব পিতামহ ভীষ্মের মাধ্যমে সংকলন করাইয়াছেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় মানবজীবনে উদ্ভূত প্রায় সকল প্রশ্নই আসিয়াছে। পিতামহ ভীষ্ম অতি যত্নসহকারে উদাহরণ সহযোগে সকল প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অজস্র প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরের মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে। যেরূপ বিষয় যেমনভাবে উপস্থাপিত করিলে মানুষের গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয় মহাভারতের সংকলক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সুচারুরূপে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। তাই যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের নিকট মহাভারতের গ্রহণযোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই মহাগ্রন্থের জনপ্রিয়তার কোন ঘাটতি আধুনিক যুগেও পরিলক্ষিত হয় না। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জীবনে নহে দীর্ঘকালব্যাপী ভারতবর্ষের সকল ভাষার কবি-চিত্তে এই মহাকাব্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং তাঁহাদের কাব্য রচনার আদর্শস্থানীয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কখনও কখনও কোন কোন কবির কাব্য রচনার মুখ্য উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে. মহাভারতের ন্যায় রামায়ণ মহাকাব্য সম্পর্কেও এই কথাই সমভাবে প্রযোজ্য।

রামায়ণ মহাভারত এক কথায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শব্দময় দর্পণ স্বরূপ। যাহাদের উপর চক্ষু সংযোগ করিলেই সম-কালীন ভারতবর্ষের সমাজ-চিত্রটি প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়। উভয় সংকলনাত্মক রচনায় কর্ণারোপ করিলে ভারতবর্ষের আদর্শ-বাণী অনুরণিত হইতে শোনা যায়।

মহাভারতের বর্ণনায় যাহা সংযুক্ত হয় নাই খিল হরিবংশে তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। খিল শব্দের অর্থ পরিশিষ্ট। তাই হরিবংশকে মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয়। মহাভারতে 'সপ্তজন্মেষু কীর্ত্তিত'—বলা হইয়াছে। কিন্তু 'সপ্তজন্ম' যে কি তাহা মূল মহাভারতে উল্লিখিত হয় নাই। হরিবংশ পুরাণে উক্ত সপ্তজন্মের কথা বলা হইয়াছে। পিতৃকল্পের কথাও মহাভারতে সম্পৃক্ত হয় নাই। হরিবংশে তাহা পরিলক্ষিত হয়। হরিবংশ যেমন মূল মহাভারতের পরিশিষ্ট তেমনি অন্যান্য পুরাণগুলিকেও মহাভারতের পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

অনুরূপভাবে উত্তরকাণ্ডটিকে রামায়ণের পরিশিষ্টরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই মহাকাব্যের প্রথম হইতে ষষ্ঠ কাণ্ডে এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলির বিস্তৃততর ব্যাখ্যা মেলে উত্তরকাণ্ডে। যেমন, যুদ্ধের পর রাম সীতাকে অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন রাণীর মর্যাদাও দান করিলেন। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে সীতার রাক্ষসগৃহযাপনে শুচিতার প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহাকে বনবাসে পাঠানো হইয়াছে। আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

রামায়ণের অসংখ্য প্রভাব মহাভারতের বিভিন্ন অংশে পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্ন লবণাসুরের সহিত সম্মুখ-সমরে দণ্ডায়মান হইলে, লবণাসুর আপন শক্তি জাহির করিয়া শত্রুঘ্নকে বলিয়াছে যে, সে অতীতে অনেক বীরকেই তৃণের মতো তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে।

শত্রুঘ্ন লবণাসুরের দাম্ভিকতার উত্তরে বলিয়াছেন, যখন তুমি বীরদের পরাজিত করিয়াছিলে, তখন শত্রুঘ্নের জন্ম হয় নাই। এখন তুমি আমার বাণে যমালয়ে গমন করিবে।

শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদান্যে নির্জিতাস্ত্বয়া।
তদদ্য বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং যমসদনম্॥ ৭।৬৯।৪

মহাভারতেও আমরা প্রায় এই বাক্যই প্রতিধ্বনিত হইতে শুনি পিতামহ ভীষ্মের কণ্ঠে। ভীষ্মের অস্ত্রগুরু পরশুরাম যখন একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিবার জন্য গর্ববোধ করিয়াছেন তখন পিতাময় ভীষ্ম আপন শৌর্য বীর্যের গর্ব করিয়া গুরু পরশুরামের উদ্দ্যেশ্য বলিয়াছেন, 'আপনি যখন পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন তখন ভীষ্মের জন্ম হয় নাই।'

ন তদা জাতবান্ ভীষ্ম ক্ষত্রিয়ো বাপি মদ্বিধঃ।
পশ্চাজ্জাতানি তেজাংসি তৃণেষু জ্বলিতং ত্বয়া॥ ৫।১৭।৬৩

রামায়ণে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাজধানী অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনে

গমন করিলেন। রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার জন্য আদেশ দান করিলে ভরত তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছেন—রামই দশরথের ন্যায় রাজ্যাভিষিক্ত হইবার যোগ্য। আমি যদি অসাধু ব্যক্তিবর্গের মত কীর্তি ও স্বর্গলাভের বিরোধী রাজ্য গ্রহণ রূপ পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে প্রজাগণের নিকট ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক বলিয়া গণ্য হইব।

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্য্যাং পাপমহং যদি।
ইক্ষ্বাকূকুলামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ॥ ২।৮২।১৪

মহাভারতেও ভীষ্মপর্বান্তর্গত গীতাতে আমরা দেখি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে অর্জুন যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে সাশ্রু নেত্রে স্বীয় হৃদয়দৌর্বল্য সারথি কৃষ্ণের নিকট প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—হে অর্জুন, এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তোমার এইরূপ মোহ কোথা হইতে আসিল? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গরা কদাপি এইরূপ আচরণ করেন না। তোমার এই রূপ মোহদ্বারা স্বর্গ বা কীর্তি কোনটিই লাভ করা সম্ভব নয়।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যকীর্তিকরমর্জুন॥ ২।২

সাধারণ জনজীবন অসাধু বা দস্যুপ্রবৃত্তির দ্বারা বিপন্ন হইলে সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্ট দমনের নিমিত্ত ভগবানের মনুষ্যদেহে ধরাতলে অবতরণের কথা দুই মহাকাব্যেই দৃষ্ট হয়। রামায়ণে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বিভিন্ন রাক্ষসগণের শৌর্য, বীর্য, জন্ম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে রামের নিকট বলিয়াছেন—আপনি প্রজাগণের সৃষ্টি কর্তা এবং শরণাগতের প্রতি প্রসন্ন, যখন ধর্মের হানি সাধনের জন্য দস্যুগণ উৎপন্ন হয়, তখন তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আপনারও পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে।

নষ্ট ধর্ম ব্যবস্থানাং কালে কালে প্রজাকরঃ।
উৎপদ্যতে দস্যুবধে শরণাগতবৎসলঃ॥ ৭।৮।১৪

মহাভারতে এই ভাবই সামান্য ভাষান্তরে কয়েকবার বিভিন্ন পর্বে দৃষ্ট হয়। গীতায় ভগবান স্বয়ং অর্জুনের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—যখনই ধর্মের হানি ও অধর্মের আধিক্য ঘটে তখনই আমি দেহধারণ করিয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৭-৮

অন্যত্র— যদা ধর্মোগ্লাতি বংশে সুরাণাং

তদা কৃষ্ণো জায়তে মানুষেষু। ১৩।১৫৮।১২ কখ

ইদং মে মানুষং জন্ম কৃতমাত্মানি মায়য়া।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় দুষ্টানাং নাশনায় চ॥*

আবার ভীষ্মপর্বে দেখা যায়

ধর্মসংস্থাপনার্থায় দৈত্যানাং চ বধায় চ।

জগতো ধারণার্থায় বিজ্ঞাপ্যং কুরু মে বিভো। ৬৫।৬৮

একাধিক উপাখ্যান সমান্তরালভাবে উভয় মহাকাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—সাবিত্রী সত্যবানের কথা, দ্রুমৎসেনের কথা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। রাম-কাহিনীর কথা পুরুষ ও যুদ্ধ নানা প্রসঙ্গে মহাভারতে বারে বারে আসিয়াছে। এইভাবে রামায়ণের বিবিধ বিষয় মহাভারতের মর্মে মর্মে গ্রথিত হইয়া আছে।

রামায়ণের সমাজের মানুষ আদর্শকে পরিত্যাগ করে নাই পক্ষান্তরে মহাভারতের সমাজের মানুষের জীবন-চর্চায় অনেক আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে। মহাভারতে যেমন ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাধান্য রামায়ণে তেমন কাব্য ও মনোরঞ্জনের প্রাধান্য বেশি। তবে মহাভারতের ক্রমবিবর্তনে রামায়ণের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিষ্ণুর উপর রামায়ণ মহাভারতের নির্ভরতা সমান। বাল্মীকি যেমন তাঁর কাব্যে মানুষের মহত্ত্ব কীর্তন করিয়াছেন, মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস সেই মানুষকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থে শ্রীমান বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের যে গভীর সম্পর্ক তাহা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করিয়াছেন। এই দুই আর্ষ মহাকাব্যের পৃথক পৃথক আলোচনা অনেকে করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের উপর রামায়ণের প্রভাবকে মুখ্য করিয়া এরূপ তুলনামূলক আলোচনা অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তরুণ গবেষক শ্রীমান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাভারতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উদাহরণ মুখে উদ্ধৃত রামায়ণের কথা পুরুষ ও যুদ্ধ, উভয় মহাকাব্যে উপলব্ধ উপাখ্যান সাম্য, মহাভারতে বর্ণিত রামোপাখ্যানের সহিত রামায়ণের তুলনা, গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত উপাদানের ভিত্তিতে উভয় গ্রন্থের পৌর্বাপর্য বিচার, মূল গ্রন্থদ্বয়ে চিত্রিত সমাজজীবন এবং মহাকাব্য-যুগের পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্য ও সমাজে উভয় গ্রন্থের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় ক্রমান্বয়ে সাতটি অধ্যায়ে আলোচনা

---

* মহাভারত, গীতা প্রেস, বিক্রমাব্দ ২০১৫ চতুর্থ খণ্ড, আশ্ব. পৃ. ৩৬৪, কলাম ২, পংক্তি, ৫-৬

করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন রামায়ণ ও মহাভারত শুধুমাত্র একে অপরের পরিপূরকই নহে উভয়ের সম্পর্কও গভীর। রামায়ণ মহাভারতের মত দুটি বিশাল গ্রন্থ হইতে দীর্ঘদিন ধরিয়া উপাদান সংগ্রহ ও তাহার যথাযথ উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে শ্রীমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ ও সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

বিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে শ্রীমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার সম্পর্ক ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে আমি ছাত্ররূপে পাই। যতদিন অতিবাহিত হইয়াছে ততই তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক গভীর হইয়াছে। অদ্যাবধি সেই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রীমান শুধুমাত্র আমার ছাত্রই নহে পুত্রতুল্য। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল বিদ্যানুরাগী শ্রীমানের রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা যেমন দিনে দিনে বর্ধিত হইয়াছে রামায়ণ মহাভারত চর্চায় তাঁহার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তাঁহার এই গবেষণা গ্রন্থ পাঠ করিয়া ছাত্র, গবেষক, সাধারণ পাঠক সকলেই উপকৃত হইবেন আশা করি।

আমার বিশ্বাস গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে রামায়ণ ও মহাভারতের মত বিশাল সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। আশা করি ধীরে ধীরে তিনি উভয় গ্রন্থের দুর্লভ রত্নরাজি উদ্ধার করিয়া সাধারণ মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিবেন এবং আপন জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবেন।

বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দিনে দিনে তাঁহার প্রজ্ঞা ও উৎসাহ বর্ধিত করুন এই প্রার্থনা।

শ্রীঅনন্তমোহন ঠাকুর

কথামুখ

এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিবিভাগের বিশিষ্ট গবেষক ড. বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত' গ্রন্থটির আভ্যন্তর গুরুত্ব "তুলনামূলক" শব্দটিতে বিধৃত। রামায়ণ ও মহাভারতের সর্বাত্মক আলোচনা করা হয়নি, কারণ এটা ধরে নেওয়া হয় যে, এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। সেই রাজবাড়ি, সেই চক্রান্তমূলক রাজনীতি, সেই যুদ্ধবিগ্রহ, লোকক্ষয়, সেই নৈতিক উপদেশনা এবং সেই একই রকমের বিয়োগান্ত পরিণতি। অতএব বলা যায় যে, ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে এই রকম তুলনামূলক আলোচনা নিতান্তই সহজ ছিল না। কিন্তু পরিশ্রম করে গ্রন্থটি তিনি লিখেছেন এবং আমার মনে হয়েছে যে, তিনি প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। যেখানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিভিন্ন, চরিত্রসমূহের কর্ম ও বোধবুদ্ধি বিভিন্ন, এমন কী লোকক্ষয়কর যুদ্ধের প্রেক্ষিত ও প্রকৃতি বিভিন্ন, যেখানে উভয় মহাকাব্যের তুলনামূলক বিচার স্বাভাবিক অর্থেই যথার্থ। তবে, এই দুই মহাকাব্যেই একটি কথা বারবার বলা হয়েছে তা হ'ল এই যে, সভ্যতা চাই, শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা চাই, কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষদের অভ্যুদয় চাই, প্রগতি চাই। এই একটি কথার জন্যই রামায়ণ ও মহাভারত অমর; এই একটি বার্তাই ভারতের মানুষদের সর্বকালে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যুগিয়েছে। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থে বিষয়টি পরিস্ফুট। আমার বিশ্বাস, সুরচিত এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে।

রমাকান্ত চক্রবর্তী

An Appreciation

I have carefully gone through the thesis 'Tulanāmūlak ālocanāy Rāmāyaṇa O' Mahābhārata' (তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত) approved by the University of Burdwan for award of Ph. D degree to its author Sri Bibekananda Bandyopadhyaya. Though both the Rāmāyaṇa and the Mahābhārata are regarded as specimens of the 'Epic', the two widely differ among themselves in points of projection of ideals treatment of themes, areas of execution as also in points of characterization and unfolding of incidents. it is a fact that the two Epics have continued to supply themes to later literary artists for their own creations and have continued to enrich the stream of Indian Culture for years together. As a matter of fact Indian Culture has been continuing to draw its perennial inspiration from the Upanishads. the Rāmāyaṇa and the Mahābhārata.

It is therefore necessary to have a comparative estimate of these two Epics not in traditional manner but by applying the methodology of modern scientific research to all their components. so that the incidents occurring in the two can be identified. the influence of one on the other can be located and identical verses occurring in the two or identical thoughts expressed through different media can be brought to light for guidance of posterity. It is refreshing that the thesis under consideration, has been able to do this significant task of locating identical stanzas and stories appearing in the two Epics as also in showing how a separate treatment has been given to the same incident in the two epics according to different of ideals and techniques It has also attained spectacular success in making a comparative statement of the social structures prevalent in the ages of the Rāmāyaṇa and the Mahābhārata and in showing the influence exerted by the two Epics on the

daily life of the people in contemporary society. These two Epics, as a matter of fact, constitute significant forces for effecting national integration, in as much as, the two have influenced not only the bards and singers, literary artists and story-tellers in all parts of the country, but have been able to retain their prestigious position as well in the society.

The work is the first of its kind to apply a new methodology to the task of analysing the two Epics, as a result of which the findings are quite new and of sufficiently high order. The author's command over Bengali idioms and expressions is commendable. I do not find any deficiency in the treatment and presentation of the author. One of the most interesting features of the work is that it contains a comparative analysis of the Rāma story contained in the Rāmāyaṇa and that contained in the Mahābhārata with the objective of showing as to which one of the two stories is older than the other. Another notable feature is that it discussess the chronology of the two Epics by adopting both literary and linguistic yardsticks. On the whole the work bears a stamp of originality and proves the author's deep penetration not only into the two Epics, but also into all facts of Indian Civilisation, which has continued to draw nourishment continuously from the Epics.

The book, I am sure, will establish itself as a source book and will inspire future research scholars trying to work on the Epics.

I congratulate the author and welcome his book to the arena of Indian Literary and Cultural studies.

Ramaranjan Mukherji

প্রাগ্‌ভাষ

রামায়ণ ও মহাভারত হল আমাদের আদি আর্ষ অর্থাৎ ঋষি রচিত মহাকাব্য। বেদের পরেই যাদের স্থান। বেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে এরাই আজ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে চলেছে।

রামায়ণ মহাভারতের কাল, ভাষা ও জনচিত্তে তার প্রভাব নির্ণয়ের ব্যাপারটি আমার কাছেও সমান আকর্ষণীয়। প্রাগ্‌বেদ থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের অন্বিষ্ট একই ভাষা, একই সংস্কৃতি। বিভিন্নকালে লেখা হলেও রামায়ণ মহাভারতের পুনর্বিন্যাস হয়েছে সমকালে। রামায়ণ-কথা ভারতবর্ষের প্রাণ। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি ভাষায় বাল্মীকির রামায়ণকে নতুন করে লিখেছেন অসংখ্য কবি। প্রধান কজনের নাম বলছি। সংস্কৃতে কালিদাস, ভবভূতি, ভট্টি; হিন্দীতে তুলসীদাস; বাংলায় কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তিন মানব রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ। তামিলে কম্বন, তেলুগুতে রঙ্গনাথ ভাস্কর, মালয়ালমে, এঝুট্টাচ্চান। পাঞ্জাবে স্বয়ং গুরু গোবিন্দ সিং শতদ্রুর তীরে বসে সর্বজনবোধ্য ভাষায় ও ছন্দে 'রামাবতার' লিখেছিলেন শিখদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

এতদিন ইউরোপ আমাদের উত্তরপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরাই সিদ্ধান্তী ওরাই গুরু, ওরাই মানদণ্ড। এখন হাওয়া ঘুরেছে। এখন প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুই পক্ষেরই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নিতে হবে। Indology নয়, বিনয় সরকারের Neo-Indology, নয়া ভারততত্ত্ব। আমরা শুধু আধ্যাত্মিকতা বিলাসী পারলৌকিক নই, আমরা আভ্যুদয়িকও। শুধুমাত্র মহাজাগতিক নই, জাগতিকও—ঠিক বেদের যুগের মতই।

এই গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক ব্রকিংটনের খণ্ডন ভালো হয়েছে।

বেদের ভাষার নাম ছিল বাক্। বৈদিক ঋষিদের ভাষা হল সেই বাকেরই শ্রেষ্ঠ রূপ 'কৃতবাক্ সমুজ্জ্বল' সংকলন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ রূপ দানা বেঁধেছে যাঁদের মধ্যে তাঁদের প্রথম হলেন অম্ভৃণ-কন্যা বাক্। তাঁর সূক্তই আমাদের বা পৃথিবীর যে কোন দেশের জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি বীর্য, প্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শ থেকে বেদের পরবর্তী যুগ আস্তে আস্তে সরে এসেছে। মহাভারতের যুগেও দময়ন্তী, সাবিত্রী, দ্রৌপদীর মত বরাঙ্গনাদের ক্ষেত্রে নিজে পতি নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। শাস্ত্র একপেশে, তাকে বৈদিক ভাবনায় ভাবাতে হবে।

দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা থেকে রামের হাতে সীতার লাঞ্ছনা কি কম? সংস্কৃত কবিদের মধ্যে একমাত্র ভবভূতিই তা দেখিয়েছেন। তাঁর পথে কজন চলেছে?

দূরদর্শনে মহাভারত দেখার সময় সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ঐ অবসর বিনোদন পর্যন্তই। পঞ্চপাণ্ডব, ভীষ্ম, দ্রোণের ক্লীবত্বে ধিক্কার দিয়ে কজন বীরপুরুষ এগিয়েছেন? খুব কম। কজন মেয়েই বা দুর্জনকে ঠেকাতে সাহস ও অস্ত্রশিক্ষা অর্জন করেছেন? মুষ্টিমেয়। তাঁদের জন্যেই সমাজ এখনো সচল। 'নাথবতী অনাথবতে' শাঁওলী মিত্র দেখিয়েছেন—কিন্তু কজন দেখে? দেখেই বা বোঝে কজন? সত্যিকার সমাজে 'রামায়ণ' অর্থাৎ রামের মত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীতায়নও হবে। শুধু উচ্চাঙ্গের কীর্তনই নয়, শৌর্যে, শস্ত্রে শাস্ত্রে কৌশলে প্রেমে অতুলনীয় সুদর্শনধারী কৃষ্ণের এবং দ্রৌপদীর ও সুভদ্রার অনুচরে দেশ ছেয়ে যাবে।

তর্ক-ঋষি অনন্তলাল ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে গবেষক ড. বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা 'তুলনা-মূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত' সম্পর্কে বলতে পারি, ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জী সহ বিরচিত এই সপ্তাধ্যায়ী আর্ষ মহাকাব্যদ্বয় সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

গৌরী ধর্মপাল

আধার গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয়

বর্তমানে আমরা রামায়ণ মহাভারতকে এপিক্ (Epic) শব্দ দুটি দ্বারা ভূষিত করি। কিন্তু পূর্বে আমাদের দেশে এপিক্ শব্দের প্রচলন ছিল না। অ্যারিস্টটল এটিকে সাহিত্যের একটি বিভাগ বলে অভিহিত করেছেন। একটি প্রতিভাসম্পন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচনা ইহাতে সংকলিত হয়। পরবর্তীকালে কোনো কবি ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। এই নিয়মেই গড়ে উঠেছে ইলিয়াড্ ও ওডিসি। অ্যারিস্টটল ইহাদের নাম দেন এপিক্। পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভের পর এই গ্রন্থদ্বয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ও ফুলে ফলে জাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। সুতরাং হোমারের নামে প্রচলিত এই কাব্যদ্বয়কে অবলম্বন করেই পাশ্চাত্যদেশে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। এই লক্ষণ অনুসারেই রামায়ণ-মহাভারতকে অনেকে 'এপিক্' শব্দ দ্বারা অভিহিত করেছেন। যদিও 'এপিক্' শব্দটি রামায়ণ-মহাভারতকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়।[১]

তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে রামায়ণ-মহাভারতে ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা যুক্ত আছে। বাল্মীকি ও বেদব্যাস-কর্তৃক সেগুলি সংগৃহীতও হয়েছে। তথাপি রামায়ণ ও মহাভারতে গ্রীক গ্রন্থদ্বয়ের উক্ত লক্ষণ কতটা প্রযোজ্য তা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারতের মৌলিক ভেদ থাকলেও উহাদের সামান্য নাম ইতিহাস।[২] ইহাদের আর্যকাব্যও বলা হয়। ইহা ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে স্বীকৃত। উভয় গ্রন্থেই পুরাতন কাহিনী বর্তমান তাই সাধারণ অর্থে উহাদের পুরাণও বলা চলে।[৩] মহাভারতকে মহাভারতেই সংহিতা রূপে বর্ণনা

---

১. 'রামায়ণ মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সম্মত হন না। প্রথমতঃ, এই দুই মহাকাব্য অলংকারশাস্ত্রের নিয়মাবলী উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে! কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব কবা হয়।'—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, "মহাকাব্যেব লক্ষণ"—রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সংগ্রহ পৃঃ ৫১১-২১।

২. পূজয়ংশ্চ পঠংশ্চৈনমিতিহাসং পুরাতনম্। রামা. ৬।১২৮।১১৭ ক.খ.
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ।। ম.ভা. ১।১।৫৪ গ.ঘ.

৩. এবমেতৎ পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ। রামা. ৬।১২৮।১২১ ক.খ.
পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ। ম.ভা ১।১।৮৬ গ.ঘ

করা হয়েছে।[৪] অবশ্য রামায়ণকার রামায়ণকেও সংহিতা নামে অভিহিত করেছেন।[৫]

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃতের প্রচার হওয়ার পরই সর্বত্র রামায়ণ মহাভারতকে স্থূল দৃষ্টিতে 'এপিক্' আখ্যা দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য এই সংজ্ঞা পূর্ণরূপে যুক্তিসহ নহে। তথাপি আধুনিক ব্যবহারের প্রাচুর্যকে অস্বীকার করা যায় না। তাই আমরাও সেই দৃষ্টিতে এই দুই গ্রন্থকে এপিক্ বা মহাকাব্য শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করেছি।[৬]

রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী মহাকাব্যগুলি প্রধানত রামায়ণের অনুসরণে লিখিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় স্বাভাবিকতা অনুপস্থিত।[৭] শুধু তাই নয় সে সকল রচনার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় সার্বত্রিক জাতীয় আদর্শের বিকাশও ঘটে নি। সেগুলির বেশিরভাগই শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্ধনার্থ তথা সমসাময়িক রাজসভার রুচির অনুসরণ পূর্বক কৃত্রিম উপায়ে রচনা করা হয়েছে। এজন্য তাদের 'কোর্ট এপিক্' বলা হয়। আমরা রামায়ণ মহাভারতের জন্য প্রায় সর্বজনব্যবহৃত 'এপিক্' শব্দ গ্রহণ করলেও অ্যারিস্টটল-বর্ণিত 'এপিক' থেকে এই দুই কালোত্তীর্ণ রচনার নানা পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত আছি।

ভারতীয় ধারণা অনুসারে মূল রামায়ণ মহর্ষি বাল্মীকির[৮] এবং মূল মহাভারত মহর্ষি বেদব্যাসের রচনা।[৯] পণ্ডিতেরা বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে দেখিয়েছেন, কালে কালে ঐ মূল গ্রন্থদ্বয়ে নানা জনের রচনা সংযোজিত হয়েছে। রামায়ণে না হলেও মহাভারতে বৈশম্পায়ন এবং সৌতি উগ্রশ্রবার রচনা মিলিত হওয়ার কথা স্বীকৃত হয়েছে। তবে তারা সকলেই মহর্ষি ব্যাসেরই সম্প্রদায়ভুক্ত।

---

৪. সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম॥ম.ভা. ১।১।২১ গ.ঘ.

৫. ভক্ত্যা রামস্য যে চেমাং সংহিতামৃষিণা কৃতম্। রামা. ৬।১২৮।১২৩ ক.খ.

৬. 'রামায়ণ মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেননা ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পাবে।'—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, "মহাকাব্যের লক্ষণ"—রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সংগ্রহ পৃঃ ৫১১-২১।

৭. Imitation in detail of the *Rāmāyaṇa* is frequent and patent, and its language and verse technique deeply affected the whole of the history of the *Kavya* A B Keith, *A History of Sanskrit Literature* p. 45

৮. শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ রামা. ৬।১২৮।১১২ গ.ঘ.

৯. ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভাবতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতম্॥ —ম.ভা ১।৬২।৫২

মহাভারতেই এক শ্লোক, দেড়শো শ্লোক, চব্বিশ হাজার শ্লোক, এক লক্ষ শ্লোক, চৌদ্দ লক্ষ, পনেরো লক্ষ এবং ত্রিশ লক্ষ শ্লোক-সমন্বিত ভারত-কথার বিভিন্ন রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুটি মহাকাব্যই অখণ্ড বৈদিক ধারায় প্রবাহিত দুটি সমাজচিত্র হলেও উভয়ের বিষয়গত তথা রূপগত ভেদ অনস্বীকার্য। কাল আদর্শ ও স্বরূপে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট।

রামায়ণের কবি আদি কবি ও তাঁর কাব্য রামায়ণ আদিকাব্য বলে পরিচিত। সমগ্র ভারতীয়গণের নিকট ইহা সম্পদ-বিশেষ। ভারতবর্ষের ইহা একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ইহার চরিত্র ও উপাখ্যানগুলির সঙ্গে পরিচিত। যুগ যুগ ধরে হিন্দুর কাব্য সাহিত্য ও চিন্তাধারায় রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম। এই মহাকাব্যে রাজা দশরথের পারিবারিক ঘটনা কবির লেখনীমুখে বিন্যস্ত হয়েছে। দশরথপুত্র রামের জীবন বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করেই মূলত ইহা গঠিত হয়েছে। মহাকাব্যের অতিরিক্ত বিষয় ইহাতে তেমন যুক্ত হয়নি বললেই চলে। যদিও মূল ঘটনাকে দৃঢ় করার জন্য স্থানে স্থানে উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে তথাপি কাব্যস্থিত উপাখ্যানগুলি মূল ঘটনা প্রবাহকে ব্যাহত করেনি। কালক্রমে ইহাতে অংশবিশেষ প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয় তবে কণ্ঠতঃ এই সংযোজনের আভাস গ্রন্থমধ্যে স্বীকৃত হয়নি। বর্ণিত ঘটনা একটি পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও ইহা পরবর্তীকালে প্রচলিত লৌকিক মহাকাব্যগুলির আদর্শরূপে মর্যাদা লাভ করেছে। কবি ইহার বিষয়বস্তু পদ্যে রচনা করেছেন তাই প্রয়োজনে ইহাতে নানা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কবির মুখের কথায় পরোক্ষভাবে (Indirect Narration-এ) বিষয়বস্তুর বর্ণনা সর্বত্রই দেখা যায়। বিষয়বস্তু কাণ্ড ও সর্গে বিভক্ত। ভারতবর্ষের মানুষ চিরকাল রামায়ণের কবিকে ত্রেতাযুগের এবং রামের সমসাময়িক বলে বিশ্বাস করে এসেছে। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে রাম একজন আদর্শ রাজা এবং সমগ্র কল্পনীয় গুণের আধার বিশেষ। সীতা রমণীর মহত্তম ধর্ম দাম্পত্য-প্রেম ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি। প্রচলিত গল্প ও প্রবাদ সমূহই তা প্রমাণ করে। এই মহাকাব্যের সভ্যতা সংযম ও আভিজাত্যের আলোকে উজ্জ্বল। এক কথায় ইহার সভ্যতায় আদর্শ প্রধান কালের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। সত্যই ইহার একমাত্র আদর্শ। সত্য এখানে মানুষের জন্য নয় সত্যের জন্যই মানুষ। এই দিক থেকে রামায়ণকে বৈদিক আদর্শবাদের বাহন বলা যেতে পারে। যদিও বৈদিক সভ্যতায় অনুপস্থিত মূর্তিপূজা, মানত প্রভৃতি এই সভ্যতায়

স্থান পেয়েছে। এখানে একটি সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনা-মিশ্রিত পারিবারিক ঘটনা সুচারুরূপে চিত্রিত হলেও প্রায় সকল চরিত্রই ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। ত্যাগের শুভ্র পতাকা উড্ডীন রাখতে প্রত্যেক চরিত্রই কিছু দুঃখ বরণ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য রামায়ণের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'প্রাচীন ভারতবর্ষ সুখ, স্বার্থ এমন-কি ঐশ্বর্যকে পর্যন্ত খর্ব করিয়া মঙ্গলকেই যেভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন আর কোথাও হয় নাই।'[১০]

এই মহাকাব্যে রাম নিজেকে অবতার মনে করেননি তাই তিনি মর্ত্য নায়ক। এখানে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা অনুপস্থিত। ইহার মুখ্য রস করুণ।[১১] পরমপুরুষত্বের কথা রাম স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। তিনি সব সময় নিজেকে মানুষ বলেছেন।

অপরপক্ষে মহাভারতে পাণ্ডব ও কৌরবদের সাংসারিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে যে লোকক্ষয় হয়েছিল সে কাহিনী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের লেখনীতে বিধৃত হলেও সেখানে ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, জীবনচর্চা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই সংকলনাত্মক গ্রন্থটিকে শুধু মহাকাব্য বলা চলে না, ইহা দর্শন পুরাণ ও অধ্যাত্ম-তত্ত্বে পরিপূর্ণ ভারতীয় সমাজদর্পণ।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা যে মননধারা যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময় তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে।'[১২] সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে মহাভারতের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ইতিহাসোপম মহাকাব্যের দ্বারা পরবর্তীকালের সকল কবিই প্রভাবিত হয়েছেন।[১৩] মহাভারতেই এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী দৃষ্ট হয়।[১৪]

১০. ভারতবর্ষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. 'বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচীন সাহিত্য।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ।

১৩. ইতিহাসোত্তমাদস্মাজ্জায়ন্তে কবিবুদ্ধয়ঃ। ম.ভা. ১।২।৩৮৫ ক.খ.

১৪. সর্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি।
পর্জন্য ইব ভূতানামক্ষয়ো ভারতদ্রুমঃ॥ ম.ভা. ১।১।৯২

ইহার উক্তিসমূহ প্রত্যক্ষ মুখে (Direct Narration-এ) অর্থাৎ কবি স্বয়ং বিষয়-সমূহ বর্ণনা না করে গ্রন্থোক্ত পাত্রপাত্রীর মুখে বক্তব্য বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। বক্তার নাম করে অর্জুন উবাচ, ভীষ্ম উবাচ এইরূপ গদ্যে সংযোজিত হয়েছে। অবশ্য গদ্য এবং পদ্য উভয়ই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। সংকলনাত্মক গ্রন্থ বলে বিভিন্ন শাস্ত্রে উপলব্ধ বিষয় মূল আখ্যানকে দৃঢ়ীভূত করার জন্য অথবা লোক-শিক্ষার জন্য উদাহরণ মুখে ইহার মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই অতিরিক্ত বিষয়সমূহ এসে মূল কথাবস্তুকে অধিকাংশ সময় আচ্ছন্ন করে তুলেছে। মহাভারতের উদ্দেশ্য যুগোপযোগী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া। তাই এটি রামায়ণের ন্যায় পারিবারিক ঘটনার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেনি।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই তার ইঙ্গিত রয়েছে।

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥

১।৬২।৫৩

তবে এই গ্রন্থে ধর্ম অর্থ ও কামের প্রচুর বর্ণনা থাকলেও মোক্ষই মূল বিষয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে।[১৫] পাণ্ডব ও কৌরবদের ভ্রাতৃবিরোধ ইহার বর্ণনীয় বিষয় হলেও সর্বত্র লিপ্ত অথচ অলিপ্ত প্রেম-পুরুষ দেবকীনন্দন কৃষ্ণই এর মুখ্য চরিত্র। এই মহাকাব্যের রস শান্ত।[১৬]

১৫. 'মহাভারতের আখ্যানভাগেরও অধিকাংশ যুদ্ধ বর্ণনার দ্বারা অধিকৃত। কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয়। নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্ত সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে পাণ্ডবদের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয় নি। এতে দেখা যায়। জিত সম্পদ্‌কে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ করে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন— এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ।'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর : আরোগ্য

১৬. মহাভারতেঽপি শাস্ত্ররূপে কাব্যচ্ছায়ান্বয়িনি বৃষ্ণিপাণ্ডববিরসাবসানবৈমনস্যদায়িনীং সমাপ্তিমুপনিবধ্নতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাৎপর্যং প্রাধান্যেন স্বপ্রবন্ধস্য দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষাবিষয়ত্বেন সূচিতঃ ...ততশ্চ শান্তো রসো রসান্তরৈর্মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ- পুরুষার্থান্তরৈস্তদুপসর্জনত্বেনানুগম্যমানোঽঙ্গিত্বেন বিবক্ষা-বিষয় ইতি মহাভারততাৎপর্যং সুব্যক্তমেবাবভাসতে।

—আনন্দবর্ধন-ধ্বন্যালোক ৪র্থ উদ্দ্যোত

প্রথম অধ্যায়

মহাভারতে উল্লিখিত রামায়ণের কথা-পুরুষ ও যুদ্ধ

ক. কথা-পুরুষ

মহাভারতের প্রায় প্রত্যেক পর্বেই রামায়ণের ব্যক্তিগণ বার বার উল্লিখিত হয়েছেন। এই উল্লেখগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করলে মহর্ষি বেদব্যাসের মহাকাব্যে রামায়ণ মহাকাব্যের প্রভাব কতখানি তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রাম

মহাভারতের অনুক্রমণিকা পর্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিঃসংশয় যে পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত। তিনি সঞ্জয়ের নিকট পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়ের অনুকূল ঘটনা একের পর এক উপস্থাপন করে গভীর শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে জীবন ধারণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বার বার সংজ্ঞা হারালেন। সঞ্জয় তাঁকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন রাজার নাম করলেন। উল্লিখিত রাজগণ প্রত্যেকেই অবিনশ্বর কীর্তির অধিকারী হয়েও অমরত্ব লাভ করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে সঞ্জয়-কর্তৃক উল্লিখিত রাজগণের নামের সঙ্গে দশরথ-পুত্র রামের কথাও এসেছে।

মরুত্তং মনুমিক্ষ্বাকুং গয়ং ভরতেমেব চ॥
রামং দাশরথিঞ্চৈব শশবিন্দুং ভগীরথম্। ১।১।২২৭ গ.ঘ. ২২৮ ক.খ.

সৌতি ঋষিগণের নিকট মহাভারতে প্রত্যেকটি পর্বের বর্ণিত বিষয়, শ্লোক-সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণনাকালে রামোপাখ্যানের সঙ্গে রামের নাম করেছেন।

রামায়ণমুপাখ্যানমত্রৈব বহুবিস্তরম্।
যত্র রামেণ বিক্রম্য নিহতো রাবণো যুধি॥ ১।২।২০০

শ্লোকটিতে রাবণের কথাও এসেছে।

অন্যত্র জরৎকারু-পুত্র স্বীয় মা মনসার অভিপ্রায় পূরণ করার জন্য রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়ের সর্পসত্রে উপস্থিত হয়েছেন। উদ্দেশ্য রাজার মনোরঞ্জনের মাধ্যমে যজ্ঞ বন্ধ করা। এখানে আস্তিক পূর্ববর্তী অনেক প্রসিদ্ধ রাজার দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের উল্লেখ করার সময় দাশরথি রামের নাম উল্লেখ করেছেন।

নৃগস্য যজ্ঞস্ত্বজমীঢ়স্য চাসীদ্
যথা যজ্ঞো দাশরথেশ্চ রাজ্ঞঃ। ১।৫৫।৫ ক.খ.

মহাভারতের দাক্ষিণাত্য-পাঠে অর্জুনের দ্রৌপদী-লাভ বর্ণনাকালে মৈথিল রাজপুত্রী সীতা-কর্তৃক রামের পতিত্বে বরণের কথা এসেছে।

উষেব সূর্যং মদনং রতিশ্চ
মহেশ্বরং পর্বতরাজপুত্রী।
রামং যথা মৈথিলরাজপুত্রী
ভৈমী যথা রাজবরং নলং হি॥

১।১৮৭ অধ্যায়, পৃ. ৫৪৩

আবার পাণ্ডবদের দ্রৌপদী লাভের পর বিদুর-কর্তৃক ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রশংসা প্রসঙ্গে মহারাজ গয় এবং দাশরথি রামের ধর্মপ্রবণতা বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মে চানবরৌ রাজন্ সত্যতায়াং চ ভারত।
রামাদ্ দাশরথেশ্চৈব গয়াচ্চৈব ন সংশয়॥ ১।২০৪।৬

সভাপর্বে যমের সভা বর্ণনাবসরে মহর্ষি নারদ কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব প্রভৃতি রাজগণের সঙ্গে দাশরথি রামের কথা বলেছেন।

কপোতরোমা তৃণকঃ সহদেবার্জুনৌ তথা
রামো দাশরথিশ্চৈব লক্ষ্মণোঽথ প্রতর্দন।[১] ৮।১৭

অন্যত্র সভাপর্বের অন্তর্গত দাক্ষিণাত্য-পাঠে বৈশম্পায়ন রামের নাম উল্লেখ করেছেন।

রামমিক্ষ্বাকুনাথং বৈ স্মরন্তং মনসা সদা। ৩১অধ্যায়, পৃ.-৭৬১

এই অধ্যায়েই ঘটোৎকচ অস্ত্র প্রয়োগে অর্জুনকে জামদগ্ন্যের সমান এবং যুদ্ধে রামের সমকক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন।

কার্তবীর্যসমো ৰীর্যে সাগরপ্রতিমো ৰলে।
জামদগ্ন্যসমো হ্যস্ত্রে সংখ্যে রামসমোঽর্জুনঃ॥ ৩১ অধ্যায়, পৃ. ৭৬২

অন্যত্র দাক্ষিণাত্য পাঠেই অর্ঘ্যাদিহরণ প্রসঙ্গে চতুর্বিংশ যোগে দশরথের গৃহে রামের অবতরণ ও তাঁর অলোক-সামান্য লীলার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এখানে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হল—

১. নাসীদল্পকৃষির্লোকে রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
২. অরোগাঃ প্রাণিনোঽপ্যাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
৩. গাথামপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো মাতঙ্গানামিবর্ষভঃ॥

---

১. এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণটি গীতা প্রেস সংস্করণে ভিন্ন। এখানে সামীক্ষিক সংস্করণে উদ্ধৃত দ্বিতীয় চবণটি গৃহীত হয়েছে। গীতা প্রেস সংস্করণে উদ্ধৃত দ্বিতীয় চরণটি হল—ব্যশ্বঃ সাশ্বঃ কৃশাশ্বশ্চ শশবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ। ৮।১৭ গ.ঘ. পরের শ্লোকেব প্রথম চরণটি হল—রাজা দশবথশ্চৈব ককুৎস্থোঽথ প্রবর্ধনঃ। ৮।১৮।

আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাবলঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ॥
রাজ্যং ভোগং চ সম্প্রাপ্য শশাস পৃথিবীমিমাম্।
রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ॥
রামভূতং জগদিদং রামে রাজ্যং প্রশাসতি। *অধ্যায় ৩৮, পৃ. ৭৯৫-৯৬

দ্রোণ পর্বেও উপরিউক্ত কয়েকটি শ্লোকের পুনরুল্লেখ লক্ষিত হয়।[২]

বনপর্বে পাণ্ডবগণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বনবাস-জীবন পালন করার জন্য দ্বৈতবনে উপস্থিত হয়েছেন। পবিত্র ব্রাহ্মণগণের সেবায় নিরত ভাইদের সঙ্গে যুধিষ্ঠির আনন্দেই বনবাস-জীবন যাপন করছেন। একদিন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন। বনবাসী যুধিষ্ঠির যথাযোগ্য সম্মানে মহর্ষিকে সম্মানিত করলেন। সহসা যুধিষ্ঠির মহর্ষির মুখে হাসি দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহর্ষি বললেন—'বৎস, আমার এ হাসির কারণ কোনো আনন্দ বা গর্ববোধ নয়। আজ তোমার বিপদ দেখে আমার দাশরথি রামের কথা মনে পড়ছে। পূর্বে আমি তাঁকেও ঋষ্যমূক পর্বতে ভ্রমণ করতে দেখেছি।

তবাপদং ত্বদ্য সমীক্ষ্য রামং
সত্যব্রতং দাশরথিং স্মরামি॥
স চাপি রাজা সহ লক্ষ্মণেন
বনে নিবাসং পিতুরেব শাসনাৎ॥ ২৫।৮ গ.ঘ.—৯ ক.খ.

বনপর্বান্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্বে নারদ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বলেছেন— হে রাজন, তুমি শৃঙ্গবেরপুরে গমন করবে যেখানে রাম বনবাসের সময় অতিক্রম করেছিলেন।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শৃঙ্গবেরপুরং মহৎ।
যত্র তীর্ণো মহারাজ রাম দাশরথিঃ পুরা॥ ৮৫।৬৫

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে অন্যান্য বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করার জন্য উপদেশ দানের সময় বলেছেন— হে রাজন, সুবিখ্যাত রাম ও রাজা ভগীরথের ন্যায় তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

এই তীর্থযাত্রা পর্বেই লোমশমুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট দাশরথি রাম কর্তৃক

---

*এই পর্বে ৮ম অধ্যায়ে রামের কথা এসেছে যেমন—
জামদগ্নশ্চ রামশ্চ নাভাগসগরৌ তথা।
ভূরিদ্যুম্নো মহাশ্বশ্চ পৃথাশ্বো জনকস্তথা॥ ২।৮।১৯ ইত্যাদি

২. ৭।৫৯।২০, ২১, ২২, ২৩, ক.খ.

পরশুরামের তেজ কিভাবে বিনষ্ট হয়েছিল তা বর্ণনা করেন। মহর্ষির এই বর্ণনায় বার বার রাজা দশরথের সঙ্গে রামের নাম এসেছে। মহর্ষি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বলেছেন—

শৃণু রামস্য রাজেন্দ্র ভার্গবস্য চ ধীমতঃ।
জাতো দশরথস্যাসীৎ পুত্রো রামো মহাত্মনঃ॥ ৯৯।৪০

এই 'দাশরথি রাম ও পরশুরাম' বৃত্তান্তে কয়েকবারই দশরথ সহ তাঁর পুত্র রামের নাম উল্লিখিত হয়েছে।[৩]

এই পর্বেই গন্ধমাদন পর্বতে হনুমানের সঙ্গে ভীমের সাক্ষাৎ হলে হনুমান ভীমের পরিচয় জানতে চাইলেন। ভীম হনুমানের নিকট স্বীয় পরিচয় দানের সময় নিজেকে রাম-পত্নী সীতার নিমিত্ত সাগরলঙ্ঘনকারী হনুমানের ভাই বলে বর্ণনা করেন।

রামপত্নীকৃতে যেন শতযোজনবিস্তৃতঃ।
সাগরঃ প্লবগেন্দ্রেণ ক্রমেণৈকেন লঙ্ঘিতঃ॥ ১৪৭।১২

আবার এখানেই হনুমানের বীরত্বে ভীম মুগ্ধ হয়ে তাঁর সত্য পরিচয় জানতে চাইলে হনুমান সংক্ষেপে রাম-কথার মাধ্যমে নিজের পরিচয় ভীমসেনের নিকট ব্যক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে বার বার হনুনানের মুখে রামের কথা শোনা যায়।[৪]

এর পর এই পর্বে আমরা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে সংক্ষিপ্ত রাম-কাহিনী শুনতে পাই। যুধিষ্ঠির বনবাসজীবনের দুঃখের কথা মহর্ষির নিকট বললে মহর্ষি এই রামকথা তাঁকে শোনান। মহর্ষি-কথিত এই রাম-কাহিনীতে আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে রামের উল্লেখ লক্ষ্য করি।[৫]

বিরাটপর্বে বিরাটরাজের রাজ্যে দ্রৌপদী কীচকের দ্বারা অপমানিতা হয়ে বার বার ভীমসেনকে কীচক বধে প্ররোচিত করেন। দ্রৌপদী যাতে ধৈর্য অবলম্বন করে সুদিনের অপেক্ষা করেন তার জন্য ভীমসেন সীতার উদাহরণ দিয়ে বলেন— সীতা পুরুষপ্রধান রামের সহধর্মিণী হয়েও রাক্ষসের হাতে কত লাঞ্ছনা সহ্য করেছিলেন।

রক্ষসা নিগ্রহং প্রাপ্য রামস্য মহিষী প্রিয়া।
ক্লিশ্যমানাপি সুশ্রোণ রামমেবান্বপদ্যত॥ ২১।১৩

উপরোক্ত শ্লোকে দাশরথি রাম এবং সীতা উভয়েরই কথা এসেছে।

---

৩. ৯৯।৪১-৪৬, ৫০, ৫২, ৫৬, ৭০, ৭১

৪. ১৪৭।২৬-৩৮, ১৪৮।১-২২

৫. ২৭৪-২৯২ অধ্যায়

উদ্‌যোগ পর্বে ব্রাহ্মণ-প্রধান গালব মাধবীকে দিবোদাসের হাতে সমর্পণ করলে দিবোদাস আনন্দের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেন। রাজা দিবোদাস মাধবীর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত তা বুঝাবার জন্য মহর্ষি নারদ, রাম জানকীর প্রতি যেরূপ অনুরক্ত ছিলেন তার তুলনা করেন।

বৈদেহ্যাং চ যথা রামো রুক্মিণ্যাং চ জনার্দনঃ।

তথা তু রমমাণস্য দিবোদাসস্য ভূপতেঃ। ১১৭।১৭ গঘ. ১৮ ক.খ.

মহর্ষি নারদ-কথিত উপরোক্ত শ্লোকাংশদ্বয়ে রাম এবং সীতা উভয়েই উল্লিখিত হয়েছেন।

ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত ৩৪তম অধ্যায়ভুক্ত শ্রীমদ্ভগবদগীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান নিজেকে শস্ত্রে দাশরথি রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্। ৩১ ক.খ.

আমাদের মনে হয় উপরোক্ত শ্লোকাংশে উদ্ধৃত 'রাম' শব্দের দ্বারা দাশরথি রামের কথাই বলা হয়েছে। কারণ উৎকর্ষের বিচারে দাশরথি রামই শ্রেষ্ঠ। আচার্য শঙ্করও এই শ্লোকের টীকায় 'রাম' শব্দটিকে দাশরথি রাম বলেই ব্যাখ্যা করেছেন।[৬]

দ্রোণ পর্বে অভিমন্যু নিহত শুনে যুধিষ্ঠির অতিশয় শোকাকুল হয়ে পড়লে মহর্ষি নারদ তাঁকে কয়েকজন রাজার মহত্ত্বের উল্লেখ করে বলেন যে বিশেষ বিশেষ মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। দেবর্ষি নারদ এ প্রসঙ্গেই যুধিষ্ঠিরের নিকট দাশরথি রামের চরিত্র বর্ণনা করেন। দেবর্ষির এই বর্ণনার প্রথম শ্লোকটি হল—

রামং দাশরথিং চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম্।

যং প্রজা অন্বমোদন্ত পিতা পুত্রানিবৌরসান্॥ ৫৯।১

এই অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদের রাম-চরিত্র বর্ণনায় রামের সঙ্গে রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রের নামও এসেছে।

অন্যত্র ত্রিগর্ত-রাজপুত্র নিরমিত্র সহদেবের হাতে নিহত হলে সহদেব যেরূপ শোভাধারণ করেন তা বর্ণনাকালে সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—দশরথ-পুত্র রাম নিশাচর খরকে সংহার করে এরূপ শোভা ধারণ করেছিলেন।

---

৬. পবনো বায়ুঃ পবতাং পাবয়িতৃণাম অস্মি রামঃ
শস্ত্রভৃতাং শস্ত্রাণাং ধারয়িতৃণাং দাশরথী রামোঽহম্।
মহাভারতের টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদী টীকায় বলেছেন—শস্ত্রভৃতাং মধ্যে রামো দাশরথিরস্মি জগদ্বিজয়িরাবণহন্তৃত্বাৎ। নীলকণ্ঠও তাঁর ভারতভাবদীপ নামক মহাভারতের টীকায় এখানে বলেছেন—রামো দাশরথিঃ।

তং তু হত্বা মহাবাহুঃ সহদেবো ব্যরোচত।
যথা দাশরথী রামঃ খরং হত্বা মহাবলম্।। ৭।১০৭।২৮

সঞ্জয়-কর্তৃক সহদেবের বীরত্ব বর্ণনায় রামের সঙ্গে খরের নামও এসেছে।

আবার সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নয় জন বাহ্লীক বীরকে বীরত্বে দাশরথি রামের সদৃশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে বাহ্লীকে পুরুষর্ষভ।
পুত্রাস্তেঽভ্যর্দয়ন্ ভীমং দশ দাশরথেঃ সমাঃ॥ ৭।১৫৭।১৬ গ.ঘ. ১৭কখ

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকট অশ্বত্থামার গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে দাশরথি রামের নাম উল্লেখ করে বলেছেন— অশ্বত্থামা বেদবিদ্, ব্রতপরায়ণ, ধনুর্বেদ বিশারদ এবং দাশরথি রামের মতো সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতির।

বেদস্নাতো ব্রতস্নাতো ধনুর্বেদে চ পারগঃ।
মহোদধিরিবাক্ষোভ্যো রামো দাশরথির্যথা।। ৭।১৯৪।১২

এই পর্বেই অন্যত্র অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন এ মিথ্যা বাক্য যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের উদ্দেশে উচ্চারণ করলে দ্রোণাচার্য পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। এই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেন। গুরুর নিকট যুধিষ্ঠিরের এ মিথ্যালাপের নিন্দা করে অর্জুন বললেন— বালী-বধে রামের অপযশের মতো দ্রোণাচার্য-বধে পৃথিবী চিরকাল যুধিষ্ঠিরের অপযশ কীর্তন করবে।

চিরং স্থাস্যতি চাকীর্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥
রামে বালিবধাদ্ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে।

৭।১৯৬।৩৫ গ.ঘ. ৩৬ ক.খ.

অর্জুন কথিত উপরোক্ত শ্লোকটিতে রামের সঙ্গে বালীর নামও এসেছে।

কর্ণ-পর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কর্ণ ও অর্জুনের কথা বলার সময় প্রাচীন কালের কয়েকজন মহাবীরের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করে বলেছেন— যেরূপ দেবরাজ ও বৃত্রাসুর এবং রাম ও রাবণের যুদ্ধে লোকক্ষয় হয়েছিল, অর্জুন ও কর্ণের যুদ্ধেও সেরূপ লোকক্ষয় হয়।

এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কর্ণার্জুনসমাগমে।
মহেন্দ্রেণ যথা বৃত্রো যথা রামেণ রাবণঃ॥ ৫।৫৩

সঞ্জয়-কথিত শ্লোকটিতে রামের সঙ্গে রাবণের নামও যুক্ত হয়েছে।

শল্য পর্বে দুর্যোধন মায়া প্রভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিলে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে মায়ার আশ্রয়েই দুর্যোধন-বধে প্ররোচিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মায়ার আশ্রয়ে রামের রাবণ-বধের কথা উল্লেখ করেন।

তথা পৌলস্ত্যতনয়ো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
রামেণ নিহতো রাজন্ সানুৰন্ধঃ সহানুগঃ।। ৩১।১১

শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উল্লিখিত শ্লোকটিতে রামের সঙ্গে রাবণের প্রসঙ্গও এসেছে।

অন্যত্র বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের উদ্দেশে কপালমোচন তীর্থ সম্বন্ধে বলেছেন— পূর্বে রাম এই তীর্থে এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করেছিলেন। সেই সদ্যচ্ছিন্ন মস্তকটি মহোদরের জঙ্ঘায় সংযুক্ত হয়।

মহতা শিরসা রাজন্ গ্রস্তজঙ্ঘো মহোদরঃ।
রাক্ষসস্য মহারাজ রামক্ষিপ্তস্য বৈ পুরা।। ৯।৩৯।৫

এর পরেই আবার বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের উদ্দেশে বলেছেন—রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা রাম রাক্ষস বিনাশের জন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করেছিলেন।

পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মহাত্মনা।
বসতা রাজশার্দূল রাক্ষসান্ শময়িষ্যতা।। ৯।৩৯।৯ গ.ঘ. ১০ ক.খ.

শান্তিপর্বে পরিজনবর্গের বিয়োগে যুধিষ্ঠির শোকে অতিশয় ভেঙে পড়লে বাসুদেব প্রাচীন ইতিহাসস্বরূপ রামের সুন্দর রাজ্যশাসনের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন যে, তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাম চোদ্দ বছর বনবাস জীবন অতিবাহিত করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। বাসুদেব এখানে মোট এগারোটি শ্লোকে বার বার রামের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

বিধবা যস্য বিষয়ে নানাথাঃ কাশ্চনাভবন্।
সদৈবাসীৎ পিতৃসমো রামো রাজ্যং যদন্বশাৎ॥
কালবর্ষী চ পর্জন্যঃ শস্যানি সমপাদয়ৎ।
নিত্যং সুভিক্ষমেবাসীদ্ রামে রাজ্যং যদন্বশাৎ॥ ২৯।৫২-৫৩

অন্যান্য শ্লোকগুলি যথাক্রমে—২৯।৫৩-৬০

এই পর্বেই পিতামহ ভীষ্ম-কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে কথিত 'গৃধ্র-জম্বুক' সংবাদে জম্বুকের মুখে রামের কথা এসেছে।

শ্রূয়তে শম্বুকে শূদ্রে হতে ব্রাহ্মণদারকঃ।
জীবিতো ধর্ম্মমাসাদ্য রামাৎ সত্যপরাক্রমাৎ॥ ১৫৩।৬৭

আবার এই পর্বেরই দাক্ষিণাত্য-পাঠে শ্রীকৃষ্ণ অবতারগণের নাম কীর্তন করার সময় দাশরথি রামের নাম উল্লেখ করেছেন।

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহশ্চ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ কৃষ্ণঃ কল্কী চ তে দশ। ৩৩৯ অধ্যায়, পৃঃ-৫৩৫০

এখানেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—আমি ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হয়ে রাম নামে বিখ্যাত হব।

সংধ্যাংশে সমনুপ্রাপ্তে ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
অহং দাশরথী রামো ভবিষ্যামি জগৎপতিঃ॥ ৩৩৯।৮৫

এই অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণ আর-একটি শ্লোকে দাশরথিরামের নাম করেছেন।

বরাহো নরসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ।
রাম দাশরথিশ্চৈব সাত্বতঃ কল্কিরেব চ॥ ৩৩৯।১০৪

অনুশাসন পর্বে পিতামহ ভীষ্ম গোদান মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেছেন— লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত প্রথম কীর্তন করেন। পরে ইন্দ্র দশরথকে, দশরথ স্বীয় পুত্র রামের নিকট, রাম প্রিয় ভাই লক্ষ্মণের নিকট এবং লক্ষ্মণ বনবাসী ঋষিগণের নিকট এই বৃত্তান্ত কীর্তন করেছিলেন।

এতৎ পিতামহোনোক্তমিন্দ্রায় ভরতর্ষভ।
ইন্দ্রো দশরথায়াহ রামায়াহ পিতা তথা॥
রাঘবোঽপি প্রিয়ভ্রাত্রে লক্ষ্মণায় যশস্বিনে।
ঋষিভ্যো লক্ষ্মণেনোক্তমরণ্যে বসতা প্রভো॥ ৭৪।১১-১২

পিতামহ ভীষ্ম-কথিত উপরোক্ত শ্লোকটিতে রামের সঙ্গে দশরথ এবং লক্ষ্মণের নামও এসেছে।

এই পর্বেই গোদানের প্রশংসা করে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— গো দান করে দাশরথিরাম স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করেছেন।

তথা বীরো দাশরথিশ্চ রামো
যে চাপ্যন্যে বিশ্রুতাঃ কীর্তিমন্তঃ॥ ৭৬।২৬ গ.ঘ.

অন্যত্র এই পর্বেই পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রাচীন রাজগণের নাম কীর্তন করার সময় ভগীরথের সঙ্গে রামের নাম করেছেন।

রামো রাক্ষসহা বীরঃ শশবিন্দুর্ভগীরথঃ। ১৬৫।৫১ গ.ঘ.

আশ্বমেধিক পর্বে মহর্ষি বেদব্যাস শোকাতুর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা লাভ করবার জন্য যজ্ঞ করার উপদেশ দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন—

তুমি দশরথাত্মজ শ্রীরাম ও তোমার পূর্বপিতামহ শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত ভরতের ন্যায় রাজসূয় যজ্ঞ, সর্বমেধ যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো।

যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্ দক্ষিণাবতা।
বহুকামান্নবিত্তেন রামো দাশরথির্যথা।। ৩।৯

সীতা

রামের ন্যায় বেদব্যাসের লেখনীতে সীতার নামও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার এসেছে। অবশ্য তিনি রাম, দশরথ, জনক, রাবণ অথবা রামায়ণের অন্যান্য

কথা-পুরুষের সঙ্গেই বেশি উল্লিখিত হয়েছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও অপরাপর কথা-পুরুষের সঙ্গে যে সকল ক্ষেত্রে তাঁর নাম পাওয়া যায় ক্রমশ সেগুলি উল্লেখ করা হবে। মহাভারতোক্ত রাম-কথাগুলিতে স্বতন্ত্রভাবেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। এই রামকথাগুলি রামের প্রসঙ্গ আলোচনাবসরে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত রাম-কথাগুলিতে তিনি কখনও মৈথিল-রাজপুত্রী, কখনও জনক-দুহিতা, কখনও রামপত্নী কখনও বা সাক্ষাৎ সীতা নামেও উল্লিখিত হয়েছেন.

লক্ষ্মণ

মহাভারত মহাকাব্যে রামায়ণের কথা-পুরুষ লক্ষ্মণও একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রামের সঙ্গে তাঁর নাম এসেছে। পূর্বে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও অপরাপর ক্ষেত্রেও কয়েকবার তাঁর নাম পাওয়া যায়।

মহাভারতের সভাপর্বে দাক্ষিণাত্য-পাঠের অন্তর্গত একস্থলে বিদুর পাণ্ডবদের বনগমনকালে পুরবাসীর অবস্থা বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় তিনি পুরবাসীর অবস্থাকে রামের বনগমনকালে অযোধ্যার জনগণের যে অবস্থা হয়েছিল তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানেও মহামতি বিদুরের বর্ণনায় লক্ষ্মণের কথা এসেছে।

যদবস্থা বভূৰবার্তাহ্যযোধ্যা নগরী পুরা।
রামে বনং গতে দুঃখাদ্ধৃতরাজ্যে সলক্ষ্মণে।। ৮০ অধ্যায়, পৃ. ৯৩৮
সা. সং 2, APP 44 Pr. 25

উপরোক্ত শ্লোকটিতে লক্ষ্মণের সঙ্গে রামের কথাও এসেছে।

দ্রোণপর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূরিশ্রবা সাত্যকির উদ্দেশে বলেছেন— আজ তুমি রামের ভাই লক্ষ্মণের শরে নিহত রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতের ন্যায় আমার শরাঘাতে মৃত্যু বরণ করে যমরাজের রাজ্যে গমন করবে।

অদ্য সংযমনীং যাতা ময়া ত্বং নিহতো রণে।
যথা রামানুজেনাজৌ রাবণির্লক্ষ্মণেন হ॥ ১৪২।১০

ভূরিশ্রবা-কথিত উক্ত শ্লোকটিতে লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম ও ইন্দ্রজিতের নামও এসেছে।

জনক

মহাভারতে উল্লিখিত জনক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের এ কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে মিথি জনক হতে সীরধ্বজ কুশধ্বজ পর্যন্ত জনক বংশের রাজক্রম রামায়ণে পাওয়া যায়। নানা পুরাণে উক্ত বংশেরই অনেক পরবর্তী ব্যক্তি 'কৃতি' পর্যন্ত তার বিস্তার। কৃতিতেই এই বংশের সমাপ্তি। ইতস্তত

রাজন্যবর্গের নামে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। আবার কোনো কোনো স্থলে কোনো নাম বিযুক্ত হয়েছে। কখনও বা একটি নতুন নামও যুক্ত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় বিষ্ণুপুরাণে প্রাপ্ত জনক রাজবংশের বিবরণ অন্যান্য পৌরাণিক বিবরণের দ্বারা সমর্থিত। রামায়ণে প্রাপ্ত আংশিক বিবরণ অবশ্যই অন্যান্য পৌরাণিক বিবরণ থেকে প্রাচীনতর। মহাভারতে আমরা কয়েকজন জনকের বিবরণ পাই। যেমন— জনকজনদেব[৭], করাল জনক[৮], জনকধর্মধ্বজ[৯], জনক ঐন্দ্রদ্যুম্নি[১০], জনকবসুমান[১১] প্রভৃতি। এঁদের পুরাণপ্রাপ্ত রাজাদের সঙ্গে মেলানো যায় না। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে জনক বংশীয় রাজারা প্রায়শ আত্মবিদ্যাশ্রয়ী

---

৭. পিতামহ ভীষ্ম-কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে কথিত, 'জনদেব-পঞ্চশিখ' সংবাদে মিথিলারাজ এই জনকজনদেবের নাম পাওয়া যায়।

জনকো জনদেবস্তু মিথিলায়াং জনাধিপঃ। ১২।২১৮।৩ ক.খ.

৮. যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে ক্ষর ও অক্ষর পদার্থের স্বরূপ জানতে চাইলে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট জনকবংশসম্ভূত 'রাজর্ষি করাল ও বশিষ্ঠ' সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস বলেন—

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
বসিষ্ঠস্য চ সংবাদং করালজনকস্য চ॥ ১২।৩০২।৭

৯. পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট 'ধর্মধ্বজ-সুলভা' সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করেন। এখানে পিতামহ জনক বংশের এই রাজাকে সন্ন্যাসধর্মতত্ত্বজ্ঞ বলে বিশেষিত করেন।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
জনকস্য চ সংবাদং সুলভায়াশ্চ ভারত॥
সংন্যাসফলিকঃ কশ্চিদ্ বভূব নৃপতিঃ পুরা।
মৈথিলো জনকো নাম ধর্মধ্বজ ইতি শ্রুতঃ॥ ১২।৩২০।৩-৪

১০. কহোড়-পুত্র অষ্টাবক্র ও রাজা জনকের কথোপকথনের সময় বালক অষ্টাবক্র জনক ঐন্দ্রদ্যুম্নির নাম উল্লেখ করেছেন।

ঐন্দ্রদ্যুম্নে যজ্ঞদৃশাবিহাবাং
বিবক্ষূ বৈ জনকেন্দ্রং দিদৃক্ষূ।
তৌ বৈ ক্রোধব্যাধিনা দহ্যমানা
বয়ং চ নৌ দ্বারপালো রুণদ্ধি।। ৩।১৩৩।৪

১১. পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে জনক বংশের রাজা বসুমানের কথা বলেছেন—

মৃগয়াং বিচরন্ কশ্চিদ্ বিজনে জনকাত্মজঃ।
বনে দদর্শ বিপ্রেন্দ্রমৃষিং বংশধরং ভৃগোঃ॥
উপাসীনমুপাসীনঃ প্রণম্য শিরসা মুনিম্।
পশ্চাদনুমতস্তেন পপ্রচ্ছ বসুমানিদম্॥ ১২।৩০৯।১-২

হতেন।[১২] অবশ্য ঐ বংশের রাজবৃন্দ ছাড়াও অন্য আত্মবিদ্যানিষ্ঠ রাজন্য অনেক ছিলেন। উপরোক্ত জনকেরা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব। রামায়ণ এবং বহুপুরাণে দেবরাত জনক এক প্রসিদ্ধ রাজা।

মহাভারতে যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্য দৈবরাতির কথা এসেছে।[১৩] প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' জনক সীরধ্বজকে যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্য বলা হয়েছে[১৪] তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। রামায়ণ[১৫] ও বিষ্ণুপুরাণাদির[১৬] মতে দেবরাতের পুত্রের নাম বৃহদুক্থ বা বৃহদ্রথ। দৈবরাতি তাঁব অপর নাম।

মহাভারতে সীতার পিতা সীরধ্বজ জনকের পরবর্তী অন্য কোনো জনক রাজ প্রত্যক্ষ উল্লিখিত হননি। কিন্তু সামান্যভাবে জনক বংশে আত্মবিদ্যার প্রচার, জনক-রাজসভায় বিভিন্ন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির আগমন এবং তাঁদের সঙ্গে এক বা একাধিক জনকের সংবাদ, কোনো জনক দ্বারা কার্তিকী পূর্ণিমায় মাংস ত্যাগ,[১৭] জনক রাজর্ষির কূপখনন,[১৮] জনক প্রতর্দন বিবাদ,[১৯] জনক অষ্টাবক্র সংবাদ[২০] অশ্মা-জনক সংবাদ[২১] প্রভৃতি নানা জনক গাথার উল্লেখ আছে।

---

১২. ...কৃতৌ সন্তিষ্ঠতেঽয়ং জনক-বংশঃ॥ ইত্যেতে মৈথিলাঃ। প্রাচুর্য্যেণ (প্রায়েণৈতে) এতেষামাত্মবিদ্যাশ্রয়িণো ভূপালা (ভবন্তি) ভবিষ্যন্তীতি॥ ৪।৫।১৩-১৪

১৩. ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট 'যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদ' প্রাচীন ইতিহাস বলার সময় জনকবংশীয় রাজা দেবরাতের কথা বলেছেন—

যাজ্ঞবল্ক্যমুনিশ্রেষ্ঠং দৈবরাতির্মহাযশাঃ।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বরম্॥ ১২।৩১০।৪

১৪. অরুন্ধতী কৌশল্যার নিকট রাজা জনকের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

এষ বঃ শ্লাঘ্যসম্বন্ধী জনকানাং কুলোদ্বহঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো মুনির্যস্মৈ ব্রহ্মপারায়ণং জগৌ॥ ৪র্থ অংক। ৯

১৫. সুকেতোরপি ধর্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ॥ রা মা ১।৭১।৬

১৬. অভূদ্ বিদেহোঽস্য পিতেতি বৈদেহো মথনান্মিথিরভূৎ। তস্যোদাবসুঃ পুত্রোঽভূৎ। ততো নন্দিবর্ধনঃ, তস্মাৎ সুকেতুঃ, তস্যাপি দেবরাতঃ, ততশ্চ বৃহদুক্থঃ
(৪।৫।১২)

১৭. পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরেব নিকট অনেক পুণ্যশ্লোক রাজাব নাম শুনিয়েছেন যাঁরা কার্তিক মাসে মাংস ত্যাগ করেছিলেন। ভীষ্ম-কথিত রাজগণেব মধ্যে জনকের নাম এসেছে—

বিরূপাশ্বেন নিমিনা জনকেন চ ধীমতা। ১৩।১১৫।৬৫ ক-খ

১৮ পুলস্ত্য বিভিন্ন পবিত্র তীর্থস্থানের নামোল্লেখ করার সময় রাজা জনকের দেবপূজিত একটি কূপের কথা বলেন যেটি গৌতমের আশ্রমে অবস্থিত।

জনকস্য তু রাজর্ষেঃ কূপস্ত্রিদশপূজিতঃ।
তত্রাভিষেকং কৃত্বা তু বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩।৮৪।১১১

১৯ অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রতর্দনো মৈথিলশ্চ সংগ্রামং যত্র চক্রতুঃ॥ ১২।৯৯।১

২০ ৩।১৩৩ ২১ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই রাজর্ষি বংশের বিভিন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নানা কথা মহাভারতে ইতস্তত উল্লিখিত হলেও রামায়ণের জনক বংশের সঙ্গে তাঁদের তুলনামুলক আলোচনার ক্ষেত্র অনুপস্থিত। তবে এ কথা মনে করার সংগত কারণ আছে যে রামায়ণ থেকে মহাভারতে জনক বংশের পরিচয় ব্যাপক। রাজর্ষি জনকের দানশীলতার কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও উল্লিখিত হয়েছে।[২২]

সমগ্র মহাভারতে সীতার পিতারূপে পরিচিত জনককে আমরা কমই পাই। মহাভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাম, সীতা প্রভৃতির সঙ্গেই তিনি উল্লিখিত হয়েছেন।

বনপর্বে হনুমান ভীমসেনকে সংক্ষেপে রাম-কাহিনী বলার সময় সীতার সঙ্গে তাঁর পিতা জনকেরও নাম করেছেন।

অহং স্ববীর্যাদুত্তীর্য সাগরং মকরালয়ম্।
সুতাং জনকরাজস্য সীতাং সুরসুতোপমাম্॥
দৃষ্টবান্ ভরতশ্রেষ্ঠ রাবণস্য নিবেশনে।
সমেত্য তামহং দেবীং বৈদেহীং রাঘবপ্রিয়াম্॥ ১৪৮।৭-৮

উদ্ধৃত শ্লোক দুটিতে রাবণ এবং রামের কথাও এসেছে।

বিরাট পর্বে দ্রৌপদী ভীমসেনকে কীচক-বধের জন্য বার বার বিরক্ত করলে ভীমসেন তাঁর নিকটে সীতার ধৈর্য ও দুঃখের উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে জনকের নামও এসেছে।

দুহিতা জনকস্যাপি বৈদেহী যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরৎ সীতা মহারণ্যনিবাসিনম্॥ ২১।১২

প্রসঙ্গটি রামের কথা আলোচনাবসরে উল্লিখিত হয়েছে। জনকের নাম থাকায় এখানে পুনরুল্লেখ করা হল।

দশরথ

মহাকবি বেদব্যাস তাঁর মহাকাব্যে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ রাজন্যবর্গের সঙ্গে রাজা দশরথের নাম একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। তবে রামায়ণের প্রধান কথা-পুরুষ রামের

২১ অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অশ্মগীতং নরব্যাঘ্র তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির॥
অশ্মানং ব্রাহ্মণং প্রাজ্ঞং বৈদেহো জনকো নৃপঃ।
সংশয়ং পরিপপ্রচ্ছ দুঃখশোকসমন্বিতঃ॥ ১২।২৮।২-৩

২২. হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি। ৪।১।৪

সঙ্গেই তাঁর নাম বেশি এসেছে। রামের প্রসঙ্গ আলোচনাকালে সেগুলি যথাসম্ভব দেখানো হয়েছে। মহাভারতে অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উল্লেখগুলি নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে।

সভাপর্বে মহর্ষি নারদ যমরাজের সভা বর্ণনা করার সময় অনেক পুণ্যশীল রাজার সঙ্গে দশরথের নাম করেছেন।

রাজা দশরথশ্চৈব ককুৎস্থোঽথ প্রবর্ধনঃ।
অলর্কঃ কক্ষসেনশ্চ গয়ো গৌরাশ্ব এব চ।। ৮।১৮

বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্বে লোমশমুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট পরশুরাম তীর্থের বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁর মুখে মহারাজ দশরথের নাম শুনতে পাই।

জিজ্ঞাসমানো রামস্য ৰীর্যং দাশরথেস্তদা।
তং বৈ দশরথঃ শ্রুত্বা বিষয়ান্তমুপাগতম্।। ৯৯।৪৪

এ ছাড়া বনপর্বান্তর্গত সংক্ষিপ্ত রাম-কথাগুলিতেও দশরথের নাম এসেছে।

শান্তিপর্বে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে রাজার জীবনে অর্থের উপযোগিতা বা গুরুত্ব যে অপরিসীম তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন— আপনি বিষয়জ্ঞ হয়ে যদি যজ্ঞানুষ্ঠান না করেন তবে পাপভাগী হবেন। মহারাজ দশরথ যজ্ঞকে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলে ভাবতেন এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন।

শাশ্বতোঽয়ং ভূতিপথো নাস্যান্তমনুশুশ্রুম।
মহান্ দাশরথঃ পন্থা মা রাজন্ কুপথং গমঃ।। ৮।৩৭

অনুশাসনপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট বিভিন্ন প্রসিদ্ধ রাজগণের প্রশংসাবসরে অযোধ্যারাজ দশরথের নাম কীর্তন করেছেন।

রঘুর্নরবরশ্চৈব তথা দশরথো নৃপঃ।
রামো রাক্ষসহা বীরঃ শশৰিন্দুর্ভগীরথঃ।। ১৬৫।৫১

রাবণ

মহাভারত মহাকাব্যের ঋষিকবি বেদব্যাস তাঁর মহাকাব্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রামের সঙ্গে রাবণের নাম উল্লেখ করেছেন। রামের প্রসঙ্গে যেখানে যেখানে রাবণের নাম এসেছে তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। এখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত রাবণের প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবর্ষি নারদ বরুণের সভা বর্ণনাকালে রাবণের নাম করেছেন।

বিশ্বরূপঃ স্বরূপশ্চ বিরূপোঽথ মহাশিরাঃ।
দশগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা দশাবরঃ॥ ৯।১৪

মহর্ষি নারদের এই বর্ণনায় রাবণের সঙ্গে বালীর কথাও এসেছে।

এই পর্বেরই অন্তর্গত দাক্ষিণাত্য-পাঠে সহদেব কর আদায়ের জন্য সমুদ্রের পারে উপস্থিত হয়ে ঘটোৎকচকে স্মরণ করেন। স্মরণমাত্র ঘটোৎকচ সহদেবের নিকট হাজির হন। সহদেবের নিকট ঘটোৎকচের এই উপস্থিতিকে রামায়ণে বর্ণিত পুলস্ত্যের নিকট রাবণের উপস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

আসসাদ চ মাদ্রেয়ং পুলস্ত্যং রাবণো যথা।
আভিবাদ্য ততো রাজন্ সহদেবং ঘটোৎকচঃ॥ অধ্যায়-৩১, পৃঃ-৭৫৯

এই পর্বেই অন্যত্র দাক্ষিণাত্য-পাঠে আবার আমরা পিতামহ ভীষ্মের মুখে রাবণের নাম শুনতে পাই।

রাবণং সগণং হত্বা দিবমাক্রমতাভিভূঃ।
ইতি দাশরথেঃ খ্যাতঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ॥ অধ্যায় ৩৮, পৃঃ-৭৯৬

শ্লোকটিতে রাবণের নামের সঙ্গে রামের প্রসঙ্গও এসেছে।

বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্বে লোমশমুনি যুধিষ্ঠিরকে পরশুরামের তীর্থ-বৃত্তান্ত বলার সময় রাবণের নাম করেন।

বিষ্ণুঃ স্বেন শরীরেণ রাবণস্য বধায় বৈ। ৯৯।৪১ ক.খ.

উদ্‌যোগ পর্বে গরুড় গালবের নিকট দক্ষিণ দিকের নানা প্রশংসা করার সময় বলেছেন, পুলস্ত্য-পুত্র মহাত্মা রাবণ কঠোর তপস্যা করে দেবগণের নিকট অমরত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং রাবণের এই কঠোর তপস্যার জন্যই দক্ষিণ দিকের প্রসিদ্ধি।

অত্র রাক্ষসরাজেন পৌলস্ত্যেন মহাত্মনা।
রাবণেন তপশ্চীর্ত্বা সুরেভ্যোঽমরতা বৃতা॥ ১০৯।১২

দ্রোণ পর্বে সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবদের রথ, ধ্বজ ও অশ্বের বর্ণনাকালে ঘটোৎকচের অশ্বকে রাবণের অশ্বের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন— পুরাকালে বাবণের অশ্বগণ যেমন কামচারী ছিল ঘটোৎকচের অশ্বগুলি সেরূপ কামচারী বলে বোধ হল।

ঘটোৎকচস্য রাজেন্দ্র ধ্বজে গৃধ্রো ব্যরোচত।
অশ্বাশ্চ কামগাস্তস্য রাবণস্য পুরা যথা॥ ২৩।৯০

এই পর্বেই দেবর্ষি নারদ রাম-চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে রাবণের

দুর্দান্ত চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন— রাবণ ব্রাহ্মণকুলের কন্টকস্বরূপ দেব ও দানবের অবধ্য। সেই প্রতাপশালী রাবণই রামের হাতে নিহত হন।

মায়াবিনং মহাঘোরং রাবণং লোককন্টকম্।
তমাগস্কারিণং রামঃ পৌলস্ত্যমজিতং পরৈঃ॥
জঘান সমরে ক্রুদ্ধঃ পুরেব ত্র্যম্বকোঽন্ধকম্।
সুরাসুরৈরবধ্যং তং দেবব্রাহ্মণকন্টকম্॥
জঘান স মহাবাহুঃ পৌলস্ত্যং সগণং রণে। ৫৯। ৫-৬

এই পর্বে অন্যত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বত্থামা বার বার ঘটোৎকচকে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হবার জন্য বললে, ঘটোৎকচ নিজের বীরত্বের গর্ব করে বলেন যে তিনি যুদ্ধের ভয়ে ভীত নন। তিনি রাক্ষসগণের অধিপতি রাবণের ন্যায় পরাক্রমশালী।

পাণ্ডবানামহং পুত্রঃ সমরেষ্বনিবর্তিনাম্।
রক্ষসামধিরাজোঽহং দশগ্রীবসমো বলে॥ ১৫৬।৯৮

শান্তিপর্বের অন্তর্গত দাক্ষিণাত্য-পাঠে পিতামহ ভীষ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করার সময় বলেছেন—সেই ক্ষত্রিয়কুলের প্রধান পুরুষকে নমস্কার। যিনি দশরথের পুত্র রামরূপে পুলস্ত্যনন্দন রাবণকে নিহত করেছিলেন।

রামো দাশরথির্ভূত্বা পুলস্ত্যকুলনন্দনম্।
জঘান রাবণং সংখ্যে তস্মৈ ক্ষত্রাত্মনে নমঃ॥ অধ্যায় ৪৭, পৃ. ৪৫৩৬

পিতামহ ভীষ্মের বাক্যে এখানে রাবণের সঙ্গে রামের কথাও এসেছে।

এই পর্বেই অন্যত্র ভগবান বিষ্ণু বিশেষ বিশেষ অবতারগণের পরিচয় দেবার সময় স্বয়ং বলেছেন— আমি দেবকার্য সাধন করার জন্য বানরদিগের সাহায্যে পুলস্ত্যকুলকলঙ্ক রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সবংশে বিনাশ করব।

তে সহায়া ভবিষ্যন্তি সুরকার্যে মম দ্বিজ।
ততো রক্ষঃপতিং ঘোরং পুলস্ত্যকুলপাংসনম্॥
হরিষ্যে রাবণং রৌদ্রং সগণং লোককন্টকম্।
দ্বাপরস্য কলেশ্চৈব সংধৌ পার্যবসানিকে॥ ৩৩৯।৮৮-৮৯

আবার এই পর্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট পিতামহ ভীষ্ম-কথিত 'নাগ-নাগপত্নী সংবাদে' রাবণের ক্রোধের উল্লেখ করে নাগরাজ স্বীয় পত্নীকে বলেছেন— ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবলপ্রতাপশালী রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে রামের হাতে নিহত হন।

রোষস্য হি বশং গত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
তথা শক্রপ্রতিস্পর্ধী হতো রামেণ সংযুগে॥ ৩৬০।১৫

বিভীষণ

মহাভারতে ইতস্তত রাবণভ্রাতা বিভীষণের নামও দেখা যায়।

সভাপর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় সহদেব কর গ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে গমন করেন। এই দিগ্‌বিজয়কালে তিনি কচ্ছদেশে অবস্থানপূর্বক বিভীষণের নিকট কর আদায়ের জন্য ঘটোৎকচকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। বিভীষণ সহদেবের শাসন মেনে নেন এবং বিবিধ মূল্যবান দ্রব্য প্রেরণ করেন।

প্রেষয়ামাস হৈড়িম্বং পৌলস্ত্যায় মহাত্মনে।
বিভীষণায় ধর্মাত্মা প্রীতিপূর্বমরিন্দমঃ॥ ৩১।৭৩

এই পর্বেই দাক্ষিণাত্য-পাঠে আরও কয়েকটি স্থলে বিভীষণের নাম পাওয়া যায়।[২৩]

বনপর্বে হনুমান ভীমসেনের নিকট যে সংক্ষিপ্ত রামোপাখ্যান বলেন তাতে রাম-কর্তৃক বিভীষণের রাজ্য প্রাপ্তির কথা এসেছে। তিনি ভীমসেনের উদ্দেশে বলেছেন— রাম রাক্ষসগণকে বধ করে তাঁর অনুগত বিভীষণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

নিশাচরেন্দ্রং হত্বা তু সভ্রাতৃসুতবান্ধবম্॥
রাজ্যেঽভিষিচ্য লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্। ১৪৮।১২ গঘ, ১৩কখ

এ ছাড়া পূর্বোল্লিখিত মার্কণ্ডেয়-কথিত রামোপাখ্যানেও বিভীষণের নাম দেখা যায়।

রামায়ণের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ন্যায় মহাভারতে হনুমানের নামও ইতস্তত লক্ষ্য করা যায়। বনপর্বে রামায়ণ-খ্যাত হনুমান ভীমসেনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় রত। মহাশক্তিশালী ভীমসেন এই হনুমানের শক্তির কাছে পরাস্ত হন। ভীমসেনের নানা প্রশ্নের উত্তরদানের সঙ্গে যুগধর্ম সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনাও আমরা তাঁর মুখে শুনতে পাই। এই বর্ণনায় আমরা হনুমানের সম্যক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাই। (অধ্যায়, ১৪৭-১৫০)

২৩ (ক) তং দূতমাগতং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ॥
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং সান্ত্বপূর্বংবচোঽব্রবীৎ। ৩১ অধ্যায়, পৃঃ ৭৬১

(খ) অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রাজন্ রত্নানি চ বহূনি চ।
স দদৌ সহদেবায় তদা রাজা বিভীষণঃ। ৩১ অধ্যায়, পৃঃ ৭৬৪

(গ) সহদেব ঘটোৎকচের উদ্দেশে বলেছেন—
গচ্ছ লঙ্কাং পুরীং বৎস করার্থং মম শাসনাৎ।
তত্র দৃষ্ট্বা মহাত্মানং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্॥ ৩১ অধ্যায়, পৃঃ ৭৫৯

(ঘ) বিভীষণং চ রাজানমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রদক্ষিণং পরীত্যৈব নির্জগাম ঘটোৎকচঃ॥ ৩১ অধ্যায়, পৃঃ ৭৬৪

দ্রোণপর্বে ভীমসেন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কর্ণ ভীমসেনকে শরজালে অতিশয় পীড়িত করে তুলেছেন। ভীমসেনের সকল অস্ত্রই কর্ণ-বাণে ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থায় ভীমসেন আত্মরক্ষার জন্য অর্জুনের শরাঘাতে নিহত একটি হাতিকে তুলে ধরলেন। ভীমের এই হাতি উত্তোলনকে সঞ্জয় অতীতে হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত উত্তোলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মহৌষধিসমাযুক্তং হনূমানিব পর্বতম্।
তমস্য বিশিখৈঃ কর্ণো ব্যধমৎ কুঞ্জরং পুনঃ॥ ১৩৯।৮৬

মহাভারতের সভাপর্বে (সা. সং. Appr. ৪৩, pr ২৫, ১০৫, ১১০) যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে চার ভাই দ্রোপদীর হস্তিনাপুর ত্যাগ করে বনগমনের সঙ্গে রামের সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনগমনের মর্মস্পর্শী অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনায় দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৈকেয়ী প্রভৃতির কথা এসেছে।*

খ. যুদ্ধ

মহাভারত ভারতযুদ্ধের ইতিহাস। এই মহাভারত মহাকাব্যে ঋষি-কবি বেদব্যাসের লেখনীতে বহু বীরের লোমহর্ষক সংঘর্ষ বিধৃত হয়েছে। মহাকবি এইসকল যুদ্ধের বীভৎসতাকে অনেক সময় অতীত মহাবীরগণের যুদ্ধের ভীষণতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মহর্ষি বেদব্যাসের এই যুদ্ধ বর্ণনায় নানা স্থলে উপমা হিসেবে রামায়ণ মহাকাব্যের বাল্মীকি-বর্ণিত যুদ্ধের কথা এসেছে। যেমন—

বনপর্বে মহাবীর ভীমসেন জটাসুরের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। উভয়েই অপরকে বধের জন্য কৃতসংকল্প। উভয়েরই উরুর আঘাতে বৃক্ষাবলী ভেঙে পড়েছে। এই ভীষণ সংগ্রাম সম্পর্কে বৈশম্পায়ন বলেছেন— পুরাকালে বালী এবং সুগ্রীব ভার্যার জন্য যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিলেন ইঁহারাও সেরূপ বৃক্ষযুদ্ধ করতে লাগলেন।

তদ্ বৃক্ষযুদ্ধমভবন্মহীরূহবিনাশনম্।
বালিসুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পুরা স্ত্রীকাঙ্ক্ষিণোর্যথা।। ১৫৭।৬০

বিরাট পর্বে আমরা দেখি দ্রৌপদীর মর্যাদা হরণেচ্ছু কীচককে বধ করার জন্য ভীমসেন গুপ্তভাবে বিরাটরাজের নৃত্যশালায় অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে কীচক মনোরম অলংকারে সজ্জিত হয়ে নৃত্যশালায় প্রবেশ করলেন। উদ্দেশ্য দ্রৌপদী লাভ। মুহূর্তে ভীমসেন কীচকের কেশাকর্ষণপূর্বক এক ভীষণ বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে ভীমসেন ও কীচকের যুদ্ধকে কপিকুল-সিংহ বালী এবং সুগ্রীব পত্নীর জন্য যে ভীষণ বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বালিসুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পুরেব কপিসিংহয়োঃ।
অন্যোন্যমপি সংরব্ধৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ॥ ২২।৫৫

---

* ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র কৃষ্ণয়া সহ ভার্যয়া।
রামো যথা মহারাজ ধর্মরাজো যথৌ তথা॥

দ্রোণপর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে নকুল ও সহদেবের বাণের আঘাতে শকুনি আহত ও হতোৎসাহ হয়ে পড়েছেন। যুদ্ধ করতে অসমর্থ দেখে মাদ্রী-পুত্রদ্বয় বাণবৃষ্টিতে তাঁকে আচ্ছন্ন করে তুলেছেন। এদিকে প্রবল বলশালী ঘটোৎকচ নতুন উৎসাহে অলায়ুধ রাক্ষসের উদ্দেশে ছুটলেন। উভয় রাক্ষসে আরম্ভ হল ভীষণ যুদ্ধ। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই রাক্ষসদ্বয়ের যুদ্ধের ভীষণতাকে রাম-রাবণ যুদ্ধের ভীষণতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন— মহারাজ, এই যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের মতোই ভীষণ।

তয়োর্যুদ্ধং মহারাজ চিত্ররূপমিবাভবৎ।
যাদৃশং হি পুরা বৃত্তং রামরাবণয়োর্মৃধে।। ৯৬।২৮

অন্যত্র এই পর্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকট পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদের সঙ্গে কৌরব পক্ষীয় বীরদের যুদ্ধের বর্ণনা শুনছেন। দুর্ধর্ষ ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে মহাবীর ভীমসেনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধ ভীষণ থেকে ভীষণতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সঞ্জয় উভয়ের এই দারুণ যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন— মহারাজ এই যুদ্ধ পুরাকালে অনুষ্ঠিত রাক্ষস প্রধান রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধের মতোই বলা চলে।

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং নররাক্ষসয়োর্মৃধে।
যাদৃগেব পুরা বৃত্তং রামরাবণয়োর্নৃপ।। ১০৬।১৭

আবার এই পর্বেই মহাবীর ঘটোৎকচের সঙ্গে বলবান অলম্বুষের সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। উভয় রাক্ষসই নিজ শক্তি প্রভাবে অপরকে পরাজিত করতে কৃতসংকল্প। যুদ্ধ এক চরম পর্যায়ে উন্নীত। সঞ্জয় কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন— মহারাজ, এই ভীষণ যুদ্ধকে পুরাকালের রাম-রাবণের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

তয়োর্যুদ্ধং সমভবদ্ রক্ষোগ্রামণিমুখ্যয়োঃ।।
যাদৃগেব পুরা বৃত্তং রামরাবণয়োঃ প্রভো। ১০৯।৩ গ.ঘ.-৪ ক.খ.

অন্যত্র এই পর্বে ভ্রাতা রাক্ষসরাজ অলায়ুধ ও ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। উভয়েই উভয়কে বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর। সঞ্জয় কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এই ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন— মহারাজ, পুরাকালে অনুষ্ঠিত বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধের মতোই এই যুদ্ধ ভয়ানক।

যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং ভৈম্যলায়ুধয়োর্নৃপ।।
হরীন্দ্রয়োর্যথা রাজন্ বালিসুগ্রীবয়োঃ পুরা। ১৭৮।২৭ গ.ঘ.-২৮ ক.খ.

কর্ণ পর্বে উদ্ধৃত দাক্ষিণাত্য-পাঠে শিখণ্ডী ও কৃপাচার্যের সংগ্রামকে সঞ্জয় পুরাকালে অনুষ্ঠিত রাম-রাবণের সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মহদাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং মুহূর্তমিব দারুণম্।
ক্রুদ্ধয়োঃ সমরে রাজন্ রামরাবণয়োরিব।। অধ্যায়-৫৪, পৃ. ৩৯৩২

শল্যপর্বে দুর্যোধন ও ভীমসেন উভয়েই গদাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। দুর্যোধন রোষনেত্র বার বার ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ পূর্বক যুদ্ধে আহ্বান করলেন। মহাশক্তিশালী ভীমসেনও পাথরের ন্যায় দৃঢ় গঠিত গদা-গ্রহণ-পূর্বক সিংহের ন্যায় দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। সঞ্জয় এই যুদ্ধোন্মত্ত দুই বীরকে যুদ্ধোদ্ধত রাম-রাবণ ও বালী-সুগ্রীবের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রামরাবণয়োশ্চৈব বালিসুগ্রীবয়োস্তথা।
তথৈব কালস্য সমৌ মৃত্যোশ্চৈব পরন্তপৌ॥ ৫৫।৩১

উপরোক্ত উদ্ধৃতি ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল যে, মহাভারতের প্রায় প্রতিটি পর্বেই রামায়ণ মহাকাব্যের ব্যক্তি ও যুদ্ধ ইতস্তত উদাহরণমুখে বার বার এসেছে।

অনেক পণ্ডিত মহাভারতে রামায়ণ মহাকাব্যের এইসকল উদ্ধৃতিকে প্রক্ষিপ্ত বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মহাভারতের যে-সকল অংশ ঐ মহাকাব্যের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মহাকাব্য গঠনে একান্ত অপরিহার্য সেইসকল স্থলেই রামায়ণের বিভিন্ন কথা-পুরুষ ও যুদ্ধের প্রসঙ্গ বেশি এসেছে। যেমন— বিরাট পর্ব, বনপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব প্রভৃতি। এই পর্বগুলিকে বাদ দিয়ে মহাভারতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কারণ এইসকল অংশেই ভারত-যুদ্ধের মূল আখ্যান মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনীতে বিধৃত হয়েছে। মহাকাব্যের এইসকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলে স্বীকার করলে সমগ্র মহাভারতকেই প্রক্ষিপ্ত বলতে হয়। তা ছাড়া কেহ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মহাভারতে রামায়ণের উপাদান সংযুক্ত করবে বলে তৈরি ছিল না। এরূপ ধারণা অযৌক্তিক। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যই স্বাভাবিকতা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রসিদ্ধ রাম-কাহিনীর বিভিন্ন উপাদান মহাভারতে স্থান পেয়েছে।

তা ছাড়া মহাভারত-কর্তা তিন ব্যক্তিই একই বিদ্যা বংশের অন্তর্ভুক্ত।[২৪] তাই এঁদের কেউই পরম গুরুর মাহাত্ম্য খর্ব করে বাল্মীকির মাহাত্ম্য দেখাতে যাবেন না। বস্তুত মহাভারতের প্রধান প্রধান অংশগুলি লিখিত হবার সময় রামায়ণের সকল ঘটনাই সমাজ-জীবনে উদাহরণস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। তাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মহাভারতের পক্ষে এই রাম-কথার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়নি। আমাদের আলোচিত উদাহরণগুলির প্রত্যেকটিই এই সিদ্ধান্তের মুখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য হবার দাবি রাখে।

২৪ একটি বেদব্যাস (উপরিচয় থেকে শুরু)
দ্বিতীয় বৈশম্পায়ন (আস্তিক পর্ব থেকে শুরু)
তৃতীয় সৌতি (নারায়ণং নমস্কৃত্য থেকে শুরু)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাকাব্যদ্বয়ে শ্লোকগত সাম্য

এই অধ্যায়ে সমগ্র রামায়ণ[1] ও সমগ্র মহাভারত থেকে শ্লোকগত সাম্য দেখানো হয়েছে। উভয়গ্রন্থে অনেক সময় একই বক্তব্য বিষয় একই শ্লোকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো স্থলে ভাষায় সামান্য ভেদ থাকলেও বক্তব্য বিষয় গ্রন্থদ্বয়ে একই দেখা যায়। এখানে প্রথমে রামায়ণে কোথায় কী প্রসঙ্গে শ্লোকগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা উল্লেখ করে মহাভারতে কোথায় কোন্ প্রসঙ্গে হুবহু অথবা কতটুকু ভাষান্তরে সেগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

রামায়ণে ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে পুণ্যময় রামচরিত্র শ্লোকাকারে রচনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন— পৃথিবীতে যতদিন গিরিমালা বিরাজ করবে এবং নদীসকল প্রবাহিত হবে ততদিন মনুষ্যসমাজে এই রাম-কথার প্রচলন থাকবে।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥
তাবদ্রামায়ণ-কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি। ১।২।৩৫

গীতা প্রেঃ ৩৬ গঘ-৩৭ কখ

মহাভারতে কর্ণ কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন— হে কেশব, কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যেন তোমার জন্য প্রাণ না হারান। শুধুমাত্র ক্ষত্রিয় বীরগণ শত্রুদ্বারা নিহত হলে, গিরিমালা ও নদীসকল যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিনই পৃথিবীতে তোমার কীর্তি অমর হয়ে থাকবে।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ জনার্দন।
তাবৎ কীর্তিভবঃ শব্দঃ শাশ্বতোঽয়ং ভবিষ্যতি॥ ৫।১৪১।৫৫

আবার মহাভারতের অপর এক স্থলে পুত্র শুকদেব পরমপদ লাভ করলে ব্যাসদেব নিরন্তর তাঁকে চিন্তা করতে থাকেন। ফলে পশুপতি স্বয়ং অভয়বাণীতে মহর্ষিকে বলেন—হে বিপ্রর্ষে, তোমার পুত্র দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য পরমগতি লাভ করেছে। শোক পরিত্যাগ করো। যতদিন পর্বতসকল বর্তমান থাকবে, সাগরসকল বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমার কীর্তি অক্ষয় থাকবে।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ো যাবৎ স্থাস্যন্তি সাগরাঃ।
তাবৎ তবাক্ষয়া কীর্তিঃ সপুত্রস্য ভবিষ্যতি॥ ১২।৩৩৩।৩৭

---

১ এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত রামায়ণের শ্লোকগুলি সমীক্ষিক সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

মহাভারতের শ্লোকদুটি রামায়ণ থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটির সঙ্গে ভাষায় সামান্য ভেদ থাকলেও ভাবগত মিল লক্ষণীয়।

রামায়ণে বর্ণিত বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ কলহে বিশ্বামিত্র শবলাকে বলপূর্বক নিয়ে যেতে চাইলে শবলার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে নানা জাতির সৈন্য উৎপন্ন হয়—এই প্রসঙ্গে একটি শ্লোকাংশের উল্লেখ করা যেতে পারে যার সঙ্গে মহাভারতে উদ্ধৃত একটি শ্লোকাংশের সাদৃশ্য বর্তমান। রামায়ণের শ্লোকাংশটি হল—

যোনিদেশাশ্চ যবনাঃ শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ। ১।৫৫।৩ ক.খ.

মহাভারতের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র কহলের সময় নন্দিনীর বিভিন্ন অঙ্গ থেকে নানা জাতির সৈন্য উৎপন্ন হয়। রামায়ণের সঙ্গে সাদৃশ্যবাহী সেই শ্লোকাংশটি হল—

যোনিদেশাশ্চ যবনান্ শকৃতঃ শবরান্ বহূন্। ১।১৭৪।৩৬ গ.ঘ.

রামায়ণে রাজা ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির পর বিশ্বামিত্রের নিকট বলেছেন— আমার গুরু বশিষ্ঠ ও তাঁর পুত্রগণ প্রসন্ন হচ্ছেন না। এখন আমি মনে করছি যে দৈবই প্রধান, পুরুষকার অর্থহীন।

দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্।
দৈবেনাক্রম্যতে সর্বং দৈবং হি পরমা গতিঃ॥ ১।৫৭।২১

মহাভারতেও অনেক স্থলেই কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধন প্রভৃতির কণ্ঠে এই ভাষাতেই সংসারের চরম সত্যটি ধ্বনিত হয়েছে। যেমন—

দুর্যোধন পাণ্ডবগণের নানাবিধ উন্নতিতে একান্ত বিষণ্ণ হয়ে মাতুল শকুনির নিকট দৈবই যে প্রধান তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন— যুধিষ্ঠিরের সেই বিশাল পবিত্র রাজলক্ষ্মী দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক।

তেন দৈবং পরং মন্যে পৌরুষং চ নিরর্থকম্। ২।৪৭।৩৬ ক.খ.

আবার উদ্‌যোগ পর্বের 'ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদে' এই ভাষা ও ভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

দিষ্টমের পরং মন্যে পৌরুষং চাপ্যনর্থকম্। ১৫৯।৪ ক.খ.

দ্রোণপর্বেও দৈববাণী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন—

দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্। ১৩৫।১ ক.খ.

রামায়ণে রামের বনগমনের সিদ্ধান্তে জননী কৌশল্যার সকরুণ বিলাপ শুনে লক্ষ্মণ ক্রোধের সঙ্গে বলেছেন—

বৃদ্ধ পিতার নির্দেশে রামের বনে যাওয়া উচিত নয়। তাঁর যুক্তি— গুরু যদি গর্বিত হন, যদি কার্যাকার্যজ্ঞানশূন্য হন এবং যদি তিনি বিপথে গমন করেন তবে তাঁকে শাসন করা উচিত।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্যং ভবতি শাসনম্॥ ২ (গীতা প্রেঃ ২১।১৬)

মহাভারতেও যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত পিতামহ ভীষ্ম-কথিত 'ভরদ্বাজ-শত্রুঞ্জয় সংবাদে' রাজা শত্রুঞ্জয়ের প্রতি নানা উপদেশের সঙ্গে এই ভাষাতেই একই সিদ্ধান্ত উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাসনম্।। ১২।১৪০।৪৮

উদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকটিতে 'কার্য' শব্দটির স্থলে 'দণ্ড' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্‌যোগ পর্বে পিতামহ ভীষ্ম গুরু পরশুরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন—পুরাণে এরূপ শোনা যায় যে, মহাত্মা মরুও বলেছেন গুরুও যদি গর্ববশত কর্তব্যবিষয়ে জ্ঞানশূন্য হন, কু-পথে পরিচালিত হন, তবে সেই গুরুকে ত্যাগ করা শিষ্যের কর্তব্য।

গুরোপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ১৭৮।৪৮

মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে রামের সঙ্গে সীতা বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কৌশল্যা পুত্রবধূ সীতাকে বিবিধ উপদেশের মাধ্যমে সাধ্বী নারীর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন। রাজমাতা কৌশল্যার বাক্য শুনে সীতা বললেন—পিতা ভ্রাতা ও পুত্র যা দান করে তা পরিমিত। কিন্তু স্বামীর যে দান তা অপরিমিত। সুতরাং কোন্ স্ত্রী এরূপ অপরিমিত দানকারী পতিকে সম্মান না করে?

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য হি দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ।। ২।৩৪।২৬

মহর্ষি বেদব্যাসের মহাকাব্যের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে 'ভার্গব-মুচুকুন্দ সংবাদ' কীর্তন করেছেন। ঐ সংবাদের অন্তর্গত 'কপোতী-ব্যাধ বৃত্তান্তে' দেখা যায় যে ব্যাধের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কপোত অগ্নিতে প্রবেশ করে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করলে কপোতী শোকাকুল চিত্তে স্বামীর প্রশংসাবসরে বলেছে—

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য হি দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ॥ ১৪৮।৬ গ.ঘ. ৭ ক.খ।

মহাভারতে উদ্ধৃত শ্লোকটিতে 'মাতা' শব্দটির স্থলে 'ভ্রাতা' শব্দটি গৃহীত হয়েছে।

রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের অন্তর্গত চুরানব্বই সর্গ। রাম সত্যরক্ষার জন্য বনে গমন করেছেন, সঙ্গে সহধর্মিণী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণ। ভরত মাতুলালয় থেকে ফিরে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে পিতা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

তারপর চিত্রকূট পর্বত চললেন অগ্রজ রামকে ফিরিয়ে আনার মানসে। ঐ পর্বতেই ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন হল।

রাম অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের ন্যায় ভরতকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসায় তৎপর হলেন।

অনুরূপভাবে মহাভারতের সভাপর্ব। অধ্যায় পঞ্চম। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হয়েছেন দেবর্ষি নারদ। উভয়ের আলোচনাবসরে দেবর্ষির মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে প্রশ্নচ্ছলে রাজনীতি বিষয়ক নানা উপদেশ।

উভয় গ্রন্থেই প্রশ্নমুখে রাজার কর্তব্যবিষয়ক যে-সকল বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির সাম্য আমাদের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে।

রামায়ণে ভাই ভরতের নিকট রাম-কর্তৃক রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বাক্যসকল দ্বারা শুধুমাত্র রাজ্যের কুশলই নয়, পরন্তু ভরত কীভাবে রাজ্য পরিচালনা করবেন তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আবার মহাভারতের সভাপর্বে নারদের উপদেশবাক্যে যুধিষ্ঠির কিভাবে রাজ্যশাসন করবেন তার উপদেশও স্পষ্ট। উভয়ক্ষেত্রে যে-সকল স্থলে একই শ্লোকের মাধ্যমে একই বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে। (মহাভারতের সামান্য পাঠান্তর বন্ধনীর মধ্যে দ্রষ্টব্য।)

যোগ্য বা শ্রেয়োলাভেচ্ছু রাজার কর্তব্য বুদ্ধিমান, বীর, সংযতেন্দ্রিয় এবং কার্যদক্ষ অন্তত একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করা। কারণ এরূপ মন্ত্রী সর্বদা রাজার বিশেষ উন্নতি সাধনে সমর্থ হন।[২] রাজা সর্বদা সহস্রাধিক মূর্খ ব্যক্তি অপেক্ষা বরং একজন মাত্র পণ্ডিত ব্যক্তিকেই সমাদর করবেন। কারণ অর্থ সংকট উপস্থিত হলে ঐ পণ্ডিত ব্যক্তিই রাজাকে বাঁচাতে পারবেন।[৩]

রাজার সকল দুর্গই ধন, ধান্য, অস্ত্র, জল, যন্ত্র, শিল্পী ও যোদ্ধাদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকা প্রয়োজন।[৪] বিনয়ী, সৎকুলজাত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, অসূয়াশূন্য এবং প্রশান্তচিত্ত একজন পুরোহিতকে সম্মানপূর্বক নিযুক্ত করা রাজার একান্ত কর্তব্য।[৫]

---

২. একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দক্ষো (দান্তো) বিচক্ষণঃ।
রাজানং রাজমাত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্।। রা.মা.-১৯, ম.ভা.-৩৭

৩ কশ্চিৎ সহস্রা (স্রৈ) ন্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি (ক্রীণাসি) পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ (পরম্)॥—রা মা. ১৭, ম.ভা.-৩৫

৪ কশ্চিদ সর্বাণি, (দুর্গাণি) দুর্গাণি (সর্বাণি) ধনধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ পরিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ॥—বা মা.-৪৪, ম.ভা.-৩৬

৫. কশ্চিদ্বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
অনসূয়ুরনুদ্রষ্টা (অনসূয়ুরনুপ্রষ্টা) সংকৃতস্তে পুরোহিতঃ॥ রা.মা.-৭, ম.ভা.-৪০

কালজ্ঞ রাজার উচিত কালবিভাগ করে যথাকালে সমানভাবে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা।[৬]

কপটতাশূন্য, কুলক্রমাগত, পবিত্রস্বভাব এবং সৎকুলজাত মন্ত্রীদিগকে প্রধান প্রধান কর্মে নিযুক্ত করা রাজার একান্ত কর্তব্য।[৭]

সৎকুলোৎপন্ন, সাধুচরিত্র এবং সৎকার্যপরায়ণ ব্যক্তি চৌর্যাপবাদগ্রস্ত হলে, মূর্খ রাজকর্মচারীরা লোভবশত যাতে তাঁকে হত্যা না করে সে বিষয়ে রাজার সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।[৮]

চতুর, বীর, বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, পবিত্রস্বভাব, সদ্‌বংশজাত, অনুরক্ত এবং যুদ্ধদক্ষ ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করা রাজার কর্তব্য।[৯]

সৈন্যগণকে দেয় যথোচিত খাদ্য এবং বেতন যথাসময়ে প্রদান করা রাজার পক্ষে মঙ্গলকর। এ বিষয়ে বিলম্ব রাজার পক্ষে ক্ষতিকর।[১০]

ভয়ংকর দণ্ডবিধানপূর্বক প্রজাগণকে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন করা রাজার কর্তব্য নয়। মন্ত্রিগণের সাহায্যে রাজ্য শাসন করা রাজার কর্তব্য।[১১]

রাজার কখনও একাকী মন্ত্রণা করা উচিত নয়, আবার বহুলোকের সঙ্গেও মন্ত্রণা করা বিধেয় নয়। মন্ত্রণার বিষয় যাতে রাজ্যমধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে রাজার সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।[১২]

৬. অশ্চিদর্থং চ ধর্মং চ কামং চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্বান্ ভারত সেবসে (সদা বরদ সেবসে)॥ রা.মা. ৫৪. ম ভা. ২০

৭. অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহাঞ্ছুচীন্।
শ্রেষ্ঠাঞ্ছ্রেষ্ঠেষু কচ্চিত্ত্বং নিযোজয়সি কর্মসু॥ রা.মা.২১.ম.ভা.-৪৪

৮. কচ্চিদার্যো বিশুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চোরকর্মণা (ক্ষারিতশ্চৌরকর্মণি)॥
অপৃষ্টঃ (অদৃষ্ট) শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ॥—রা.মা.৪৭, ম.ভা.-১০৫

৯ কশ্চিদ্ ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ (মতিমান্) মতিমান্ (ধৃতিমান) শুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ (স্তথা)॥ —রা.মা. ২৪, ম.ভা -৪৭

১০. কাশ্চিদ্ বলস্য ভক্তং চ বেতনং চ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালং (কালে) দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে (বিকর্যসি)॥ রা মা.-২৬, ম.ভা.-৪৯

১১ কশ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতপ্রজম্ (ভৃশমুদ্বিজসে প্রজাঃ)।
রাষ্ট্রং তবানুজানন্তি (তবানুশাসন্তি) মন্ত্রিণঃ কৈকেয়ীসুত (ভরতর্ষভ)॥ রা মা. পৃ ৫৩৫,
২১৪১*, ম.ভা. ৪৫

১২. কশ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কশ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো ন রাষ্ট্রং পরিধাবতি॥ রা.মা. ১৩. ম.ভা. ৩০

যারা দৈনিক বা মাসিক বেতনে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের বেতন যথাসময়ে দেওয়া রাজার পক্ষে মঙ্গলকর। অন্যথায় তারা প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। ফলে মহাবিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়।[১৩]

রাজার কখনও নিদ্রার অধীন হওয়া উচিত নয়, যথাসময়ে জেগে থাকা কর্তব্য। তিনি রাত্রিশেষে কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করবেন।[১৪]

রাজা কখনোই অর্থসেবা দ্বারা ধর্মকে কিংবা ধর্মসেবা দ্বারা অর্থকে অথবা ক্ষণমাত্র প্রীতিকারক কামসেবা দ্বারা অর্থ ও ধর্ম উভয়কেই পরিত্যাগ করবেন না।[১৫]

প্রজাদিগকে ভয়ংকর দণ্ডবিধান করলে, যাজকেরা যেরূপ পতিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেন এবং স্ত্রীলোকেরা যেমন উগ্রস্বভাব অথচ কামুক স্বামীকে অবজ্ঞা করেন, রাজাও প্রজাদের অবজ্ঞার পাত্র রূপে পরিণত হন।[১৬]

বিধানজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সরলস্বভাব এমন একজন ব্যক্তিকে রাজার অগ্নিহোত্রে নিয়োগ করা উচিত যিনি প্রত্যহ যথাসময়ে এসে যে হোম করেছেন বা হোম করবেন তা রাজাকে অবহিত করাবেন।[১৭]

নাস্তিকতা, মিথ্যাব্যবহার, ক্রোধ, অনবধানতা. দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করা, আলস্য, অস্থিরচিত্ততা, কেবলই অর্থের চিন্তা, অনভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা, নিশ্চিত কাজ আরম্ভ না করা, মন্ত্রণা প্রকাশ করা, শত্রুর প্রতি বিষ প্রয়োগ প্রভৃতি করা এবং বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া— রাজার উচিত এই চতুর্দশ দোষ পরিহার করা।[১৮]

রামায়ণে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করছেন : তোমার বেদাধ্যয়ন সফল হয়েছে তো? ভার্যা সফল হয়েছে তো? অন্যান্য শাস্ত্রাধ্যয়ন সফল হয়েছে তো?

---

১৩. কালাতিক্রমণে (কালাতিক্রমণাদেতে) হ্যেব ভক্তবেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি (যদভৃত্যাঃ) সোঽনর্থঃ সুমহান্ স্মৃতঃ॥ রা.মা ২৭, ম.ভা.-৫০

১৪. কশ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কশ্চিৎ কালে বিবুধ্যসে।
কশ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থনৈপুণম্ (চিন্তযস্যর্থমর্থবিৎ)॥—রা.মা.-১২, ম.ভা. -২৯

১৫. কচ্চিদর্থেন বা ধর্মমর্থং ধর্মেণ বা পুনঃ (ধর্মেণার্থমথাপি বা)
উভৌ বা প্রীতিলোভেন (প্রীতিসারেণ) (ন) কামেন ন বিবাধসে (প্রবাধসে)॥
রা.মা.-৫৩, ম.ভা.১৯

১৬. কশ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা।
উগ্রপ্রতিগ্রহীতারং কামযানমিব স্ত্রিয়ঃ॥ রা.মা -২২, ম.ভা.-৪৬

১৭. কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
হুতং চ হোষ্যমাণং চ কালে বেদয়তে সদা॥ রা.মা.-৮, ম.ভা ৪১

১৮ নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্॥ রা.মা. ৬৬, ম.ভা ১০৮ কখ. খঘ

মহাভারতেও মহর্ষি নারদ সমজাতীয় শ্লোকের মাধ্যমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্নই করেছেন।[১৯] আবার সামন্ত রাজাদের প্রসঙ্গে রাম ভরতকে যে প্রশ্ন করেছেন।

মহাভারতেও মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে সেই প্রশ্ন করেছেন।[২০]

বিপক্ষের অপরিচিত এমন তিনটি গুপ্তচর নিয়োগ পূর্বক বিপক্ষের আঠারো জন লোককে, অর্থাৎ বিপক্ষের মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দ্বারপাল, অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, কারাগার-রক্ষক, আয়সচিব, রক্ষি-পরিচালক, নগর-রক্ষক, শিল্প-পরিচালক, কর্মাধ্যক্ষ, সভাধ্যক্ষ, দণ্ডসচিব, দূর্গরক্ষক, সীমান্ত-রক্ষক এবং বন-রক্ষককে আর স্বপক্ষের মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ ব্যতীত ঐ অপর পনেরো জনকে রাজার পরীক্ষা করা কর্তব্য।[২১]

বিশ্বস্ত, লোভশূন্য এবং কুলক্রমাগত লোকেরা রাজার কোন্ কোন্ কাজ সম্পন্ন করেছে অথবা সম্পন্ন করে এনেছে অথচ তার ফল হস্তগত হয়নি এমন অবস্থায়ও যাতে অন্যে তাব সংবাদ না জানতে পারে সে বিষয়ে রাজার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।[২২]

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ ও অমাত্যগণ-কর্তৃক যত্নপূর্বক সংগোপিত মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়ের মূল।[২৩]

কর্মচারিগণ নিঃসংকোচে যাতে রাজার নয়নগোচর না হয়, অথবা সর্বদা রাজার দর্শন পরিহার করে যাতে না চলে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কর্মচারিগণের সর্বদা দর্শন একান্ত অদর্শন এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বনই রাজার অভীষ্ট সিদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।[২৪]

---

১৯. কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ (সফলংধনম্)।
কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎতে সফলং শ্রুতম্॥ রা.মা. পৃ: ৫৪২, ২১৬৫,১০,
ম.ভা. ১১১

২০ কচ্চিৎ সর্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ (ভূমিপালাঃ) প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু (ত্বদর্থেষু সংত্যজন্তি সমাহিতাঃ (ত্বয়াঽহৃদৃতাঃ)॥ রা.মা. ২৮,
ম.ভা. ৯৬

২১. কাচ্চদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারকৈঃ॥ রা.মা. ৩০, ম.ভা. ৩৮

২২ কচ্চিত্ত্ব সুকৃতান্যের (রাজন্ কৃতান্যেব) কৃতরূপাণি (কৃতপ্রায়াণি) বা পুনঃ।
বিদুস্তে সর্বকার্যাণি (বীর কর্মাণি) ন কর্তব্যানি পার্থিবাঃ (নানবাপ্তানি কানিচিৎ)॥
রা.মা ১৫, ম.ভা. ৩৩, গ.ঘ ৩৪ ক.খ.

২৩ মন্ত্রো বিজয়মূলং হি (বিজয়োমন্ত্রমূলোহি) রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব। (রাজ্ঞো ভবতি ভারত)
সুসংবৃত্তো মন্ত্রধরৈরমাত্যৈঃ (কশ্চিৎ সংবৃতমন্ত্রৈস্তৈরমাত্যৈঃ) শাস্ত্রকোবিদৈঃ॥
রা.মা ১১, ম.ভা ২৭, গ.ঘ ২৮, ক.খ.

২৪ কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া (পরোক্ষাস্তে বিশঙ্কিতাঃ)।
সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্ (সংসৃষ্টং চাত্র কারণম্) রা মা পৃ ৫৩৯, ২১৬০*,
ম ভা. ৩২

রাজার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও সুদগ্রহণ— এই কাজগুলি সৎলোক দ্বারা পরিচালনা করা উচিত। যে-সকল রাজা নিরুপদ্রবে ঐ চারটি কাজের উপর নির্ভর করতে পারেন তাঁরা উন্নতি লাভ করেন।[২৫]

প্রধান প্রধান কাজে উত্তম ব্যক্তিদিগকে, মধ্যম কাজে মধ্যম ব্যক্তিদিগকে এবং নীচ কাজে নীচ ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করা রাজার কর্তব্য।[২৬]

অন্য রাজার রাজ্য জয় করা প্রভৃতি কাজ অল্প ব্যয়ে বা অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন করতে হবে, অথচ তাতে প্রচুর লাভ করতে হবে— এরূপ স্থির করে রাজা শীঘ্রই সে কাজ আরম্ভ করবেন। অনর্থক বিলম্ব করে এরূপ কাজে বিঘ্ন উৎপাদন রাজার অনুচিত।[২৭]

রাজার কর্তব্য মঙ্গলকারী বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি. গুরু, বৃদ্ধ, দেবতা, তপস্বী, দেবায়তনের বৃক্ষ এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করা।[২৮]

যে দুষ্ট ব্যক্তি চুরি করেছে তাকে সেই চুরি করা দ্রব্যসহই ধরে আনলে— রাজকর্মচারী ঘুষের লোভে সেই চোরকে যেন ছেড়ে না দেয়, রাজার সে বিষয়ে নজর রাখা উচিত।[২৯]

শূর শাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় কুলীন ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রিরূপে নিয়োগ করা রাজার একান্ত কর্তব্য।[৩০]

---

২৫. কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্বে কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ।
(কশ্চিৎ স্বনুষ্ঠিতা তাত বার্তা তে সাধুভির্জনৈঃ)
বার্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকো হি (লোকোঽয়ং) সুখমেধতে॥ রা.মা.-৪০, ম.ভা. ৮০

২৬ কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাঃ কর্মসুঃ যোজিতাঃ॥ রা.মা. ২০। ম.ভা. ৪৩

২৭. কচ্চিদর্থং (অর্থান্) বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং (মূলান্) মহোদয়ম্ (মহোদয়ান্)।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্তুং ন দীর্ঘয়সি (বিঘ্নয়সি) রাঘব (তাদৃশান্)॥ রা.মা. ১৪, ম.ভা ৩১

২৮. কচ্চিদ্‌গুরূংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্দেবতাতিথীন্।
(কশ্চিজ্‌জ্ঞাতীন্ গুরূন্ বৃদ্ধান্ দৈবতাংস্তাপসানপি)
চৈত্যাংশ্চ সর্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি॥
(চৈত্যাংশ্চ বৃক্ষান্ কল্যাণান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি)॥ রা.মা ৫২, ম.ভা. ১০১

২৯. গৃহীতশ্চৈব পৃষ্টশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ।
(দুষ্টো গৃহীতস্তৎকারী তজ্‌জ্ঞৈর্দৃষ্টঃ সকারণঃ)
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো (স্তেনো) ধনলোভান্নরর্ষভ (দ্রব্যলোভাৎ)॥ রা.মা. ৪৮, ম ভা. ১০৬

৩০. কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
(কচ্চিদাত্মসমাঃ বৃদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ সম্বোধনক্ষমাঃ)
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ (অনুরক্তাশ্চ) কৃতাস্তে তাত (বীর) মন্ত্রিণঃ।। রা মা. ১০, ম.ভা
২৬ গঘ, ২৭ ক.খ.

একাকী অর্থ চিন্তা, বিপরীতদর্শী ব্যক্তিগণের সঙ্গে মন্ত্রণা, কর্তব্যরূপে নিশ্চিত কাজের অনারম্ভ, মন্ত্রণাপ্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ের যাতে অনুষ্ঠান না হয় সে বিষয়ে রাজার সতর্ক থাকা প্রয়োজন।[৩১]

উল্লিখিত রাজনীতিবিদ্‌গণের পক্ষে একান্ত পালনীয় বিষয়গুলি যথাযথভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাম ভরতকে একটি শ্লোকের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করছেন— ভরত, আয়ুষ্কর যশস্কর এবং ধর্ম, অর্থ ও কামজনক এইরূপ বুদ্ধি ও এইরূপ ব্যবহার তোমার চলছে তো?

অনুরূপভাবে মহাভারতের সভাপর্বেও আমরা দেখি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে নারদের একই প্রশ্ন।[৩২]

উদ্ধৃত রাজনীতি বিষয়ক উপদেশগুলির কোনো কোনোটি বর্তমান মনুসংহিতায় পাওয়া যায়, আবার কোনোটি সেখানে অনুপস্থিত। এ কথা সঠিকভাবে বলা যায় না যে বর্তমান মনুসংহিতা থেকে এগুলি উভয় মহাকাব্যে এসেছে। বর্তমান মনুসংহিতার পূর্বে কোনো বৃহৎ মানবধর্মশাস্ত্র ছিল না, এরূপ বলা যায় না। কারণ ভারতীয় সাহিত্যে মনু একজন নহেন, চৌদ্দ জন। তাঁদের মধ্যে চাক্ষুষ, প্রচেতস্‌, সাবর্ণ, সারোচিষ, স্বায়ম্ভুব, বৈবস্বত মনুর প্রসঙ্গ মহাভারতে এসেছে। বর্তমান মনুসংহিতা বর্তমান মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত মনুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রামায়ণ ও মহাভারতে উপলব্ধ রাজনীতিবিষয়ক মতগুলি অপরাপর মনুর হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে মনুর নামে খ্যাত নানা শ্লোক মুখে মুখে প্রচলিত থাকাও অসম্ভব নয়। এই লোকমুখ-প্রসিদ্ধ শ্লোকগুলি রামায়ণ মহাভারত এবং বর্তমান মনুসংহিতায় সংকলিতও হয়ে থাকতে পারে। এ বিষয়ে অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের *Dharma Sūtras A Study in their Origin and Development* -নামক গ্রন্থের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য :

> Regarding the references to the work of Manu, contained in the *Mahābhārata*, there is nothing in them to prove conclusively the existence of a sūtra work of Manu. The Epic may have referred to the floating mass of verses attributed to Manu or an earlier version of the Manusamhitā.[৩৩]

৩১ একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রণম্‌ (চিন্তনম্‌)।
নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্‌॥ রা মা. ৫৭, ম ভা. ১০৮, ক.খ., ১০৯ ক.খ

৩২. কশ্চিদেষৈব (কশ্চিদেষা চ) তে বুদ্ধির্যথোক্তা (বুদ্ধিবৃত্তিরেষা) মম রাঘব (চতেহনঘ)।
আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্মকামার্থসংহিতা (ধর্মকামার্থদর্শিনী)॥
রা. মা.পৃ ৫৪২, ২১৬০ (১০), ম.ভা. ১০৫

৩৩ পৃ ৪০

মহাকবি বাল্মীকির রাম-কথায় ভরতের মুখে রাম পিতা দশরথের মৃত্যু সংবাদে অতিশয় কাতর হয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ডদানের জন্য মন্দাকিনী তীরে উপনীত হলেন। তার পর কুশের আস্তরণের উপরিভাগে বদরীফল, তিলকল্কমিশ্রিত ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড, অর্পণ করে কাঁদতে কাঁদতে পিতার উদ্দেশে বললেন— মহারাজ, আমাদের যা খাদ্য আপনিও তাই গ্রহণ করুন। মানুষ নিজে যা আহার করে পিতৃগণ ও দেবগণকে তাই অর্পণ করে।

ইদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো ভবতি তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥ ২।৯৫।৩১

মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বে বিদুর সম্বন্ধে অদ্ভুত দৈববাণী শ্রবণান্তর অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— বৎস, তুমি আমার নিকট জল ও ফলমূল গ্রহণ করো। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় থাকে তখন তাকে সে অবস্থায় অনুরূপ অতিথি সৎকার করতে হয়।

আপো মূলং ফলং চৈব মমেদং প্রতিগৃহ্যতাম্।
যদর্থো হি নরো রাজংস্তদর্থোঽস্যাতিথিঃ স্মৃতঃ॥[৩৪]

২৬।৩৬ গঘ,৩৭ কখ

রামায়ণ মহাকাব্যে ভরত রামের হাতে রাজ্যদান করার জন্য সকরুণ অনুরোধ ও পুনঃ পুনঃ অশ্রু বিসর্জন করতে থাকলে রাম তাঁকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে বলেন— সংসারে যে-সকল বস্তু সঞ্চয় করা হয় তাদের ক্ষয় অনিবার্য, সকল প্রকার উন্নতিরই অবনতি ঘটে, সকল সংযোগেরই শেষ পরিণাম বিয়োগ। আর জীবনের পরিণতি মৃত্যুতেই হয়।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥ ২।৯৮।১৬

উত্তর কাণ্ডে আবার দেখা যায় লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করে ব্যথিত হৃদয়ে শোকসন্তপ্ত অগ্রজ রামকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এই শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন।[৩৫]

---

৩৪ যদর্থো স্থলে 'যদন্নো' এবং 'তদর্থো' স্থলে 'তদন্নো' পাঠই অধিকতর যুক্তিসংগত। মহাভারতে সমজাতীয় অপর একটি শ্লোক—

যস্মিন্ যথা বর্ততে মনুষ্য
তস্মিংস্তথা বর্তিতব্যং স ধর্মঃ।। ৫।৩৭।৭ ক খ.

৩৫ ৭-৫১-১০

মহাভারতেও আমরা সংসারের এই চরম সত্যের কথা নারদের মুখে শুনতে পাই। মহর্ষি নারদ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবকে একই ভাষাতেই সত্যটি ব্যক্ত করেছেন।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্॥ ১২।৩৩০।২০

রামায়ণে রাম ভরতকে সিংহাসনে বসার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ ভরত রাজ্যশাসন করলে তাঁর পিতৃসত্য পালন করা হবে এবং অযোধ্যাও শাসনহীন হবে না। ভরত যাতে পিতৃরাজ্য শাসনে অসম্মত না হন তার জন্য পিতার জীবনে পুত্রের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে বলেন— জনশ্রুতি আছে যে, পূর্বে গয়া প্রদেশে বুদ্ধিমান যশস্বী জয় নামক রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে পিতৃপুরুষের প্রীতির জন্য এরূপ গাথা গান করেছিলেন—

যেহেতু পুত্র পিতাকে 'পুং' নামক নরক থেকে ত্রাণ করে ও সর্বতোভাবে রক্ষা করে সেইজন্যই তাকে 'পুত্র' নামে অভিহিত করা হয়।

পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্বতঃ।। ২।১০৭।১২

মহাভারতেও শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট প্রায় একই ভাষাতে 'পুত্র' নামের সার্থকতা ব্যাখ্যা করেছেন।

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥ ১।৭৪।৩৯

শ্লোক দুটির ভাষায় সামান্য পার্থক্য থাকলেও বক্তব্য একই।[৩৬]

বাল্মীকীয় মহাকাব্যে রাম ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসার জন্য অনুরোধ করার সময় পূর্বোক্ত গাথার উল্লেখপূর্বক আরও বলেন— মানুষের গুণবান বহু পুত্র কামনা করা উচিত। কারণ তাদের মধ্যে যে-কেহ গয়া গমন করতে পারে।

এষ্টব্যা ৰহবঃ পুত্রা গুণবন্তো ৰহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ।। ২।১০৭।১৩

মহাভারতেও বিপ্রকুলচূড়ামণি ধৌম্য জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে পূর্বদিকের তীর্থস্থানগুলির বর্ণনাবসরে বলেছেন— মানুষের বহু পুত্র কামনা করা কর্তব্য, কারণ তাদের মধ্যে যে-কেহ গয়া গমন করতে পারে।

৩৬. মনুসংহিতার সঙ্গে মহাভারতের শ্লোকটির কোনো পার্থক্য নেই—
পুন্নাম্নো নরকাদাস্মাৎত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥ ৯।১৩৮

যদর্থে পুরুষব্যাঘ্র কীর্তয়ন্তি পুরাতনাঃ।

এষ্টব্যা ৰহবঃ পুত্রা যদ্যেকঽপি গয়াং ব্রজেৎ।। ৩।৮৭।৯

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে জটায়ুর সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হলে জটায়ু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের সঙ্গে বলেছেন— ব্রাহ্মণগণ পরমপুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়গণ বক্ষস্থল থেকে, বৈশ্যগণ ঊরুদ্বয় থেকে এবং শূদ্রগণ পাদদ্বয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে— শ্রুতিতে এরূপ উল্লেখ আছে।

মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।

ঊরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ।। ৩।১৩।৩৩

মহাভারতেও পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের নিকট কৃষ্ণমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করার সময় বলেছেন— তিনি মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় থেকে বৈশ্য এবং চরণদ্বয় থেকে শূদ্র উৎপাদন করেছেন।

মুখতঃ সোঽসৃজদ্ বিপ্রান্ ৰাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা।

বৈশ্যাংশ্চাপ্যূরুতো রাজন্ শূদ্রান্ বৈ পাদতস্তথা॥

৬।৬৭।১৮ গঘ. ১৯ কখ.

উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত শ্লোক দুটির মধ্যে পার্থক্য শুধু ক্ষত্রিয় জন্মের ক্ষেত্রে।[৩৭]

রামায়ণে সুগ্রীবাগ্রজ বালী রামের বাণাঘাতে ভূলুণ্ঠিত ও আসন্নমৃত্যু অবস্থায় রামের উদ্দেশে বলেছেন— হে রাম, পাঁচটি পঞ্চনখ পশুই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য।

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব। ৪।১৭।৩৪ ক.খ.

মহাভারতেও পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে 'বিশ্বামিত্র-চণ্ডাল সংবাদ' নামে এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেন। এই উপাখ্যানেই চণ্ডাল বিশ্বামিত্রের উদ্দেশে প্রায় অনুরূপ বাক্যেই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য পাঁচটি পঞ্চনখ প্রাণীর কথা বলে।

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ বিশঃ। ১২।১৪১।৭০ ক.খ.

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণে আছে বর্ষা ঋতুকে পিছনে ফেলে শরৎ উপস্থিত হয়েছে। রাম সীতাবিরহে কাতর হয়ে নিজেকে দীন এবং সুগ্রীবের শরণাগত ও

---

৩৭. মহাভারতে অনুরূপ আর-একটি শ্লোক দেখা যায়। যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে পিতামহ ভীষ্ম-কথিত 'বায়ু-পুরুরবা সংবাদে' পুরুরবা বায়ুকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করলে বায়ু বলেন—

ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রাহ্মণা রাজসত্তম।

ৰাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট ঊরুভ্যাং বৈশ্য এব চ।। ১২।৭২।৪

অবজ্ঞার পাত্র বলে মনে করে লক্ষ্মণকে বললেন— অকৃতজ্ঞ সুগ্রীব নিশ্চয়ই সীতা-অন্বেষণ বিষয়ে তার পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হয়েছে। সুতরাং তুমি আমার বাক্যানুসারে তাকে বলো— যারা স্বয়ং কৃতকার্য হয়ে অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্য সাধনে যত্ন নেয় না তাদেরকে কৃতঘ্ন বলে। মৃত্যুর পর তাদেরকে কুক্কুরাদিতেও ভক্ষণ করে না।

কৃতার্থ হ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।

তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্ নোপভুঞ্জতে॥ ৪।৩০।৭৩

মহর্ষি বেদব্যাসের মহাকাব্যেও সদ্‌বংশের লক্ষণ বর্ণনাবসরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বিদুর বলেছেন— যে মানুষ বন্ধুগণ দ্বারা সৎকৃত ও কৃতকার্য হয়েও তাদের উপকারে যত্ন নেয় না সেই কৃতঘ্ন ব্যক্তির মৃত্যু হলে শবমাংসভোজী প্রাণীরাও তার দেহ স্পর্শ করে না।

সৎকৃতাশ্চ কৃতার্থাশ্চ মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।

তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্ নোপভুঞ্জতে॥ ৫।৩৬।৪২

রামায়ণে হনুমান একাকীই লঙ্কার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে সীতার সংবাদ রামকে দান করেন। হনুমানের এই বীরত্বে রাবণ ব্যথিত হয়ে রাক্ষসগণকে স্ব স্ব কর্তব্য নির্ণয়ে মনোনিবেশ করতে বলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন—

পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান— উত্তম, অধম ও মধ্যম।

ত্রিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমাধমমধ্যমাঃ।—৬।৬।৬ ক.খ.

মহাভারতেও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নানা উপদেশের সঙ্গে বলেছেন— রাজন্, পৃথিবীতে মানুষ তিন রকমের— উত্তম, অধম এবং মধ্যম।

ত্রিবিধাঃ পুরুষা রাজন্নুত্তমাধমমধ্যমাঃ। ৫।৩৩।৬৩ ক.খ.

রামায়ণে বিভীষণকে তিরস্কার করার সময় রাবণ জ্ঞাতিগণের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন— গাভীগণে দুগ্ধ. ব্রাহ্মণগণে দম, স্ত্রীগণে চপলতা এবং জ্ঞাতিগণে ভয় সর্বদা বর্তমান থাকে।

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে দমঃ।

বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।। ৬।১০।৯

মহাভারতেও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নানা সদুপদেশের সঙ্গে বলেছেন— গাভী থেকে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণই তপস্যা করে থাকেন। নারীগণেও চপলতা জন্মে ও জ্ঞাতি থেকে ভয় উৎপন্ন হয়।

সম্পন্নং গোষু সম্ভাব্যং সম্ভাব্যং ব্রাহ্মণে তপঃ।

সম্ভাব্যং চাপলং স্ত্রীষু সম্ভাব্যং জ্ঞাতিতো ভয়ম্॥ ৫।৩৬।৫৮

উদ্ধৃত শ্লোকটির ভাষা রাবণ-কর্তৃক ব্যবহৃত শ্লোকটির থেকে সামান্য পৃথক হলেও বক্তব্য বিষয়ে কোনো তারতম্য নেই।

রামায়ণে বিভীষণ দুর্বিনীত রাবণকে ন্যায়পথে আনার জন্য বিভিন্ন প্রকার সদুপদেশের সঙ্গে বলেছেন— সংসারে মধুর বাক্য ব্যবহারকারী ব্যক্তির অভাব হয় না। কিন্তু পরিণামে হিতকর অথচ অপ্রিয় এমন বাক্য বলার ও শোনার উভয় প্রকার ব্যক্তিই দুর্লভ।

সুলভা পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।। ৬।১০।১৬

মহাভারতেও ধর্মাত্মা বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি নানা উপদেশের সঙ্গে উপরোক্ত সত্যটি একই শ্লোকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।[৩৮]

মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণে বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিতে এলে সুগ্রীব বিভিন্ন শাস্ত্র-সম্মত যুক্তির মাধ্যমে রামকে বার বার সতর্ক করতে থাকেন। রাম সুগ্রীবের বাক্য শুনে বিভীষণ যে মন্দ উদ্দেশ্যে আসেন নি এবং শরণাপন্ন বলেই তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত এ কথা সুগ্রীবকে বোঝাতে থাকেন। এই অবসরেই তিনি বলেন— শুনেছি, কোনো সময়ে এক ব্যাধ কপোতের বসবাস-যোগ্য এক গাছের নীচে হাজির হয়। শত্রু জেনেও কপোত নিজের শরীরের মাংস দিয়ে সেই অতিথির সৎকার করে।

শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
অর্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ।। ৬।১২।১১

মহাভারতে ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের নিকট শরণাগত ব্যক্তিকে প্রতিপালনের ফল সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন— পূর্বে এক কপোত শরণাগত শত্রুর যথোচিত সৎকারের উদ্দেশ্যে নিজের মাংস দান করে তার ক্ষুধাশান্তি করেছিল।

শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
পূজিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ।। ১২।১৪৩।৪

মহাভারতে উদ্ধৃত শ্লোকটিতে 'অর্চিতশ্চ' শব্দটির স্থলে 'পূজিতশ্চ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এটিই শুধু পার্থক্য।

বাল্মীকির মহাকাব্যে ইন্দ্রজিৎ হনুমানের উদ্দেশে বলেছেন— হে বানর, স্ত্রী বধ করা উচিত নয়— এরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। শত্রুগণ যাতে পীড়া অনুভব করে তাই করা উচিত।

৩৮. ৫।৩৭।১৫

ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্ ব্রবীষি প্লবঙ্গম।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যচ্চ কর্তব্যমেব তৎ॥ ৬।৮১।২৮

মহর্ষি বেদব্যাসের মহাকাব্যেও সাত্যকি ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করলে কৌরবগণ তাঁর নিন্দা করেন।

সাত্যকি এই নিন্দার প্রতিবাদে বলেন— বালক অভিমন্যু-বধের সময় তাঁদের এই কর্তব্যপরায়ণতা কোথায় ছিল? তা ছাড়া যদিও স্ত্রীলোককে হত্যা করা উচিত নয়, তবু সর্বদাই যত্নপূর্বক শত্রুর পীড়াজনক কার্য করা কর্তব্য। এ কথা প্রাচীনকালে মহর্ষি বাল্মীকি বলে গিয়েছেন।

অপি চায়ং পুরা গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।
ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয় ইতি যদ্ ব্রবীষি প্লবঙ্গম॥
সর্বকালং মনুষ্যেণ ব্যবসায়বতা সদা।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎ স্যাৎ কর্তব্যমেব তৎ॥ ৭।১৪৩।৬৭-৬৮

রামায়ণে সীতা-হত্যা সংবাদে রাম সংজ্ঞা হারালে লক্ষ্মণ নানা বাক্যে তাঁকে সান্ত্বনা দেন। তিনি রামের উদ্দেশে বলেন যে, রাজ্য ত্যাগ করে বনে আসা তাঁর উচিত হয়নি। স্বল্পজলবিশিষ্ট নদী যেমন গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে যায়, তেমনি অল্পবুদ্ধি অর্থহীন ব্যক্তির সমস্ত কর্মই নষ্ট হয়ে যায়।

অর্থেন হি বিযুক্তস্য পুরুষস্যাল্পতেজসঃ।
ব্যুচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়া সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥ ৬।৭০।৩২

মহাভারতেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্জুন অর্থের গুরুত্ব বোঝাতে অনুরূপ বাক্যই ব্যবহার করেছেন।

অর্থেন হি বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥ ১২।৮।১৮

শ্লোক দুটির মধ্যে সামান্য শব্দগত পার্থক্য থাকলেও উভয়ের ভাবগত মিল লক্ষণীয়। রামায়ণে লক্ষ্মণ আবার উপরোক্ত মুহূর্তেই রামের উদ্দেশে বলেছেন—

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ।। ৬।৭০।৩৪

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের দুঃখময় মুহূর্তে অর্জুন অর্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলেছেন— এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তির অর্থ আছে তারই বন্ধুগণও আছে, যে ব্যক্তি অর্থবান সে-ই পুরুষ এবং সে-ই পণ্ডিত।[৩৯]

---

৩৯. যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ।। ১২।৮।১৯

রামায়ণে রামরাজ্যের প্রশংসাবসরে বলা হয়েছে— রামের রাজত্বকালে প্রজাবর্গ সর্বদা 'রাম' 'রাম' করত। সমুদয় জগৎ তখন রাম-ময় হয়েছিল।

রামো রামো রামইতি প্রজানামভবন্‌কথাঃ।
রামভূতং জগদ্‌ভূদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৬।১১৬।৩৬৯৮*, পৃ. ৮৮৭

মহাভারতে মহর্ষি নারদ রামের চরিত্র বর্ণনাকালে অনুরূপ শ্লোকেই রাম-রাজ্যের প্রশংসা করেছেন।[৪০]

রামের রাজ্যাভিষেকে বিঘ্ন উপস্থিত হলে অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ যে কিভাবে শোকাভিভূত হয়ে পরে সে অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আদিকবি বাল্মীকি বলেছেন— গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে যেমন বৃক্ষ সকল পীড়িত হয়ে পড়ে, তেমনি রামের পীড়ায় প্রজাগণ পীড়িত হয়ে পড়েছে। জগতের প্রভু রামের পীড়ায় সকল জগৎ পীড়িত হয়েছে। বৃক্ষের মূলে আঘাত হানলে যেমন ফুল ও ফলে সুশোভিত সমগ্র বৃক্ষই আঘাতগ্রস্থ হয়, তেমনি রামের দুঃখে সকল প্রজাই দুঃখিত এবং মর্মাহত। কারণ ধর্মাত্মা রাম মনুষ্যকুলের মূল স্বরূপ। অন্যান্য মানুষ রামরূপী বৃক্ষের ফুল, ফল, পাতা ও শাখার মতো।

তস্মাৎ তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিলসংক্ষয়াৎ॥
পীড়য়া পীড়িতং সর্বং জগদস্য জগৎপতেঃ।
মূলস্যোবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ॥
মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণাং ধর্মসাবো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলং চ পত্র চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ॥ ২।৩৩।১৩-১৫

অনুরূপভাবে মহাভারতের সভাপর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বনগমনের ঘটনায় হস্তিনাপুরের প্রজাগণ যেভাবে দুঃখাভিভূত হয়েছিল তার বর্ণনা মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনীতে প্রায় একই ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তস্মাত্তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিল-সক্ষয়াৎ॥
পীড়য়া পীড়িতং সর্বং জগত্তস্য জগৎপতেঃ।
মূলস্যৈবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ॥
মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণাং ধর্মরাজো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলং চ পত্রং চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ॥

গীতা প্রে. সং পৃ. ৯৩৪.
সা. সং, App 41, 30 pr.

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে সীতা নিজ সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নিতে প্রবেশের প্রাক্‌

৪০. রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবৎ কথা।।
রামাদ্‌ রামং জগদ্‌ভূদ্‌ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।। ৭।৫৯।২২ গ.ঘ. ২৩ ক.খ.

মুহূর্তে বলেছেন—যদি ভগবান সূর্য, বায়ু, দিক সকল, চন্দ্র, দিন ও রাত্রী, প্রভাত ও সন্ধ্যা—এই দুটি সন্ধ্যাকাল, পৃথিবী এবং অন্য দেবতাগণ আমায় শুদ্ধ-চরিত্র বলে মনে করেন তবে অগ্নিদেব সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।

আদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ।
অহশ্চাপি তথা সংধ্যে রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা।
যথান্যেপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম্॥ ১১৬।২৮

মহাভারতের শকুন্তলা নিজেকে দুষ্মন্তের বিবাহিত স্ত্রী বলে পরিচয় দেবার সময় বলেছেন—সূর্য, চন্দ্র, বায়ু অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল, মন, যম, দিন, রাত্রি, প্রভাত এবং সন্ধ্যা এই দুই সন্ধ্যাকাল এবং ধর্ম এঁরা মানুষের সমস্ত কথাই জানেন।

আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌ চ দৌভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥ ১।৭৪।৩০

দুই মহাকাব্যে ব্যবহৃত শ্লোক দুটির মধ্যে সামান্য ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও বক্তব্য বিষয় মূলতঃ একই।

রামায়ণের একটি সর্গে এক গৃধ্র ও এক উলুকের বাসা নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়।[৪১] বিবদমান দুই পক্ষী তাদের বিবাদ নিরসনের জন্য রামের নিকট উপস্থিত হয়। রাম মন্ত্রিগণের সঙ্গে উভয়ের বিবাদ নিরসনের সময় বলেন— যে সভায় বৃদ্ধগণ থাকেন না, সেটি সভাই নয়, যে বৃদ্ধরা ধর্মের উপদেশ দেন না, তাঁরা বৃদ্ধই নন, যে ধর্মে সত্য নেই, তা ধর্মই নয়, এবং যে সত্য ছলসমন্বিত তা সত্যই নয়।

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্।
নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্॥

(আর্যশাস্ত্র সং) ৭। প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৩।৩৩

মহাভারতের সভাপর্বে আমরা দ্রৌপদীর কণ্ঠে একই বাক্যে এই সত্যটিই ধ্বনিত হতে শুনি।[৪২]

৪১. বাল্মীকি সংস্করণে এই সর্গটি প্রক্ষিপ্ত বলে স্বীকৃত।
(Appendix-I No 10.70) পৃ. ৬৩২

৪২ মহাভারতে গীতা প্রেস সংস্করণ ২।৬৭।৫২ সংখ্যক শ্লোকের পর এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। শ্লোকটিতে সংখ্যা উল্লিখিত হয়নি।

আবার অন্যত্র মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নানা উপদেশের মধ্যে বলেছেন—

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
ন তে বৃদ্ধা যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনাভ্যুপেতম্॥ ৫।৩৫।৫৮

এখানে রামায়ণে উদ্ধৃত শ্লোকটির সঙ্গে মহাভারতের শ্লোকের ভাষাগত ও ভাবগত সাম্য লক্ষণীয়। রামায়ণে 'ছলেনানুবিদ্ধম্'-এর স্থলে মহাভারতে 'ছলেনাভ্যুপেতম্' শব্দটি গৃহীত হয়েছে।

উভয় মহাকাব্যে ব্যবহৃত উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সম্বন্ধে বলা যায় যে, এগুলির অধিকাংশই মানবজীবনের উপলব্ধ সত্য। মানবসভ্যতার অগ্রগতি যে উন্নততম পর্যায়কেই স্পর্শ করুক-না-কেন, মানবজীবনে এগুলির সত্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। চলমান মানবজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলি আহৃত। জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায় নি। তাই যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজে এই সত্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। কখনও স্মৃতিতে কখনও বা পুঁথিতে স্বীয় মর্যাদায় এগুলি স্থান পেয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যের জন্মক্ষণ ভিন্ন যুগে হলেও উভয় মহাকাব্যকার এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই উভয় মহাকাব্যেরই পাত্রপাত্রীর কণ্ঠে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এগুলি ধ্বনিত হয়েছে। শুধুমাত্র মহাকাব্যদ্বয়েই নয়, পরবর্তীকালে পুরাণ এবং কথাসাহিত্যেও এগুলি সযত্নে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারতীয় রামোপাখ্যান

মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত রামোপাখ্যানের বক্তা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়। জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণের ঘটনায় বিষাদগ্রস্ত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যেই এই উপাখ্যানের অবতারণা। বনবাসজীবনের দুঃখময় মুহূর্তে উপাখ্যানটি যুধিষ্ঠিরের মনে প্রেরণা জোগায়। মহর্ষি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণনা করেছেন।[১] এজন্য স্বাভাবিকভাবেই এই উপাখ্যানে অনেক গৌণ বিষয় বাদ পড়েছে। অনেক সময় উভয়ের ঘটনাগত অনৈক্য যেমন নজরে পড়ে তেমনি নতুন চরিত্র সংযোজনও রামোপাখ্যানে দেখা যায়।

বরোদা হতে প্রকাশিত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ভূমিকায় রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতীয় রামোপাখ্যানের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।[২] কিন্তু এই আলোচনায় উভয়ের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্যই দেখানো হয়েছে। এখানে উদ্ধৃত বিষয়গুলি ছাড়াও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিক আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হবে।[৩]

মহাভারতের বনপর্বে (২৫৮ থেকে ২৭৫ অধ্যায়) মোট আঠারোটি অধ্যায়ে রামোপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই উপাখ্যানে ২৫৮ থেকে ২৬০ অধ্যায়ের বর্ণনায় রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ডের কয়েকটি কথা এসেছে। রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসের জন্ম ও তপস্যার কথা রামায়ণের উত্তর কাণ্ডেই দেখা যায়। কিন্তু মহাভারতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রথমেই তা বর্ণনা করেছেন। এখন এই তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ডের সাম্য-বৈষম্য আলোচনা করা যেতে পারে।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, যেমন— অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে দশরথের পুত্রলাভ, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সহায়তায় দশরথের

---

১. 'In the Āraṇyakaparvan, commonly known as the Vanaparvan, the Rāmopākhyāna closely follows in general our Rāmāyaṇa, notwithstanding some isolated though striking discrepancies between two accounts." Jacobi, *Das Rāmāyaṇa*

২. সামীক্ষিক সংস্করণ যুদ্ধকাণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৩১-৩৫

৩. আমাদের এ আলোচনায় বরোদা থেকে প্রকাশিত রামায়ণের সামীক্ষিক সংস্করণ ও পুণা হতে প্রকাশিত মহাভারতের সামীক্ষিক সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

পুত্রেষ্টি যাগ, তাড়কাবধের জন্য বিশ্বামিত্র-কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে নিযুক্তি, জনক রাজসভায় রামের হরধনু ভঙ্গ এবং সীতালাভ ও অন্যান্য ভাইদের বিবাহ, অহল্যার উপাখ্যান মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে বর্ণিত হয় নি।

উত্তরকাণ্ডের বিষয় যেমন— রাক্ষসাদির জন্ম ও তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি সংক্ষেপে বর্ণিত হলেও কয়েকটি বিষয়ে উভয়ের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

রামায়ণে কৈকসীর গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে রাবণ, কুম্ভকর্ণ শূর্পণখা ও বিভীষণের জন্ম দেখানো হয়েছে।[৪]

মহাভারতীয় রামকথায় বিশ্রবার ঔরসে পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে খর ও শূর্পণখা এবং মালিনীর গর্ভে বিভীষণের জন্মের কথা বলা হয়েছে।[৫]

এখানে কৈকেয়ীর দাসী মন্থরাকে দেবপ্রেরিত 'দুন্দুভী' নাম্নী গন্ধর্বী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নামটি মহাভারতকারের নতুন সংযোজন।[৬] এর পর মহাভারতে যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের কাছে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার বনগমনের কারণ জানতে চাইলে[৭] মহর্ষি ২৬১ অধ্যায়ের মাত্র ৩৫টি শ্লোকে রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের বিষয় বর্ণনা করলেন।[৮] মহাকবি বেদব্যাসের এই সংক্ষিপ্তকরণের জন্য মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে স্থান পেল না দেবাসুর যুদ্ধে পরিশ্রান্ত দশরথের

---

৪. এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ।
জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্॥
অথ নামাকরোত্তস্য পিতামহসমঃ পিতা।
দশশীর্ষঃ প্রসূতোঽয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি॥
তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
প্রমাণাদ্‌যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে॥
ততঃ শূর্পণখা নাম সংজজ্ঞে বিকৃতাননা।
বিভীষণশ্চ ধর্মাত্মা কৈকস্যাঃ পশ্চিমঃ সুতঃ॥ ৭।৯।২১, ২৫-২৭

৫. পুষ্পোৎকটায়াং যজ্ঞাতে দ্বৌ পুত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ বলেনাপ্রতিমৌ ভুবি॥
মালিনী জনয়ামাস পুত্রমেকং বিভীষণম্।
রাকায়াং মিথুনং যজ্ঞে খরঃ শূর্পণখা তথা॥ ৩।২৫৯। ৭-৮

৬. পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধর্বী দুন্দুভী ততঃ।
মন্থরা মানুষে লোকে কুব্জা সমভবত্তদা॥ ২৬০-১০

৭. কথং দাশরথী বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ
প্রস্থাপিতৌ বনং ব্রহ্মন্ মৈথিলী চ যশস্বিনী॥ ২৬১।২

৮. ২৬১।৩-৩৭

কৈকেয়ীর প্রতি সন্তোষ ও বরদানের কাহিনী, কৈকেয়ীর নিষ্কলুষ মন ও পরে তার পরিবর্তন; রামের বনগমন সংবাদে কৌশল্যার নিদারুণ অবস্থা বর্ণন, বনগমনের জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের রামের নিকট অনুরোধ এবং রামের এ প্রস্তাব অনুমোদন, রামের বনগমনের পর রাজবাড়ি ও রাজ্যের করুণ অবস্থা বর্ণন, গুহের সঙ্গে রামের মিলন, দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির কাহিনী কথন, ভরত কর্তৃক কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা, ভরতের সঙ্গে গুহের কথোপকথন, ভরতের নিকট রামের রাজ্য-শাসন বিষয়ক নানা প্রশ্ন এবং সীতা ও অনসূয়ার কথোপকথন।

রামায়ণে বিরাধ বধের কাহিনী দিয়ে অরণ্যকাণ্ড আরম্ভ হয়েছে। এ কাহিনীটি মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে বর্ণিত হয় নি। মহাভারতকার এখানে দণ্ডকারণ্যে রামের শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন ও তাঁর সৎকারের কথা দিয়ে অরণ্যকাণ্ডের বিষয় আরম্ভ করেছেন। মহাভারতে ২৬১ অধ্যায়ের চল্লিশ-সংখ্যক শ্লোক থেকে ২৬৪ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত মোট ১০৮টি শ্লোকে অরণ্যকাণ্ডের বিষয় সমাপ্ত হয়েছে।

মহর্ষি বেদব্যাসের এই রামোপাখ্যানে শরভঙ্গ মুনির অগ্নিতে প্রবেশ এবং কুমারে পরিণত হয়ে ব্রহ্মলোকে গমনের কথা আসে নি। যা আমরা বাল্মীকির লেখনীতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হতে দেখি।[৯]

এর পর মহাভারতীয় রাম-কথার সঙ্গে রামায়ণের কিছু ঘটনার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণে বাসস্থান নির্ণয়ের সময় রামের সঙ্গে জটায়ুর সাক্ষাৎ এবং জটায়ু-কর্তৃক নিজ বংশাবলী বর্ণন, শূর্পণখার পঞ্চবটীতে আগমন ও সীতা আক্রমণ এবং শেষে লক্ষ্মণ-কর্তৃক শূর্পণখার কর্ণ নাসিকা ছেদন, আহত শূর্পণখার রাবণের নিকট অভিযোগ— রামের হাতে খর-দূষণের মৃত্যু, অকম্পন-কর্তৃক রাবণের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ— এই ক্রম পাওয়া যায়।

---

৯. ততোঽগ্নিং স সমাধায় হুত্বা চাজ্যেন মন্ত্রবিৎ।
শরভঙ্গো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্॥
তস্য রোমাণি কেশাংশ্চ দদাহাগ্নির্মহাত্মনঃ।
জীর্ণাং ত্বচং তথাস্থীনি যচ্চ মাংসং চ শোণিতম্॥
স চ পাবকসংকাশঃ কুমারঃ সমপদ্যত।
উত্থায়াগ্নিচয়াত্তস্মাচ্ছরভঙ্গো ব্যরোচত॥
স লোকানাহিতাগ্নীনামৃষীণাং চ মহাত্মনাম্।
দেবানাং চ ব্যতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্যরোহত॥ ৩।৪।৩২-৩৫
মহাভারতে শুধুমাত্র শরভঙ্গ মুনির সংকারের উল্লেখমাত্র দেখা যায় :
সংকৃত্য শরভঙ্গং স দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ। ২৬১।৪০ ক.খ.

বনপর্বের রামোপাখ্যানে এখানে জটায়ু অনুপস্থিত, লক্ষ্মণ-কর্তৃক শূর্পণখার নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদনের কথা বলা হয়েছে।[১০] রামের সঙ্গে যুদ্ধে খর-দূষণ নিহত হবার পর শূর্পণখার রাবণের কাছে অভিযোগের চিত্র পাওয়া যায়। অকম্পন চরিত্রটি এখানে পাওয়া যায় না।

এ ছাড়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মুনির বর্ণনায় বাদ পড়েছে : শূর্পণখা-কর্তৃক রাবণের নিকট সীতা হরণের প্রস্তাব, মারীচের কথায় সীতা হরণ বিষয়ে রাবণের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ও সীতা হরণে দৃঢ়সংকল্প, মারীচের পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনের দ্বারা রাবণের নিকট রামের অতুলনীয় শক্তি কথন।

এর পর উভয়ের মধ্যে কয়েকটি ঘটনার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণে যেমন— মারীচের কণ্ঠে রামের আর্তনাদ শোনার পরও লক্ষ্মণ আশ্রম ত্যাগ করে জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থে যেতে না চাইলে সীতা লক্ষ্মণের উপর দোষারোপ করে বলেন— ভরতের কার্যসাধনের উদ্দেশ্যেই তার বনে আগমন অথবা সীতাকে পাওয়াও লক্ষ্মণের অভিপ্রায় থাকতে পারে। মহাভারতীয় রামকথায় ভরত-কর্তৃক লক্ষ্মণের নিয়োগ বিষয়ক উক্তি সীতার মুখে শোনা যায় না।[১১] লঙ্কায় অপহৃতা সীতা ও রাবণের কথোপকথন এবং সীতাকে স্বমতে আনার জন্য রাবণের চেষ্টার কথাও এই রাম-কথায় নেই।

আদিকবি বাল্মীকির বর্ণনায় সীতা-অন্বেষণরত দুই ভাই-এর প্রথমে আশ্রম দর্শন ও পরে জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।

বেদব্যাসের উপাখ্যানে বৈদেহী-অন্বেষণরত দুই ভাই জটায়ু দর্শনের পর আশ্রমে উপস্থিত হন। এখানে রামের সঙ্গে জটায়ুর কথোপকথন, রাম-লক্ষ্মণের মতঙ্গমুনির আশ্রমে গমন, রাক্ষসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রাক্ষসীর লক্ষ্মণের সঙ্গে

---

১০. মহাভারতে - হতেষু তেষু রক্ষঃসু ততঃ শূর্পণখা পুনঃ।
যযৌ নিকৃত্তনাসোষ্ঠী লঙ্কাং ভ্রাতুর্নিবেশনম্।। ২৬১।৪৪

রামায়ণে ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তস্যাঃ ক্রুদ্ধো রামস্য পশ্যতঃ।
উদ্ধৃত্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণনাসং মহাবলঃ।। ৩।১৭।২১

১১. রামায়ণে - সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা।। ৩।৪৩।২২

মহাভারতে নৈষ কালো ভবেন্মূঢ় যং ত্বং প্রার্থয়সে হৃদা।।
অপ্যহং শস্ত্রমাদায় হন্যামাত্মানমাত্মনা।
পতেয়ং গিরিশৃঙ্গাদ্বা বিশেয়ং বা হুতাশনম্।।
রামং ভর্তারমুৎসৃজ্য ন ত্বহং ত্বাং কথঞ্চন।
বিহীনমূপতিষ্ঠেয়ং শার্দূলী ক্রোষ্টুকং যথা।। ২৬২।২৬ গ ঘ.-২৮

বিহারে ইচ্ছা প্রকাশ এবং শেষে তার নাসিকা, কর্ণ ও স্তন ছেদন প্রভৃতির বর্ণনা নেই।

রামায়ণে এর পর রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এক কবন্ধের। এই কবন্ধ দনুর পুত্র।[১২] বিকটরূপ ধারণ করে স্থূলশিরা নামক মুনিকে ভয় দেখানোর ফলে তাঁর অভিশাপে সে বিকটরূপই প্রাপ্ত হয়। উক্ত কবন্ধ রামের নিকট পূর্বেই তার অভিশাপের কারণ ও মুক্তির উপায় ব্যক্ত করে। রাম কবন্ধের কাছে সীতার সংবাদ জানতে চাইলে কবন্ধ রামের দর্শনে দিব্যরূপ লাভ ক'রে তা বলতে স্বীকৃত হয়।

মহাভারতীয় রামকথাতেও এই কবন্ধ উপস্থিত। নাম বিশ্বাবসু। ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাক্ষসে পরিণত হয়।[১৩]

রামায়ণে ইন্দ্র-কর্তৃক উদরে মুখমণ্ডল হবার কথা পাওয়া যায়। এখানে তা বলা হয়নি। এখানে কবন্ধ দিব্যরূপ লাভ করার পর রাম সীতার কথা জানতে চাইলে দিব্যপুরুষ তা বর্ণনা করে। রামায়ণে রাম কবন্ধের দক্ষিণবাহু এবং লক্ষ্মণ বাম বাহু ছেদন করেন।[১৪] মহাভারতে ঠিক তার বিপরীত।[১৫]

রামায়ণে এর পর রাম ও লক্ষ্মণ শবরীর সঙ্গে মিলিত হন। মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে শবরীর উল্লেখ নেই। অরণ্যকাণ্ডের বিষয় এখানেই সমাপ্ত হতে দেখা যায়।

এর পর মহাভারতের বনপর্বে ২৬৪তম অধ্যায়ের নবম শ্লোক থেকে ২৬৭তম অধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোকে অর্থাৎ মোট ১৮৪টি শ্লোকে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও সুন্দরকাণ্ডের বিষয় সমূহের অবতারণা করা হয়েছে। এই সামান্য সংখ্যক শ্লোকে মহাভারতকার রামায়ণের ২টি কাণ্ডের বিষয় উল্লেখ করেছেন বলে বর্ণিত ঘটনার সিংহভাগই এখানে স্থান পায় নি।

---

১২. তদা ত্বং প্রাপ্স্যাসে রূপং স্বমেব বিপুলং শুভম্॥
শ্রিয়া বিরাজিতং পুত্রং দনোস্ত্বং বিদ্ধি লক্ষ্মণ। ৩।৬৭। ৬গঘ-৭কখ.

১৩. তস্যাচচক্ষে গন্ধর্বো বিশ্বাবসুরহং নৃপ।
প্রাপ্তো ব্রহ্মানুশাপেন যোনিং রাক্ষসসেবিতাম্॥ ২৬৩।৩৮

১৪. দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুমসক্তমসিনা ততঃ।
চিচ্ছেদ রামো বেগেন সব্যং বীরস্তু লক্ষ্মণঃ॥ ৩।৬৬।৬

১৫. ছিন্ধ্যাস্য দক্ষিণং বাহুং ছিন্নঃ সব্যো ময়া ভুজঃ॥
ইত্যেবং বদতা তস্য ভুজো রামেণ পাতিতঃ।
খড়্গেন ভৃশতীক্ষ্ণেন নিকৃত্তস্তিলকাণ্ডবৎ॥
ততোঽস্য দক্ষিণং বাহুং খড়্গেনাজঘ্নিবানবলী॥ ২৬৩।৩২গঘ.-৩৪কখ.

বাল্মীকির কাহিনীতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মিলন হলে সুগ্রীব সীতার পরিত্যক্ত বস্ত্র ও অলংকার রামকে দেখান।[১৬] বেদব্যাসের রাম-কাহিনীতে এখানে বস্ত্রের কথাই বলা হয়েছে। অলংকারের কোনো উল্লেখ নেই।[১৭]

রামের বালী-বধের কাহিনীতেও উভয়ের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। রামায়ণে প্রথমে সুগ্রীব বালীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে, পরে রামের আদেশে লক্ষ্মণ গজপুষ্পী নাম্নী লতা সুগ্রীবের গলায় পরিয়ে দেন এবং সুগ্রীব পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষ মালা পরিধানকারী সুগ্রীবকে চিনতে পেরে রাম বালীকে বধ করেন।[১৮]

মহাভারতের রামোপাখ্যানে বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধকালীন অবস্থায় হনুমান সুগ্রীবের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে রাম বালীকে বধ করেন।[১৯] অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বালী-বধরূপ মূল ঘটনার কারণ রাম।

তা ছাড়া সুগ্রীব-কর্তৃক রামের নিকট ভ্রাতৃ-বিরোধের কারণ বর্ণন, মৃত্যুপথযাত্রী বালী-কর্তৃক রামকে ভর্ৎসনা, তারার বিলাপ, বালীর সৎকার, ভ্রাতৃবিরোধের জন্য সুগ্রীবের অনুশোচনা, রাম-কর্তৃক বর্ষা ও শরৎ ঋতু বর্ণন এখানে পাওয়া যায় না।

এর পর মহাভারতের রামোপাখ্যানের সঙ্গে রামায়ণের কিছু মুখ্য ঘটনার বৈসাদৃশ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। রামায়ণে সীতা-অন্বেষণ বিষয়ে সুগ্রীবের ঔদাসীন্য ও রাম-কর্তৃক লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের রাজধানীতে প্রেরণ, লক্ষ্মণের উদ্দেশে তারার সান্ত্বনা দান, শেষে সীতা-অন্বেষণার্থ সুগ্রীবের বানরগণকে প্রেরণ প্রভৃতি ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে।

মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে বালী-বধের পরই অশোক বনে রাক্ষসী-বেষ্টিতা সীতার করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে। রামায়ণে এই চিত্রটি সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের

---

১৬. আত্মনা পঞ্চমং মাং হি দৃষ্ট্বা শৈলতটে স্থিতম্।
উত্তরীয়ং তয়া ত্যক্তং শুভান্যাভরণানি চ॥ ৪।৬।৯

১৭. তদ্বাসো দর্শয়ামাসুস্তস্য কার্যে নিবেদিতে।
বানরাণাং তু যৎ সীতা হ্রিয়মাণাভ্যবাসৃজৎ॥ ২৬৪।১২

১৮. ততো গিরিতটে জাতামুৎপাট্য কুসুমাযুতাম্।
লক্ষ্মণো গজপুষ্পীং তাং তস্য কণ্ঠে ব্যসর্জয়ৎ॥ ৪।১২।৩৬

১৯. ন বিশেষস্তয়োর্যুদ্ধে তদা কশ্চন দৃশ্যতে।
সুগ্রীবস্য তদা মালাং হনুমান্‌কণ্ঠ আসজৎ॥ ২৬৪।৩৩

লঙ্কা, তথা অশোক বনে প্রবেশের পর স্থান পেয়েছে। মার্কণ্ডেয়ের বর্ণনায় সুগ্রীবের ঔদাসীন্যের জন্য রামের ক্রোধ, লক্ষ্মণকে প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনা পাওয়া যায় অশোক বনে সীতার করুণ চিত্র অঙ্কনের পর।

এর পর আরও কিছু মূল কাহিনীর বৈসাদৃশ্য— যেমন রামায়ণে অশোক বনে সীতাকে বশে আনার জন্য রাবণের চেষ্টা, এবং শেষে ব্যর্থ হয়ে রাক্ষসীদের উপর এ ভার অর্পণের চিত্র আঁকা হয়েছে। এখানে ত্রিজটা নাম্নী রাক্ষসী তার শুভসূচক স্বপ্ন দর্শনের কথা ব'লে সীতাকে সান্ত্বনা দেয়।

মহাভারতীয় বনপর্বের রামোপাখ্যানে প্রথমে রাক্ষসীগণ সীতাকে বশে আনার চেষ্টা করে এবং পরে রাবণকেই এ কাজ করতে দেখা যায়। এখানে অবিন্ধ্যের দেখা স্বপ্নের কথা ব'লে ত্রিজটা সীতাকে সান্ত্বনা দেয়।

রামের নিকট হনুমানের সীতা-অন্বেষণ বৃত্তান্ত কথনের ক্রমটিও উভয় গ্রন্থে সমভাবে রক্ষিত হয়নি। রামায়ণে এ বৃত্তান্তে হনুমান ময়-নির্মিত অরণ্যে যে তাপসীর কথা বলে তাঁর নাম স্বয়ম্প্রভা।[২০] মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে ময়দানবের বাড়িতে তপস্যারতা তাপসীর নাম প্রভাবতী।[২১]

আরও কয়েকটি বিষয়, যেমন— সীতার সঙ্গে হনুমানের কথোপকথন, হনুমান-কর্তৃক লঙ্কার বিবিধ অনিষ্ট সাধন ও রাবণের সঙ্গে কথোপকথন, লঙ্কা দহনের পর পুনরায় হনুমানের সীতার সঙ্গে কথোপকথন প্রভৃতি মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে স্থান পায়নি।

এর পর সমুদ্র লঙ্ঘনের কাহিনী দিয়ে যুদ্ধকাণ্ড আরম্ভ হয়েছে। বনপর্বের ২৬৭ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক থেকে ২৭৫ অধ্যায়ের ৬৯টি শ্লোক নিয়ে এই কাণ্ডের বিষয় শেষ হয়েছে। এখানে রাবণের উদ্দেশ্যে বিভীষণ-কর্তৃক সীতাকে রামের হাতে সমর্পণের নির্দেশ, রাবণ-কর্তৃক বিভীষণের তিরস্কার বর্ণিত হয়নি। আর এখানে সমুদ্রের নির্দেশে নল-কর্তৃক সেতু নির্মাণের পর রামের সঙ্গে বিভীষণের বন্ধুত্ব হয়েছে। রামায়ণে এই বন্ধুত্ব হয় সেতু নির্মাণের পূর্বেই।

শুক-কর্তৃক বানরসেনার পরিচয়, রাবণ-কর্তৃক মায়া অবলম্বনে তৈরি রামের ছিন্ন মস্তক ও ধনু দেখিয়ে সীতাকে মোহিত করার চেষ্টা, সরমার সীতাকে সান্ত্বনা

২০. শাশ্বতঃ কামভোগশ্চ গৃহং চেদং হিরণ্ময়ম্॥
দুহিতা মেরুসাবর্ণেরহং তস্যাঃ স্বয়ংপ্রভা। ৪।৫০।১৫ গঘ ১৬ কখ

২১. ময়স্য কিল দৈত্যস্য তদাসীদ্বেশ্ম রাঘব!
তত্র প্রভাবতী নাম তপোঽতপ্যত তাপসী॥ ২৬৬।৪০

দান এবং রামের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য রাবণের প্রতি নির্দেশ মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনীতে আসে নি।

রামায়ণে প্রহস্তকে বধ করে নীল।[২২] মহাভারতীয় রামকাহিনীতে প্রহস্তকে বধ করে বিভীষণ।[২৩] তার পরেই হনুমানের হাতে নিহত হয় ধূম্রাক্ষ। তা ছাড়া এর পর অকম্পন প্রভৃতি কয়েকজন যোদ্ধার পরিচয়, হনুমানের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ, পরে নীলের সঙ্গে এবং শেষে যুদ্ধ করেন লক্ষ্মণ, রাবণের বাণে লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ, হনুমানের পিঠে আরোহণ করে রামের রাবণের অভিমুখে গমন। যুদ্ধে রাবণের ক্লান্তি বোধ, রাম-কর্তৃক রাবণকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ এখানে পাওয়া যায় না।

বাল্মীকির রামায়ণ কাব্যে রামের হাতে পরাজিত হয়ে রাবণ রঘুবংশের রাজা অণরণ্যের বেদবতীর ও নলকুবরের অভিশাপ স্মরণ করেন। এর পর রাবণ-কর্তৃক কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করার নির্দেশ ও যূপাক্ষের নির্দেশে কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রার কথা পাওয়া যায়।

মহাভারতের রামোপাখ্যানে রাবণের অভিশাপ স্মরণের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। এখানে রাবণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করে তাঁকে তিরস্কার করেন এবং শেষে বজ্রবেগ ও প্রমাথীর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় নির্দেশ দেন।

এর পর রামায়ণকার কুম্ভকর্ণ-কর্তৃক রাবণের কাজের সমালোচনা ও সদুপদেশ, রাবণ-কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে কুম্ভকর্ণের যুদ্ধযাত্রা, রাবণের প্রতি মহোদরের উপদেশ, অচৈতন্য সুগ্রীবকে নিয়ে কুম্ভকর্ণের লঙ্কায় প্রবেশ, কুম্ভকর্ণের নাক কান ছিন্ন করে সুগ্রীবের পলায়ন, লক্ষ্মণ ও কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ, রাম-কর্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ।[২৪] তার মৃত্যু সংবাদে রাবণের

২২. হতে প্রহস্তে নীলেন তদকম্প্যং মহদ্বলম্।
রক্ষসামপ্রহৃষ্টানাং লঙ্কামভিজগাম হ।। ৬।৪৬।৪৮

২৩. ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শতঘণ্টাং বিভীষণঃ।
অভিমন্ত্র্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্য শিরঃ প্রতি।।
পতন্ত্যা স তয়া বেগাদ্রাক্ষসোঽশনিনাদয়া।
হৃতোত্তমাঙ্গো দদৃশে বাতরুগ্‌ণ ইব দ্রুমঃ।। ২৭০। ৩-৪

২৪. স কুম্ভকর্ণং সুরসৈন্যমর্দনং
মহৎসু যুদ্ধেষুপরাজিতশ্রমম্।
ননন্দ হত্বা ভরতাগ্রজো রণে
মহাসুরং বৃত্রামিবামরাধিপঃ।। ৬।৫৫।১২৯

উৎসাহ ভঙ্গ, ত্রিশিরা-কর্তৃক রাবণকে উৎসাহ দান, শেষে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর এবং সুপার্শ্বের যুদ্ধে গমন প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে দেখিয়েছেন।

উপরে বর্ণিত বিষয় সমূহের বেশির ভাগই মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয়-বর্ণিত রামোপাখ্যানে দেখা যায় না। এখানে লক্ষ্মণ-কর্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ দেখানো হয়েছে,[২৫] এবং কুম্ভকর্ণ-বধের পর হনুমান বজ্রবেগকে, নীল প্রমাথীকে বধ করে। বামায়ণে এ স্থলে উক্ত ঘটনা আসে নি।

বাল্মীকির মহাকাব্যে এর পর অঙ্গদ নরান্তককে হনুমান দেবান্তককে, নীল মহোদরকে, হনুমান ত্রিশিরাকে, ঋষভ মহাপার্শ্বকে এবং লক্ষ্মণ পবনের নির্দেশে ব্রহ্মাস্ত্রে অতিকায়কে নিহত করেন।

মহাভারত মহাকাব্যের অন্তর্গত রামোপাখ্যানে এই ঘটনাগুলি অনুপস্থিত।

রামায়ণে এর পর রাবণ-কর্তৃক ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে প্রেরণ, ইন্দ্রজিতের অস্ত্রে রাম-লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লুপ্তি, জাম্ববানের নির্দেশে হনুমান-কর্তৃক মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী আনয়ন এবং পরে রাম-লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লাভের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে এখানে মাত্র প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষ-বধের পর রাবণ-কর্তৃক ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে প্রেরণ, বিভীষণ কর্তৃক মন্ত্রপূত বিশল্যদ্বারা লক্ষ্মণের শল্যহীনতার কথা পাওয়া যায়।

এর পর রাম-লক্ষ্মণকে সংজ্ঞাহীন দেখে ইন্দ্রজিতের সগর্বে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন, হনুমানের পর্বত আনয়ন, বানরগণ-কর্তৃক লঙ্কানগরী দহন, বানর ও রাক্ষসগণের ভীষণ যুদ্ধ, অঙ্গদ-কর্তৃক কম্পন ও প্রজঙ্ঘ, দ্বিবিদ-কর্তৃক শোণিতাক্ষ, মৈন্দ-কর্তৃক যূপাক্ষ, সুগ্রীব-কর্তৃক কুম্ভ, হনুমান-কর্তৃক নিকুম্ভ এবং রাম-কর্তৃক মকরাক্ষ-বধ প্রভৃতি রামায়ণে বিস্তৃতভাবে চিত্রিত হলেও মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে এগুলি উল্লিখিত হয় নি। এখানে ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে সংজ্ঞাহীন করে লঙ্কায় প্রবেশ করলে কুবের-কর্তৃক প্রেরিত যক্ষের জলদান এবং লক্ষ্মণ-কর্তৃক অকৃতাহ্নিক ইন্দ্রজিৎ বধের কথা মাত্র পাওয়া যায়।

রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রজিৎ-কর্তৃক মায়াসীতা বধ, তজ্জন্য হনুমানের যুদ্ধক্ষেত্র-ত্যাগ, সীতা হনন সংবাদে রামের মূর্ছা, লক্ষ্মণের প্রবোধ দান, বিভীষণের লক্ষ্মণকে

২৫. স বভূবাতিকায়শ্চ বহুপাদশিরোভুজঃ।
তং ব্রহ্মাস্ত্রেণ সৌমিত্রির্দদাহাদ্রিচয়োপমম্॥—২৭১।১৬

সেনাসহ নিকুম্ভিলায় প্রেরণের প্রস্তাব, সৈন্যসহ লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলায় গমন এবং উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে নেই।

মহর্ষি বাল্মীকির বর্ণনায় অমাত্যগণের নিকট রাবণ ইন্দ্রজিতের বধ সংবাদ পেয়ে সীতাকে নিহত করতে উদ্যত হন। শেষে অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করে।[২৬]

কিন্তু মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে রাবণ প্রথমে ইন্দ্রজিতের শূন্য রথ দর্শন করেন পরে পুত্রকে নিহত দেখে ভয়ে আকুল ও শোক এবং মোহে পীড়িত হয়ে সীতাকে বধ করতে উদ্যত হন। রাবণের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে অবিন্ধ্য তাঁকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করে।[২৭]

এর পর রামায়ণের ঘটনা, যেমন— সুগ্রীবের রাক্ষস-সেনা সংহার ও বিরূপাক্ষ বধ, মহোদর বধ, অঙ্গদ-কর্তৃক মহাপার্শ্ব বধ, রাবণের শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণের মূর্ছা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাবণের পলায়ন, হনুমানের ঔষধি আনয়ন, সুষেণ-কর্তৃক ঔষধি প্রয়োগে লক্ষ্মণের চৈতন্যলাভ প্রভৃতি মহাভারতের রামোপাখ্যানে অনুপস্থিত।

রামায়ণে দেবরাজের নির্দেশে দেব-সারথি-মাতলি রামকে ইন্দ্রতুল্য ধনু, কবচ, শর ও শক্তিসহ রথ দান করেন।[২৮]

বেদব্যাসের রাম-কথায় শুধু রথের উল্লেখই দেখা যায়।[২৯] সেই রথ দেখে রাবণের মায়া বলে রামের সন্দেহের কথাও এখানে নতুন।[৩০]

এ ছাড়াও এখানে বর্ণিত হয় নি— রামের রাবণের প্রতি তিরস্কার, অচেতন-প্রায় রাবণকে নিয়ে সারথির পলায়ন, পুনরায় রাবণের তিরস্কারে সারথির যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাগমন, অগস্ত্যমুনির নির্দেশে রামের আদিত্য হৃদয় পাঠ প্রভৃতি। মহাভারতের

২৬. ৬।৮৩

২৭. এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরবিন্ধ্যো রাবণং তদা।
ক্রুদ্ধং সংশয়ামাস জগৃহে চ স তদ্বচঃ॥ ২৭৩।৩২

২৮. সহস্রাক্ষেণ কাকুৎস্থ রথোঽয়ং বিজয়ায় তে।
দত্তস্তব মহাসত্ত্ব শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ॥
ইদমৈন্দ্রং মহচ্চাপং কবচং চাগ্নিসংনিভম্।
শরশ্চাদিত্যসঙ্কাশাঃ শক্তিশ্চ বিমলা শিতা॥—৬।৯০।৯-১০

২৯. অয়ং হর্যশ্বযুগ্জৈত্রো মঘোনঃ স্যন্দনোত্তমঃ।
অনেন শক্রঃ কাকুৎস্থ সমরে দৈত্যদানবান্॥—২৭৪।১৩ ক.খ

৩০. ইত্যুক্তো রাঘবস্তথ্যং বচোঽশঙ্কত মাতলেঃ।
মায়েয়ং রাক্ষসস্যেতি তমুবাচ বিভীষণঃ॥ ২৭৪।১৫

রামোপাখ্যানে রামের ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণের দেহ দগ্ধ হলে দেহাবশিষ্ট ভস্মও দেখা যায় না এরূপ বর্ণনা আছে।

কিন্তু রামায়ণে মাতলির কথায় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা নিহত রাবণের প্রাণশূন্য দেহ ভূতলে পতিত হতে দেখা যায়।[৩২] রাবণ-বধের পর বিভীষণের বিলাপ, রামের সান্ত্বনা দান, রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী প্রভৃতির বিলাপ, রাবণের সংকার প্রভৃতি বেদব্যাসের রামোপাখ্যানে স্থান পায় নি।

রামায়ণে রাবণ বধের সংবাদ হনুমান সীতাকে দিলে তিনি রামকে দেখতে চাইলেন। রামের নির্দেশে বিভীষণ সীতাকে রামের নিকট হাজির করলেন। রাম সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। তিনি সীতাকে বললেন— রাবণ বধ করে তাঁকে উদ্ধার করাই ছিল তাঁর কর্তব্য। এখন সীতা যেখানে খুশি যেতে পারেন, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতির মধ্যে যাকে খুশি তিনি গ্রহণ করতে পারেন। এই কথা শুনে ব্যথিত-হৃদয়া সীতা স্বীয় সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করতে চান। এবং শেষে রামের ইচ্ছায় লক্ষ্মণ-কর্তৃক নির্মিত চিতায় প্রবেশ করেন।[৩৩] পরে দেবগণসহ দশরথ উপস্থিত হয়ে রামকে সীতা গ্রহণ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। রাম তাতে স্বীকৃত হন।

মহাভারতীয় রামকাহিনীতে অবিন্ধ্যসহ বিভীষণ সীতাকে রামের নিকট আনয়ন করেন। পরে রাম সীতা-চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হলে সীতা ব্যথিত হয়ে ভূতলে পতিত হন।[৩৪] সীতার প্রতি লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতিকে গ্রহণের নির্দেশ এখানে নেই। পরে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, কুবের, সপ্তর্ষিগণ ও দশরথ রামকে সাক্ষাৎ

---

৩১. শরীরধাতবো হ্যস্য মাংসং রুধিরমেব চ।
নেশুর্ব্রহ্মাস্ত্রনির্দগ্ধা ন চ ভস্মাপ্যদৃশ্যত॥ ২৭৪।৩১

৩২. গতাসুর্ভীমবেগস্তু নৈঋতেন্দ্রো মহাদ্যুতিঃ।
পপাত স্যন্দনাদ্ভূমৌ বৃত্রো বজ্রহতো যথা॥
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষা নিশাচরাঃ।
হতনাথা ভয়ত্রস্তাঃ সর্বতঃ সংপ্রদুদ্রুবুঃ॥ ৬।৯৭।২১-২২

৩৩. স বিজ্ঞায় মনচ্ছন্দং রামস্যাকারসূচিতম্।
চিতাং চকার সৌমিত্রির্মতে রামস্য বীর্যবান্॥ ৬।১০৪।২১
জনঃ স স মুহাংস্তত্র বালকবৃদ্ধসমাকুলঃ।
দদর্শ মৈথিলীং তত্র প্রবিশন্তীং হুতাশনম্॥ ৬।১০৪।২৬

৩৪. সুবৃত্তামসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ্য মৈথিলি।
নোৎসহে পরিভোগায় শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা॥
ততঃ সা সহসা বালা তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বচঃ।
পপাত দেবী ব্যথিতা নিকৃত্তা কদলী যথা॥ ২৭৫।১৩-১৪

দেন ও সীতার শুদ্ধ চরিত্রের কথা বলেন। শেষে রাম সীতা-গ্রহণ ও দশরথের নির্দেশে অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তনে স্বীকৃত হন। এখানে সীতার অগ্নিপ্রবেশের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। এখানে মৃত বানরদের জীবন দেন ব্রহ্মা।[৩৫] রামায়ণে রাম ইন্দ্রের কাছে এ বর গ্রহণ করেন।[৩৬]

রামায়ণে এর পর দেখা যায় কয়েকটি ঘটনার পরই রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। তবু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যেটুকু নজরে পড়ে তা হল রামায়ণে যুদ্ধ কাণ্ড শেষ হয়েছে রামের দশ হাজার বৎসর রাজ্যপালনের কথা উল্লেখের মাধ্যমে।

সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।
দশ বর্ষ সহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥ ৬।১১৬।৯০

সামীক্ষিক সংস্করণে যুদ্ধকাণ্ড উক্ত শ্লোক দ্বারা সমাপ্ত হলেও তারকা-চিহ্নিত অবস্থায় গ্রন্থের মাহাত্ম্যকারী অনেক শ্লোক স্থান পেয়েছে।

পক্ষান্তরে মহাভারতীয় রাম-কথার সমাপ্তি হয়েছে দেবগণ ও ঋষিগণসহ রামের গোমতী নদীর তীরে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিত রামোপাখ্যানের শেষ শ্লোকটিতে এ চিত্র স্পষ্ট :

ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্॥ ২৭৫।৬৯

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ ও মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত রামোপাখ্যানের ঘটনাগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য যথাসম্ভব দেখানো হল।

রামায়ণ মহাকাব্যখানি সামনে রেখে মহাভারতীয় রামোপাখ্যানটি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় যে শুধুমাত্র কাহিনীই নয়, রামায়ণের শ্লোক, শ্লোকার্ধ, শ্লোকাংশ, শব্দ সবই উপাখ্যানটির প্রায় সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে।

অধ্যাপক ইয়াকবি (Jacobi), স্লুস্টজ্ (Slustzkiewicz) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত উভয়ের শ্লোক. শ্লোকার্ধ ও শ্লোকাংশের সাম্য যথাসম্ভব দেখিয়েছেন।

---

৩৫. ততস্তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে তথেতি বচনে তদা।
সমুত্তস্থুর্মহারাজ বানরা লব্ধচেতসঃ॥ ২৭৫।৪২

৩৬. মৎপ্রিয়েষ্বভিরক্তাশ্চ ন মৃত্যুং গণয়ন্তি চ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সময়ুস্তে বরমেতদহং বৃণে॥ ৬।১০৮।৬
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
মহেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচেদং বচনং প্রীতিলক্ষণম্॥
মহানয়ং বরস্তাত ত্বয়োক্তো রঘুনন্দন।
সমুত্থাস্যন্তি হরয়ঃ সুপ্তা নিদ্রাক্ষয়ে যথা॥ ৬।১০৮।৯-১০

পরবর্তীকালে ভারতীয় পণ্ডিত ভি.এস.সুকথঙ্কর (V.S.Sukthankar) আরও বিস্তারিতভাবে উভয়ের শ্লোক-সাম্য আলোচনা করেছেন।[৩৭]

উপরোক্ত পণ্ডিতগণ উভয়গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্লোক, শ্লোকার্ধ ও শ্লোকাংশের সাম্য দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে উভয়ের সামঞ্জস্য নেই সেরূপ স্থলেও একই শ্লোকার্ধ বা শ্লোকাংশ উভয় রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ সামঞ্জস্যমূলক শ্লোক, শ্লোকার্ধ ও শ্লোকাংশগুলিও আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে।

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
হৃতা ভার্যা বলীয়সা	হৃতা ভার্যা দুরাত্মনা
২৫৮, ১ঘ	৬,২৯, ৪খ
হত্বা গৃধ্রং জটায়ুবম্	গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্
২৫৮, ২ঘ	১,১,৪২ খ
বদ্ধা সেতুং সমুদ্রস্য	বদ্ধা সেতুং মহোদধৌ
২৫৮, ৩গ	৬, ২৯, ৪খ
এতন্মে ভগবন্‌সর্বং	এতন্মে ভগবন্‌সর্বং
২৫৮, ৫ক	৭, ৩৫, ১৩ক
রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ	রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ
২৫৮, ৫ঘ, ২৭৪, ২৯ঘ, ২৬২, ১৫ঘ এবং ৩; ১৪৭, ৩৪ঘ	২,৬৬, ২৬ঘ এবং ৫, ৪১, ৭খ
রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্॥	রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্॥
২৫৮, ৯ঘ	৩,৪৮,২৫খ
পুলস্ত্যো নাম তস্য	পুলস্তো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ
২৫৮, ১২ক	৭,২,৪গ
ব্রহ্মদ্বিট্‌ পিশিতাশনঃ।	রৌদ্রশ্চ পিশিতাশনাঃ
২৫৯, ১২খ	১, ৩৩, ১৮ঘ
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ	সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ
২৫৯, ১৩ক	১, ১৭, ১৪ক

৩৭. Sukthankar Memorial Edition, Vol.I, p.391-401.

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব. রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্ছিত্ত্বা দশাননঃ।	পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্চাগ্নৌ-জুহাব সঃ॥
২৫৯, ২০ ক.খ.	৭.১০.১০.গ.ঘ
অন্যান্য প্রসঙ্গে ১, ৫৬, ৪ক, ১, ৬১, ১৬গ	
যক্ষরাক্ষসতস্তথা।	যক্ষরাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ
২৫৯, ২৫খ	১, ৩৩, ১৮গ
বিভীষণমুবাচ হ।	বিভীষণমাবাচ হ
২৫৯, ২৯খ	৭, ১০,২৯খ
বরং বৃণীষ্ব পুত্র ত্বং	বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং
২৫৯, ২৯গ	৭,৩,১৩গ
পরমাপদ্গতস্যাপি নাধর্মে মে মতির্ভবেৎ। অশিক্ষিতং চ ভগবন্ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতুমে॥	পরমাপদ্গতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ। অশিক্ষিতং চ ব্রহ্মাস্ত্রং ভগবন্ প্রতিভাতু মে॥
২৫৯, ৩০	৭, পৃ. ৬৬।১৬৭*
যস্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রকর্যন। নাধর্মে রমতে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে॥	যস্মাদ্ রাক্ষসযনৌ তে জাতস্যামিত্রকর্ষণ। নাধর্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে॥
২৫৯, ৩১	৭, ১০, ৩০
বিমানং পুষ্পকং তস্য	বিমানং পুষ্পকং তস্য
২৫৯, ৩৪ক	৩, ৩০, ১৪ক
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা সতাং ধর্মমনুস্মরন্॥	বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা নিত্যং ধর্মপরঃ শুচিঃ।
২৫৯, ৩৬ ক.খ.	৭, ১০, ৬ ক.খ.
দশগ্রীবো মহাবলঃ	দশগ্রীবো মহাবলঃ
২৬০, ২খ	৫, ১৬, ৩খ
বিষ্ণোঃ সহায়ানৃক্ষীষু	বিষ্ণোঃ সহায়ান্বলিনঃ
২৬০, ৭ক	১, ১৬, ২গ
কামরূপবলান্বিতান্॥	কামরূপো বলোপেতা
২৬০, ৭ঘ	কামরূপো বলান্বিতাঃ
	১, ১৬,৪৯৫, পৃ. ১১৮-১৯
দেবগন্ধর্বদানবাঃ॥	দেবগন্ধর্বদানবাঃ।
২৬০, ৮খ	৫,১, ৭১ঘ ৩, ৬১,১১খ

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা	পিতামহ্ বচঃ শ্রুত্বা
২৬০, ১০ক	১, ৩৯, ৪ক
সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।	সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
২৬০, ১৩খ	৬, ৫৭, ১৩খ
বায়ুবেগসমা জবে।	বায়ুবেগসমা জবে।
২৬০, ১৩ঘ	১, ১৬, ৩খ
ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।	ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
২৬১, ২খ	৩, ১৯,৭খ
মত্তমাতঙ্গগামিনম্।	মত্তমাতঙ্গগামিনম্॥
২৬১, ৯খ	২, ৩, ১১ঘ
বৃহস্পতিসমং মতৌ॥	বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা
২৬১, ১০ঘ	৪, ৫৩, ৪ক
কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্।	কৌশল্যানন্দবর্ধনম্
২৬১, ১৩খ	১, ৭২, ১৭খ
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং মে	সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং মে
২৬১, ১৫গ	১, ১১, ১১গ
আশীবিষস্ত্বাং সংক্রুদ্ধশ্চণ্ডো- দশতি দুর্ভগে॥	আশীবিষস্ত্বাং দশতু মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি। দুর্ভগে হ্যকৃতপ্রজ্ঞে বিপরীতার্থদর্শিনি॥
২৬১, ১৭ গ.ঘ.	২, ১৩৩*, পৃ. ৪৪
সুভগা খলু কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।	সুভগা খলু কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।
২৬১, ১৮ ক.খ.	২, ৮, ৩ ক.খ.
সর্বাভরণভূষিতা।	সর্বাভরণভূষিতা
২৬১, ১৯খ	৩, ৪৫, ২৭খ
অবধ্যো বধ্যতাং কোঽদ্য বধ্যঃ - কোঽদ্য বিমুচ্যতাম্॥	অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্
২৬১, ২৩ গ.ঘ.	২, ১০, ১০ ক.খ.
আভিষেচনিকং যত্তে রামার্থমুপকল্পিতম্	অভিষেকসমারম্ভো রাঘবস্যোপকল্পিতঃ।
২৬১, ২৫ ক.খ.	২, ১০, ২৭ ক.খ.
চাতুর্বর্ণস্য রক্ষিতা	চাতুর্বর্ণস্য রক্ষিতা।
২৬১, ১২৪৫, পৃ. ৯০৬	৫, ৩৩, ১১খ

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ)	রামায়ণ
বনপর্ব, রামোপাখ্যান	(সামীক্ষিক সংস্করণ)
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।	নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
চীরাজিনজটাধারী রামো বসতু তাপসঃ॥	চীরাজিনজটাধারী রামো ভবতু তাপসঃ
২৬১, ১২৪৬*, পৃ. ৯০৬	২, ১০, ২৮
বৈদেহী জনকাত্মজা॥	বৈদেহী জনকাত্মজে
২৬১, ২৮ঘ	৩, ৪৮০*, পৃ. ২২২
কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ॥	কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ
২৬১, ৩০ঘ	২, ৩৫, ১০খ
বনস্থৌ রামলক্ষ্মণৌ।	বনস্থৌ রামলক্ষ্মণৌ
২৬১, ৩১খ	৩, ১৩, ২খ
কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ	কৌসল্যাং চ সুমিত্রাং চ
২৬১, ৩৫ক	২, ২৮, ৬গ
পিতৃর্বচনকারিণা।	পিতুর্বচনকারিণা।
২৬১, ৩৮খ	২, ১৮, ২৯ঘ
প্রবিবেশ মহারণ্যং	প্রবিবেশ মহাবনম্
শরভঙ্গাশ্রমং প্রতিশরভঙ্গাশ্রমং প্রতি।	৩, ১৭, ২৪
২৬১, ৩৯গঘ	পরভঙ্গাশ্রমং প্রতি॥
	৩, ৪, ১৬খ
দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।	দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
২৬১, ৪০খ	২, ৯৭, ২৩খ
নদীং গোদাবরীং রম্যাম্	নদীং গোদাবরীং রম্যাম্
২৬১, ৪০গ	৩, ৬০, ২খ
চতুর্দ্দশ সহস্রানি জঘান ভুবি রক্ষসাম্।	চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং জঘান যঃ
২৬১, ৪২গ.ঘ.	৫, ৩৫, ১৬ ক.খ.
দূষণং চ খরং চৈব নিহত্য	চতুর্দশ সহস্রানি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
২৬২, ৪৩ক	৩, ৩১, ১১ ক.খ.
	দূষণং চ খরং চৈব হতং
	৩, ৩০, ২ক
কচ্চিৎ ক্ষেমং পুরে তব।	কশ্চিৎ কুশলং রাজঁল্লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বর
২৬১ ৩খ	৩, ৩৩, ৬৪৫*, পৃ. ১৭১

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্।	মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্॥
২৬২, ১০খ	৩, ৩৫, ১খ
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে	অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে
২৬২, ১২গ	৩, ৩৮, ১৭ক
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং চুক্রোশার্তস্বরেণ হ॥	হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবমাক্রুশ্য তু মহাস্বরম্
২৬২, ২২ গ.ঘ.	৩, ৪২, ১৮ ক.খ.
বিশেয়ং বা হুতাশনম্	প্রবিবেশ হুতাশনম্
২৬২, ২৭ঘ	৩, ৪ঘ
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষোরাবণঃ	এতস্মিন্নন্তরে রক্ষ
২৬২, ৩০ক	৩, ৪ঘ
অভব্যো ভব্যরূপেন ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ।	অভব্যো ভব্যরূপেণ ভর্তারমনুশোচতীম্।
২৬২, ৩০ গ.ঘ.	৩, ৪৪, ৯ ক.খ.
মম লঙ্কা পুরী নাম্না রম্যা পারে মহোদধেঃ॥	মম পারে সমুদ্রস্য লঙ্কা নাম পুরী শুভা।
২৬২, ৩৩ গ.ঘ.	৩, ৪৬, ১০ ক.খ.
স দদর্শ তদা সীতাং	স দদর্শ ততঃ সীতাং
২৬৩, ২ ক	৫, ১৫, ৩ক
স দদর্শ তদা গৃধ্রং	
২৬৩, ১৫গ	
সা দদর্শ গিরিপ্রস্থে পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্।	দদর্শ গিরিশৃঙ্গস্থান পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্।
২৬৩, ৮ ক.খ.	৩, ৫২, ১ গ.ঘ.
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং	প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং
২৬৩, (১২৬০*), পৃ. ৯১৩	৩, ৫২, ১১গ
বনে রাক্ষসসেবিতে।	বনে রাক্ষসসেবিতে॥
২৬৩, ১১খ	৩, ৫৫, ১৪ঘ
সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।	সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
২৬৩, ১৭খ	৩, ৩৭, ৪১খ
ব্যপবিদ্ধবৃসীঘটম্।	বিপ্রবিদ্ধবৃসীকটম্।
২৬৩, ২২খ	৩, ৫৮, ৭খ

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
হরণঞ্চৈব বৈদেহ্যা	হরণং চৈব বৈদেহ্যা
২৬৩, ২৮ক	৪. ৫৫, ১১৫০*, পৃ:-৩৩৯
রাবণেন হৃতা সীতা	রাবণেন হৃতা সীতা
২৬৩, ৩৯ক	৩, ৬৭, ১৯ক
সুগ্রীবমভিগচ্ছস্ব	সুগ্রীবমভিগচ্ছ ত্বং
২৬৩, ৩৯গ.	৩, ৭১, ২৫ক
হংসকারণ্ডবাযুতা।	হংসকারণ্ডবাকীর্ণাং
২৬৩, ৪০খ	৩, ৭১, ১৩৭২*, পৃ. ৩৭২
সংবসত্যত্র সুগ্রীবশ্চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ।	তস্যাং বসতি সুগ্রীবশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।
২৬৩, ৪১ ক.খ.	৩, ৬৯, ৩২ ক.খ.
ততোঽবিদূরে নলিনীং প্রভূতকমলোৎপলাম্।	বিশালা নলিনী যত্র প্রভূতকমলোৎপলা
২৬৪, ১ ক.খ.	৪, ৪২, ২১ ক.খ.
জগাম মনসা প্রিয়াম্॥	জগাম মনসা প্রিয়াম্
২৬৪, ২ঘ	৪, ২৯, ৫ঘ
প্রবৃত্তিরুপলব্ধা তে	প্রবৃত্তিমুপলভ্য তে
২৬৪, ৫ক	৪, ৫৭, ৩৪ঘ
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং তু	চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং তু
২৬৪, ২০ক	৫, ১১, ৪ক
তারা তারাধিপপ্রভা	তারা তারাধিপাননা
২৬৪, ২০খ	৪, ২০, ১ঘ
ভ্রাতা চাস্য মহাবাহুঃ সৌমিত্রিরপরাজিতঃ লক্ষ্মণো নাম মেধাবী স্থিতঃ কার্যার্থসিদ্ধয়ে॥	ভ্রাতা চাস্য মহাতেজা গুণতস্তুল্যবিক্রমঃ। অনুরক্তশ্চ ভক্তশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান॥
২৬৪, ২২	৩, ৩২, ১২
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনূমাংশ্চানিলাত্মজঃ।	মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনূমাঞ্জাম্বাবানপি
২৬৪, ২৩ ক.খ.	৪, ৪৯, ৬ ক.খ.
পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ॥	পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ
২৬৪, ৩২ঘ	৬, ৭৮, ১৭১৭* ঘ. পৃ. ৫৮১
সা মালয়া তদা বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া।	স তথা শুশুভে শ্রীমাঁল্লতয়া কণ্ঠসক্তয়া।
২৬৪, ৩৪ ক.খ.	৪, ১২, ৩৭ ক.খ.

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।	বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্
২৬৪, ৩৭খ	৪, ৪৭, ১৯খ
তাপসীবেশধারিণী।	তাপসীবেশধারিণীং
২৬৪, ৪২খ	৪, ৫১, ৯ঘ, ৪, ৫২, ৩ঘ
গতাসু তাসু সর্বাসু	গতাসু তাসু সর্বাসু
২৬৪, ৫৩ক	১, ৯, ২৩ক
শৃণু চেদং বচো মম॥	শৃণু চেদং বচো মম
২৬৪, ৫৪ঘ	৭, ৪৭, ৯ঘ
অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বৃদ্ধো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।	অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী রাক্ষসো বৃদ্ধমেতঃ।
২৬৪, ৫৫ ক.খ.	৫, ৩৪, ৭৫৯*, পৃ. ২৫২
অসকৃৎখরযুক্তে তু রথে নৃত্যন্নিব স্থিতঃ॥	রথেন খরযুক্তেন
২৬৪, ৬৪ গ.ঘ.	৫, ২৫, ১৯ক
কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে	কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে
২৬৪, ৬৫ক	৫, ২৫, ২৪খ
রক্তমাল্যানুলেপনাঃ॥	রক্তমাল্যানুলেপনঃ
২৬৪, ৬৫ঘ	৫, ২৫, ১৯ঘ
শ্বেতপর্বতমারূঢ় এক এব বিভীষণঃ॥	শ্বেতপর্বতমারূঢ়স্ত্বেক এব বিভীষণঃ
২৬৪, ৬৬ গ.ঘ.	৫, ২৫, ৬১৭*, পৃ. ২০৭
স কল্পবৃক্ষসদৃশো যত্নাদপি বিভূষিতঃ। শ্মশানচৈত্যদ্রুমবদ্ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥	স কল্পবৃক্ষপ্রতিমো বসন্ত ইব মূর্তিমান্। শ্মশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥
২৬৫, ৫	৫, ২০, ৫২০*, পৃ. ১৭৯
সীতে পর্যাপ্তমেতাবৎকৃতো ভর্তুরনুগ্রহঃ।	সীতে পর্যাপ্তমেতাবদ্ ভর্তুঃ স্নেহঃ প্রদর্শিতঃ
২৬৫, ৮ ক.খ.	৫, ২৪, ২১ ক.খ. (গী.প্রে. সং)
ভজস্ব মাং বরারোহে	ভজস্ব মাং বরারোহে
২৬৫.৯ক	৭.৮০.৪ক
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা	তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা
২৬৫, ১৭গ	৫, ১৯, ১৩ক
ন চৈবোপয়িকী ভার্যা	নাহমৌপয়িকী ভার্যা
২৬৫, ২১ক	৫, ১৯, ১৬ক

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং	কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং
২৬৫, ২৮ক	৩, ৪৮, ২৪ক
াক্ষসীভিঃ পরিবৃতা বৈদেহী শোককর্শিতা।	রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।।
২৬৫, ৩০ ক.খ.	৫, ৬৩, ১২ গ.ঘ.
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে	বসন্ মাল্যবতঃপৃষ্ঠে
২৬৬, ১গ	৪, ২৭. ১গ
নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো	নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো
২৬৬, ৪৯, ঙ	৪, ৫৭, ৭ক
তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী	তত্র দৃষ্টা ময়া সীতা রাবণান্তঃপুরে সতী।।
২৬৬, ৫৮ ক.খ.	৫, ৬৩, ১০ ক.খ.
ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকস্য	ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকস্য
২৬৬, ৬৭ক	৫, ৩৮, ৪গ
চিত্রকূটে মহাগিরৌ	চিত্রকূটে মহাগিরৌ।
২৬৬, ৬৭খ	২, ৮৪, ২১খ
দগ্ধা চ তাং পুরীম্	দগ্ধা পুরীং তাং
২৬৬, ৬৮খ	৫, ৫২, ১০৮৮*, পৃ. ৬৩২
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্।	বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যত।
২৬৭, ২ক.খ.	৬, ৩৮, ১৮ গ.ঘ.
গোলাঙ্গুলো মহারাজ গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ।	গোলাঙ্গুলমহারাজো গবাক্ষো ভীমবিক্রমঃ।
২৬৭, ৪ গ.ঘ.	৪, ৩৮, ১৮ ক.খ.
এতে চান্যে চ বহবো	এতে চান্যে চ বহবো
২৬৭, ৯ক.	৪, ৩৮, ৩২গ
হরিযূথপযূথপাঃ	কে বা যূথপযূথপাঃ।
২৬৭, ৯খ.	৬, ১৭, ৮খ
শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ	শারদভ্রপ্রতীকাশা
২৬৭, ১১গ	৬, ৫৭, ৩৫ গ.
দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্॥	দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।
২৬৭, ৪৪গ.ঘ.	৬.১৫, ২০ ক.খ.

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ॥	চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ
২৬৭, ৪৬ঘ	৬, ১৩, ৯খ
রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।	রাক্ষসৌ শুকসারণৌ।
২৬৭, ৫২খ	৬, ১৬, ৯খ
আহ ত্বাং রাঘবো রাজন্	আহ ত্বাং রাঘবো রামঃ
২৬৮, ১০ক	৬, ৩১, ৬৭ক
অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্। বিনশ্যন্ত্যনয়াবিষ্টা দেশাশ্চ নগরাণি চ॥	অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্। সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ॥
২৬৮, ১১	৫, ১৯, ১০
হন্তাস্মি ত্বাং মহামাত্যং	হন্তাস্মি ত্বাং মহামাত্যং
২৬৮, ১৫ক	৬, ৩১, ৬৮ক
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ॥	অরাক্ষসমিমং লোকং কর্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ।
২৬৮, ১৬ গ.ঘ.	৬, ৩১, ৫৬ ক.খ.
রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥	রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
২৬৮, ১৭ঘ	৬, ১৭, ৫খ
চত্বারো রজনীচরাঃ।	চত্বারো রজনীচরাঃ॥
২৬৮, ১৮খ	৬, ৩১, ৭৩ঘ
নখৈর্দন্তৈশ্চ বীরাণাং	নখৈর্দন্তৈশ্চ রাক্ষসান্॥
২৬৮, ৩৬গ	৬, ৭৭, ১৭ঘ
পুরা দেবাসুরে যথা॥	তব দেবাসুরে যুদ্ধে
২৬৯, ১০ঘ	২, ৯, ৯ক
সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুমৈঃ	সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুম
২৭০, ১৩ঘ	৪, ৪২, ২৯ঘ
হনূমান্ মারুতাত্মজঃ	হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
২৭০, ১৪ঘ	৬, ৪২, ২৯খ
সাশ্বং সরথসারথিম্।	রথং সাশ্বং সসারথিম্
২৭০, ১৪খ	৬, ৩৩, ১৯খ
রথং সাশ্বং সসারথিম্	
২৭২. ১৮ঘ	

মহাভারত : (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
নিহতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষং	ধূম্রাক্ষং নিহতং দৃষ্ট্বা
২৭০, ১৫ক	৬, ৪২, ৩৬ক
হতশেষা নিশাচরাঃ	হতশেষা নিশাচরাঃ।
২৭০, ১৭খ	৬, ৪২, ৩৬খ
ভক্ষয়ামাস বানরান্	ভক্ষয়ামাস বানরান্।
২৭১, ৪খ	৬, ৫৫, ৭৪খ
কুম্ভকর্ণস্য মূর্ধনি	কুম্ভকর্ণস্য মূর্ধনি।
২৭১, ৮খ	৬, ৫৫, ১১৮৬* (৫), পৃ. ৩৮৮
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।	তদ্বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
২৭১, ২১ ক.খ.	৩, ২৪, ২৮ ক.খ.
ততঃশ্রুত্বা হতংসংখ্যে কুম্ভকর্ণং সহানুগম্	শ্রুত্বা বিনিহতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
২৭২, ১ ক.খ.	৬, ৫৬, ২ ক.খ.
শতশোঽথ সহস্রশঃ॥	শতশোঽথ সহস্রশঃ।
২৭২, ২৩ঘ	২, ৫১, ৭খ
ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।	ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
২৭২, ২৬খ	৬, ৪১, ৫খ
রাবণি ক্রোধমূর্ছিতঃ।	রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
২৭৩, ২০খ	৬, ৬৮, ১৪খ
শরানাশীবিষোপমান্॥	শরানগ্নিশিখোপমান/শরানাশীবিষোপমান্
২৭৩, ২০ঘ	৬, ৭৬, ৪ঘ, (পাদটীকা ১)
রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥	রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ
২৭৪, ৫ঘ	৬, ৮৩, ১৮৮১*, ১০ পৃ. ৬২৪
মাতলিঃ শক্রসারথিঃ॥	মাতলিঃ শক্রসারথিঃ।
২৭৪, ১২ঘ	৬, ১০০, ৫খ
শস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥	শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
২৭৪, ২১ঘ	৬, ৯২, ২৯খ
রামং কমলপত্রাক্ষং	রামং কমলপত্রাক্ষং
২৭৫, ৩ক	৬, ২৯, ১৯গ

মহাভারত (সামীক্ষিক সংস্করণ) বনপর্ব, রামোপাখ্যান	রামায়ণ (সামীক্ষিক সংস্করণ)
ততোঽন্তরিক্ষং তৎসর্বং দেবগন্ধর্বসংকুলম্। শুশুভে তারকাচিত্রং শরদীব নভস্তলম্॥	সা তস্য শুশুভে শালা তাভিঃ স্ত্রীভির্বিরাজিতা। শরদীব প্রসন্না দৌস্তরাভিরভিশোভিতা।।
২৭৫, ২০	৫, ৭, ৩৭
যদি হ্যকামামাসেবেৎস্ত্রিয়মন্যামপি ধ্রুবম্। শতধাস্য ফলেদ্দেহ ইত্যুক্তঃ সোঽভবৎপুরা।।	যদা হ্যকামাং কামার্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্। মূর্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা॥
২৭৫, ৩৩	৭, ২৬, ৪৪
রামং শস্ত্রভৃতাং বরম্।	রামং শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥
২৭৫, ৪৯খ	৩, ৩, ১৪ঘ
যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি॥	যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি॥
২৭৫, ৪৮ঘ	৬, ৮৮, ৫৩ঘ
পুষ্পকেণ বিমানেন	তেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা
২৭৫, ৫৬গ	৬, ১১০, ২৩কখ
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ	বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ
২৭৫, ৬৫গ	১, ৭, ৩ঘ
দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্॥	শতাশ্বমেধানাজহ্রে সদশ্বান্ভূরিদক্ষিণান্॥
২৭৫, ৬৯গ.ঘ.	৬, ১১৬, ৮২ গ.ঘ.

দশাশ্বমেধান্ জারূথ্যান্ আজহার নিরর্গলান্
হরিবংশে, হরিবংশপর্ব ৪১।১৪১
(গীতা প্রে. সং)

মহাভারতে উল্লিখিত আমাদের আলোচিত রামোপাখ্যানটি ছাড়াও মহাভারতোক্ত অন্যান্য সংক্ষিপ্ত রামোপাখ্যানের সঙ্গেও রামায়ণের শ্লোকাংশের সাম্য দেখা যায়।

মহাভারতের বনপর্বে আরও একটি রামোপাখ্যান পাওয়া যায়।[৩৮] গন্ধমাদন পর্বতের সমতলভূমিতে কদলী বনে ভীমের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ হয়। ভীম হনুমানের অপরিমিত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তাঁর আসল পরিচয় জানতে চান। তখন হনুমান নিজেকে রামায়ণ-খ্যাত বলে প্রমাণ করার জন্য ভীমের নিকট মাত্র ২৬টি শ্লোকে রামোপাখ্যান বর্ণনা করেন। হনুমান-কর্তৃক কথিত এই সংক্ষিপ্ত রামোপাখ্যানে রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের বিষয় যেমন— হনুমানকে রামের অমরত্ব দান ও তাঁর এগারো হাজার বছর রাজত্ব করার কথাও পাওয়া যায়।[৩৯]

দ্রোণপর্বে অভিমন্যু-বধে যুধিষ্ঠির শোকাচ্ছন্ন হলে বেদব্যাস তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শোকার্ত মহারাজ সঞ্জয়ের প্রতি নারদ দ্বারা বর্ণিত ষোড়শরাজীয় উপাখ্যান বর্ণনা করেন। চব্বিশটি শ্লোকে এই রাম-কথা বর্ণিত হয়েছে। উক্ত রাম-কথায় রামের রাবণ-বধ ও তাঁর সুন্দর রাজ্যশাসনের প্রসঙ্গও এসেছে।[৪০]

আবার শান্তিপর্বে দেখা যায় যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির শোকাচ্ছন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দেন। তিনি এ সময় পূর্বোক্ত নারদ-কথিত রামোপাখ্যান পুনরায় বিবৃত করেন।[৪১]

এই পর্বেই গৃধ্র-জম্বুক সংবাদে এক মৃত ব্রাহ্মণ বালকের আত্মীয়স্বজনকে জম্বুক রামায়ণের শম্বুক-বধের উল্লেখ করে বলে যে তার শোনা আছে সত্যপরাক্রম রাম তপঃপরায়ণ শূদ্র শম্বুককে বধ করলে ধর্মপ্রভাবে এক ব্রাহ্মণ বালক পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁদের মৃতপুত্র ত্যাগ করে গৃহে যাওয়া উচিত নয়।[৪২]

মহাভারতে উল্লিখিত রাম-কথাগুলির মধ্যে বনপর্বে উদ্ধৃত মার্কণ্ডেয়-কথিত রামোপাখ্যানকে অনেক পণ্ডিত রামায়ণের উৎস বলে ব্যাখ্যা করেন। আমাদের মনে হয় এ ধারণা কল্পনাপ্রসূত। মহাভারতকার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেই রামোপাখ্যান তাঁর কাব্যে সংযোজন করেছেন। দ্রৌপদী হরণের গ্লানি ও অরণ্যজীবনযাপনের নিদারুণ কষ্টে ব্যথিত হয়ে যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনির উদ্দেশে বলেছেন, আমরা অতর্কিত ভার্যাহরণ দুঃখ পেলাম, এখন দুঃখকর বনবাসজীবন

---

৩৮ ১৪৭, ২৪-৩৮

৩৯. দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
রাজ্যং কারিতবান্ রামস্ততস্তু ত্রিদিবং গতঃ।। ১৪৭; ৩৮

৪০. 7 APP 8. 440 pr - 480

৪১. ২৯, ৪৬-৫৫

৪২ শ্রূয়তে শম্বুকে শূদ্রে হতে ব্রাহ্মণদারকঃ।
জীবিতো ধর্ম্মমাসাদ্য রামাৎসত্যপরাক্রমাৎ।। ১৪৯, ৬২

চলছে এবং মৃগয়ায় জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। অতএব আমার মতো মন্দভাগ্য কোনো রাজা আছেন কি? অথবা পূর্বে আপনি এরূপ দেখেছেন কি? বা তাঁর কথা আপনার শোনা আছে কি?[৪৩]

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—

প্রাপ্তমপ্রতিমং দুঃখং রামেণ ভরতর্ষভঃ।
রক্ষসা জানকী তস্য হৃতা ভার্যা বলীয়সা॥ ২৫৮।১

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ও মহর্ষির উত্তরদানের মাধ্যমে সমগ্র রাম-কাহিনী বর্ণিত হল। ধৈর্যহারা যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দানের জন্যই মহর্ষির এই রামোপাখ্যানের অবতারণা। যুধিষ্ঠিরের বর্তমান অবস্থা দেখে অতীতে রাম-কাহিনীর কথাই মহর্ষির স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে। তাই সমগ্র উপাখ্যানটি মহর্ষি অতীতকালের বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। মহর্ষির হাতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে সত্য, তবে মূল ঘটনাটি মোটামুটি একই আছে। পরিবর্তন যা হয়েছে তা অবান্তর ঘটনায়।

আবার কোনো কোনো স্থলে কয়েকটি নতুন চরিত্র সংযোজিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মহাভারতীয় এই রামোপাখ্যানের ছায়াতেই রামায়ণ রচিত হয়েছে তা বলা চলে না।

কেহ কেহ আবার এই রামোপাখ্যানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেন যে, যেহেতু এই মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ঘটনা উল্লিখিত হয় নি সেহেতু উত্তরকাণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত বা বাল্মীকির রচনা নয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে মানুষ রুচি অনুসারে রামায়ণকে দেখেছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় রামায়ণের ভাবানুবাদ তার নিদর্শন। যে সামাজিক পরিবেশে বা সংস্কৃতিতে রামায়ণের যে যে ঘটনা খাপ খায়নি তারই পরিবর্তন ঘটেছে। যাঁর যে অংশ কটু লেগেছে তিনিই সেই অংশ বদল করে নিজের মতো করে নিয়েছেন।

রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো কথা রামরাজ্য। সংসারে রামরাজ্যের আদর্শ স্থাপন মহাকাব্যের উদ্দেশ্য। রামের রাজ্যশাসনকে মানুষ যুগ যুগ মূল্য দিয়ে এসেছে। প্রশংসা করে এসেছে তাঁর প্রজ্ঞানুরঞ্জনের। সুতরাং উত্তর কাণ্ডকে বাদ দিলে

৪৩. তদ্দারহরণং প্রাপ্তমস্মাভির্রবিতর্কিতম্॥
দুঃখশ্চায়ং বনে বাসো মৃগয়াযাং চ জীবিকা।
হিংসা চ মৃগজাতীনাং বনৌকোভির্বনৌকসাম্॥
জ্ঞাতিভির্বিপ্রবাসশ্চ মিথ্যা ব্যবসিতৈরয়ম্॥
অস্তি নূনং ময়া কশ্চিদল্পভাগ্যতরো নরঃ।
ভবতা দৃষ্টপূর্বো বা শ্রুতপূর্বোঽপি বা ভবেৎ॥ ২৫৭, ৮. গ.ঘ-১০

রামরাজ্য হয় কিভাবে? যেটি বাদ দিলে অঙ্গহানি হয় না সেটিকেই আমরা প্রক্ষিপ্ত বলতে পারি। আর যেগুলি বাড়তি আছে বলে মনে হয় সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে। এই যুক্তিকে অবলম্বন করে অনেকে বলেন আদি ও উত্তরকাণ্ডে কাব্যবস্তু-গঠন-বহির্ভূত বিষয় এসেছে।

এই মতের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, কাব্যবস্তু গঠনের যে নিয়ম পরবর্তীকালে ভারতে এবং বহির্ভারতে চলিত হয়েছে সেই নিয়ম অনুসারে বাল্মীকির চলার প্রসঙ্গই আসে না। তিনি রামের মহিমাকে বিশদভাবে বর্ণনা করার জন্য যদি কোনো বিষয় যোগ করার প্রয়োজন মনে করেন তবে তা তিনি করতে পারেন। যেটি নিতান্ত অপেক্ষিত সেটি রাখা হবে আর যেটি অনপেক্ষিত সেটি একেবারে বাদ দিতে হবে এ কথা বাল্মীকি কোথাও স্বীকার করেন নি।

তা ছাড়া রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের কাহিনী মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে না এলেও উত্তরকাণ্ডের কয়েকটি শ্লোক হুবহু এই রামোপাখ্যানে স্থান পেয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের রামোপাখ্যানেও উত্তরকাণ্ড স্বীকৃত হয়েছে।[৪৪] মহাভারতের অঙ্গীভূত খিল হরিবংশেও রামোপাখ্যান দেখা যায়।[৪৫] শুধু তাই নয়, এই উপাখ্যানের সঙ্গে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে সাম্যও বর্তমান।[৪৬] মহাকবি ভবভূতিও উত্তর কাণ্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও উত্তরকাণ্ডসহ রামায়ণকে গ্রহণ করে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন।[৪৭] বস্তুত মহাভারতীয় রামোপাখ্যানে উত্তরকাণ্ডগত বিষয়ের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে বলা যায় যে, রামোপাখ্যানে মূল রাম-কাহিনীর সব দেওয়া সম্ভব হয় নি। রামায়ণ একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যান। মহাভারতীয় রামোপাখ্যান উপাখ্যান মাত্র। এটি অতীত ঘটনারই গল্পাকারে উপস্থাপন। তাই রামায়ণের মূল যে আখ্যান তার কথাই সংক্ষিপ্তাকারে এখানে আসাই স্বাভাবিক, আনুষঙ্গিক ঘটনা না আসাই সম্ভব। এই পরিবর্তনের

---

৪৪. ৯।১০-১১ অধ্যায়

৪৫. হরিবংশ পর্ব ৪১/১২১-১৫৫

৪৬. "The Hari-Vamsa bears to the Mahābhārata a relation very similar to that which the Uttara-Kānda, or last Book of the Rāmāyana bears to the preceding Books of that poem" Monier Williams . *Indian Wisdom*. p.417.

৪৭. "শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা প্রেমকে একদিন মৃত্যুতমসার তীরে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মহাকবি এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া এই অনাথিনী, কুশ এবং লব, কাব্য ও ললিতকলা নামক যুগলসন্তান প্রসব করিয়াছেন।" ইত্যাদি- পঞ্চভূত—অপূর্ব রামায়ণ।

আধারে আমরা বলতে পারি না যে বাল্মীকি-রামায়ণ রামোপাখ্যানের বিস্তৃততর রূপ। রামায়ণের গঠনশৈলী, তার রচনাসৌকর্য এবং তার সর্বভারতীয় স্বীকৃতিই এই গ্রন্থের মৌলিকতার পরিচায়ক। মহাভারতে মূল আখ্যানের বিষয়বস্তুকে দৃঢ়ীকরণের জন্য মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র মুখে প্রাচীন রামকথা উপাখ্যানরূপে সংযুক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতে এবং তদতিরিক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রাম-কথা বর্ণিত আছে। এই সমস্ত বিবরণে ইতস্তত সামান্য পার্থক্য থাকলেও বাল্মীকি-কৃত আর্ষ রামায়ণই যে রামোপাখ্যানের মূল স্রোত এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই।[৪৮]

অনেকের মতে জয়দ্রথ-কর্তৃক দ্রৌপদী হরণের ঘটনায় রাবণ-কর্তৃক সীতা হরণের প্রভাব বিদ্যমান। তাই তাঁদের ধারণা রামায়ণই সংক্ষিপ্তাকারে মহাভারতে এসেছে।[৪৯]

অনেকে আবার এই যুক্তিকে অস্বীকার করে বলেন যে মহাভারতকারই রামোপাখ্যানকে প্রাচীন ইতিহাস বলে স্বীকার করেছেন।[৫০] সুতরাং এই প্রাচীন রামোপাখ্যানের আধারেই রামায়ণ রচিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের

৪৮. "Now the Rāmopakhyāna in the Mahābhārata, which shows some differences from the text of Vālmiki, yet discloses the influence of the latter and has several passages showing its minute acquaintance with Vālmiki's text Jacobi, Winternitz and Sukthankar the first editor of the critical edition of the Mahābhārata, discussed this question of the relation of the Ramopākhyāna in the Mahābhārata with Vālmiki Rāmāyaṇa and concluded that the Rāmopakhyāna knew Vālmiki and represented a free summary of Vālmiki's text." V. Raghavan, *The Rāmāyana in Sanskrit Literature*, p.3

৪৯. "Mārkaṇḍeya is made to recount the narrative to Yudhisthira, after the recovery of Draupadi, (Who had been carried by Jayadratha, as Sitā was by Rāvaṇa) in order to show that there were other examples in ancient times of virtuous people suffering violence at the hands of wicked men It is probable (and even Professor Weber admits it to be possible) that the Mahābhārata episode was epitomized from the Rāmāyaṇa, and altered here and there to give it an appearance of originality." - M. Monier Williams, *Indian Wisdom*, p.368.

৫০. মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বলেছেন—

শৃণু রাজন্ পুরাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।
সভার্যেণ যথা প্রাপ্তং দুঃখং রামেণ ভারত।। পৃ ২৫৮, ৬, ১২৩৪*

বক্তব্য, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র বাক্যে রামোপাখ্যান ও রামায়ণের ভেদ স্বীকৃত হয় নি। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে মহাভারতীয় রামোপাখ্যানই সত্য আর রামায়ণটি মনগড়া বা এই উপাখ্যানেরই বিস্তৃততর রূপ। আসলে মহাভারতকার যখন রামোপাখ্যান রচনা করেন তখন উত্তরকাণ্ড সহ সমগ্র রামায়ণই তাঁর সামনে উপস্থিত ছিল, উত্তরকাণ্ড থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিগুলি থেকেই এ কথা অনুমান হওয়া স্বাভাবিক।[৫১] কিন্তু মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্তই গ্রহণ করেছেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র উদ্দেশ্য রামের দুঃখকষ্টের দিনগুলিরই বর্ণনা, রাজ্য প্রাপ্তির পরের ঘটনা তাঁর এ প্রসঙ্গে বলার প্রয়োজন হয় নি।

তবু মহর্ষির উপাখ্যানে উত্তরকাণ্ডের কয়েকটি শ্লোক এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের কথাও স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক ইয়াকবিও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,

The Rāmāyaṇa must already have been generally familiar as an ancient work before the Mahābhārata reached its final form.[৫২]

সুতরাং মহাভারতীয় রামোপাখ্যানকে যেমন রামায়ণের উৎস বলে ব্যাখ্যা করার সঠিক প্রমাণ অনুপস্থিত তেমনি এই রামোপাখ্যানে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের কাহিনী অনুপস্থিত দেখে তা পরবর্তীকালে রামায়ণে সংযোজিত হয়েছে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়াও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।[৫৩]

৫১. "In this restricted sense we must understand the statement that the Rāmopākhyāna is an epitome of our Rāmāyana, a fast which we may regard as established on account of numerous verbal agreements which have been shown to exist between the two poems" V.S Sukthankar, V.S. Sukthankar Memorial Volume

৫২. *The Rāmāyaṇa*, p 71

৫৩. It is also important to note that the Rāmopakhyāṇa already known the full text of Vālmiki as it is current with the Bāla and Uttara Kāṇdas and knows also the longer verses, it is also noteworthy that its narrative opens with the story of Rāvaṇa, a feature found generally in the South-East Asian versions

V Raghavan *The Rāmāyaṇa in Sanskrit Literature*

চতুর্থ অধ্যায়

মহাকাব্যদ্বয়ে উপলব্ধ উপাখ্যান সমূহে সাম্য ও বৈষম্য

রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই মূল আখ্যান বর্ণনাবসরে অনেক উপাখ্যান যুক্ত হয়েছে। মহাভারতের মূল আখ্যান ভাগের নাম ছিল 'জয়' নামক ইতিহাস।[১] তার দৈর্ঘ্য ছিল চব্বিশ হাজার শ্লোক। ভরত-বংশীয় ক্ষত্রিয়দের গৃহযুদ্ধের বিবরণ প্রধানত উহার উপজীব্য ছিল। ক্রমশই এই ভারত আখ্যান মহাভারতে পরিণত হয়। বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বিষয়টির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। মূল গ্রন্থে আখ্যানই ছিল, উপাখ্যান ছিল না।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।

উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ ১।১।১০২

তবে আখ্যান ও উপাখ্যানের একটি মৌলিক ভেদ বর্তমান। যে ঘটনাটিকে অবলম্বন করে মূল ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেটিই ওই গ্রন্থের আখ্যান। 'আ' অর্থাৎ 'সম্যক্ রূপে', 'খ্যা' শব্দের অর্থ প্রকথন্। উপাখ্যানগুলি ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে যুক্ত হয়েছে। সংযুক্ত উপাখ্যানগুলির সঙ্গে মূল আখ্যানভাগের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গক্রমে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এগুলির সংযুক্তি। মূল ইতিহাসগ্রন্থ যখন জাতীয় মহাকাব্যে পরিণত হল তখন ক্রমশ এই উপাখ্যানগুলি মূল আখ্যানে যুক্ত হওয়া সম্ভব। অবশ্য পরবর্তীকালে সংযোজিত প্রত্যেকটি উপাখ্যানই আখ্যানভাগের বক্তব্যকে স্পষ্ট করেছে বলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মহাভারতের জরৎকারু মুনির উপাখ্যানটি[২] উল্লেখ করা যায়।

জরৎকারু মুনি ব্রহ্মাচর্য-পালন পূর্বক মোক্ষলাভ করতে ইচ্ছুক। একদিন ভ্রমণে বেরিয়ে কোনো এক স্থানে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে একটি বিশাল গর্তে নিম্নাভিমুখে ঝুলতে দেখলেন। অপরিচিত ব্যক্তিদিগের এই নিদারুণ অবস্থা দেখে তিনি তাদের পরিচয় জানতে আগ্রহী হলেন। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ বললেন, আমরা যাযাবর নামক ঋষি। সন্তান ক্ষয় হেতুই আমরা অধঃপতিত হচ্ছি। আমরা বড়ো হতভাগ্য। আমাদের জরৎকারু নামে এক বংশধর আছে। সে সন্তানলাভের

[১] জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা। ১।৬২।২০

[২] ১।১৩

নিমিত্ত পত্নীগ্রহণ না করে তপস্যায় কালযাপন করছে। সেহেতু আমাদের কুলক্ষয় আসন্ন। সেজন্যই আমাদের এই দুর্দশা। জরৎকারু থাকতেও আমরা এই কষ্টভোগ করছি। জরৎকারু পিতৃগণের এই কাতরোক্তিতে দার গ্রহণে সম্মত হন। উপাখ্যানটি মূল আখ্যানভাগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত নয়। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এর অবতারণা করা হয়েছে। বৈদিক কালের সভ্যতায় বংশরক্ষাকেই বেশি মূল্য দেওয়া হত। উপনিষদের যুগে মানুষের সমাজ জীবনের পরিবর্তন ঘটল। মানুষ সংসার থেকে দারগ্রহণ পূর্বক সন্তান উৎপাদন অপেক্ষা মোক্ষ প্রাপ্তিকেই জীবনের চরম আদর্শ রূপে মর্যাদা দিল। সম্ভবত তাতে সমাজে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিল। তাই তৎকালীন সমাজের মানুষ আবার মর্যাদা দিতে শুরু করল সংসার জীবনের। উপরোক্ত উপাখ্যানটির উদ্দেশ্য এই সংসার জীবনেরই জয়গান গাওয়া।

রামায়ণেও ঋষ্যশৃঙ্গমুনির উপাখ্যান,[৩] রাজা নৃগের উপাখ্যান[৪] প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে। আমাদের আলোচনায় ক্রমশ তা স্পষ্ট হবে।

কখনোও বৈদিক সংহিতায় কখনোও বা ব্রাহ্মণগ্রন্থে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো উপাখ্যানের সন্ধান মেলে। আবার তৎকাল-প্রচলিত লিখিত অথবা মৌখিক ইতিহাস পরম্পরা হতে অনেক উপাখ্যান সংগৃহীত হয়েছে তা অনুমান করা যেতে পারে। কালে কালে মূলগুলির অপ্রচলন এবং মহাভারতের বিশেষ প্রচলনের ফলে মহাভারতই সকল কথার আধার রূপে পরিগণিত হয়েছে বলা যেতে পারে। সৌতি বলেছেন,

অনাশ্রিত্যেদমাখ্যানং কথা ভুবি ন বিদ্যতে। ১।২।৩৭ ক.খ.

সমাজ জীবনে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বিষয়ক মানুষের যা-কিছু ঈপ্সিত তার সবই মহাভারতে স্থান পেয়েছিল। যা মহাভারতে পাওয়া যেত না তা অন্যত্রও পাওয়া যেত না। আকারে প্রকারে মহাভারত এবং পুরাণে প্রভেদ নেই বললেই চলে। তবে পুরাণগুলি মহাভারতের পরবর্তী। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ কথা পুরাণকারেরা স্বীকার করেছেন।

বৈদিক ও তৎপরবর্তী লৌকিক সাহিত্যে কালে কালে যে-সমস্ত উপাখ্যান ভারতীয় জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল রামায়ণের তুলনায় মহাভারতরূপী মহাসাগরে সেগুলির বেশিরভাগেরই সন্ধান মেলে। কিন্তু উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত

৩. ৭।৫৩

৪ ১।১০

প্রত্যেক উপাখ্যানের মূল অন্বেষণ আজ আর সম্ভব নয়। রামায়ণ এবং বিশেষভাবে মহাভারতের বহু উপাখ্যান কখনো আক্ষরিকভাবে কখনো কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের সঙ্গে কখনোও বা বিষয়সাম্য রক্ষা পূর্বক ভাষান্তরে পুরাণ সাহিত্যে বিবৃত হয়েছে। যেমন মৎস্যপুরাণের এবং বায়ু পুরাণের যযাতি উপাখ্যানটি[৫] মহাভারতেরই উপাখ্যান।[৬]

মহাভারতে কুরু-পাঞ্চাল বিরোধের সম্পর্কে নানা প্রমাণ আছে।[৭] দেখা যায় মহারাজ দ্রুপদ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির কথা অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁর কৌরব-বিরোধের কারণ কৌরবকুলে দ্রোণাচার্যের সমাদর। দ্রোণাচার্য দ্রুপদকে অপমান করেছিলেন। উদ্‌যোগ পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রুপদের যুদ্ধের প্রতি বিশেষ আগ্রহ এই বিরোধেরই সূচনা করে। হরিবংশ পুরাণে ভীষ্ম এবং উগ্রায়ুধের বিরোধে একটি প্রাচীনতর কুরু-পাঞ্চাল বিরোধের উদাহরণ স্পষ্ট দেখা যায়।[৮] আবার প্রাচীন মূল আখ্যান যখন মহাভারতে এসেছে তখনও তাতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ রামোপাখ্যানের[৯] কথা উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যে যে-সকল উপাখ্যান মোটামুটি এক সেগুলি এখন বিবৃত হচ্ছে। একই উপাখ্যানের উভয় মহাকাব্যে উদ্ধৃতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সেগুলির সাম্য-বৈষম্যের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ-মূলক আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে।

---

৫. মৎ. পু. ৮, বায়ু. পু. প্রকরণ ৫৫ (২)
৬. ম.ভা. ১।৭৮
৭ দ্র. মহাভারতের কথা, পৃ ৯৪-৯৫
৮. খি হ. বং. হরিবংশ-পর্ব, ৪০ অধ্যায়
৯. ২।২৩১

রাজা নৃগের উপাখ্যান

রামায়ণে[১০] বিচারপ্রার্থী নাগরিক রাজদ্বারে এসে উপেক্ষিত হলে রাজার যে অবস্থা হয় তা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাম লক্ষ্মণের কাছে নৃগের উপাখ্যান বলেছেন। পূর্বে ব্রাহ্মণভক্ত নৃগ অসংখ্য সবৎসা গাভী এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। সেই সময় কোনো দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি গাভীও সেইসঙ্গে চলে যায়। পরে দরিদ্র ব্রাহ্মণটি ওই ব্রাহ্মণের গৃহে স্বীয় গাভীটি দেখে তা প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। শেষে বিবদমান ব্রাহ্মণদ্বয় যোগ্য বিচারের আশায় নৃগ রাজার দরবারে উপস্থিত হন। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও রাজার সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হয়ে ব্রাহ্মণদ্বয় রাজাকে কৃকলাসরূপে গহ্বরে বাস করার অভিশাপ দেন। নরনারায়ণ ঋষি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে রাজার মুক্তি ঘটবে এই কথা বলে ব্রাহ্মণদ্বয় প্রস্থান করেন।[১১] শেষে রাজা নৃগ পুত্রগণ-কর্তৃক পাতালে গৃহ নির্মাণ করে সেখানে অভিশাপ ভোগ করতে থাকেন।

মহাভারতের গীতা প্রেস সংস্করণে বন-পর্বের ১৯৯ সংখ্যক অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক মহর্ষি নৃগের অভিশাপ মুক্তির কথা বলা হয়েছে।[১২]

আবার পিতামহ ভীষ্মও যুধিষ্ঠিরের কাছে রাজা নৃগের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।[১৩]

এখানে যদুবংশের বালকগণ জল আহরণের জন্য লতাগুল্মে আবৃত কূপমধ্যে একটি কৃকলাস দেখে উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৃকলাসকে উদ্ধার করে তার পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে রাজা নৃগ তাঁর পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত সবিস্তারে ব্যক্ত করেন। এ-সমস্ত ঘটনা রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে বেশি দেখা যায়।

---

১০. ৭।৫৩ (সামীক্ষিক সংস্করণে এটি প্রক্ষিপ্ত বলে স্বীকৃত)
(সা. সং. Appendix-I. No. 8)

১১. শ্বভ্রে ত্বং কৃকলীভূতো দীর্ঘকালং নিবৎস্যসি।
উৎপৎস্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্তিবর্ধনঃ॥
বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ।
স তে মোক্ষয়িতা শাপাদ্ রাজংস্তস্মাদ্ ভবিষ্যসি॥ ৭।৫৩।২০-২১

১২. ননু দেবকীপুত্রেণাপি কৃষ্ণেন নরকে মজ্জমানো রাজর্ষির্নৃগস্তস্মাৎ কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃ সমুদ্ধৃত্য স্বর্গং প্রাপিত ইতি। ১৮

১৩. ১৩।৭০

রামায়ণে অভিশাপ দিচ্ছেন দুই ব্রাহ্মণ[১৪] আর মহাভারতে রাজা ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণের অপরাধে পাপ ভোগের জন্য স্বয়ং যমরাজ-কর্তৃক প্রেরিত হচ্ছেন।[১৫] এখানে দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গৃহে ফিরে যান কিন্তু রামায়ণে ক্রুদ্ধ হয়ে উভয়েই অভিশাপ দান করেন। রামায়ণে অভিশাপ এবং পরবর্তীকালে কৃষ্ণ-কর্তৃক তা থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে কৃষ্ণ-কর্তৃক উদ্ধারও দেখানো হয়েছে এবং নৃগ নিজেই স্বীয় অভিশাপ বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেছেন।[১৬]

মহাভারতের উপাখ্যানে গোরুর মূল্যই বেশি প্রকটিত হয়েছে। রামায়ণে মূল্য দেওয়া হয়েছে বিচার প্রার্থীর এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎই হয়নি। পক্ষান্তরে মহাভারতে রাজা বহু চেষ্টা করেও ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে উপাখ্যানটিকে দীর্ঘতর করা হয়েছে। রামায়ণে রাজার ত্রুটি স্খালনের কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। তাই রাজা দুই ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎই করেন নি। কিন্তু মহাভারতে রাজাকে দোষ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছে, অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দৈব ও পুরুষকারের কথা বলার সময় বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে রাজা নৃগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন— রাজর্ষি নৃগ মহাযজ্ঞে ভুলবশত এক ব্রাহ্মণকে অপরের গো দান করেন ফলে কৃকলাসত্ব প্রাপ্ত হন।[১৭]

রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের উপাখ্যানটি যেহেতু পল্লবিত সেহেতু মহাভারতের উপাখ্যানটি পরবর্তী হতে পারে।

---

১৪. ক্রুদ্ধৌ পরমসন্তপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্।
অর্থিনাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাত্ত্বং নৈষি দর্শনম্॥ ৭।৫৩।১৮

১৫. ...ধর্মরাজং ব্রুবন্নেবং পতিতোঽস্মি মহীতলে॥
অশ্রৌষং পতিতশ্চাহং যমস্যোচ্চৈঃ প্রভাযতঃ॥ ১৩।৭০ ২৪ গ.ঘ. ২৫ ক.খ.

১৬. স বাসুদেবেন সমুদ্‌ধৃতশ্চ
পৃষ্টশ্চ কার্যং নিজগাদ রাজা।
নৃপস্তদাঽঽত্মানমথো ন্যবেদয়ৎ
পুরাতনং যজ্ঞসহস্রযাজিনম্॥ ১৩।৭০।৭

১৭. গোপ্রদানেন মিথ্যা চ ব্রাহ্মণেভ্যো মহামখে।
পুরা নৃগশ্চ রাজর্ষিঃ কৃকলাসত্বমাগতঃ॥ ৬।৩৮

আবার এমনও হতে পারে উভয় মহাকাব্য যুগেরও পূর্বে এই উপাখ্যানটি সমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে উভয় মহাকাব্যই তা গ্রহণ করেছে। তবে মহাকাব্যদ্বয়ে উপাখ্যানটি দেখে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক বলা যেতে পারে।

ভাগবতপুরাণেও নৃগ উপাখ্যানটি দেখা যায়।[১৮] এখানে শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের নিকট উপাখ্যানটি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করেছেন। এই উপাখ্যানটির সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যানটিরই সাম্য বেশি।

কল্মাষপাদ উপাখ্যান

রামায়ণে আমরা মহর্ষি বাল্মীকিকে শত্রুঘ্নের নিকট কল্মাষপাদের কাহিনী বলতে শুনি।[১৯]

শত্রুঘ্নের পূর্ব পুরুষ সুদাস নামক রাজার বীরসহ (মিত্রসহ) নামে একটি পুত্রের জন্ম হয়। বীরসহ বালক বয়সে মৃগয়া করার সময় ব্যাঘ্ররূপী দুই রাক্ষসকে দেখেন। ব্যাঘ্ররূপী রাক্ষস দুটি বহুসংখ্যক মৃগ ভোজন করেও তৃপ্ত হয় না। বীরসহ মৃগশূন্য বনভূমি দেখে ক্রোধবশত রাক্ষসদ্বয়ের একটিকে বাণদ্বারা নিহত করেন। বীরসহের হাতে একটি রাক্ষস নিহত হলে অপরটি সন্তপ্ত হয়ে প্রতিশোধ নেবার কথা বলে অন্তর্হিত হয়। এ ঘটনার বহুদিন পরে বীরসহ অযোধ্যার রাজা হয়ে আশ্রমের নিকট অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। বশিষ্ঠ মহাযজ্ঞ রক্ষা করতে থাকেন। যজ্ঞ শেষ হলে সেই রাক্ষস পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করে বশিষ্ঠের বেশ ধরে রাজার কাছে আমিষ খাদ্য খাবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। বশিষ্ঠরূপী রাক্ষসের কথায় রাজা পাচকগণকে আমিষ খাদ্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। এদিকে রাক্ষস আবার পাচকের বেশ ধরে বশিষ্ঠের জন্য নরমাংস রন্ধন করে। রাজা স্ত্রী মদয়ন্তীর সঙ্গে কুলগুরু বশিষ্ঠকে সেই মাংস দান করেন। বশিষ্ঠ অন্নে নরমাংস আছে জেনে রাজাকে নরমাংসভোজী রাক্ষস হবার অভিশাপ দেন। রাজাও হস্তস্থিত জল দ্বারা মুনিকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে রানীর অনুরোধে নিবৃত্ত হন। রাজার হস্তস্থিত জল তাঁর নিজের পায়ের উপর পড়ে। ওই জলস্পর্শে রাজার পা দুটি কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হয়। তাতে তিনি কল্মাষপাদ নামে পরিচিত হন।

১৮ ভা পু. (উত্তরার্ধ) ৬৪ অধ্যায়

১৯ ৭।৬৫

মহাভারতে গন্ধর্বরাজ অর্জুনকে কল্মাষপাদের উপাখ্যান বর্ণনা করেন।[২০] একদিন ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ মৃগয়ার উদ্দেশ্যে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। শ্রান্ত হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রাজার সঙ্গে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্ত্রির পথে সাক্ষাৎ হয়। এই সময় আবার বিশ্বামিত্র যাজ্যক্রিয়ার জন্য রাজাকে অনুরোধ করতে যান। এদিকে পথে শক্ত্রিকে দেখে রাজা তাঁকে পথ রোধ করতে নিষেধ করেন। শক্ত্রিও রাজাকে পথ ছাড়তে বললে উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। শেষে মোহবশত রাজা শক্ত্রিকে কশাদণ্ড দ্বারা প্রহার করেন। কশাঘাতে অধীর হয়ে শক্ত্রি রাজাকে মাংসলোলুপ রাক্ষস হবার অভিশাপ দেন।

রাজা কল্মাষপাদ এভাবে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে বশিষ্ঠপুত্র শক্ত্রিকে প্রসন্ন করার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র রাজার মনোভাব জেনে কিঙ্কর নামে এক রাক্ষসকে রাজার শরীরে প্রবেশ করার জন্য আদেশ করেন। রাক্ষস বিশ্বামিত্রের অভিশাপ ভয়ে ভীত হয়ে রাজার দেহে প্রবেশ করে। রাজা রাক্ষসের প্রভাবে পীড়িত হয়ে কর্তব্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তার পর তিনি বন থেকে গৃহের অভিমুখে যাবার সময় এক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে সমাংস অন্ন প্রার্থনা করেন। রাজা ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করতে বলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গৃহে দীর্ঘসময় সুখে কাটানোর পর রাত্রে ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়লে সূপকারকে মাংস নিয়ে ব্রাহ্মণের নিকট গমন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু সূপকার কোথাও মাংস না পেয়ে শেষে রাজার আদেশে নরমাংস রন্ধন করে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করে। ব্রাহ্মণ রাজার পাঠানো মাংসকে নরমাংস বুঝতে পেরে তাঁকে নরমাংসভোজী রাক্ষস হবার অভিশাপ দেন। ব্রাহ্মণ দুবার তাঁর অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করা মাত্র শক্ত্রির পূর্বোক্ত বাক্যানুসারে রাজা রাক্ষসে পরিণত হন। তাঁর ইন্দ্রিয় সকলও বিকল হয়ে পড়ে। কিছুকালের মধ্যেই রাজা শক্ত্রিকে সামনে পেলে তাঁর প্রাণ সংহার করেন।

বিশ্বামিত্র শক্ত্রিকে নিহত দেখে শক্ত্রির অপর ভাইদেরকেও নিহত করার নির্দেশ দেন। রাক্ষসরূপী রাজা বিশ্বামিত্রের ইচ্ছানুসারে ক্রোধপরবশ হয়ে শক্ত্রির ভাইদেরও নিহত করেন।

রামায়ণের বালকাণ্ডে রঘুর পুত্র প্রবুদ্ধকেই রাক্ষসে পরিণত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[২১] আবার উত্তরকাণ্ডে ইক্ষ্বাকু বংশজ সুদাস-পুত্র মিত্রসহ রাক্ষসে

২০. ১।১৭৫

২১. রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবুদ্ধঃ পুরুষাদকঃ॥
কল্মাষপাদোঽপ্যভবৎ তস্মাজ্জাতস্তু শঙ্খণঃ। ৭০।৩৯ গ-ম. - ৪০ কখ

পরিণত হন দেখা যাচ্ছে।[২২] মৃগয়ায় গিয়ে রাজা দুই রাক্ষসের মধ্যে একটিকে নিহত করলে অপরটির কারসাজিতে বশিষ্ঠের অভিশাপে রাজা রাক্ষসে পরিণত হন।

মহাভারতে ইক্ষবাকু বংশের এই রাজাকে কল্মাষপাদ নামেই দেখা যায়। রামায়ণের ন্যায় হস্তস্খলিত জলের স্পর্শে পা দুটি কৃষ্ণবর্ণ হলে 'কল্মাষপাদ' নাম হয় এরূপ ঘটনার উল্লেখ এখানে নেই।

মহাভারতে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্র শক্ত্রির সঙ্গে পথে রাজার কলহ হয়। রাজা শক্ত্রিকে কশাঘাত করলে ক্রুদ্ধ হয়ে শক্ত্রি রাজাকে অভিশাপ দেন।[২৩] রামায়ণে এই শক্ত্রির কোনো উল্লেখ নেই। মহাভারতে বিশ্বামিত্র পিছন দিক দিয়ে কিঙ্কর নামক রাক্ষসকে রাজার শরীরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন।[২৪] রামায়ণে বিশ্বামিত্র বা কিঙ্কর নামক এই রাক্ষসের কোনো উল্লেখ নেই।

মহাভারতে উপাখ্যানটিতে রাজা এক ব্রাহ্মণকে সমাংস অন্ন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গৃহে ফিরে আসেন এবং প্রতিশ্রুতির বিষয় বিস্মৃত হন। তার পর সন্ধ্যায় নরমাংসের সঙ্গে সূপকারকে ব্রাহ্মণের নিকট পাঠান। ব্রাহ্মণ ওই মাংস ভোজনের অযোগ্য জেনে রাজাকে রাক্ষসত্ব প্রাপ্তির অভিশাপ দেন। কিন্তু রামায়ণে বশিষ্ঠ-শাপেই রাজা নরমাংসলোলুপ রাক্ষসে পরিণত হন।

২২. তদাপ্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ সুমহাযশাঃ॥
কল্মাষপাদঃ সংবৃত্তঃ খ্যাতশ্চৈব তথা নৃপঃ। ৬৫।৩২ গ.ঘ—৩৩ ক.খ
আবার অযোধ্যাকাণ্ডে রঘুর পুত্ররূপে বর্ণিত সৌদাস এবং কল্মাষপাদ একই ব্যক্তি।
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।
কল্মাষপাদঃ সৌদাস ইত্যেবং প্রথিতো ভুবি॥ ১১০।২৯

২৩. অমুঞ্চন্তং তু পন্থানং তমৃষিং নৃপসত্তমঃ।
জঘান কশয়া মোহাৎ তদা রাক্ষসবন্মুনিম্॥
কাশাপ্রহারাভিহতস্ততঃ স মুনিসত্তমঃ।
তং শশাপ নৃপশ্রেষ্ঠং বাসিষ্ঠঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥
হংসি রাক্ষসবদ্ যস্মাদ্ রাজাপসদ তাপসম্
তস্মাৎ ত্বমদ্যপ্রভৃতি পুরুষাদো ভবিষ্যসি
মনুষ্যপিশিতে সক্তশ্চরিষ্যসি মহীমিমাম্॥ ১।১৭৫। ১১-১৪ ক.খ

২৪ শাপাৎ তস্য তু বিপ্রর্ষের্বিশ্বামিত্রস্য চাজ্ঞয়া।
রাক্ষসঃ কিংকরো নাম বিবেশ নৃপতিং তদা॥ ১।১৭৫।২১

মহাভারতে রাজা রাক্ষসে রূপান্তরিত হয়ে শক্ত্রিকে নিহত করেন। তার পর বিশ্বামিত্রের নির্দেশে রাক্ষসরূপী রাজা শক্ত্রির অন্যান্য ভাইদেরও নিহত করেন।[২৫]

রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে এ-সকল ঘটনা বেশি দেখা যায়। মহাভারতের এ উপাখ্যানটিতে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের পূর্বকলহ ও বিশ্বামিত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ প্রকট হয়ে উঠেছে। রামায়ণের উপাখ্যানটিতে আমরা এরূপ কোনো ঘটনার উল্লেখ পাই না।

মুখ্য ঘটনাগুলির সঙ্গে উভয় উপাখ্যানের মিল থাকলেও নানা গৌণ ঘটনার সমাবেশে মহাভারতের উপাখ্যানটি বেশ দীর্ঘ ও জটিল রূপে চিত্রিত হয়েছে। আবার মহাভারতের অনুশাসন পর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে দৈব ও পুরুষকারের কথা বলার সময় সুদাস-পুত্রের রাক্ষসত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করে বলেছেন, কোসলরাজ সৌদাস অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেও বশিষ্ঠের অভিশাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[২৬] এখানে সৌদাস নাম পাওয়া যাচ্ছে, কল্মাষপাদ নয়। রামায়ণের বালকাণ্ডে রঘুর পুত্র সৌদাসের কথা বলা হয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি ব্যাস ব্রাহ্মণগণের জন্য ক্ষত্রিয় নৃপতির দানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার সময় সৌদাস ও তার পত্নী মদয়ন্তীর কথা বলেন।[২৭]

অনুশাসন পর্বে একটি বশিষ্ঠ-সৌদাস সংবাদও দেখা যায়। এই সৌদাসকে ইক্ষ্বাকুবংশের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮]

কল্মাষপাদের এই কাহিনীটিতে অনেক পণ্ডিত বৈদিক যজ্ঞের সোম-নিপীড়নের

২৫. এবমুক্ত্বা ততঃ সদ্যস্তং প্রাণৈর্বিপ্রযুজ্য চ।
শক্ত্রিনং ভক্ষয়ামাস ব্যাঘ্রঃ পশুমিবেপ্সিতম্॥
শক্ত্রিনং তু মৃতং দৃষ্টবা বিশ্বামিত্রঃ পুনঃ পুনঃ।
বসিষ্ঠস্যৈব পুত্রেষু তদ্ রক্ষ সংদিদেশ হ॥
স তাঞ্ছক্ত্যবরান্পুত্রান্ বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ভক্ষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব॥ ১।১৭৫।৪০-৪২

২৬ অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈঃ সংকৃতঃ কোসলাধিপঃ।
মহর্ষিশাপাৎ সৌদাসঃ পুরুষাদত্বমাগতঃ॥ ৬।৩২

২৭. রাজা মিত্রসহশ্চাপি বসিষ্ঠায় মহাত্মনে।
মদয়ন্তীং প্রিয়াং দত্ত্বা তয়া সহ দিবং গতঃ॥ ২৩৪।৩০

২৮. এতস্মিন্নেব কালে তু বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্।
ইক্ষ্বাকুবংশজো রাজা সৌদাসো বদতাং বরঃ। ৭৮।১

কাহিনীর ছায়া আছে বলে ধারণা করেন।[২৯] রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তী পুরাণ সাহিত্যে বিভিন্নস্থলে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজন্যবর্গের পরিচয় দানের সময় কল্মাষপাদের নাম এসেছে। ভাগবতে[৩০] এই উপাখ্যানটি দীর্ঘতর ও উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত উপাখ্যানের সঙ্গে সামান্য ঘটনাগত বৈসাদৃশ্যও বর্তমান। খিল হরিবংশেও সৌদাস বা মিত্রসহের কল্মাষপাদ নাম পাওয়া যায়।[৩১]

শুনঃশেফ উপাখ্যান

শুনঃশেফ উপাখ্যানটি রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দেখা যায়। মহাভারতে উপাখ্যানটির উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু রামায়ণের উপাখ্যানটি পূর্ণাঙ্গ। বৈদিক সাহিত্যেও এই উপাখ্যানটির প্রচলন ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।[৩২] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিবৃত উপাখ্যানটি নিম্নরূপ,

নারদের নির্দেশে অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের আরাধনায় পুত্র রোহিতকে লাভ করেন। পুত্র জন্মালে যজ্ঞে বরুণের উদ্দেশ্যেই তাকে বলি দিতে হবে এই ছিল শর্ত। নানা অছিলায় হরিশ্চন্দ্র শর্ত পালনে কালাতিপাত করলে রোহিত একদিন ধনুক হাতে অরণ্যে পলায়ন করে। তার পর ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রের কথায় ছয় বছর ইতস্তত ভ্রমণ করে। শেষে অজিগর্তের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে শত গাভীর বিনিময়ে যজ্ঞ-পশুরূপে ক্রয় করে পিতার নিকট হাজির হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র শুনঃপুচ্ছকে পিতা ও কনিষ্ঠ শুনোলাঙ্গুকে মাতা ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। ফলে মধ্যম শুনঃশেফই পিতার দ্বারা বিক্রিত হয় এবং পিতাই শত গাভীর বিনিময়ে পুত্রকে বন্ধন ও বধ করতে সম্মত হন। শুনঃশেফ প্রজাপতির নির্দেশে নানা দেবতার স্তব করে শেষে উষার স্তুতি দ্বারা শাপমুক্ত হয়। ইন্দ্র তাকে হিরণ্ময় রথ দান করেন।

২৯. এই উপকথার আদিমস্তরে ইহার একটি ঐতিহাসিক বা অর্ধৈতিহাসিক পটভূমি বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে ঋগ্বেদোক্ত সোম-নিপীড়নের কাহিনীর সহিত ইহার সংযোগ বিদ্যমান ছিল। সুতসোম কাহিনীর অনেক নামের ব্যাখ্যা বৈদিক চিন্তাজগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।—হিমাংশুভূষণ সরকার, 'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য', পৃ. ৩৪৫

৩০. ৯ম স্কন্ধ ৯ অধ্যায়

৩১. সুদাসস্যাসুতস্ত্বাসীৎ সৌদাসো নাম পার্থিবঃ।
খ্যাতঃ কল্মাষপাদো বৈ নাম্না মিত্রসহস্তথা॥ হরিবংশ পর্ব; ১৫।২১

৩২. ঐ.ব্রা., ৭ম পঞ্চিকা, ৩৩ অধ্যায়, ১-৬ খণ্ড
"ঋগ্বেদে ১ম মণ্ডলের ২৪তম সংখ্যক সূক্তের দেবতা আজিগর্তের পুত্র শুনঃশেফ ঋষি।"

তারপর বিশ্বামিত্রের কোলে উপবেশন করলে সে দেবরাত নামে পরিচিত হয়। এখন অজিগর্ত স্বীয় পুত্র প্রার্থনা করলে বিশ্বামিত্র তাকে দিতে অস্বীকার করেন। শুনঃশেফও পিতার সঙ্গে যেতে অস্বীকৃত হয়। শেষে বিশ্বামিত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মর্যাদা দান করেন। বিশ্বামিত্রের প্রথম পঞ্চাশজন পুত্র দেবরাতকে জ্যেষ্ঠ রূপে স্বীকার না করায় অভিশপ্ত হন। বাকি পঞ্চাশজন দেবরাতকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করলে তাঁরা পিতা বিশ্বামিত্রের আশীর্বাদ লাভ করেন।

রামায়ণে[৩৩] ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ করার ইচ্ছা করলে ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের নির্দেশে পশুর প্রতিনিধিরূপে একটি মনুষ্য অনুসন্ধান করতে থাকেন। শেষে ভৃগুর পুত্র ঋচীকের নিকট থেকে বহু ধনরত্ন ও গাভীর বিনিময়ে তার পুত্র ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মাতা কনিষ্ঠ পুত্র শুনককে বিক্রি করতে রাজী না হলে মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ নিজেই নিজেকে বিক্রয়যোগ্য ভেবে অম্বরীষের সঙ্গে যজ্ঞ-পশুরূপে গমন করতে রাজী হয়। শেষে দুঃখিত চিত্তে গমনকালে জ্যেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্রের কাছে নিজের প্রাণরক্ষা ও অম্বরীষের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবার বর প্রার্থনা করে। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের প্রাণ রক্ষা ও অম্বরীষের যজ্ঞ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নিজের পুত্রগণকে যজ্ঞীয় পশু হয়ে অগ্নির তৃপ্তি বিধান করার নির্দেশ দিলে পুত্রগণ তা অস্বীকার করে। ফলে বিশ্বামিত্র তাদের কুক্কুর মাংসভোজী হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করার অভিশাপ দেন এবং শুনঃশেফকে অগ্নি প্রভৃতির দেবতার স্তুতি করার নির্দেশ দিলে সবশেষে ইন্দ্রের স্তুতি করে সে শাপমুক্ত হয়। অম্বরীষের যজ্ঞও সম্পন্ন হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে পরাশর মহারাজ জনককে দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধার শুভফলের কথা বলার সময় শুনঃশেফের দেবস্তুতির উল্লেখ করে বলেছেন, মহাত্মা ঋচীকতনয় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব লাভ করে ঋক্ মন্ত্রগান দ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তব করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।[৩৪]

আবার অনুশাসন পর্বে পিতামহ ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠির বিশ্বামিত্রের গুণাবলী কীর্তন করার সময় শুনঃশেফের প্রসঙ্গে বলেছেন,

ঋচীক-পুত্র মহাতপা শুনঃশেফ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বিশ্বামিত্রের প্রভাবে পশুতে পরিণত হন এবং সেই মহাত্মার দ্বারাই মহাযজ্ঞ থেকে ভ্রষ্ট হন।[৩৫]

---

৩৩ ১।৬২

৩৪. বিশ্বামিত্রস্য পুত্রত্বমৃচীকতনয়োঽগমৎ।
ঋগ্ভিঃ স্তুত্বা মহাবাহো দেবান্ বৈ যজ্ঞভাগিনঃ॥ ২৯২।১৩

৩৫ ঋচীকস্যাত্মজশ্চৈব শুনঃশেপো মহাতপাঃ।
বিমোক্ষিতো মহাসত্রাৎ পশুতামপ্যপাগতঃ ॥ ৩।৬

প্রথমোক্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যানটির সঙ্গে রামায়ণের উপাখ্যানটির ঘটনাগত ও ব্যক্তিনাম-ঘটিত অনৈক্য বর্তমান। যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আজিগর্তের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ আর রামায়ণের উপাখ্যানে শুনঃশেফের পিতা ঋচীক। হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর পুত্র রোহিতের নামও রামায়ণে বর্ণিত উপাখ্যানে নেই। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানাংশ দুটিতে শুনঃশেফকে ঋচীকের তনয় রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রামায়ণকে অনুসরণ করেই উপাখ্যানটির অংশ বিশেষ মহাভারতে স্থান পেয়েছে বলা যেতে পারে।

ব্রহ্মপুরাণে (১০৪) হরিবংশে[৩৬] প্রভৃতি পরবর্তীকালের পুরাণ সাহিত্যেও শুনঃশেফের কথা এসেছে।

যযাতি উপাখ্যান

রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই নহুষ-পুত্র যযাতির উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। তবে বিস্তৃতি ও অন্তর্বর্তী ঘটনার বিচারে উভয় উপাখ্যানের মধ্যে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়।

রামায়ণে[৩৭] রাম-লক্ষ্মণের নিকট যযাতির উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। যযাতির দুই পত্নী শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী। শর্মিষ্ঠার গর্ভে পুরু ও দেবযানীর গর্ভে যদুর জন্ম হয়। শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুরু স্বীয়গুণে যযাতির প্রিয়পাত্র হলে যদু তা সহ্য করতে পারে না। মা দেবযানীকে সে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে ক্রুদ্ধ করে তোলে। দেবযানী পিতা শুক্রাচার্যের শরণ নেয় এবং যযাতির অন্যায়ের কথা বলে তাঁকে রুষ্ট করে তোলে। শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধে পরিণত করেন। শুক্রাচার্যকে অনেক অনুরোধ করে যযাতি ঐ জরা অপরের দেহে সঞ্চালনের ক্ষমতা লাভ করেন। সংসারের সুখভোগে অতৃপ্ত যযাতি ঐ জরা যদুকে দিতে চাইলে যদু ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পুরু এই জরা গ্রহণ করে। যযাতি পুরুকে নিজের জরা দান করে বহু বছর রাজ্যভোগ করেন এবং ভোগশেষে পুরুর কাছ থেকে জরা ফিরিয়ে নেন। যযাতি যদুকে অভিশাপ ও পুরুকে রাজ্যভার দিয়ে বানপ্রস্থাশ্রমে যান। তার পর বহুদিন পরে পাপ ক্ষয় হলে তিনি স্বর্গলাভ করেন।

৩৬. সম্বন্ধোঽপ্যস্য বংশেঽস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ।
বিশ্বামিত্রাত্মজানাং তু শুনঃশেপোঽগ্রজঃ স্মৃতঃ।। হরিবংশ পর্ব ২৭।৫৩ ৬চ-৫৪ কখ

৩৭. ৭।৫৮-৫৯

মহাভারতে কুরু বংশের পরিচয় দানের সময় বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে যযাতির উপাখ্যান বলেছেন।[৩৮] রামায়ণের তুলনায় এখানে উপাখ্যানটি অনেক বেশি বিস্তৃত। শুক্রাচার্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাহরণে দেবতাদের মন্ত্রণা থেকে এই উপাখ্যানের সূত্রপাত। এখানে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে বস্ত্র নিয়ে কলহের বিবরণও দেখা যায়। এই কলহের মূল কারণ বায়ুরূপী ইন্দ্র।[৩৯] এই কলহকে কেন্দ্র করেই দেবযানীকে শর্মিষ্ঠা কূপে নিক্ষেপ করে।[৪০] আবার রাজা যযাতি মৃগয়ার পথে দেবযানীকে কূপ থেকে তোলেন।[৪১] এ সকল ঘটনা রামায়ণে দেখা যায় না। দেবযানী-কর্তৃক শর্মিষ্ঠার বিরুদ্ধে পিতার নিকট অভিযোগ; অসুররাজ বৃষপর্বা-কর্তৃক স্বীয় দুহিতা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসিত্বে নিয়োগাদি[৪২] ঘটনাও রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে বেশি এসেছে।

এরপর শর্মিষ্ঠাসহ অন্যান্য দাসীবেষ্টিতা দেবযানীর সঙ্গে যযাতির সাক্ষাৎ হলে দেবযানী যযাতিকে বিবাহ করতে উৎসুক হয়। যযাতি প্রথমে ব্রাহ্মণ-কন্যা বলে দেবযানীকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শেষে শুক্রাচার্যের কথায় তিনি শর্মিষ্ঠাকে গ্রহণ করেন। শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠাকে পত্নীর মর্যাদা দিতে নিষেধ করেন, কিন্তু যযাতি শর্মিষ্ঠার অনুরোধে তার সঙ্গে মিলিত হন। এ ঘটনা রামায়ণে বর্ণিত হয়নি। এখানে দেবযানীই যযাতির বিবাহিত পত্নী। রামায়ণে উভয়েই যযাতির স্ত্রী রূপে স্বীকৃত।

এখানে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য অনু ও পুরু নামে তিনটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়।[৪৩] রামায়ণে উভয়ের মোট পুত্র সংখ্যা

৩৮. ১।৮১

৩৯. এবমুক্তস্তু সহিতৈস্ত্রিদশৈর্মঘবাংস্তদা।
তথেত্যুক্ত্বা প্রচকাম সোঽপশ্যত বনে স্ত্রিয়ঃ॥
ক্রীড়ন্তীনাং তু কন্যানাং বনে চৈত্ররথোপমে।
বায়ুভূতঃ স বস্ত্রাণি সর্বাণ্যেব ব্যমিশ্রয়ৎ॥ ১।৭৮।৩-৪

৪০. সমুচ্ছ্রয়ং দেবযানীং গতাং সক্তাং চ বাসসি।
শর্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে ততঃ স্বপুরমাগমৎ। ১।৭৮।১২ গ.ঘ-১৩ ক.খ.

৪১. তামথো ব্রাহ্মণীং রাজা বিজ্ঞায় নহুষাত্মজঃ
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণাবুজ্জহার ততোঽবটাৎ ১।৭৮।২২ গ.ঘ.-২৩ ক.খ.

৪২. অহং দাসীসহস্রেণ দাসী তে পরিচারিকা।
অনু ত্বাং তত্র যাস্যামি যত্র দাস্যতি তে পিতা॥ ১।৮০।২২

৪৩. যযাতির্দেবযান্যাং তু পুত্রাবজনয়ন্নৃপঃ।
যদুং চ তুর্বসুং চৈব শক্রবিষ্ণূ ইবাপরৌ॥
তস্মাদেব তু রাজর্ষেঃ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী।
দ্রুহ্যুং চানুং চ পূরুং চ ত্রীন্ কুমারানজীজনৎ॥ ১।৮৩।৯-১০

দুই।[৪৪]

মহাভারতে শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির ঔরসজাত পুত্র দেখে দেবযানী নিজেই পিতার নিকট অভিযোগ করছে।[৪৫] রামায়ণে পুত্রের দুঃখে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানী পিতার নিকট যযাতির অবহেলার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবেদন করছে।[৪৬]

মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানটির সমাপ্তি অংশেই রামায়ণের উপাখ্যানটির সঙ্গে বেশি সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মহাভারতের যযাতি চন্দ্রবংশের আর রামায়ণের যযাতি সূর্য বংশের বলে স্বীকৃত।* মহাভারতের নলোপাখ্যানের ন্যায় যযাতি উপাখ্যান বিস্তৃত বলা যেতে পারে। মহাভারতের উপাখ্যানটির দুটি ভাগ, পূর্ব-যাযাত আর উত্তর-যাযাত। সকল দিক থেকে বিচার করলে মহাভারতের যযাতি উপাখ্যানটিই পূর্ণাঙ্গ।

যযাতি উপাখ্যানটি ভারতীয় সাহিত্যে মহাকাব্য যুগেরও প্রাচীন বলে মনে হয়। বৈদিক সাহিত্যেও নানা স্থলে এই উপাখ্যানে বর্ণিত ব্যক্তি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৭] মহাকাব্যদ্বয়ের পরবর্তিকালীন পুরাণ সাহিত্যেও এর স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতোক্ত উপাখ্যানটিতে উদ্ধৃত বিশেষ বিশেষ শ্লোক বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশ প্রভৃতিতে হুবহু স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া ভাগবত,[৪৮] ব্রহ্মপুরাণ[৪৯] হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থে এই উপাখ্যানের বিস্তৃত বর্ণনা মেলে।

সগরের উপাখ্যান

রামায়ণে[৫০] কৌশিক রামের নিকট সগরের উপাখ্যান বর্ণনা করেন। ভৃগুর বরে

৪৪. তয়োঃ পুত্রৌ তু সম্ভূতৌ রূপবন্তৌ সমাহিতৌ।
শর্মিষ্ঠাজনয়ৎ পূরুং দেবযানী যদুং তদা॥ ৭।৫৮।১০

৪৫ দেবযান্যুবাচ,
অধর্মেণ জিতো ধর্মঃ প্রবৃত্তমধরোত্তরম্।
শর্মিষ্ঠযাতিবৃত্তাস্মি দুহিত্রা বৃষপর্বণঃ॥
অত্রোঽস্যাং জনিতাঃ পুত্রা রাজ্ঞানেন যযাতিনা।
দুর্ভগায়া মম দ্বৌ পুত্রৌ তাত ব্রবীম তে॥ ১।৮৩।২৮-২৯

৪৬. অবজ্ঞয়া চ রাজর্ষি পরিভূয় চ ভার্গব।
ময্যবজ্ঞাং প্রযুঙক্তে হি ন চ মাং বহু মন্যতে॥ ৭।৫৮।২১

৪৭. ঋগ্বেদ—১০।৪৮, ৪৯; ৬২; সূক্ত

৪৮. ৯ম. স্কঃ, অধ্যায় ১৮

৪৯. অধ্যায়-৪৯, *রামা. ১।৭০।৪২

৫০. ১।৩৮

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সগর স্বীয় মহিষী কেশিনী অসমঞ্জা ও সুমতির গর্ভে একটি অলাবুর মাধ্যমে ষাট্ হাজার পুত্র লাভ করেন।[৫১] যজ্ঞেচ্ছু রাজা সগরের যজ্ঞাশ্ব রাক্ষসরূপী ইন্দ্র হরণ করলে তিনি ষাট হাজার পুত্রকে অশ্ব উদ্ধারে প্রেরণ করেন। তারা পৃথিবী খনন করে অশ্বের সন্ধান পেলেও কপিলরূপী বিষ্ণুর রোষবহ্নিতে ভস্মীভূত হয়। শেষে রাজা সগর পৌত্র অংশুমানের সাহায্যে যজ্ঞাশ্ব উদ্ধার করে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এ সময়ই পাতালে গরুড়ের সঙ্গে অংশুমানের সাক্ষাৎ হয় এবং গরুড়ের কাছেই তিনি জানতে পারেন যে গঙ্গার পবিত্র সলিল স্পর্শে তাঁর ষাট হাজার পূর্বপুরুষের স্বর্গ লাভ সম্ভব। সগর ও অংশুমানের পুত্র দিলীপ এ কাজ করতে অসমর্থ হলে দিলীপের পুত্র ভগীরথ তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে প্রবাহিত করার ক্ষমতা অর্জন করেন। পরে তিনি গঙ্গার বেগ ধারণের জন্য তপস্যায় সন্তুষ্ট করে মহাদেবকে নিয়োগ করেন। গঙ্গার অহংকার ছিল মহাদেবকে প্লাবিত করবে কিন্তু মস্তকে পড়া মাত্র মহাদেব গঙ্গার সে চেষ্টা ব্যর্থ করেন। তবে ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে অবরোধ দূর করে দেন। সাতভাগে বিভক্ত হয়ে গঙ্গা ভগীরথের নির্দিষ্ট পথে গমন করতে থাকেন। এ সময় গঙ্গার প্লাবনে জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করলে তিনি গঙ্গাকে পান করেন এবং ভগীরথের উপর কৃপা করে জানু থেকে গঙ্গাকে মুক্তি দান করেন। এজন্য গঙ্গা জাহ্নবী নামে পরিচিত হন। গঙ্গার জলে ভগীরথ তর্পণ করেন ও পূর্বপুরুষদের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। ভগীরথ ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রশংসিত হন।

রামায়ণে বর্ণিত এই সগর উপাখ্যানটির সঙ্গে মহাভারতে উল্লিখিত সগর উপাখ্যানটির প্রায় সকল ঘটনারই মিল পাওয়া যায়। তবু পার্থক্য যেটুকু আছে তা নিম্নরূপ।

মহাভারতে লোমশমুনি-কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে এ উপাখ্যান কথিত হয়েছে।[৫২] এখানে সগরের দুই মহিষীর নাম বৈদর্ভী ও শৈব্যা।[৫৩] সগর বৈদর্ভীর

---

৫১. অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যজায়ত।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগরাত্মজম্॥
সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুম্বং ব্যজায়ত।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্ বিনিঃসৃতাঃ॥ ১।৩৮।১৬-১৭

৫২ ৩।১০৭

৫৩ তস্য ভার্যে হ্যভবতাং রূপযৌবনদর্পিতে।
বৈদর্ভী ভরতশ্রেষ্ঠ শৈব্যা চ ভরতর্ষভ॥ ৩।১০৬।৯

গর্ভজাত অলাবু ত্যাগ করতে চাইলে ওটি রক্ষণের জন্য দৈববাণী হয়।[৫৪] এ দৈববাণীর উল্লেখ রামায়ণে নেই। এখানে সগরের অশ্বটি জলশূন্য জলধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে,[৫৫] রামায়ণে অশ্বটি অপহরণ করেন রাক্ষসরূপী ইন্দ্র।[৫৬] মহাভারতে ষাট হাজার সগর-পুত্র কপিলের দ্বারা ভস্মীভূত হবার খবর নারদ সগরের কাছে নিবেদন করে,[৫৭] রামায়ণে অংশুমান এ খবর রাজাকে দেন।[৫৮] পাতালে অংশুমানের সঙ্গে গরুড়ের সাক্ষাতের কথা এখানে অনুপস্থিত যার উল্লেখ রামায়ণে বিদ্যমান।

রামায়ণে জহ্নুমুনি-কর্তৃক গঙ্গা শোষণ ও শিব-কর্তৃক গঙ্গার অহংকার ভঙ্গের উল্লেখ আছে কিন্তু মহাভারতে এসব ঘটনা দেখা যায় না।

সগর উপাখ্যানটিও মহাকাব্যযুগের পরবর্তীকালের পুরাণ সাহিত্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। ভাগবত (৯ : ৮), মৎস্যপুরাণ (১২) এবং হরিবংশে (হরিবংশ পর্ব-১৫ অধ্যায়) ও অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান

রামায়ণে[৫৯] রাজা দশরথের নিকট সুমন্ত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।

মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন ব্রহ্মচারী ও তপস্বী। সে সময় অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদের (লোমপাদের) পাপে দেশে অনাবৃষ্টি আরম্ভ হলে বেদজ্ঞগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে এনে রাজকন্যা শান্তাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু মহর্ষির অভিশাপের ভয়ে কেহই এ কাজ করতে রাজী হয় না।

৫৪. তদালাবুং সমুৎস্রষ্টুং মনশ্চক্রে স পার্থিবঃ।
অথান্তরিক্ষাচ্ছুশ্রাব বাচং গম্ভীরনিঃস্বনাম্। ৩।১০৬।২০ গ.ঘ.—২১ ক.খ.

৫৫. তস্যাশ্বো ব্যচরদ্ ভূমিং পুত্রৈঃ স পরিরক্ষিতঃ।
সমুদ্রং স সমাসাদ্য নিস্তোয়ং ভীমদর্শনম্॥ ৩।১০৭।১২

৫৬. তস্য পর্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ।
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় যজ্ঞিয়াশ্বমপাহরৎ। ১।৩৯।৭ গ.ঘ.—৮ ক.খ.

৫৭. তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদ্ ভূতান্ নারদঃ সুমহাতপাঃ॥
সগরান্তিকমাগচ্ছৎ তশ্চ তস্মৈ নবেদয়ৎ। ৩।১০৭।৩৩ গ.ঘ.—৩৪ ক.খ.

৫৮. সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোঽংশুমানতিবীর্য্যবান্।
ত্বরিতং হয়মাদায় পুনরায়ান্মহাতপাঃ॥
ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন।
ন্যবেদয়দ্ যথাবৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা॥ ১।৪১।২২-২৩

৫৯. ১।১০

শেষে এক বৃদ্ধা বেশ্যা কতকগুলি পরমাসুন্দরী রমণীর সহায়তায় ছলনায় ভুলিয়ে ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ্যে পদার্পণ করলে দেবতা পর্যাপ্ত জলবর্ষণ করেন। ঋষ্যশৃঙ্গের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য রাজা তাঁর কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের হাতে দান করেন। ঋষ্যশৃঙ্গও রাজার রাজ্যে বাস করতে থাকেন।

মহাভারতে মহর্ষি লোমশের মুখ থেকে যুধিষ্ঠির ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান শুনছেন।[৬০]

উর্বশীকে দেখে মহর্ষি বিভাণ্ডকের রেতঃ জলে পতিত হলে কোনো মৃগী জলপানের সময় তা পান করে গর্ভবতী হয়। এই মৃগী ছিল ব্রহ্মা-কর্তৃক শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা। মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। শিরোদেশে শৃঙ্গ ছিল তাই তার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ।[৬১] ঋষ্যশৃঙ্গের এই বিচিত্র জন্মের কথা রামায়ণে নেই।

মহাভারতে প্রথমে ছলনাময়ী রমণীগণ নারী-পুরুষ ভেদজ্ঞানহীন ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভন দেখিয়ে পরে বিভাণ্ডকের ভয়ে পলায়ন করে। প্রথম নারীসঙ্গ লাভে ঋষ্যশৃঙ্গের মন বিকল হয়ে পড়ে। বিভাণ্ডক এ বিকৃত মানসিকতার কারণ জানতে চাইলে ঋষ্যশৃঙ্গ নারীদেহের ও অলংকারের যে-সকল বর্ণনা করেন তা রামায়ণে দেখা যায় না। ছলনাময়ী রমণীগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকার উপর নির্মিত তপোবনের প্রলোভন[৬২] দেখিয়ে অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ ঘটান।

এ ধরনের নৌকার উল্লেখও রামায়ণে নেই।

৬০. ৩।১১০ অধ্যায়

৬১. দীর্ঘকালং পরিশ্রান্ত ঋষিঃ স দেবসম্মিতঃ॥
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ দৃষ্টাপ্সরসমুর্বশীম্।
অপ্সূপস্পৃশতো রাজন্ মৃগী তচ্চাপিবৎ তদা।
সহ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিণী চাভবৎ ততঃ।
সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা॥
দেবকন্যা মৃগী ভূত্বা মুনিং সূয় বিমোক্ষ্যসে। ৩।১১০।৩৪ গ.ঘ. -৩৭ ক.খ.
ইত্যর্যেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজন্নাসীন্মহাত্মনঃ।
তেনর্য্যশৃঙ্গ ইত্যেবং তদা স প্রথিতোঽভবৎ॥ ১১০।৩৯

৬২. অতীব রমণীয়ং তদতীব চ মনোহরম্।
চক্রে নাব্যাশ্রমং রম্যমদ্ভুতোপমদর্শনম্॥
ততো নিবধ্য তাং নাবমদূরে কাশ্যপাশ্রমাৎ। ৩।১১১।৩-৪ ক.খ.

ঋষ্যশৃঙ্গের সন্ধানে তাঁর পিতা বিভাণ্ডকের অঙ্গরাজ্যে গমন ও পুত্রবধূসহ রাজ্যেশ্বর পুত্রকে দেখে তাঁর পরিতৃপ্তির কথাও আমরা রামায়ণে পাই না। উপাখ্যানটি রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে অনেক বেশি বিস্তৃত। মহাভারতে এটিকে আরো বেশি চিত্তাকর্ষক করে বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি ব্যাস ব্রাহ্মণগণের রক্ষায় ক্ষত্রিয় নৃপতিদের দানের ঘটনা উল্লেখ করার সময় বলেন, নৃপতি লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের হাতে নিজ কন্যা শান্তাকে দান করেন।[৬৩]

ইন্দ্র-সুরভি উপাখ্যান

রামায়ণে[৬৪] রামানুজ ভরত মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় ফিরে শুনেছেন তাঁর মা কৈকেয়ীর জন্যই রামকে রাজ্য ত্যাগ করে বনে যেতে হয়েছে। আর রাম-বিরহই পিতা দশরথের মৃত্যুর কারণ। এই সংবাদ শোনা অবধি তিনি মা কৈকেয়ীকে নানা পরুষ বাক্যে ভর্ৎসনা শুরু করেছেন। মায়ের এই জঘন্যতম অপরাধকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। বাৎসল্য স্নেহ যে কত বড় তা বোঝাবার জন্য ভরত এ সময় মায়ের নিকট একটি উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। ভরতোক্ত এই উপাখ্যানটি ইন্দ্র-সুরভি সংবাদ নামে পরিচিত।

একদিন গো-মাতা সুরভি দেবলোক থেকে দেখতে পান পৃথিবীতে তাঁর দুই পুত্র (বৃষ) লাঙ্গল কর্ষণে ক্লান্ত হয়ে অচেতনপ্রায় হয়ে পড়েছে। তিনি অতিপরিশ্রান্ত পুত্র দুটিকে দেখে রোদন শুরু করে দেন। সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র অধোদেশ দিয়ে গমন করলে তাঁর শরীরে সুরভির অশ্রু ঝরে পড়ে। ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করা মাত্র দেবরাজ ক্রন্দনরতা সুরভিকে দেখতে পান। দেবলোকে কোনো ভয় না থাকা সত্ত্বেও সুরভির এই অবস্থা দেখে দেবরাজ তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দেবরাজের প্রশ্নের উত্তরে গো-মাতা সুরভি বলেন, দেবলোকে কোনো ভয় উপস্থিত হয় নি সুতরাং তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু ভূতলে আমার দুটি পুত্র বড় বিপদে পড়েছে। সূর্যতাপে ক্লান্ত আমার পুত্র দুটিকে কর্ষক অতিশয় পীড়া দিচ্ছে দেখেই রোদন করছি। কারণ ওরা আমার শরীর থেকেই

৬৩. করন্ধমস্য পুত্রস্তু কৃতাত্মা মরুতস্তথা।
কন্যামঙ্গিরসে দত্ত্বা দিবমাশু জগাম হ॥ ২৩৪।২৮

৬৪. ২।৭৪

জন্মলাভ করেছে। সুতরাং ওদের ক্লেশেই আমি শোকাকুল হয়ে পড়েছি। দেখো পুত্রের সমান প্রিয় আর কেউ হয় না।

উপাখ্যানটি শেষ করে ভরত মাতা কৈকেয়ীর উদ্দেশে বললেন— সুরভির সংসারে সহস্র সহস্র পুত্র থাকলেও দুটি পুত্রের কষ্টে মায়ের এই আকুলতা দেখে ইন্দ্র বুঝলেন জগতে পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউই নেই। সুতরাং রাম-জননী কৌশল্যার কথা আজ ব্যাখ্যার অতীত।

মহাভারতেও[৬৫] ভগবান বেদব্যাস কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন— ইহলোকে পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই হতে পারে না। গো-মাতা সুরভি অশ্রু- মোচন দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে এ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দান করেন। মহারাজ, এ বিষয়ে 'ইন্দ্র-সুরভি সংবাদ' নামক এক অতি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান বলছি শোনো।

পুরাকালে দেবলোকে একদিন গো-মাতা সুরভিকে রোদন করতে দেখে দেবরাজ তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দেবরাজের জিজ্ঞাসার উত্তরে সুরভি বলেন, আমি পুত্রের দুঃখে দুঃখিত হয়ে রোদন করছি। ঐ দেখো নির্দয় লোকেরা আমার পুত্র বৃষগুলিকে লাঙ্গলে নিযুক্ত করে কশাঘাত করছে। আমার পুত্রদের নিদারুণ যন্ত্রণা দেখে আমি কাতর হয়ে পড়েছি। এদের একটির নাম মহাবল এজন্য ও কোনো রকমে বেশি ভার বহন করতে সমর্থ। দ্বিতীয়টি অতিশয় কৃশ ও দুর্বল। তাই অতিকষ্টে ও অল্প ভার বহন করেছে। কশাদ্বারা আমার দুটি পুত্র বার বার আহত হয়েও ভার বহনে অসমর্থ হচ্ছে। পুত্র দুটির এই অবস্থা দেখে আমি রোদন করছি।

গো-মাতা সুরভির এ কথা শুনে দেবরাজ বললেন, হে সুরভে, তোমার সহস্র সহস্র পুত্রের মধ্যে যদি একটির মৃত্যু হয় তবে এরূপ পরিতাপের কী আছে? ইন্দ্রের এই প্রশ্ন শুনে সুরভি বললেন, আমার অসংখ্য পুত্র হলেও সকলের প্রতি ভালোবাসা সমান। তা ছাড়া আমার যে পুত্রটি দীন ও সাধু তাকেই আমি বেশি কৃপা করি।

উভয় মহাকাব্যেই বাৎসল্য স্নেহের উৎকর্ষ প্রমাণ করার জন্যই উপাখ্যানটির অবতারণা করা হয়েছে। তবে রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে উপাখ্যানটি আরোও সুবিন্যস্ত এবং বিস্তৃততর। মহাভারতের উপাখ্যানে বৃষ দুটির নামোল্লেখ করা

৬৫ ৩।৯

হয়েছে[৬৬] রামায়ণে তা অনুপস্থিত। মহাভারতে সাধু ও দীন পুত্রের প্রতি সুরভির অধিক কৃপার কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৬৭] কিন্তু সুরভির মুখে এরূপ কোনো উক্তি রামায়ণে বর্ণিত উপাখ্যানে নেই।

বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ

বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা ভঙ্গের জন্য ইন্দ্রের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে উভয় মহাকাব্যেই সুন্দর উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। রামায়ণে[৬৮] দেখা যায় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি পদ লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে ঋষিত্ব দান করেন। বিশ্বামিত্র তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। কঠোর তপস্যারত অবস্থায় বিশ্বামিত্রের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে একদিন মেনকা স্নানের জন্য পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হন। বিশ্বামিত্র রূপবতী মেনকাকে দেখে কাম-পীড়িত হন এবং মেনকার অনুগ্রহ লাভ করতে চান। মেনকা বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করতে থাকেন। দশ বছর পর বিশ্বামিত্র নিজ তপস্যা বিঘ্নের জন্য অনুতপ্ত হন। মেনকা ভীতা ও কম্পিতা হয়ে বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপস্থিত হলে বিশ্বামিত্র মধুর বাক্যালাপে তাঁকে বিদায় দেন। তিনি এ কাজের জন্য দেবগণকেই দায়ী করেন।

পুনরায় বিশ্বামিত্র কাম-জয়ের জন্য কৌশিকী নদীর তীরে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় চিন্তিত হয়ে দেবগণ ও ঋষিগণের পরামর্শে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে মহত্ত্ব ও ঋষিত্ব দান করেন। বিশ্বামিত্র এই বরে সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করেন। ঊর্ধ্ববাহু ও অবলম্বনহীন হয়ে বায়ুমাত্র সেবন করে তিনি ভীষণ তপস্যায় মগ্ন হলে দেবরাজ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তার পর বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গের জন্য রম্ভাকে আদেশ করেন। রম্ভা বিশ্বামিত্রের অভিশাপ-ভয়ে এ কাজ করতে অসম্মত হলে ইন্দ্র সাহস দান করে তাকে বলেন

৬৬. কৃপাবিষ্টাস্মি দেবেন্দ্র মনশ্চোদ্বিজতে মম।
একস্তত্র বলোপেতো ধুরমুদ্বহতেঽধিকাম্॥
অপরোঽপাবলপ্রাণঃ কৃশো ধমনিসংততঃ।
কৃচ্ছ্রাদুদ্বহতে ভারং তং বৈ শোচামি বাসব॥ ৩।৯।১১-১২

৬৭. যদি পুত্র সহস্রাণি সর্বত্র সমতৈব মে।
দীনস্য তু সতঃ শক্র পুত্রস্যাভ্যধিকা কৃপা॥ ৩।৯।১৬

৬৮. ১।৬৩-৬৫

যে, তিনি মনোহর কোকিল রূপে তার পাশেই অবস্থান করবেন। তার পর রম্ভা ইন্দ্রের কথামতো সুন্দর রূপ ধরে বিশ্বামিত্রের সামনে গিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। বিশ্বামিত্র সামনে রম্ভাকে দেখে কোকিল কূজন ও অশ্রুতপূর্ব মনোহর সংগীত শুনে এ কাজ দেবরাজের বলে ধারণা করেন এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রম্ভাকে পাষাণে পরিণত হবার অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, পরে অতি তেজস্বী কোনো ব্রাহ্মণ দ্বারা শাপমুক্তি ঘটবে। ক্রোধের বশবর্তী হওয়ায় বিশ্বামিত্রের তপস্যার ফল নষ্ট হলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হন এবং পরে কখনো ক্রোধ প্রকাশ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি পুনরায় ব্রহ্মর্ষি পদলাভের আশায় কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন। শেষে ব্রহ্মর্ষি পদ লাভ করেন।

মহাভারতেও বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র অপ্সরা-প্রধান মেনকাকে তাঁর তপস্যা ভঙ্গের জন্য নিয়োগ করেন। মেনকা বিশ্বামিত্রের ক্রোধ-বহ্নির কথা চিন্তা করে ইন্দ্রের নিকট বর প্রার্থনা করেন যাতে বিশ্বামিত্র তাঁকে দগ্ধ করতে না পারেন। শুধু তাই নয়, বায়ু, ভগবান মন্মথও যেন তাকে সাহায্য করেন, আর বন থেকে যেন সুগন্ধ বায়ু বইতে থাকে। মেনকার এ-সকল প্রস্তাবে ইন্দ্র রাজী হন। মেনকাও বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে তাঁর সামনে ক্রীড়া করতে আরম্ভ করেন। বায়ু সময় বুঝে মেনকার বস্ত্র অপহরণ করলে মেনকা লজ্জিতা হয়ে বস্ত্র সংগ্রহের জন্য ছোটেন। বিশ্বামিত্র তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে কাছে ডাকেন এবং তপস্যা বন্ধ করে মেনকার সঙ্গে ক্রীড়ায় রত হন। কিছুদিন অতিক্রান্ত হলে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়।

রামায়ণের উপাখ্যানটির সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যানটির সাদৃশ্যই বেশি। তবে রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে কিছু গৌণ বিষয় যুক্ত হয়েছে। যেমন, মেনকার ইন্দ্রের নিকট বিশ্বামিত্র কর্তৃক দগ্ধ না হওয়ার বর প্রার্থনা,[৬৯] তাঁর কাছে বায়ু ও মন্মথের সাহায্য প্রার্থনা[৭০] মেনকা-বিশ্বামিত্রের মিলনে শকুন্তলার জন্ম[৭১] প্রভৃতি।

৬৯. যথাসৌ ন দহেৎ ক্রুদ্ধস্তথাহজ্ঞাপয় মাং বিভো ১।৭১।৩৫ গ.ঘ.

৭০. কামং তু মে মারুতস্তত্র বাসঃ
প্রক্রীড়িতায়া বিবৃণোতু দেব।
ভবেচ্চ মে মন্মথস্তত্র কার্যে
সহায়ভূতস্তু তব প্রসাদাৎ॥ ১।৭১।৪১

৭১. কামরাগাভিভূতস্য মুনেঃ পার্শ্বং জগাম সা।
জনয়ামাস স মুনির্মেনকায়াং শকুন্তলাম্॥ ১।৭২।৯

রামায়ণে আমরা দেখি মেনকা কর্তৃক বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ হলে তিনি আবার কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন। তখন ইন্দ্র রম্ভাকে পুনরায় তাঁর তপস্যা ভঙ্গের জন্য প্রেরণ করলে বিশ্বামিত্রের শাপে রম্ভা পাষাণে পরিণত হয়।[৭২]

মহাভারতে কিন্তু মেনকা কর্তৃক বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ ও মেনকার সঙ্গে মিলনে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম দেখানো হয়েছে।[৭৩] রম্ভার পাষাণে পরিণতি যুক্ত হয়নি।

তবে মহাভারতে এই উপাখ্যানে রম্ভার কথা না থাকলেও অনুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠির বিশ্বামিত্রের তপস্যা-শক্তির বর্ণনাবসরে রম্ভার পাষাণে পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন— রম্ভা নাম্নী অপ্সরা মহর্ষির আশাভঙ্গ করার জন্য উপস্থিত হলে তাঁর অভিশাপে পাষাণে পরিণত হন।[৭৪]

সমুদ্র-মন্থন উপাখ্যান

রামায়ণে[৭৫] বিশ্বামিত্র রামের নিকট সুমদ্র-মন্থনের উপাখ্যান বর্ণনা করেন। তিনি পূর্বে ইন্দ্রের নিকট এ উপাখ্যান শোনেন।

দিতি ও অদিতির পুত্রগণ জরা মৃত্যু ও ব্যাধিনাশক রস লাভের আশায় ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করতে চান। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু ও মন্দরগিরিকে মন্থন-দণ্ড করে ক্ষীরোদ সমুদ্রকে মন্থন করতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘদিন মন্থন চলতে থাকলে শেষে বাসুকির মস্তক সকল তীব্র বিষ উদ্‌গীরণ করতে থাকে এবং মন্দর পর্বতের শিলাতে দংশন আরম্ভ করে। ফলে অগ্নির

৭২. সহস্রাক্ষস্য তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ।
রম্ভাং ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকাত্মজঃ॥
যন্মাং লোভয়সে রম্ভে কামক্রোধজয়ৈষিণম্।
দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে॥
ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাস্তপোবলসমন্বিতঃ।
উদ্ধরিষ্যতি রম্ভে ত্বাং মৎক্রোধকলুষীকৃতাম্॥ ১।৬৪।১১-১৩

৭৩. চিরার্জিতস্য তপসঃ ক্ষয়ং স কৃতবানৃষিঃ
তপসঃ সংক্ষয়াদেব মুনির্মোহং সমাবিশৎ।
কামরাগাভিভূতস্য মুনেঃ পার্শ্বং জগাম সা
জনয়ামাস স মুনির্মেনকায়াং শকুন্তলাম্॥ ১।৭২।৮-৯

৭৪. তপোবিঘ্নকরী চৈব পঞ্চচূড়া সুসম্মতা।
রম্ভা নামাপ্সরাঃ শাপাদ্ যস্য শৈলত্বমাগতা॥ ২৩।৩।১১

৭৫ ১।৪৫

ন্যায় বিষের উদ্ভব হয় এবং সারা সংসার দগ্ধ হতে থাকে। দেবগণ সকলে মিলে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন। ভগবান শ্রীহরি এই সমুদ্রমন্থনজাত বিষ মহাদেবকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। দেবগণের ভীত অবস্থা দেখে মহাদেব এই বিষ গ্রহণ করেন। তার পর দেব ও দানবগণ ক্ষীরোদ সাগরকে পুনরায় মন্থন করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মন্থনদণ্ড মন্দরপর্বত পাতালে প্রবেশ করে। দেবগণ গন্ধর্বগণের সঙ্গে মধুসূদনের স্তুতি আরম্ভ করলে দেবগণের কাতর বাক্যে বিষ্ণু এক অংশে কচ্ছপের রূপ ধরে পিঠে মন্দর পর্বতকে নিয়ে সমুদ্রে শয়ন করেন। সর্বাত্মা কেশব স্বয়ং দেবগণের মধ্যে অবস্থান করে পর্বতের অগ্রভাগ ধরে মন্থন করতে থাকেন। এইভাবে হরি দেবগণের মধ্যে অবস্থান করে মন্থন করতে থাকলে সমুদ্র থেকে আয়ুর্বেদ-নিপুণ ধন্বন্তরি নামক এক পুরুষ ও বহু সুন্দরী রমণীর আবির্ভাব ঘটে।[৭৬] ক্ষীররূপ অপ্ মন্থনের ফলে রমণী সকল উত্থিত হলে ঐ রমণীগণ অপ্সরা নামে পরিচিত হয়।[৭৭] দেব ও দানবগণ কেহই তাদের গ্রহণ না করলে ষাট কোটি অপ্সরা সাধারণ স্ত্রীতে পরিগণিত হয়। তার পর বরুণ-কন্যা বারুণী গ্রহীতা পুরুষকে অন্বেষণ করতে করতে উত্থিত হয়। দিতির পুত্রগণ বরুণ-কন্যাকে গ্রহণ না করলে শেষে অদিতির পুত্রগণ বরুণ-কন্যাকে গ্রহণ করেন।

সুরা গ্রহণ করার ফলে অদিতির পুত্রগণ সুর এবং সুরা গ্রহণ না করার ফলে দিতির পুত্রগণ অসুর নামে প্রসিদ্ধ হন।[৭৮] তারপর সমুদ্র থেকে উচ্চৈঃশ্রবা নামক শ্রেষ্ঠ অশ্ব, কৌস্তভ নামক মণি ও শেষে অমৃত উত্থিত হয়।[৭৯]

অমৃতের জন্য দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়লে বিষ্ণু মোহিনী মায়ার আশ্রয় করে রমণীর রূপ ধরে

---

৭৬. দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ পুরুযোত্তমঃ।
অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্বেদময়ঃ পুমান্॥
উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ সকলমণ্ডলুঃ।
পূর্বং ধন্বন্তরির্নাম অপ্সরাশ্চ সুবর্চসঃ॥ ১।৪৫।৩১-৩২

৭৭. অপ্সু নির্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্ বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্॥ ১।৪৫।৩৩

৭৮. অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ॥ ১।৪৫।৩৮

৭৯. উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নং চ কৌস্তুভম্।
উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতমুত্তমম্॥ ১।৪৫।৩৯

অমৃত হরণ করেন।[৮০] অমৃত পানে বলীয়ান দেবতারা দিতির পুত্রগণকে নিহত করে স্বর্গরাজ্য জয় করেন।[৮১]

মহাভারতে শৌনকের নিকট উগ্রশ্রবা সমুদ্র-মন্থন উপাখ্যান শোনান।[৮২]

একদিন দেবগণ সুমেরু নামক রমণীয় মহীধরে উপবেশন করে অমৃত প্রাপ্তির বিষয়ে মন্ত্রণা শুরু করেন। নারায়ণ দেবগণকে অমৃত বিষয়ে চিন্তিত দেখে ব্রহ্মাকে বলেন— দেবগণ ও অসুরগণ মিলিতভাবে সমুদ্র মন্থন করলে অমৃত উত্থিত হবে। দেবগণ সমুদ্র-মন্থনের আদেশ লাভ করে মন্দরকে মন্থন-দণ্ড রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু মন্দরকে তুলতে অসমর্থ হয়ে ব্রহ্মা ও নারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু ও ব্রহ্মার নির্দেশে ভুজঙ্গরাজ অনন্তদেব মন্দরকে তুলতে অসমর্থ হন। তার পর অনন্তদেবের সঙ্গে দেবগণ সমুদ্রের আদেশ চান। সমুদ্র স্বীয় ক্লেশ সহ্য করার বিনিময়ে অমৃতের অংশ পেতে চান। দেব ও অসুরগণ কূর্মরাজকে গিরিবরের আধার হতে বলেন। কূর্মরাজ রাজী হলে ইন্দ্র তাঁর পিঠে চড়ে গিরিরাজকে চালিত করেন। অসুরগণ বাসুকির সম্মুখভাগ ও সুরগণ পুচ্ছদেশ ধরেন। মন্থন করার সময় দেবগণ নাগরাজকে এমন বলে আকর্ষণ করেন যে তাঁর মুখ দিয়ে নিরন্তর অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো নিশ্বাস বায়ু নির্গত হতে থাকে। জলস্থিত ও পাতালস্থ শত শত জন্তু নিহত হতে থাকে। মন্দর পর্বতে অসুরগণের মধ্যে সংঘর্ষে জাত অগ্নি পর্বতস্থ জীবজন্তুকে দগ্ধ করতে থাকে। ইন্দ্র মেঘবারি সিঞ্চনে তা নির্বাপিত করেন। নানা মহৌষধি রস গলিত হয়ে সমুদ্রে পড়তে থাকে। নানারূপ উৎকৃষ্ট রসে সমুদ্র ক্ষীর রূপে পরিণত হয়, অবশেষে দেবগণ শ্রান্ত হয়ে বল সংগ্রহের জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলে ব্রহ্মার নির্দেশে নারায়ণ দেবগণকে বল দান করেন। পুনরায় দেবগণ সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করলে সমুদ্র থেকে চন্দ্রের উদ্ভব হয়। তারপর ঘৃত থেকে শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী আবির্ভূতা হন। পরে শ্বেতবর্ণা উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব উৎপন্ন হয়। ঘৃত থেকে কৌস্তভ মণি উৎপন্ন হয়ে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে শোভিত হয়। শেষে ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হাতে সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়। দৈত্যগণ অমৃত পাওয়ার জন্য কলহ শুরু করে। পরে সমুদ্র থেকে ঐরাবত নামে মহাগজ আবির্ভূত হলে ইন্দ্র তা গ্রহণ করেন।

---

৮০. যদা ক্ষয়ং গতং সর্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অমৃতং সোঽহরং তূর্ণং মায়ামাস্থায় মোহিনীম্॥ ১।৪৫।৪২

৮১. নিহত্য দিতিপুত্রাংস্তু রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ। ১।৪৫।৪৫ ক.খ.

৮২. ১।১৭

সুরগণ তবুও সমুদ্র মন্থনে ক্ষান্ত হন না। পরে কালকূট গরল উৎপন্ন হয়। সেই গরলের প্রভাবে ত্রিলোক মূর্ছিত হয়। ব্রহ্মা তাতে ভীত হয়ে মহাদেবকে সেই বিষ পান করতে বললে মহাদেব কণ্ঠে সে বিষ ধারণ করে নীলকণ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হন। দানবগণ এই ব্যাপার দেখে হতাশ হয়ে অমৃত ও লক্ষ্মী লাভের জন্য দেবগণের সঙ্গে কলহ আরম্ভ করে। এ সময় নারায়ণ মোহিনী মায়ার আশ্রয় করে সুন্দরী নারীর রূপ ধরে অসুরগণের নিকট উপস্থিত হলে তারা নারীর অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়ে তাঁকে অমৃত সমর্পণ করে।[৮৩]

এখানে দেখা যাচ্ছে উভয় মহাকাব্যেই মুখ্য ঘটনার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু গৌণ বিষয় সমুহের সংযোজনে। রামায়ণে বর্ণিত সমুদ্র মন্থন উপাখ্যানের তুলনায় মহাভারতে বৃহৎ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

রামায়ণে দেখা যায় জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির জন্য দিতি ও অদিতির পুত্রগণ সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করে।[৮৪]

মহাভারতে দেবগণ সমুদ্র মন্থনের কথা চিন্তা করলে নারায়ণ ব্রহ্মাকে অসুরদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র মন্থনে নির্দেশ দেন।[৮৫]

মহাভারতের উপাখ্যানটিতে দেখা যায় দেবগণ মন্দর পর্বত তুলতে অসমর্থ হয়ে নারায়ণ ও ব্রহ্মার সাহায্য প্রার্থনা করেন ও শেষে ভুজঙ্গরাজ অনন্তদেব মন্দরকে তুলতে সমর্থ হন।

রামায়ণে এ সমস্ত অন্তর্বর্তী ঘটনা অনুপস্থিত। রামায়ণে মন্দর পর্বত পাতালে

---

৮৩. ততো নারায়ণো মায়াং মোহিনীং সমুপাশ্রিতঃ।
স্ত্রীরূপমদ্ভুতং কৃত্বা দানবানভিসংশ্রিতঃ।
ততস্তদমৃতং তস্যৈ দদুস্তে মূঢ়চেতসঃ।
স্ত্রিয়ৈ দানবদৈতেয়াঃ সর্বে তদগতমানসাঃ॥ ১।১৮।৪৫-৪৬

৮৪. পূর্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রা মহাবলাঃ।
অদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্য্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ॥
ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনাম্।
অমরা বিজরাশ্চৈব কথং স্যামো নিরাময়াঃ॥ ১।৪৫।১৫-১৬

৮৫. অমৃতায় সমাগম্য তপোনিয়মসংযুতাঃ॥
তত্র নারায়ণো দেবো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ।
চিন্তয়ৎসু সুরেষ্বেবং মন্ত্রয়ৎসু চ সর্বশঃ॥
দেবৈরসুরসঙ্ঘৈশ্চ মথ্যতাং কলশোদধিঃ॥ ১।১৭

প্রবেশ করে এবং শেষে দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু কূর্মরূপ ধরে মন্দর পর্বতকে পিঠে নিয়ে সমুদ্রে শয়ন করেন।[৮৬]

মহাভারতে নাগরাজকে আকর্ষণ করার ফলে মন্দর পর্বতের বৃক্ষে অগ্নির আবির্ভাব ও নানা প্রাণীর প্রাণনাশ ঘটে। তা ছাড়া দেবগণের শ্রান্ত হয়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত দেবগণের উদ্দেশ্যে নারায়ণের বলদান, সমুদ্র থেকে চন্দ্রের উদ্ভব, লক্ষ্মী ও ঐরাবত নামক মহাগজের উদ্ভব প্রভৃতি রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রামায়ণের উপাখ্যানে মন্থনের প্রথম দিকেই বিষের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে।[৮৭] কিন্তু মহাভারতে বিষের উদ্ভব দেখানো হয়েছে অমৃত আবির্ভাবের পরে।[৮৮]

সমুদ্রমন্থনজাত বিষ উভয় মহাকাব্যের উপাখ্যানেই মহাদেবকে গ্রহণ করতে দেখা যায় তবে এই বিষ কণ্ঠে ধারণ করার ফলে মহাদেবের নীলকণ্ঠ নামকরণের কথা মহাভারতেই পাওয়া যায়।[৮৯] অবশ্য মহাভারতে মহাদেবের নীলকণ্ঠ নাম হওয়ার অন্য ব্যাখ্যাও আছে।

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র উপাখ্যান

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র উপাখ্যানটি উভয় মহাকাব্যেই স্থান লাভ করেছে। মহাভারতে[৯০] গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ অর্জুনকে এই উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

৮৬. ততো দেবাসুরাঃ সর্বে মমন্থু রঘুনন্দন।
প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ পর্বতোত্তমঃ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্॥
পালয়াস্মান্ মহাবাহো গিরিমুদ্ধর্তুমর্হসি।
ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাস্থিতঃ॥
পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ। ১।৪৫।২৭-৩০ ক.খ.

৮৭. ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ॥
...উৎপপাতাগ্নিসংকাশং হালাহলমহাবিষম্। ১।৪৫।১৮, ২০ কখ

৮৮. এতদত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা দানবানাং সমুত্থিতঃ।
অমৃতার্থে মহান্ নাদো মমেদমিতি জল্পতাম্॥
....অতিনির্মথনাদেব কালকূটস্ততঃ পরঃ। ১।১৮।৩৯; ৪১ কখ

৮৯. দধার ভগবান্ কণ্ঠে মন্ত্রমূর্তির্মহেশ্বরঃ।
তদাপ্রভৃতি দেবস্তু নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতিঃ॥ ১।১৮।৪৩

৯০ ১।১৭৪

বিশ্বামিত্র একদিন মৃগয়াকালে অমাত্যগণের সঙ্গে বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করেন। বশিষ্ঠ নিজের কামধেনু নন্দিনীর সাহায্যে রাজা ও তাঁর অনুচরবর্গকে উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করান। রাজা বিশ্বামিত্র নন্দিনীর সৌন্দর্য ও অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা দেখে প্রচুর ধনরত্নের বিনিময়ে তাকে গ্রহণ করতে চান। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবে অসম্মত হলে বিশ্বামিত্র বলপূর্বক নন্দিনীকে হরণ করতে উৎসাহী হন। শেষে নন্দিনী বশিষ্ঠের আদেশে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করে। বিশ্বামিত্রের সৈন্য নন্দিনী সৃষ্ট সৈন্যের কাছে পরাজিত হয় ও নন্দিনী রক্ষা পায়। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এই অদ্ভুত ব্রহ্মতেজে বিস্মিত হয়ে ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করে তপস্যায় মগ্ন হন। শেষে ব্রহ্মত্ব লাভ করে ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপান করতে সমর্থ হন।

রামায়ণে[৯১] শতানন্দ রামের নিকট বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। এখানে সামান্য ফলমূল দ্বারা বশিষ্ঠের আতিথ্যেই বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে স্বরাজ্যে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।[৯২] বশিষ্ঠের এই অনুরোধের কথা মহাভারতে দেখা যায় না।

রামায়ণে বশিষ্ঠের কামধেনুর নাম শবলা[৯৩], নন্দিনী নয়[৯৪]। রামায়ণে শবলা-সৃষ্ট সৈন্যগণের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা মহাভারতের তুলনায় ভয়ংকর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে নন্দিনী-সৃষ্ট সৈন্য বিশ্বামিত্রের একটি সৈন্যকেও সংহার করে নি।[৯৫] পক্ষান্তরে রামায়ণে শবলাসৃষ্ট সৈন্যগণ বিশ্বামিত্রের অসংখ্য সৈন্য নিহত করে।[৯৬]

রামায়ণের উপাখ্যানে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গলাভের প্রস্তাবের বশিষ্ঠ-কর্তৃক

৯১. ১।৫২

৯২. অতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি বলস্যাস্য মহাবল।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য যথার্হং সম্প্রতীচ্ছ মে॥
এবং ব্রুবন্তং রাজানং বসিষ্ঠং পুনরেব হি।
ন্যমন্ত্রয়ৎ ধর্মাত্মা পুনঃ পুনরুদারধীঃ॥
বাঢ়মত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ হ। ১।৫২।১৩, ১৮—১৯ কখ

৯৩. এহ্যেহি শবলে ক্ষিপ্রং শৃণু চাপি বচো মম। ১।৫২।২১ ক.খ.

৯৪. কালিদাস রঘুবংশে নন্দিনী নামই স্বীকার করেছেন।

৯৫. ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যন্তে কেচিৎ তত্রাস্য সৈনিকাঃ।
বিশ্বামিত্রস্য সংক্রুদ্ধৈর্বাসিষ্ঠৈর্ভরতর্ষভ॥ ১।১৭৪।৪২

৯৬. তৈস্তন্নিষূদিতং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।
সপদাতিগজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন॥ ১।৫৫।৪

প্রত্যাখ্যান,[৯৭] বশিষ্ঠ-পুত্রগণের শাপে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি,[৯৮] প্রভৃতি বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হলেও মহাভারতের উপাখ্যানটিতে এ-সকল বিষয় অনুপস্থিত।

আদিকাব্যে বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা ও বার বার ব্যর্থতার যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও ক্রোধ দমন ব্যতীত ব্রাহ্মণত্ব লাভ অসম্ভব এই ধারণাই প্রকটিত হয়।

মহাভারতে আরোও একটি বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র উপাখ্যান পাওয়া যায়।[৯৯] এখানেও জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা বলেছেন। গাধি বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে স্বর্গে গমন করলে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র সৈন্যসহ বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বিশ্বামিত্র-কর্তৃক আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ হলে বশিষ্ঠ কামধেনু দ্বারা শবরসৈন্য সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রের সৈন্য ছত্রভঙ্গ করেন। 'তপস্যাই একমাত্র বল'—বিশ্বামিত্র এ কথা বুঝে তপস্যায় মন দেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে শেষে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব দান করেন।

বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে আরোও একটি 'বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র' উপাখ্যান মহাভারতে স্থান পেয়েছে।[১০০] বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই নিজের তপস্যা নিয়ে গর্ব করতেন। একদা সরস্বতী নদী বিশ্বামিত্রের আদেশে বশিষ্ঠকে তাঁর নিকট বহন করে নিয়ে যান। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের প্রাণনাশের জন্য অস্ত্র অন্বেষণে উদ্‌গ্রীব হলে সরস্বতী মুহূর্তে বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের হাত থেকে অপসারিত করেন। এ কাজের জন্য সরস্বতী বিশ্বামিত্রের শাপে জলের পরিবর্তে রক্ত বহন করতে থাকে।

উল্লিখিত তিনটি উপাখ্যানের মধ্যে প্রথমটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে হয়।[১০১]

৯৭. ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ।
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাঘব॥
গচ্ছেয়ং সশরীরেণ দেবতানাং পরাং গতিম্।
বসিষ্ঠং স সমাহূয় কথয়ামাস চিন্তিতম্॥
অশক্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রত্যাখ্যাতো বশিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্॥ ১।৫৭।১১-১৩

৯৮. ঋষিপুত্রাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্॥
শেপুঃ পরমসংক্রুদ্ধাশ্চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি।
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ॥ ১।৫৮।৮ গ.ঘ. ৯ কখ-১০ কখ

৯৯. ৯।৪০, ১০০. ৯।৪২

১০১. কিংনিমিত্তমভূদ্ বৈরং বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ।
বসতোরাশ্রমে দিব্যে শংস নঃ সর্বমেব তৎ॥
ইদং বাসিষ্ঠামাখ্যানং পুরাণং পরিচক্ষতে।
পার্থ সর্বেষু লোকেষু যথাবৎ তন্নিবোধ মে॥ ১।১৭৪।১-২

ইল্বল-বাতাপি উপাখ্যান

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বিভিন্ন পুণ্যশ্লোক ঋষিগণের আশ্রমে আশ্রমে বনবাস জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। এইভাবে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। একদিন সুতীক্ষ্ণ মুনির নির্দেশে চলেছেন অগস্ত্য মুনির আশ্রমের সন্ধানে। উদ্দেশ্য মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের সাক্ষাৎলাভ। নির্জন অরণ্যানীর মধ্যে পবিত্র-স্বচ্ছতোয়া সরোবরের তীর দেশ দিয়ে যাত্রাকালে মুনিবর অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রম রামের দৃষ্টিগোচর হয়। ঋষি-ভ্রাতার আশ্রমটি দেখে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে ইল্বল ও তার ভ্রাতা বাতাপির উপাখ্যান বলতে শুরু করেন।[১০২]

ইল্বল ও বাতাপি নামে দুই হৃদয়হীন অসুর বাস করত। তারা কামরূপ ছিল। জ্যেষ্ঠ ইল্বল সংস্কৃত বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করে মেষরূপধারী স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিকে হত্যা এবং রন্ধনপূর্বক তাঁদের ভোজন করাত। ব্রাহ্মণগণের ভোজন শেষ হলে ইল্বল বাতাপিকে আহ্বান করত। বাতাপি ইল্বলের ডাক শোনামাত্র ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ ভেদ করে বেরিয়ে আসত।

দেবগণের প্রার্থনায় মহর্ষি অগস্ত্য ঐ ভাবে বাতাপিকে ভক্ষণ করেন। তার পর যথাসময়ে ইল্বল নির্গত হবার জন্য বাতাপিকে আহ্বান করে। মহর্ষি অগস্ত্য হাস্যবদনে বাতাপির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। বাতাপির মৃত্যু সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে ইল্বল অগস্ত্যকে নিহত করতে উদ্যত হলে তেজস্বী মুনি তাকে আপন অগ্নিতুল্য তেজ দ্বারা দগ্ধ করেন।

মহাভারতে লোমশমুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট ইল্বল-বাতাপির উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।[১০৩] পূর্বে মণিমতী পুরীতে কামরূপী দৈত্য ইল্বল ভাই বাতাপির সঙ্গে বাস করত। একদিন ইল্বল এক ব্রাহ্মণকে দেবরাজের ন্যায় একটি সন্তান প্রার্থনা করে বিমুখ হয়। তার পর ক্রোধবশত আগন্তুক ব্রাহ্মণদের জীবন নাশের জন্য মেষরূপী বাতাপিকে রন্ধন করে ভোজন করাতে শুরু করে। পরে বাতাপিকে আহ্বান করলে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ ভেদ করে বাতাপি বেরিয়ে আসত। এই ভাবে ব্রাহ্মণদের জীবনাবসান ঘটত। এই সময় মহামুনি অগস্ত্য পূর্বপুরুষগণের নির্দেশে বিদর্ভরাজ-কন্যা লোপামুদ্রাকে বিয়ে করেন। লোপামুদ্রা একদিন অগস্ত্যকে পিতার গৃহের মত শয্যা ও অলংকারাদি প্রার্থনা করেন। অগস্ত্য ধন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন রাজার কাছে নিরাশ হয়ে শেষে ইল্বলের নিকট হাজির হন। দানবরাজ

১০২. ৩।১১

১০৩. ৩।৯৬

ইল্বল অগস্ত্যসহ রাজগণকে দেখে আনন্দিত হয়ে মেষরূপী বাতাপিকে উত্তমরূপে পাক করান। সমাগত রাজগণ তা দেখে বিষণ্ণ হলেও অগস্ত্য হৃষ্টমনে বাতাপির মাংস ভোজ করেন। বাতাপির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অতিশয় দুঃখিত ইল্বল মহর্ষিসহ রাজগণের আগমনের কারণ জানতে আগ্রহী হয়। অগস্ত্য ইল্বলকে যথাশক্তি দান করতে বলেন। ইল্বল রাজগণসহ মহর্ষিকে সুবর্ণ, গো, রথ প্রভৃতি দান করেন। অগস্ত্য লোপামুদ্রার ইচ্ছা পূরণ করতে সমর্থ হন।

রামায়ণে ইল্বল কেন এই বিচিত্র পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণগণকে নিহত করত তা বলা হয়নি। কিন্তু মহাভারতে ইল্বল ব্রাহ্মণের কাছে ইন্দ্রতুল্য পুত্র ভিক্ষা করে বঞ্চিত হলে ক্রোধে ব্রাহ্মণ হত্যায় লিপ্ত হয় তা দেখানো হয়েছে।[১০৪]

রামায়ণে দেখা যায় অগস্ত্য দেবগণের নির্দেশে ইল্বলের গৃহে গমন করেন তাকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে।[১০৫] মহাভারতের উপাখ্যানে দেখা যাচ্ছে অগস্ত্য ধন সংগ্রহের জন্য ইল্বলের গৃহে এসেছেন।[১০৬]

পূর্বপুরুষদের নির্দেশে বংশরক্ষার জন্য অগস্ত্যের লোপামুদ্রার সৃষ্টি বিদর্ভরাজের হাতে সমর্পণ ও পরে তাকে বিবাহ এবং শেষে তাকে খুশি করার জন্য ধনলাভেচ্ছু হয়ে ইল্বলের গৃহে গমন এ সকল ঘটনা মহাভারতে বেশি এসেছে।

ইল্বল জীর্ণ বাতাপিকে আহ্বান করলে অগস্ত্যের শরীরের অধোদেশ থেকে বায়ু নির্গত হবার কথা রামায়ণে নেই।[১০৭] রামায়ণে বাতাপি জীর্ণ হয়েছে জেনে ইল্বল অগস্ত্যকে প্রহার করতে উদ্যত হলে তাঁর ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হয়।[১০৮]

১০৪. স ব্রাহ্মণং তপোযুক্তমুবাচ দিতিনন্দনঃ।
পুত্রং মে ভগবানেকমিন্দ্রতুল্যং প্রযচ্ছতু॥
তস্মৈ স ব্রাহ্মণো নাদাৎ পুত্রং বাসবসম্মিতম্।
চুক্রোধ সোঽসুরস্তস্য ব্রাহ্মণস্য ততো ভৃশম্॥ ৩।৯৬।৫-৬

১০৫. অগস্ত্যেন তদা দেবৈঃ প্রার্থিতেন মহর্ষিণা।
অনুভূয় কিল শ্রাদ্ধে ভক্ষিতঃ স মহাসুরঃ॥ ৩।১১।৬১

১০৬. ততঃ সর্বে সমেত্যাথ তে নৃপাস্তং মহামুনিম্।
ইদমূচুর্মহারাজ সমবেক্ষ্য পরস্পরম্॥
অয়ং বৈ দানবো ব্রহ্মন্নিল্বলো বসুমান ভুবি।
তমতিক্রম্য সর্বেঽদ্য বয়ং চার্থামহে বসু॥
তেষাং তদাসীদুচিতমিল্বলস্যৈব ভিক্ষণম্। ৩।৯৮।১৮-২০ ক.খ.

১০৭. ততো বায়ুঃ প্রাতদুরভূদধস্তস্য মহাত্মনঃ।
শব্দেন মহতা তাত গর্জন্নিব যথা ঘনঃ। ৩।৯৯।৭

১০৮. সোঽভ্যদ্রবদ্দ্বিজেন্দ্রং তং মুনিনা দীপ্ততেজসা।
চক্ষুষানলকল্পেন নির্দগ্ধো নিধনং গতঃ॥ ৩।১১।৬৬

কিন্তু মহাভারতে ইম্বল বাতাপিকে অগস্ত্যের উদরে জীর্ণ জেনে করজোড়ে রাজগণসহ মহর্ষির আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করে।[১০৯]

রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে উপাখ্যানটিকে দীর্ঘতর করা হয়েছে। যদিও মূল বক্তব্য উভয় মহাকাব্যেই এক।

বৃত্রাসুর উপাখ্যান

রামায়ণে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের নিকট বৃত্রাসুর-বধের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।[১১০]

বৃত্রাসুর একসময় কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলে ইন্দ্র বিষ্ণুর কাছে হাজির হলেন প্রতিকারের আশায়। বৃত্র আরো কিছুকাল তপস্যা করলে সকল লোককেই তার বশীভূত হয়ে থাকতে হবে ইন্দ্রের এই ছিল আশঙ্কা। কিন্তু বৃত্রাসুর ছিল বিষ্ণুর প্রিয় তাই স্বয়ং বধ না করে তাঁর তেজকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন যাতে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করতে সমর্থ হন।[১১১] বিষ্ণুতেজের প্রথমভাগ প্রবিষ্ট হল ইন্দ্রের মধ্যে, দ্বিতীয় ভাগ বজ্রমধ্যে এবং তৃতীয়ভাগ ভূতলে।[১১২] দেবগণ বৃত্রের বধোপায় জেনে আনন্দিত হলেন। তার পর ইন্দ্র তপস্যারত বৃত্রকে বজ্রদ্বারা নিহত করলেন।[১১৩] নিরপরাধ বৃত্রকে বধ করায় ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করে। শেষে অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনায় ইন্দ্র শাপমুক্ত হন।

মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য লোমশমুনি তাঁর কাছে বৃত্রাসুরের উপাখ্যান বর্ণনা করেন।[১১৪]

এখানে দেখা যাচ্ছে দুর্ধর্ষ যুদ্ধমত্ত বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছেন। ব্রহ্মা নির্দেশ দেন মহামুনি দধীচির অস্থিদ্বারা নির্মিত বজ্রই বৃত্রাসুর বধের একমাত্র উপায়।

১০৯. ইম্বলস্তু বিষণ্ণোঽভূদ্ দৃষ্ট্বা জীর্ণং মহাসুরম্।
প্রাঞ্জলিশ্চ সহামাত্যৈরিদং বচনমব্রবীৎ। ৩।৯৯।৯ গ.ঘ. ১০ ক.খ.

১১০. ৭।৮৪-৮৬

১১১. ত্রেধাভূতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসত্তমাঃ।
তেন বৃত্রং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৮৫।৬

১১২. একাংশো বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব তু।
তৃতীয়ো ভূতলং যাতু তদা বৃত্রং হনিষ্যতি॥ ৮৫।৭

১১৩. বজ্রং প্রগৃহ্য পাণিভ্যাং প্রাহিণোদ্ বৃত্রমূর্ধনি॥ ৮৫।১৩ গ.ঘ.

১১৪. ৩।১০০-১০১

দেবগণ দধীচির নিকট হাজির হয়ে তাঁর অস্থিসকল বজ্র তৈরির জন্য ভিক্ষা করেন। উদার-হৃদয় দধীচি মৃত্যুবরণ করে দেবকার্যে সহায়তা করেন। তাঁর অস্থিদ্বারা বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করেন। বজ্র নির্মিত হলে দেবগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

মহাভারতোক্ত এই উপাখ্যানটির সঙ্গে রামায়ণের উপাখ্যানটির কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। যেমন রামায়ণে ইন্দ্র বৃত্র বধের উপায় নির্ধারণের জন্য বিষ্ণুর কাছে হাজির হন।[১১৫] মহাভারতোক্ত উপাখ্যানটিতে দেবগণ এই কার্য সাধনের জন্য উপস্থিত হন ব্রহ্মার নিকট।[১১৬] মহামুনি দধীচির অস্থিদ্বারা বিশ্বকর্মা-কর্তৃক বজ্র নির্মাণের কথা[১১৭] রামায়ণের উপাখ্যানটিতে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, এখানে বৃত্রাসুরের কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে নিরপরাধ তপস্যারত বৃত্রকে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে নিহত করেন। এবং বৃত্রবধে ইন্দ্র অনুতপ্ত হন।[১১৮] মহাভারতে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের মধ্যে ভয়ংকর সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করেন।[১১৯]

মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বের নবম থেকে দশম অধ্যায়ে আরো একটি বৃত্রাসুর বধের উপাখ্যান পাওয়া যায়।

১১৫. তপস্তপ্যতি বৃত্রে তু বাসবঃ পরমার্তবৎ।
বিষ্ণুং সমুপসংক্রম্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৭।৮৪।১১

১১৬. পুরন্দরং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে॥
কৃতাঞ্জলীংস্তু তান্ সর্বান্ পরমেষ্ঠীত্যুবাচ হ। ৩।১০০।৫ গঘ-৬ কখ

১১৭. ত্বষ্টা তু তেষাং বচনং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ প্রযতঃ প্রযত্নাৎ॥
চকার বজ্রং ভৃশমুগ্ররূপং।
কৃত্বা চ শক্রং স উবাচ হৃষ্টঃ। ১০০।২৩ গঘ-২৪ কখ

১১৮. ততঃ সর্বে মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ।
তদরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ॥
....কালাগ্নিনেব ঘোরেণ দীপ্তেনেব মহার্চিষা।
পততা বৃত্রশিরসা জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ॥
অসম্ভাব্যং বধং তস্য বৃত্রস্য বিবুধাধিপঃ।
চিন্তয়ানো জগামাশু লোকস্যান্তং মহাযশাঃ॥ ৭।৮৫।১০, ১৪-১৫

১১৯. ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্তঃ
শ্রুত্বা রবং ঘোররূপং মহান্তম্।
ভয়ে নিমগ্নস্ত্বরিতো মুমোচ
বজ্রং মহৎ তস্য বধায় রাজন্॥ ৩।১০১।১৪

এই উপাখ্যানে ইন্দ্রের নির্দেশে নিরপরাধ ত্রিশিরা নিহত হলে প্রজাপতি ত্বষ্টা তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি-প্রদান পূর্বক বৃত্রকে উৎপাদন করেন।[১২০] ত্বষ্টার আদেশে বৃত্র দেবলোকে ইন্দ্রের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হন। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইন্দ্রের জয়লাভ হলেও শেষে অমিতপরাক্রম বৃত্রকে ত্বষ্টার তপঃপ্রভাবে অপরাজেয় দেখে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। দেবগণ দুঃখিত চিত্তে বিষ্ণুর শরণ নেন। বিষ্ণু অদৃশ্যরূপে বজ্রে প্রবেশ করবেন এই আশ্বাস দিয়ে দেবগণকে বৃত্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব তোলেন। বৃত্র প্রস্তাব অস্বীকার করেন। শেষে ঋষিগণের নানা উপদেশবাক্য শুনে বৃত্রাসুর বলেন—যদি দেবগণ প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁরা শুষ্ক বা আর্দ্র, প্রস্তর বা কাষ্ঠ, অস্ত্র বা শস্ত্র দিয়ে দিনে বা রাত্রে তাঁকে বধ করবেন না, তা হলে তিনি সন্ধি করতে পারেন।[১২১] ঋষিরা বৃত্রাসুরের প্রস্তাবে সম্মত হলে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন। পরে একদিন সন্ধ্যাকালে বৃত্রাসুরকে দেখে ইন্দ্র তাঁর প্রতি সবজ্র ফেনরাশি নিক্ষেপ করেন। বিষ্ণু তাতে প্রবেশ করে বৃত্রাসুরকে নিহত করেন।

ইন্দ্র প্রথমেই ত্রিশিরাকে হত্যা করার জন্য ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন, পুনরায় তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করে উক্ত পাপে জর্জরিত হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে জলে বাস করতে থাকলে দেবগণ নহুষকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যের উপাখ্যানেই বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্র ব্রহ্ম-হত্যার পাপে লিপ্ত হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে ঐ পাপ থেকে মুক্তি পান।

রামায়ণোক্ত উপাখ্যানটিতে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলে পাপ বর্ষাকালীন নদী, ভূমিতল, যুবতী, সত্যবাদী ব্রাহ্মণ ও ঘাতককে আশ্রয় করে।[১২২]

১২০. অগ্নৌ হুত্বা সমুৎপাদ্য ঘোরং বৃত্রমুবাচ হ।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্ধস্ব প্রভাবাৎ তপসো মম॥ ৯।৪৮

১২১. ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ নাশ্মনা ন চ দারুণা।
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ ন দিবা ন তথা নিশি॥
বধ্যো ভবেয়ং বিপ্রেন্দ্রাঃ শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ।
এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নিত্যদা॥ ১০।২৯-৩০

১২২. একেনাংশেন বৎস্যামি পূর্ণোদাসু নদীষু বৈ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পঘ্নী কামচারিণী॥

মহাভারতোক্ত উপাখ্যানটিতে ব্রহ্মহত্যার পাপ বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পৃথিবী ও স্ত্রী জাতিতে রাখা হয়।[১২৩]

মহাভারতের পূর্বোক্ত বনপর্বের বৃত্রাসুর উপাখ্যানটিতেও ইন্দ্রের ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপ ও শেষে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদনের মাধ্যমে তা থেকে মুক্তির কথা এসেছে। যার উল্লেখ আমরা রামায়ণে বর্ণিত উপাখ্যানটিতে দেখতে পাই।

মহাভারতের শান্তিপর্বেও (২৭৯-৮২ অধ্যায়) বৃত্রাসুরের উপাখ্যান পিতামহ ভীষ্মের মুখে বর্ণিত হয়েছে। এখানে উপাখ্যানটি আরো পূর্ণাঙ্গ।

বৃত্রাসুরের উপাখ্যানটি প্রায় সকল পুরাণেই নানা রূপে পরিব্যাপ্ত। বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের সংগ্রামই বেশি দেখা যায় হয়। ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেই তিনি পুরাণ- সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের অনেক ঋঙ্‌মন্ত্রে বৃত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে বৃত্রকে বধ করে ইন্দ্র বারিবর্ষণের পথ উন্মুক্ত করে দেন।[১২৪] ঋগ্বেদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় মেঘের মধ্যে জলকে অবরুদ্ধ করে রাখে যে শক্তি তাকেই বৃত্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সম্ভবত ঋগ্বেদোক্ত এই ইন্দ্র-বৃত্র কল্পিত কাহিনীই পরবর্তীকালে মহাকাব্যে এবং আরো পরে পুরাণ-সাহিত্যে[১২৫] এসেছে এবং নানা অলংকরণে সেটি বিভিন্ন আকৃতিতে পল্লবিত হয়েছে।

ভূম্যামহং সর্ব্বকালমেকেনাংশেন সর্বদা।
বসিষ্যামি ন সন্দেহঃ সত্যেনৈতদ্ ব্রবীমি বঃ॥
যোঽয়মংশস্তৃতীয়ো মে স্ত্রীষু যৌবনশালিষু।
ত্রিরাত্রং দর্পপূর্ণাসু বসিষ্যে দর্পঘাতিনী॥
হন্তারো ব্রাহ্মণান্ যে তু মৃষাপূর্বমদূষকান্।
তাংশ্চতুর্থেন ভাগেন সংশ্রিয়ষ্যে সুরর্ষভাঃ॥ ৭।৮৬।১৩-১৬

১২৩. বিভজ্য ব্রহ্মহত্যাং তু বৃক্ষেষু চ নদীষু চ।
পর্বতেষু পৃথিব্যাং চ স্ত্রীষু চৈব যুধিষ্ঠির॥ ১৩।১৯

১২৪. পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোঽপো বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ত্।
বৃত্রস্য যত্প্রবণে দুর্গৃভিশ্বনো নিজঘন্থ হন্বোরিন্দ্র তন্যতুম॥ ঋ.বে. ১।৫২।৬

খ. বি যস্তিরো ধরুণমচ্যুতং রজোঽতিষ্ঠিপো দিব আতাসু বর্হণা।
স্বর্মীড়হে যন্মদ ইন্দ্র হর্য্যাহন্বৃত্রং নিরপামৌবৃজো অর্ণবম্॥ ঋ.বে. ১।৫৬।৫

১২৫. ভা.পু. ৬।১২
হরি বং, বিষ্ণু পর্ব, ৭০।১৬
অগ্নি পু. ২৭৬।২১
পদ্ম পু. — সৃঃ খণ্ড, ৭৩।৩৭ প্রভৃতি।

অষ্টাবক্র উপাখ্যান

মহাভারতে[১২৬] মহারাজ যুধিষ্ঠির অষ্টাবক্র কাহিনী জানতে চাইলে লোমশ মুনি বললেন— উদ্দালকের শিষ্যের নাম কহোড়[১২৭]। তিনি সর্বদা যত্নের সঙ্গে আচার্যের নিকট বেদ অধ্যয়ন করতেন ও তাঁর পরিচর্যা করতেন। উদ্দালক অনুগত শিষ্যের পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বীয় কন্যা সুজাতার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। একদা সুজাতার গর্ভ থেকে কহোড়-পুত্র পিতার বেদাধ্যয়নের ত্রুটি নির্দেশ করলে গর্ভস্থ পুত্রের অপমানে রুষ্ট হয়ে পুত্রকে দেহের আট স্থানে বাঁকা হয়ে জন্মানোর অভিশাপ দেন। সুজাতা পুত্রপ্রসবকালে কহোড়কে ধন সংগ্রহের জন্য পাঠালে কহোড় জনকরাজসভায় বন্দীর দ্বারা শাস্ত্রালোচনায় পরাজিত হয়ে জলে নিমগ্ন হন। উদ্দালক সুজাতাকে স্বীয় জামাতার কথা অষ্টাবক্রকে জানাতে নিষেধ করেন। পরে একদিন দ্বাদশবর্ষ বয়সে উপনীত অষ্টাবক্র উদ্দালকের কোলে বসে থাকলে শ্বেতকেতু (অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুকে দাদা বলে জানতেন) পিতার কোল নয় বলে অষ্টাবক্রকে অপমানিত করেন। অপমানিত হয়ে অষ্টাবক্র মা সুজাতার কাছে পিতার পরিচয় জানতে চাইলে সুজাতা সকল বৃত্তান্ত অষ্টাবক্রের কাছে প্রকাশ করেন। তারপর অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুকে সঙ্গে নিয়ে জনকরাজ দরবারের উদ্দেশে গমন করে। দ্বাদশবর্ষীয় বালক জনকরাজ-সভার পলিতকেশ শাস্ত্রবিদ্‌দের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় অক্ষম এরূপ বিবেচনায় প্রথমে প্রবেশাধিকার পায় না। শেষে পরীক্ষায় জনককে সন্তুষ্ট করে সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং বন্দীর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়। অষ্টাবক্র সর্বসমক্ষে পাণ্ডিত্যে বন্দীকে পরাস্ত করেন। পরাজিত হয়ে বন্দী তাঁর পিতা বরুণের হাত থেকে পরাজিত বিপ্রগণ সহ অষ্টাবক্রের পিতা কহোড়কে মুক্তি দেন।[১২৮]

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শেষে সীতা গ্রহণে রাম অনিচ্ছুক হলে সীতা স্বীয় শুদ্ধতা প্রমাণের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।[১২৯] সীতা যে পবিত্রা তা প্রমাণের জন্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ রামের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সেইসঙ্গে উপস্থিত

---

১২৬. ৩।১৩২

১২৭. কহোড় এবং কহোল উভয় বানানই দৃষ্ট হয়।

১২৮. অহং পুত্রো বরুণস্যোত রাজ্ঞো
 ন মে ভয়ং বিদ্যতে মজ্জিতস্য।
 ইমং মুহূর্তং পিতরং দ্রক্ষ্যতেঽয়
 মষ্টাবক্রশ্চিরনষ্টং কহোড়ম্॥ ৩।১৩৪।৩১

১২৯. ৬।১১৮

হলেন দশরথ। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে দেখে অতিশয় আনন্দিত হলেন। তার পর নানা আনন্দসূচক বাক্যের সঙ্গে রামকে বললেন, কহোড় নামক ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ যেরূপ পুত্র অষ্টাবক্র থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন সেরূপ আমিও তোমার ন্যায় সুপুত্র থেকে উদ্ধার পেয়েছি।[১৩০]

উপাখ্যানটি মহাভারতে পূর্ণাঙ্গ। রামায়ণে এর উল্লেখ মাত্র দেখা যাচ্ছে। মনে হয় উপাখ্যানটি রামায়ণের পূর্বে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। উভয় মহাকাব্যেই প্রয়োজন অনুসারে স্থান পেয়েছে।

বুধ ও ইলার উপাখ্যান

রামায়ণে[১৩১] কর্দম প্রজাতির পুত্র ইল একদিন ভৃত্য ও সৈন্যগণ সঙ্গে মৃগয়ায় গমন করেন। পার্বত্য-নির্ঝরের নিকট ভগবান শঙ্কর স্ত্রী-রূপ ধারণ করে পার্বতীর সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হলে সেখানের সকল প্রাণীই স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। রাজা ইল মৃগয়ার নিমিত্ত ঐ প্রদেশে গমন করে সকল প্রাণীর সঙ্গে নিজেকেও স্ত্রী-রূপে দেখে দুঃখিত হন।[১৩২] তার পর কাজটি ভগবান শঙ্করের জেনে তাঁর শরণাপন্ন হন। মহাদেব পুরুষত্ব ভিন্ন অন্য বর দিতে রাজী হলে ইল তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে তিনি পার্বতীর শরণাপন্ন হন। পার্বতী মহাদেবের সম্মতি নিয়ে পার্থিত বরের অর্ধাংশ দান করতে স্বীকৃত হন। দেবীর নিকট এরূপ বিচিত্র বরদানের কথা শুনে ইল পর্যায়ক্রমে একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ হবার বর প্রার্থনা করেন। দেবী ইলের ইচ্ছায় সম্মত হন এবং বলেন যে তিনি যখন পুরুষ রূপে বিচরণ করবেন তখন স্ত্রীভাব স্মরণ থাকবে না, আবার স্ত্রীরূপে থাকার সময় পুরুষের স্বভাব স্মরণে আসবে না। এইভাবে পার্বতীর বরে মহারাজ ইল এক মাস পুরুষ ও একমাস ইলা নাম্নী রমণীরূপে বাস করতে থাকেন। একদিন ইলা বনভূমির নিকটে একটি সরোবরে সোম-পুত্র তরুণ বুধকে দেখে বিস্মিতা

১৩০. তারিতোঽহং ত্বয়া পুত্র সুপুত্রেণ মহাত্মনা।
অষ্টাবক্রেণ ধর্মাত্মা কহোলো ব্রাহ্মণো যথা॥ ৬।১১৯।১৭
সামীক্ষিক সংস্করণেও শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। ৬।১০৭।১৬

১৩১. ৭।৮৭-৯০ অধ্যায়

১৩২. যত্র যত্র বনোদ্দেশে সত্ত্বাঃ পুরুষবাদিনঃ।
বৃক্ষাঃ পুরুষমানস্তে সর্বে স্ত্রীজনা ভবন্॥
যচ্চ কিংচন তৎ সর্বং নারীসংজ্ঞং বভূবহ ৭।৮৭।১৩-১৪ কখ
আত্মানং স্ত্রীকৃতং চৈব সানুগং রঘুনন্দন। ৭।৮৭।১৬ কখ

হন। বুধও ইলাকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ইলার সহচরীগণের কথায় তাঁকে অবিবাহিত জেনে আবর্তনীবিদ্যার দ্বারা ইলার সকল বৃত্তান্ত জানতে পারেন। ইলার সহচরীগণকে কিংপুরুষী হয়ে পর্বত-প্রদেশে বাস করার নির্দেশ দেন। তার পর বুধ ইলার সঙ্গে রমণ করতে থাকেন। একমাস পূর্ণ হলে সুন্দরী ইলা রাজা ইলে পরিণত হন এবং স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে বলেন। তখন রাজা ইল এক মাস স্ত্রী হয়ে বুধের সঙ্গে রমণ করতে থাকেন আর একমাস পুরুষ হয় ধর্মাচরণ করেন। এইভাবে নয় মাস অতীত হলে ইলা পুরূরবা নামক একটি পুত্র প্রসব করেন।[১৩৩] ইলা যে-সকল মাসে পুরুষে পরিণত হতেন বুধ সেই সেই মাসে ধর্মযুক্ত বাক্যদ্বারা রাজা ইলের মনোরঞ্জন করতেন। তার পর বুধের চেষ্টায় কর্দমের নির্দেশে মরু ও অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করে ভগবান শঙ্করকে সন্তুষ্ট করে ইল পুনরায় পুরুষে পরিণত হন।

মহাভারতে এই উপাখ্যানটি পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায় না। পুরূরবার জন্ম-কথার প্রসঙ্গে ইলা-বুধের কথা এসেছে।

আদিপর্বে বৈশম্পায়ন সাধারণ সৃষ্টি বর্ণনাকালে ইলা ও বুধের নাম উল্লেখ করে বলেন, ইলা থেকে পুরূরবা উৎপন্ন হয়েছিলেন। ইলা একই আধারে ছিলেন পুরূরবার পিতা আর মাতা।[১৩৪]

অনুশাসনপর্বে মানুষ যে-সকল ব্যক্তির নাম কীর্তন করলে পুণ্য লাভ করতে পারবে তা বলার সময় ইলা ও বুধের পুত্র পুরূরবার নাম এসেছে।[১৩৫]

অহল্যা উপাখ্যান

রামায়ণের আদিকাণ্ডে[১৩৬] রাম মিথিলার উপবনে পরিত্যক্ত অথচ সুন্দর একটি আশ্রম দেখে আশ্রমটি কার তা বিশ্বামিত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বামিত্র

১৩৩. ততঃ সা নবমে মাসি ইলা সোমসুতাৎ সুতম্।
জনয়ামাস সুশ্রোণী পুরুরবসমূর্জিতম্॥ ৭।৮৯।২৩

১৩৪. অন্যোন্যভেদাৎ তে সর্বে বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পুরূরবাস্ততো বিদ্বানিলায়াং সম্পদ্যত॥
সা বৈ তস্যাভবন্মাতা পিতা চৈবেতি নঃ শ্রুতম্।
ত্রয়োদশ সমুদ্রস্য দীপানশ্নন্ পূরূরবাঃ॥ ১।৭৫।১৮-১৯

১৩৫. মনোশ্চ বংশজ ইলা সুদ্যুম্নশ্চ ভবিষ্যতি।
বুধাৎ পূরূরবাশ্চাপি তস্মাদায়ুর্ভবিষ্যতি॥ ১৪৭।২৬ গঘ—২৭ কখ

১৩৬. ১।৪৮-৪৯

বললেন, পূর্বে এই আশ্রমে মহাতপস্বী গৌতম ও তাঁর পত্নী অহল্যা তপস্যা করতেন। একদিন গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র অহল্যার মর্যাদা হরণ করে পলায়ন কালে গৌতমের নজরে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে গৌতম অভিশাপ বলে ইন্দ্রকে কোষহীন করেন[১৩৭] আর অহল্যা এ অপকর্মের জন্য ভস্মশায়িনী হন।[১৩৮] পরে দেবগণের চেষ্টায় ইন্দ্র কোষযুক্ত ও রামের আগমনে গৌতম-পত্নী অহল্যা শাপমুক্ত হন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আরো একটি অহল্যা-উপাখ্যান পাওয়া যায়।[১৩৯] উপরোক্ত উপাখ্যানটি অপেক্ষা উত্তরকাণ্ডের উপাখ্যানটি আরও বিস্তৃততর এবং গৌণ ঘটনার সংযোজনের বিচারে কিছুটা স্বতন্ত্র।

একবার দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতের হাতে বন্দী হন। দেবগণ পরাজিত হন। স্বয়ং ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে বরদানে সন্তুষ্ট করে দেবরাজকে মুক্ত করেন। ইন্দ্র স্বীয় দুর্দশার কারণ জানতে চাইলে ব্রহ্মা ইন্দ্রের পূর্বকৃত পাপকর্ম স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলেন, পূর্বে আমি সকল প্রজাসৃষ্টির শেষে বিশিষ্ট একটি প্রজা সৃষ্টির জন্য অদ্ভুত রূপ-গুণসম্পন্না একটি নারী সৃষ্টি করে নাম দিলাম অহল্যা। এই অদ্ভুত রূপবতী অহল্যা কার পত্নী হতে পারে এ বিষয়ে চিন্তিত হলাম। তুমি আমার অনুমতি ছাড়াই অহল্যাকে স্বীয় পত্নীরূপে স্থির করলে। আমি মহামুনি গৌতমের নিকট অহল্যাকে গচ্ছিত রাখলাম। দীর্ঘকাল পরে গৌতম তাকে আমার নিকট প্রত্যার্পণ করলেন। মহামুনি গৌতমের ধৈর্য দেখে তাঁর হাতেই অহল্যাকে দান করলাম। গৌতমও অহল্যার সঙ্গে সুখে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু তোমার মন কামে পূর্ণ থাকার জন্য ক্রুদ্ধ হলে এবং মুনির আশ্রমে গমনপূর্বক অহল্যার প্রতি বলাৎকার প্রয়োগ করলে।

১৩৭. গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্।
দৃষ্ট্বা সুরপতিস্ত্রস্তো বিষন্নবদনোঽভবৎ॥
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেষধরং মুনিঃ
দুর্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্ বচনমব্রবীৎ।
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্মতে।
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি॥
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সুরোষেণ মহাত্মনা।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ॥ ১।৪৮।২৫-২৮

১৩৮. বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥ ১।৪৮।৩০

১৩৯. ৭।৩০

অপকর্মে ব্যাপৃত অবস্থায় তুমি গৌতমের দৃষ্টিগোচর হলে। মহর্ষি তোমায় অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'হে দেবেন্দ্র, যেহেতু তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর প্রতি বলাৎকার প্রয়োগ করেছ সেহেতু তুমি যুদ্ধে শত্রুর হাতে বন্দী হবে।[১৪০] তোমার এই জারভাব মনুষ্যালোকমধ্যেও প্রবর্তিত হবে। শুধু তাই নয়, যে জারভাবে পাপাচারে লিপ্ত হবে তার উপর ঐ পাপের অর্ধভাগ এবং বাকি অর্ধভাগ তোমার উপর পতিত হবে যেহেতু তুমিই এর প্রবর্তক। দেবরাজ পদে কেহই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।[১৪১]

মহামুনি গৌতম নিজের পত্নীকেও স্বীয় রূপ-যৌবন থেকে ভ্রষ্ট ও অদৃশ্য হয়ে বাস করার অভিশাপ দিলেন।[১৪২] ইন্দ্র যেহেতু গৌতমের রূপ ধারণ পূর্বক অহল্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তাই অহল্যার অপরাধ স্বেচ্ছানুসারী নয়। অহল্যা গৌতমের নিকট এই সত্য প্রকাশ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করলে গৌতম বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশে এক মহাতেজস্বী বীরের আবির্ভাব হবে। তিনি স্বয়ং বিষ্ণু। তিনি সংসারে রাম নামে পরিচিত হবেন। তুমি তাঁর দর্শনে পবিত্র হবে ও পুনরায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে।[১৪৩]

উপাখ্যানটি শেষ করে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন, মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে তোমার এই সংকট উপস্থিত। অতএব তুমি যে পাপ করেছ তা স্মরণ করো।

মহাভারতে এ উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ দেখা যায় না। তবে এটির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

একদা নহুষ শচীদেবীকে পত্নীরূপে পেতে চাইলে দেবগণ তাঁকে ধর্মানুসারে

১৪০. যস্মান্মে ধর্ষিতা পত্নী ত্বয়া বাসব নির্ভয়াৎ।
তস্মাত্ত্বং সমরে শক্র শত্রুহস্তং গমিষ্যসি॥ ৭।৩০।৩২

১৪১. যশ্চ যশ্চ সুরেন্দ্রঃ স্যাদ্ ধ্রুবঃ স ন ভবিষ্যতি। ৭।৩০।৩৫ ক.খ.

১৪২. তাং তু ভার্যাং সুনির্ভৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
দুর্বিনীতে বিনিধ্বংস মমাশ্রমসমীপতঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাত্ত্বমনবস্থিতা। ৭।৩০।৩৬-৩৭ ক.খ.

১৪৩. উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ॥
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপযাস্যতি।
ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ॥
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।
স হি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্॥
তস্যাতিথ্যঞ্চ কৃত্বা বৈ মৎসমীপং গমিষ্যসি।
বৎস্যসি ত্বং ময়া সার্ধং তদা হি বরবর্ণিনি॥ ৭।৩০।৪১ গঘ—৪৪

প্রজাপালনে মনোনিবেশ করতে বলেন। কারণ শচীদেবী ইন্দ্রের ধর্মপত্নী, সুতরাং পরস্ত্রীতে অভিলাষ করা তার উচিত নয়। এ কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে নহুষ বলেন— পূর্বে পুরন্দর যখন অহল্যার সতীত্ব নাশ প্রভৃতি দুষ্কর্ম করেন তখন তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয় নি কেন?[১৪৪]

আবার মহাভারতের শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট ব্রাহ্মণগণের মহিমা কীর্তন করার সময় বলেন— ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি আশ্চর্য। দেখো, দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সতীত্বনাশ করেছিলেন বলে গৌতমের শাপে তাঁর মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুজালে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি কৌশিকের অভিশাপে তাঁর অণ্ডকোষ নিপতিত এবং শেষে মেষের অণ্ডকোষ দ্বারা তাঁর অণ্ডকোষ নির্মিত হয়।[১৪৫]

রামায়ণের বালকাণ্ডের অহল্যা উপাখ্যানটিতেও ইন্দ্রের কোষহীন হবার কথা আছে। এবং পরে দেবগণের চেষ্টায় মেষের কোষ সংযুক্তির মাধ্যমে ইন্দ্রের পরিত্রাণের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।[১৪৬] কিন্তু মহাভারতের উপরোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথিত উপাখ্যানাংশে কৌশিক-কর্তৃক ইন্দ্রের কোষ নিপতিত হবার কথা রয়েছে। আর গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুজালে পরিপূর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

শুধুমাত্র রামায়ণ-মহাভারতেই নয় বৈদিক সাহিত্যেও কোথাও অহল্যার উপাখ্যান কোথাও বা অহল্যার নাম দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং জৈমিনীয়[১৪৭]

১৪৪. অহল্যা ধর্ষিতা পূর্বমৃষিপত্নী যশস্বিনী।
জীবতো ভর্তুরিন্দ্রেণ স বঃ কিং ন নিবারিতঃ॥ ৫।১২।৬

১৪৫. অহল্যাধর্ষণনিমিত্তং হি গৌতমাদ্ধরিশ্মশ্রুতামিন্দ্রঃ
প্রাপ্তঃ কৌশিকনিমিত্তং চেন্দ্রো মুষ্কবিয়োগং
মেষবৃষণত্বং চাবাপ॥ ১২।৩৪২।২৩

১৪৬. অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।
মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছত॥
অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাংতুষ্টিং প্রদাস্যতি।
ভবতাং হর্ষণার্থং চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ।
অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং যূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্॥
অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবেশয়ন্॥ ১।৪৯।৬-৮

১৪৭. ইন্দ্রাগচ্ছেতি। ইন্দ্রো বৈ যজ্ঞস্য দেবতা তস্মাদহেন্দ্রাগচ্ছেতি হরিব আগচ্ছমেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে। গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জারেতি তদ্যান্যেবাস্য চরণানি তৈরেবৈনমেতৎপ্রমুমোদয়িষতি॥ শ.প.ব্রাঃ ৩।৩।৪।১৮
জৈ.ব্রা. ২।৭৯

ব্রাহ্মণে অহল্যা উপাখ্যান আছে। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণেও অহল্যার কথা আছে।[১৪৮] তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও ইন্দ্র অহল্যার উপপতি বলে বর্ণিত হয়েছেন।[১৪৯]

বৈদিক সাহিত্যের সীমানা পেরিয়ে অহল্যা উপাখ্যানটি নানা পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভাগবত,[১৫০] হরিবংশ,[১৫১] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,[১৫২] বামন পুরাণ,[১৫৩] অগ্নিপুরাণ,[১৫৪] মৎস্য পুরাণ,[১৫৫] ও ব্রহ্মপুরাণ[১৫৬] প্রভৃতিতে অহল্যার নাম দৃষ্ট হয়।

মধুকৈটভ বধ উপাখ্যান

রামায়ণে[১৫৭] রাম শত্রুঘ্নকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার পর দিব্যবাণ দান করে বললেন, হে শত্রুঘ্ন, তুমি এই বাণে লবণাসুরকে বধ করবে। দিব্যরূপধারী বিষ্ণু যখন মহাসাগরে শয়ান ছিলেন তখন তিনি দেবতা-অসুর এবং সকল প্রাণীরই অদৃশ্য ছিলেন। সেই সময়ই ভগবান নারায়ণ রাগান্বিত হয়ে দুরাত্মা মধু ও কৈটভকে বিনাশ এবং সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করার জন্যই এই দিব্য শর সৃষ্টি করেন। ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোক সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে মধু ও কৈটভের সঙ্গে সমস্ত রাক্ষসেরা তাঁর বিঘ্নোৎপাদন করতে থাকে। তখন তিনি এই বাণ-দ্বারাই যুদ্ধে মধু ও কৈটভকে বিনাশ করেন।

মহাভারতের বনপর্বে[১৫৮] মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে মধুকৈটভ উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।

একদা সমস্ত জগৎ জলমগ্ন হলে ভগবান বিষ্ণু জলমধ্যে অনন্ত নাগের ফণায় নিদ্রিত হলেন। নিদ্রাচ্ছন্ন বিষ্ণুর নাভিদেশ থেকে সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন একটি পদ্মের আবির্ভাব হল। সহসা সেই পদ্ম হতে চারটি বেদ, চারটি মূর্তি ও চতুর্মুখ পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন।

১৪৮. ষড়.বিং.ব্রাঃ ১।১,
১৪৯. 'ইন্দ্র অহল্যায়ৈ জার'— তৈত্তি.আঃ ১।১২
১৫০. ৯।২১
১৫১. খি.হ.বং, হরিবংশ পর্ব ৩২
১৫২. কৃষ্ণ খণ্ড-৪৭
১৫৩. ৪।৫
১৫৪. ২৮৭ অধ্যায়
১৫৫. ৫০ অধ্যায়
১৫৬. ৮৭ অধ্যায়
১৫৭. ৭।৬৩
১৫৮ ২০৩।৯-৩৫

ব্রহ্মার জন্মগ্রহণের পর পরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় কিরীট কৌস্তভধারী দেদীপ্যমান ভগবান বিষ্ণুকে দেখে বিস্মিত হয় এবং পদ্মস্থিত পিতামহকে ভয় দেখাতে থাকে। পিতামহ ব্রহ্মা দানবদ্বয়ের ভয়ে ভীত হয়ে বিষ্ণুর নাভিস্থিত পদ্মের নাল কম্পিত করতে থাকলে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

নিদ্রাভঙ্গের পর বিষ্ণু দানবদ্বয়কে বর প্রদানে আগ্রহী হলে দানবদ্বয়ই বিষ্ণুকে বর গ্রহণ করতে বলে। বিষ্ণু দানবদ্বয়ের প্রস্তাব শুনে বলেন, 'তোমরা অসামান্য বীর্য্য সম্পন্ন, তোমাদের ন্যায় পৌরুষ অন্যের নেই। অতএব আমি যেন তোমাদের নিধন করতে পারি এই বর প্রদান করো। লোকহিতার্থেই আমার এই বর প্রার্থনা।'[১৫৯]

বিষ্ণুর বাক্য শুনে দানবদ্বয় বলে, হে পুরুষোত্তম। আমরা সত্য, ধর্ম, তপস্যা প্রভৃতি গুণে সর্বদাই নিরত। পূর্বে আমরা স্বেচ্ছাচারকালেও মিথ্যা ভাষণ করি নি। পূর্বে আমরা তোমাকে বর দিয়েছিলাম যে, তুমি আমাদিগকে অনাবৃতস্থানে বধ করবে এবং আমরা তোমার পুত্র হব। এখন তুমি সেইমতো কাজ করো আর আমাদের প্রতিজ্ঞার যেন অন্যথা না হয়। ভগবান বিষ্ণু এই কথা শোনা মাত্র আকাশ ও পৃথিবী কোথাও অনাবৃত্ত স্থান না পেয়ে স্বীয় অনাবৃত ঊরুদেশে চক্রদ্বারা মধু-কৈটভের শিরশ্ছেদ করলেন।[১৬০]

মহাভারতের শান্তিপর্বে[১৬১] পিতামহ ভীষ্ম পুরুষপ্রধান কৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে মধু-কৈটভ উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।

সর্বব্যাপী নারায়ণ আকাশ বায়ু তেজ, পৃথিবী ও জল এই পঞ্চভূতের সৃষ্টি করে স্বয়ং জলের উপর শয়ন করলেন।

পরে তিনি মনের সঙ্গে অহংকারের সৃষ্টি করলেন যার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ হতে লাগল। আরো পরে সেই পুরুষপ্রধানের নাভিদেশ থেকে সূর্যের ন্যায় একটি পদ্মের উদ্ভব হল। ক্রমশ সেই পদ্ম থেকে পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন। তার পর তমোগুণসম্পন্ন মধুনামে এক অসুর জন্মগ্রহণ করে পিতামহ ব্রহ্মার উপর অত্যাচার আরম্ভ করল। তখন ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার উপকারার্থে মধুকে নিহত করলেন। মধুকে বধ করার জন্য তাঁর নাম হল মধুসূদন।

---

১৫৯. বধ্যত্বমুপগচ্ছেতাং মম সত্যপরাক্রমৌ।
এতদিচ্ছাম্যহং কামং প্রাপ্তুং লোক হিতায় বৈ॥ ২০৩।২৭

১৬০. মধুকৈটভয়ো রাজন্ শিরসী মধুসূদনঃ।
চক্রেণ শিতধারেণ ন্যকৃন্তত মহাযশাঃ॥ ২০৩।৩৫

১৬১ ২০৭ অধ্যায়

শান্তিপর্বে[১৬২] আরো একটি মধু-কৈটভ উপাখ্যান পাওয়া যায়।

একদা ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রার সাহায্যে সলিলের উপর শয়ন করে জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তিত হলেন। সেই সময় তাঁর নাভিপদ্ম থেকে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মা যে পদ্মে উপবেশন করেছিলেন সেই পদ্মের পত্রে নারায়ণ-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত দুই বিন্দু জল ছিল। ঐ জলবিন্দুদ্বয়ের মধ্যে একটি মধুর ন্যায় দেখতে ছিল। সেই জলবিন্দুটি দেখে নারায়ণ বললেন, এই জলবিন্দু থেকে তমোগুণের আধার মধু নামক দৈত্য উৎপন্ন হোক। সঙ্গে সঙ্গে মধুদৈত্য আবির্ভূত হল। অপর জলবিন্দুটি অতিশয় কঠিন ছিল। সেটি থেকে নারায়ণের ইচ্ছানুসারে রজোগুণাবলম্বী কৈটভ নামক দৈত্য উৎপন্ন হল। নারায়ণ-সৃষ্ট দৈত্যদ্বয়ের বেদকর্তা ব্রহ্মার উপর ঈর্ষা হল। ঈর্ষান্বিত দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মার নিকট বেদ হরণপূর্বক রসাতলে উপস্থিত হল। ব্রহ্মা ব্যথিত হয়ে নারায়ণের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। তখন নারায়ণ বেদোদ্ধারের জন্য হয়গ্রীব মূর্তি ধারণ করে রসাতলে প্রবেশ করে উদাত্তাদি স্বর সহ সামগান আরম্ভ করলেন। দৈত্যদ্বয় সেই শব্দ শ্রবণ করা মাত্র ব্যগ্র হয়ে রসাতলে বেদ নিক্ষেপ করে শব্দানুসারে ধাবিত হল। নারায়ণ হয়গ্রীব মূর্তি ধারণপূর্বক বেদ সকল উদ্ধার করে ব্রহ্মার হাতে দিলেন এবং মহাসমুদ্রের ঈশান কোণে স্বীয় হয়গ্রীব মূর্তি স্থাপন করে পূর্বরূপ ধারণ পূর্বক নিদ্রিত হলেন। এদিকে দানবদ্বয় রসাতল থেকে উঠে নারায়ণকে নিদ্রামগ্ন দেখে ক্রোধান্বিত হল এবং 'এই শ্বেতবর্ণ পুরুষই রসাতল থেকে বেদ অপহরণ করেছে।' এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ করল। নারায়ণ জাগরিত হয়ে দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী অবলোকন করে উভয়ের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত হলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে দানবদ্বয়কে নিহত করলেন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বেও[১৬৩] মধু দৈত্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বাসুদেব ব্রহ্মাকে বিনাশ করতে উদ্যত স্বীয় কর্ণেন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন ভয়ংকর উগ্রবুদ্ধি-সম্পন্ন মধু নামক অসুরকে সংহার করেছিলেন। সেই হেতু দেব-দানব, মানব ও মহর্ষিগণ তাঁকে জনার্দন নামে অভিহিত করেন।

মহাভারতে উল্লিখিত উপরোক্ত বনপর্বে একটি ও শান্তিপর্বের দুটি পূর্ণাঙ্গ

---

১৬২. ৩৪৭ অধ্যায়

১৬৩. কর্ণস্রোতোদ্ভবং চাপি মধুং নাম মহাসুরম্॥
তমুগ্রমুগ্রকর্মাণমুগ্রাং বুদ্ধিং সমাস্থিতম্।
ব্রহ্মণোঽপচিতিং কুর্বঞ্ জঘান পুরুষোত্তমঃ॥
তস্য তাত বধাদেব দেবদানবমানবাঃ।
মধুসূদনমিত্যাহুঋষয়শ্চ জনার্দনম্॥ ৬৭।১৪ গদ্য - ১৬

উপাখ্যানের মধ্যে শেষের উপাখ্যানটিই বিস্তৃততম। রামায়ণে রাম-কথিত মধুকৈটভ উপাখ্যানে বিষ্ণুর মধু-কৈটভ বধের জন্য দিব্য শর সৃজন এবং সৃষ্ট শরের দ্বারা মধু-কৈটভ বধের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬৪] কিন্তু মহাভারতের বনপর্বের উপাখ্যানটিতে নারায়ণ চক্রদ্বারা মধু-কৈটভের শিরশ্ছেদ করেন।[১৬৫]

আবার মহাভারতের শান্তিপর্বের প্রথম (২০৭ অধ্যায়) উপাখ্যানটিতে রামায়ণের ন্যায় সংক্ষিপ্ত হলেও কৈটভের নাম উপাখ্যানে আসে নি। কৃষ্ণ-কর্তৃক মধু দৈত্য বধের কথাই বর্ণিত হয়েছে।[১৬৬]

শান্তিপর্বের দ্বিতীয় উপাখ্যানটিতে (৩৪৭ অধ্যায়) মধু-কৈটভের জন্ম থেকে আরম্ভ করে নিধন পর্যন্ত সুচারুরূপে বর্ণিত হলেও রামায়ণের ন্যায় বাণাঘাতে মধু-কৈটভের বধ বর্ণনা করা হয়নি।[১৬৭]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনাবসরে মধু-কৈটভ বধ বর্ণিত হয়েছে।[১৬৮] হরিবংশেও মধু-কৈটভ বধের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়।[১৬৯]

বলির উপাখ্যান

রামায়ণে[১৭০] বিশ্বামিত্র রামের উদ্দেশ্যে বলির উপাখ্যান বলেছেন।

সিদ্ধাশ্রম প্রসঙ্গে রামের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র বলেন, ভগবান বিষ্ণু যে সময় এখানে তপস্যায় রত ছিলেন সে সময় বিরোচনের পুত্র বলি ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণসহ সকল দেবতাকে পরাজিত করে ত্রিভুবন অধিকার করেন। তিনি সে সময় একটি যজ্ঞানুষ্ঠানও আরম্ভ করেন। ঐ যজ্ঞের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক থেকে আগত প্রার্থীদের বলি প্রার্থনা অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্য দান করতে থাকেন। বলির

---

১৬৪. সৃষ্টঃ শরোঽয়ং কাকুৎস্থ যদা শেতে মহার্ণবে।
স্বয়ম্ভূরজিতো দিব্যো যং নাপশ্যন্ সুরাসুরাঃ॥
...তৌ হত্বা জনভোগার্থে কৈটভং তু মধুং তথা।
অনেন শরমুখ্যেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ॥ ৭।৬৩। ২০, ২৩

১৬৫. ২০৩।৩৫

১৬৬. তমসা পূর্বজো যজ্ঞে মধুর্নাম মহাসুরঃ॥
তমুগ্রমুগ্রকর্মাণমুগ্রং কর্ম সমাস্থিতম্
ব্রহ্মণোপচিতিং কুর্বন্ জঘান পুরুষোত্তমঃ॥ ২০৭।১৪ গঘ, ১৫

১৬৭. অথ যুদ্ধং সমভবৎ তয়োর্নারায়ণস্য বৈ॥
রজস্তমোবিষ্টতনূ তাবুভৌ মধুকৈটভৌ।
ব্রাহ্মণোপচিতিং কুর্বন্ জঘান মধুসূদনঃ॥ ৩৪৭।৬৯ গঘ, ৭০

১৬৮. ৮১ অধ্যায়

১৬৯. ভবিষ্যপর্ব ১৩, অধ্যায়

১৭০. ১।২৯

এই যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সকল দেবগণ অগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে এই আশ্রমে এসে বিষ্ণুকে বলেন— ভগবন্, বিরোচনের পুত্র বলি একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত। এই যজ্ঞ সমাপ্ত হবার পূর্বেই আপনি আপনার আশ্রিত দেবগণের কাজ সম্পন্ন করুন। আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য মায়া আশ্রয়পূর্বক মানবত্ব গ্রহণ করুন। এই সময় মহাতেজস্বী কশ্যপ স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হয়ে অদিতি দেবীর সঙ্গে সহস্রবৎসর ব্যাপী ব্রত শেষ করে বরদাতা মধুসূদনের স্তব আরম্ভ করেন। ভগবান হরি কশ্যপের স্তবে প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলে কশ্যপ ভগবান হরিকে স্বীয় ঔরসজাত ও অদিতির গর্ভজাত পুত্ররূপে প্রার্থনা করেন। অনন্তর কশ্যপের ইচ্ছানুসারে বিষ্ণু অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং বামনরূপ ধারণ করে বলির নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনাপূর্বক ত্রিলোক আক্রমণে ইচ্ছুক হন। তার পর পৃথিবীসহ সমস্ত লোক গ্রহণ করে বলপূর্বক বলিকে বন্ধন করেন এবং মহাতেজস্বী বামন ত্রিভুবনকে ইন্দ্রের অধীনে এনে দেন।

মহাভারতের বনপর্বে[১৭১] রাজা জনমেজয়ের উদ্দেশ্যে বৈশম্পায়ন বলির উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।

ভগবান নারায়ণ সংসারের মঙ্গলার্থে কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্ম নেন। সহস্র বৎসর পর অদিতি নানা সুলক্ষণযুক্ত বামনাকার একটি পুত্রের জন্ম দেন। বৃহস্পতিসহ বামনদেব দানব-রাজ বলির যজ্ঞ দর্শনের জন্য যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। দৈত্যরাজ বলি অদ্ভুত বামনরূপ দর্শনে অভিভূত হয়ে বামন দেবকে তাঁর অভিলষিত বস্তু দান করতে আগ্রহী হন। বামনদেব দৈত্যরাজ বলির ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদপূর্বক ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ বলি সঙ্গে সঙ্গে প্রীত মনে বামনের মনস্কামনা পূরণ করেন। তখন বামনদেব দিব্যরূপ ধারণ করে তিন পদ দ্বারা দানবের কাছ থেকে ত্রিভুবন গ্রহণ করে দেবরাজ ইন্দ্রকে দান করেন।

উপরোক্ত রামায়ণের উপাখ্যানটির সঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানটির সামান্য কাহিনীগত পার্থক্য দেখা যায়।

রামায়ণের কাহিনীটিতে দেখা যায় কশ্যপ নারায়ণকে স্তবে সন্তুষ্ট করেন। কশ্যপের স্তুতিতে প্রীত হয়ে নারায়ণ বর দিতে চাইলে কশ্যপ নারায়ণকে নিজ পুত্ররূপে পেতে চান, নারায়ণ তাতে সম্মত হন।[১৭২] উপাখ্যানের এই পূর্বাংশটি মহাভারতে আসেনি।

১৭১. ২৭২ অধ্যায়

১৭২. বরং বরদ সুপ্রীতো দাতুমর্হসি সুব্রতে।
পুত্রত্বং গচ্ছ ভগবন্নদিত্যা মম চানঘ॥ ১।২৯।১৬

রামায়ণোক্ত উপাখ্যানটিতে বামনরূপী বিষ্ণু বলির নিকট পৃথিবী সহ তিনটি লোক বলপূর্বক গ্রহণ করে বলিকে বন্ধন করেন।[১৭৩]

মহাভারতীয় উপাখ্যানটিতে বামনরূপী বিষ্ণু বলির নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করলে বলি প্রীত হয়ে বামনকে তা দান করেন।[১৭৪]

মহাভারতের শান্তিপর্বে[১৭৫] পিতামহ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ধৈর্য-ধারণে সাফল্যের কথা বলার সময় 'বলি-ইন্দ্র' সংবাদ নামে একটি দীর্ঘ উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। উপাখ্যানটির প্রারম্ভে বলি ও বামনরূপী বিষ্ণুর কথা এসেছে।

পুরাকালে দেব ও দানবদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। এই সংগ্রামে অগণিত দেব ও দানবের প্রাণ সংহার হয়। শেষে দানবরাজ বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়। তার পর কিছুদিন অতিবাহিত হলে বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করে বলিকে বঞ্চনাপূর্বক ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য দান করেন।

এই উপাখ্যানটি ছাড়াও মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে বলির সঙ্গে দেবগণের বিশেষ করে ইন্দ্রের সংগ্রামের কথা পাওয়া যায়।[১৭৬]

হরিবংশেও বলির উপাখ্যান পাওয়া যায়।[১৭৭] বামন পুরাণ,[১৭৮] কূর্মপুরাণ,[১৭৯] স্কন্দপুরাণ,[১৮০] ভাগবৎ পুরাণ[১৮১] প্রভৃতিতে কোথাও বলির নাম কোথাও বলির উপাখ্যান উল্লিখিত হয়েছে।

---

১৭৩. অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত।
বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ॥
ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীম্।
আক্রম্য লোকাল্লোকার্থী সর্বলোকহিতে রতঃ॥ ১।২৯।১৯-২০

১৭৪. স্বস্তীত্যুক্ত্বা বলিং দেবঃ স্ময়মানোঽভ্যভাষত।
মেদিনীং দানবপতে দেহি মে বিক্রমত্রয়ম্।
বলির্দদৌ প্রসন্নাত্মা বিপ্রায়ামিততেজসে। ৩।২৭২।৬৭-৬৮ কখ

১৭৫. ২২৭ অধ্যায়

১৭৬. ২।৯।১২, ৩।১০২।২৩, ৩১৫।১৫, ৪।৫৮।৫৯, ৬৪।১২, ৫।১০।৭, ৩২।২৪, ১৩০।৫, ৭।২১।৪, ৯৪।৭৫, ১১৭।২, ১৩৬।৩৪, ১৪২।৮, ১৫৬।৩৩, ৮।৭৯।৮৭, ৮৭।৫, ৮৯।৫ ইত্যাদি।

১৭৭. ভবিষ্যপর্ব ৭১-৭৩ অধ্যায়

১৭৮. ২৩ অধ্যায়

১৭৯. পূ বিভাগ ১৬।১৩

১৮০. ৮।৬০,

১৮১. ৮ম স্কন্ধ ১১-২৩ অধ্যায়

মান্ধাতা ও লবণাসুর উপাখ্যান

রামায়ণে[১৮২] ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ চ্যবন শত্রুঘ্নের উদ্দেশ্যে বললেন,

প্রাচীনকালে যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী নিজের অধীনে এনে শেষে দেবলোক জয়ে উদ্‌গ্রীব হন। দেবরাজ ইন্দ্র মান্ধাতার মনোভাব বুঝে তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলেন, 'হে মান্ধাত, তুমি সমগ্র মনুষ্যলোকের রাজা হতে সক্ষম হওনি, সুতরাং দেবলোক জয়ের ইচ্ছা তোমার সাজে না।' দেবরাজের বাক্য শুনে মান্ধাতা বলেন, 'হে ইন্দ্র, মনুষ্যলোকে কে আমার শাসনে বশীভূত নয়?' দেবরাজ ইন্দ্র মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মধুবন নিবাসী লবণাসুর তোমার আজ্ঞা পালন করে না। ইন্দ্রের বাক্য শুনে অযোধ্যারাজ মান্ধাতা সৈন্য ও ভৃত্যগণসহ লবণাসুরকে বশীভূত করার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু মান্ধাতার প্রেরিত দূতকে লবণাসুর ভক্ষণ করে ফেলে। দূতের বিলম্ব দেখে মান্ধাতা চারিদিকে শরবর্ষণদ্বারা রাক্ষসকে পীড়িত করতে থাকেন। মান্ধাতার দ্বারা পীড়িত হয়ে লবণাসুর শেষে তাঁকে নিধনের জন্য শূল হানেন। লবণাসুর-নিক্ষিপ্ত শূল বাহনসহ মান্ধাতাকে নিহত করে লবণাসুরের নিকট ফিরে আসে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উপমন্যুর শিব-সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মান্ধাতা-লবণাসুরের কথা এসেছে।[১৮৩] শিবভক্ত উপমন্যু মহাদেবের হাতে একটি শূল দেখেছিলেন। এই শূলের শক্তি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'এই শূল পাশুপতের তুল্য অথবা পাশুপত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ভগবান মহাদেব ঐ লোকবিখ্যাত শূলের দ্বারা স্বর্গ মর্ত্য বিদীর্ণ সাগর শুষ্ক ও বিশ্ব সংসার ধ্বংস করতে পারেন। প্রাচীনকালে রাক্ষসকুলের মহাবীর লবণাসুর এই শূলের দ্বারা ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ত্রিলোকজয়ী যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাকে সসৈন্যে নিহত করেছিলেন।[১৮৪]

রামায়ণে চ্যবন-কথিত লবণাসুর উপাখ্যানটি মহাভারতের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ। শুধু তাই নয়, রামায়ণে লবণাসুরের পিতা মধুর রুদ্রের নিকট শূল লাভের বর্ণনাও পাওয়া যায়।[১৮৫]

উপাখ্যানটি রামায়ণ ও মহাভারত যুগের পূর্বেও সমাজে প্রচলিত ছিল।

---

১৮২. ৭।৬৭

১৮৩. ১৪ অধ্যায়

১৮৪. যৌবনাশ্বো হতো যেন মান্ধাতা সবলঃ পুরা।
চক্রবর্তী মহাতেজাস্ত্রিলোকবিজয়ী নৃপঃ॥
মহাবলো মহাবীর্যঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
করস্থেনৈব গোবিন্দ লবণস্যেহ রক্ষসঃ॥ ১৩।১৪।২৬৬-৬৭

১৮৫. ৭।৬১

প্রচলিত উপাখ্যানটি উভয় মহাকাব্যেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়।

এরূপ উভয় মহাকাব্য যুগের পূর্বে সমাজ জীবনে প্রচলিত বা লৌকিক জীবনে ব্যবহৃত অনেক উপাখ্যানই মহাকাব্যদ্বয়ে স্থান পেয়েছে। উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ উপাখ্যানগুলিকে যথাসম্ভব আলোচনা করা হল। কিন্তু পূর্ণ উপাখ্যান ছাড়াও একটি মহাকাব্যে কোনো উপাখ্যানের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা অপর মহাকাব্যে তার উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়। যেমন, মহাভারতে দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান ও তাঁর স্ত্রী সত্যবতীর পাতিব্রত্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[১৮৬] রামায়ণে রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য সীতাকে অযোধ্যায় রেখে বনগমন করতে চাইলে সীতা রামের সঙ্গিনী হতে চান। এ সময় তিনি রামের নিকট নিজেকে সাবিত্রীর ন্যায় স্বামী-অনুগামিনী বলে বর্ণনা করেন।[১৮৭]

মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট শরণাগত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করলে যে ধর্মলাভ হয় তা ব্যাখ্যা করার সময় 'ভার্গব-মুচুকুন্দ' সংবাদে উল্লিখিত কপোতী-ব্যাধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। এই বৃত্তান্তে এক কপোত-দম্পতি তাদের শরণাগত শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত নিষ্ঠুর ব্যাধকে নিজেদের মাংস দ্বারা কীভাবে অতিথি সৎকার করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৮৮]

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণ জ্যেষ্ঠ-কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে রামের পক্ষে যোগদান করতে এলে সুগ্রীব তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। শুধু তাই নয়, বিভীষণ রাবণের কোনো উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই রামের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। রাম বিভীষণের প্রতি সুগ্রীবের এই সন্দেহ নিরসন করার জন্য শত্রু হলেও বিভীষণ শরণাগত তাই তাকে আশ্রয় দেওয়া প্রয়োজন বলে ব্যাখ্যা করেন। এই সময় তিনি শরণাগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কপোত-দম্পতির প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেন যে, শুনেছি, কোনো সময়ে একজন ব্যাধ কপোতের আবাসভূত এক গাছের নীচে উপস্থিত হয়। কপোত সপত্নী কপোতীর অপহারক শত্রুকেও শরণার্থী ও শীতার্ত দেখে যথাসাধ্য সেবা করেছিল এমন-কি নিজের মাংস দান করে ব্যাধের ক্ষুধা নিবারণ করেছিল।[১৮৯]

---

১৮৬. ৩।২৯৩-৯৯ (পতিব্রতামাহাত্ম্য পর্ব)

১৮৭. দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্॥ ২।৩০।৬ (সা. সং ২।২৭।৬)

১৮৮. ১৪৩-১৪৯ অধ্যায়

১৮৯. শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রু শরণমাগতঃ।
অর্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ॥

রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই উপাখ্যানটিকে প্রাচীন ইতিহাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপাখ্যানটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় জনজীবনে প্রচলিত ছিল এরূপ বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে উভয় মহাকাব্যকারই প্রয়োজনবোধে এটি ব্যবহার করেছেন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে[১৯০] পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট শিবি-কপোত-শ্যেন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। রাজা শিবির সর্বজীবের প্রতি দয়ার কথা প্রসঙ্গে ভীষ্ম এই প্রাচীন ইতিহাস যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন।[১৯১]

পূর্বে একটি সুন্দর দর্শন কপোত এক শ্যেনপক্ষী-কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে দয়ালু শিবিরাজার কোলে আশ্রয় নেয়। রাজা শিবি ভয়ার্ত কপোতটিকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য এমন কি জীবন পর্যন্ত দান করবেন বলে কপোতের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। শেষে শ্যেনপক্ষী কপোতের সন্ধানে রাজার নিকট হাজির হয়ে নিজের শিকার ফেরত চান। ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষী খাদ্যের অভাবে অবসন্ন তাই তার ভক্ষ্য কপোত দান না করলে রাজার অধর্ম হবে এ কথা সে রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা শিবি কপোতের প্রাণ রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাই তিনি কপোতের সমপরিমাণ অন্য প্রাণীর মাংস শ্যেনপক্ষীকে দান করতে স্বীকৃত হন। শ্যেনপক্ষী রাজার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হলে তিনি কপোতের সমপরিমাণ স্বীয় দেহের মাংস শ্যেনপক্ষীকে দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তার পর তুলাদণ্ড স্থাপনপূর্বক কপোতকে একদিকে রেখে অপরদিকে নিজ দেহের মাংস কেটে তুলাদণ্ডে তুলতে থাকেন। কিন্তু রাজা পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় ও ঊরুদ্বয় থেকে সমস্ত মাংস কেটে তুলাদণ্ডে তুললেও তা কপোতের সমপরিমাণ হয় না। তখন নিরুপায় রাজা রক্তাক্ত দেহে স্বয়ং তুলাদণ্ডে আরোহণ করেন। রাজা তুলাদণ্ডে আরোহণ করামাত্র দেবগণ তাঁর দেহে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন, রাজা শিবিও বিমানে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করেন।

দেবাসুর যুদ্ধ

রামায়ণে[১৯২] দেবাসুর যুদ্ধে রাজা দশরথ আহত হলে রানী কৈকেয়ী তাঁকে সেবা- শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। দশরথ রানী কৈকেয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট

স হি তং প্রতিজগ্রাহ ভার্যাহর্তারমাগতম্।
কপোতো বানরশ্রেষ্ঠ কিং পুনর্মদ্বিধো জনঃ॥ ১৮।২৪-২৫

১৯০. ৩২ অধ্যায়

১৯১. ইদং শৃণু মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মপুত্র মহাযশঃ।
ইতিহাসং পুরাবৃত্তং শরণার্থং মহাফলম্॥ ১৩।৩২।৩

১৯২. ২।১২

হয়ে তাঁকে দুটি বর দিতে চান। রানী কৈকেয়ী বরদুটি যথাসময়ে নেবেন বলে মত প্রকাশ করলে রাজা রানীর প্রস্তাবে সম্মত হন। তার পর একদিন কৈকেয়ী দশরথের নিকট প্রথম বরে রামের চৌদ্দ বছর বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা করেন।[১৯৩] প্রিয় পুত্র রামের বনবাসের কথা শুনে রাজা দশরথ কাতর হয়ে কৈকেয়ীকে অন্য বর প্রার্থনা করতে বলেন। তখন কৈকেয়ী দশরথকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে অধর্ম এবং বংশের অন্যান্য পুণ্যশ্লোক প্রতিজ্ঞা- রক্ষাকারী রাজার নাম স্মরণ করিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গেই কৈকেয়ী রাজা দশরথকে বলেছেন— আপনি নিজ বংশীয় পূর্বতন রাজগণের কলঙ্ক ঘোষণা করেছেন কারণ বরদান করতে প্রতিশ্রুত হয়ে পরক্ষণে অন্য প্রকার বলছেন। শ্যেনপক্ষীর সঙ্গে কপোতের বিবাদ উপস্থিত হলে রাজা শৈব্য নিজ প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য স্বীয় মাংস দান করেছিলেন।[১৯৪]

এই প্রসঙ্গেই কৈকেয়ী ভূতলশায়ী দশরথকে আরো বলেছেন— সত্য পালন-রূপ কুলমর্যাদা পালন করা আপনার অবশ্যকর্তব্য। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সত্য পালনকেই পরম ধর্ম বলেন। আমি সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেই আপনাকে সত্য পালনরূপ ধর্মানুষ্ঠানে প্রেরণা দিচ্ছি। শিবি নামক নৃপতি প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ শরীর শ্যেনপক্ষীকে দান করে পরমগতি লাভ করেছিলেন।[১৯৫]

উপাখ্যানটি মহাভারতে পূর্ণাঙ্গ। উপযুক্ত পরিবেশে পিতামহ ভীষ্ম-কর্তৃক এটি কথিত হয়েছে। আবার রামায়ণে কৈকেয়ীর মুখে যথা সময়ে এই উপাখ্যানটির উল্লেখ দেখা যাচ্ছে।

মহাভারতে উপাখ্যানটিকে ইতিহাস রূপে গণ্য করা হয়েছে। রামায়ণের যুগেও শিবিরাজের এই দানের কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল বলা যেতে পারে।

১৯৩. নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।
ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্॥
এষ মে পরমঃ কামো দত্তমেব বরং বৃণে। ২।১১।২৬ গঘ- ২৭, ২৮ কখ

১৯৪. কিল্বিষং ত্বং নরেন্দ্রাণাং করিষ্যসি নরাধিপ।
যো দত্ত্বা বরমদ্যৈব পুনরন্যানি ভাষসে॥
শৈব্যঃ শ্যেন-কপোতীয়ে স্বমাংসং পক্ষিণে দদৌ। ২।১২।৪২-৪৩ কখ

১৯৫. আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্মং ধর্মবিদো জনাঃ।
সত্যমাশ্রিত্য চি ময়া ত্বং ধর্মং প্রতিচোদিতঃ
সংশ্রুত্য শৈব্যঃ শ্যেনায় স্বাং তনুং জগতীপতিঃ।
প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্॥ ২।১৪।৩-৪ (সা.সং ২।১২।৩-৪)

মহাভারতে 'গরুড়' উপাখ্যান কদ্রুর দ্বারা সপত্নী বিনতার দাসিত্বে নিয়োগ এবং বিনতার পুত্র গরুড়ের অমৃত হরণের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১৯৬]

রামায়ণে কৌশল্যা রামের বনগমনকালে মঙ্গল কামনা করে পুত্রের উদ্দেশ্যে বলেন, পূর্বে অমৃতের আহরণকারী গরুড়ের জন্য তাঁর জননী বিনতা যে মঙ্গল কামনা করেছিলেন সেই মঙ্গল তোমার হোক।[১৯৭]

অন্যত্র রাম সীতা ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যা ত্যাগ করলে দশরথ বিলাপ করতে করতে গৃহে প্রবেশ করলেন। সেই গৃহের বর্ণনাবসরে বলা হয়েছে, ঐ গৃহ রাম সীতা ও লক্ষ্মণশূন্য হয়ে অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। গরুড় সমস্ত সর্প হরণ করলে অগাধ মহাহ্রদের যেরূপ অবস্থা হয় গৃহটিরও সেরূপ অবস্থা হয়েছিল।[১৯৮]

আবার রাম-শূন্য অযোধ্যার করুণ অবস্থা বর্ণনাকালে ঐ উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে। গরুড়-কর্তৃক হ্রদ থেকে সর্পগণ উত্থিত হলে হ্রদের যেরূপ কোনো শোভা থাকে না রাম না থাকায় অযোধ্যার কোনো শোভা ছিল না।[১৯৯]

মহাভারতে উপাখ্যানটি পূর্ণাঙ্গ। রামায়ণে উল্লেখ মাত্র দেখা যায়। রামায়ণেই উপাখ্যানটিকে পূর্বের বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাই উপাখ্যানটি উভয় মহাকাব্য-যুগের পূর্ব থেকেই ভারতীয় জনজীবনে প্রচলিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। তৈত্তিরীয় সংহিতা[২০০] এবং শতপথ ব্রাহ্মণেও ইহার উল্লেখ আছে।[২০১]

রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি ভৃগুর পতিব্রতা পত্নী বা শুক্রাচার্যের জননী অসুরদের উপর পক্ষপাতের জন্য স্বর্গলোককে ইন্দ্রশূন্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বিনাশ করেন।

বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।
অনিন্দ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা। ১।২৫।২১

মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্মের মুখে এই উপাখ্যানটির প্রসঙ্গ এসেছে।

১৯৬. ১।২৮-৩৪ অধ্যায়

১৯৭. যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥ ২।২৫।৩৩

১৯৮. মহাহ্রদমিবাক্ষোভ্যং সুপর্ণেন হৃতোরগম্।
রামেণ রহিতং বেশ্ম বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ। ২।৪২।২৫

১৯৯. এষা রামেণ নগরী রহিতা নাতিশোভতে।
আপগা গরুড়েনেব হ্রদাদুদ্ধৃতপন্নগা॥ ২।৪৭।১৭

২০০ তৈ. সং —৬।১

২০১. শ. ব্রাঃ —৩।৬।২

ভৃগুবংশসম্ভূত মহামুনি শুক্রাচার্য বিষ্ণুর অবতার পরশুরামের মাতৃবধের জন্য দেবগণের প্রতি রোষান্বিত হয়েছিলেন।

এষ ভার্গবদায়াদো মুনির্মান্যো দৃঢ়ব্রতঃ।
সুরাণাং বিপ্রিয়করো নিমিত্তে কারণাত্মকে॥ ২৮৯।৭

এই অধ্যায়ে রামায়ণ এবং মহাভারতে প্রায় সমানভাবে বিবৃত ২২টি উপাখ্যানের উল্লেখ করা হল। এরূপ আরো অনেক উপাখ্যান দুই মহাকাব্যেই সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। মহাকাব্যদ্বয়ের মৌলিক ও গভীর সম্বন্ধ প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে এই উপাখ্যানগুলিও বিশেষ প্রমাণের কাজ করে। পূর্বে আমরা উভয়গ্রন্থে শ্লোকগত ও বস্তুগত সাম্যের উল্লেখ করেছি। এখানে উদাহরণগত সাম্য দেখানো হল।

পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য

বর্তমান অধ্যায়ে রামায়ণ-মহাভারতের পৌর্বাপর্য বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন গবেষক ও পণ্ডিতগণের বিতর্ক বহুদিনের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মতানুসারে মহাকাব্যদ্বয়ের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

রামায়ণ রামের সমসাময়িক এবং বাল্মীকির লেখা বলেই পরিচিত।* এবং মহাভারত মহর্ষি বেদব্যাসের লেখা ও যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলেই এদেশের লোকের ধারণা।

ত্রিভির্বর্ষৈরিদং পূর্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
অখিলং ভারতং চেদং চকার ভগবান্ মুনিঃ॥ ১৮।৫।৪৮

এই গ্রন্থদুটি অক্ষত অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছায় নি। পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন হাতে ভিন্ন ভিন্ন অংশ উভয় গ্রন্থে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই অবস্থায় কোন্‌টি মৌলিক আর কোন্‌টি পরবর্তীকালের রচনা তা নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। মূল গ্রন্থদুটিকে ইতিহাস বলা হয়েছে। সেহেতু অলৌকিক কোনো ঘটনা গ্রন্থদ্বয়ে না থাকারই কথা। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই নানা স্থলে অনেক অলৌকিক ঘটনার সন্ধান মেলে—যেমন, বর্তমান মহাভারতের বিবরণ অনুসারে শান্তনুর সহোদর ভ্রাতা বাহ্লীক তাঁরই বৃদ্ধ প্রপৌত্র অভিমন্যুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। লৌকিক দৃষ্টিতে এটি অসম্ভব। অবশ্য মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্যেও মানুষকে 'শতায়ু বৈ পুরুষ' বলা হয়েছে। ঐতরেয় উপনিষদের মহিদাস ঐতরেয় ১১৬ বছর বেঁচেছিলেন। কঠোপনিষদেও এরূপ কথা আছে। তবু বলা যায় রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত এ-জাতীয় দু-চারটি অসংগতি দেখে উভয় গ্রন্থকে অনৈতিহাসিক বলে সন্দেহ করা চলে না। কারণ এ কথা স্বীকার করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে উভয় গ্রন্থেই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বহু অনৈতিহাসিক ঘটনাও কালে কালে যুক্ত হয়েছে। এখন প্রশ্ন উভয় মহাকাব্যের মধ্যে কোন্‌টি পূর্ববর্তীকালের রচনা।

এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, অনেক স্বনামধন্য পণ্ডিতই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ে গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। এভাবে যাঁরা মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্বক নিরপক্ষে বিচারে প্রবৃত্ত হননি তাঁদের মধ্যে অনেকেই রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা অর্বাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে যাঁরা রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করেন তাঁদের যুক্তিও সর্বদা পূর্ণাঙ্গ বা গ্রন্থভিত্তিক নয়।

---

* আদিকাব্যমিদং চার্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্। রামা ৬।১২৮।১০৭ গ.ঘ

পাশ্চাত্য পণ্ডিত এম.ভিন্টারনিত্জ (M. Winternitz)-এর মতে মহাভারতের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর ধারণা এই সময়ের মধ্যে কোনো সময় রামায়ণ রচিত হয়।[১]

অধ্যাপক ওয়াশবার্ন হপকিনস্ (Hopkins) মহাভারতের রচনাকাল সম্পর্কে বলেন—For the Mahābhārata the time from 300 B.C. to 100 B.C. appears now to be the most probable date though excellent authorities extend the limits from 400 B.C. to A.D. 400.[২]

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যীশু খ্রিস্টের জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেই মহাভারত গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[৩]

পুণা থেকে প্রকাশিত মহাভারতের সামীক্ষিক সংস্করণে মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে উদ্ধৃতিটিও প্রণিধানযোগ্য।[৪]

বাল্মীকি রামায়ণ নামে আমাদের নিকট যে গ্রন্থ এসেছে তার রচনাকাল নির্দেশ করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ সালের মধ্যে।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বর্তমান মহাভারতের মধ্যে লুক্কায়িত জয় নামক ইতিহাস এক গ্রন্থকারের দ্বারা এককালে রচিত। অর্থাৎ ভারতযুদ্ধের সমসাময়িক বেদব্যাসের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে এটি লিখিত হওয়া সম্ভব। পরবর্তীকালে বিষয় যোজনা করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই সকল

১. Between the 4th century B.C. and 4th century A.D. the transformation of the epic Mahābhārata into our present compilation took place, probably gradually.—M Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol. I. Pt. II. p. 417.

২. *Epic Mythology*, p. 1.

৩. 'তবে ইহা স্থির যে খ্রীস্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্ত সংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল।'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র।

৪. 'We shall, therefore not be wrong in holding that the details of daily life as portrayed on Indian sculptures and statues belonging roughly to the period 300 B.C. to 150 B.C. in so far as they depict certain costumes, ornaments, etc. must have been those which had prevailed from very ancient times - say for about a thousand years previous to their depictment-times, which we may, without much contradiction, generally designate as the Epic or Mahābhārata period.' --A note on the illustrations in the first volume of the critical Edition of the Mahābhārata, Vol. I Part I P CXII. Bhawanrao Pandit Pratinidhi

অংশ সংযোজনের সময়কে মহাভারত রচনার কাল বলা চলে না। মহাভারতের প্রতিটি শাখাই যেমন আদিতে উদ্‌গত হয়নি তেমনি অধুনাপ্রাপ্ত রামায়ণের সকল অংশই যে মহর্ষি বাল্মীকির মৌলিক রচনা তাও বলা যায় না।

কিন্তু উভয় গ্রন্থের মৌলিক অংশদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীনতর কোনোটি এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অনেক পণ্ডিতের ধারণা মহাভারতের মূল কাহিনী রামায়ণ অপেক্ষাও প্রাচীন। আমাদের মনে হয় এই সিদ্ধান্ত কল্পনাপ্রসূত। মহাভারতের মূল কাহিনী যদি রামায়ণের মূল কাহিনী অপেক্ষা প্রাচীনতর হয় তবে সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্যের কোনো অংশে তার কোনো আখ্যানাংশ উদাহরণ-মুখেও উদ্ধৃত হল না কেন? মহাভারতের মতো প্রসিদ্ধ একটি কাহিনী কি রামায়ণকারের অজানা থাকা সম্ভব? আবার অধুনাপ্রাপ্ত মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত বিষয়ের আধারে বলা যেতে পারে যে মহাভারত রচনা আরম্ভ এবং সমাপ্তি এই সময়ের মধ্যবর্তী যুগে যদি রামায়ণ রচিত হয় তা হলেও বাল্মীকি নিশ্চয়ই রামায়ণের কোনো অংশে মহাভারতের নাম বা আখ্যানাংশ অথবা কথা-পুরুষের নাম উল্লেখ করতেন। যেমন বেদব্যাসের লেখনীতে রামায়ণের ঘটনা ও কথা-পুরুষ বার বার এসেছে।

অবশ্য এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে বলেন যে রামায়ণেও মহাভারতের অনেক বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। যেমন রামায়ণে 'বাসুদেব' শব্দের ব্যবহার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে অন্যতম উদাহরণ। কৃষ্ণ 'বাসুদেব' মহাভারত মহাকাব্যের প্রাণপুরুষ। এই শব্দটি রামায়ণে এসেছে।[৫] সুতরাং যেহেতু দেবকীপুত্র 'বাসুদেব' রামায়ণকার-কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছেন সেহেতু তাঁদের মতে রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তীকালের রচনা।

এখানে উল্লেখ্য যে সংস্কৃতসাহিত্যে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পৃথক্ পৃথক্ স্থলে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতি প্রত্যয়ের রূপভেদেও শব্দের অর্থভেদ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাই 'বাসুদেব' শব্দটি উভয় মহাকাব্যে কোন্ স্থলে কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। 'বসুদেব' শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'অণ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'বাসুদেব' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ বাসুদেবের জন্ম হয়। মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে—

> অনুগ্রহার্থং লোকানাং বিষ্ণুর্লোকনমস্কৃতঃ।
> বসুদেবাৎ তু দেবক্যাং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ ॥[৬]

৫ যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ॥ ১।৪০।২

৬ ১।৬৩।৯৯

যাঁরা রামায়ণকে মহাভারতের তুলনায় অর্বাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেন তাঁরা রামায়ণোক্ত 'বাসুদেব' শব্দ দ্বারা বসুদেবের পুত্রকেই কল্পনা করেন। আমাদের মনে হয় রামায়ণে বর্ণিত 'বাসুদেব' শব্দটি মহাভারতের বসুদেব-তনয়কে ইঙ্গিত করে না। এখানে 'বাসুদেব' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ অন্য।

বাসয়তি জগৎ চরাচরাত্মকম্ ইতি বাসুঃ। বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ। যিনি চরাচরাত্মক বিশ্বকে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন তিনিই 'বাসু'। এরূপ 'বাসু' শব্দের সঙ্গে 'দেব' শব্দের সমাস করে পরমাত্মবোধক 'বাসুদেব' শব্দটি নিষ্পন্ন হতে পারে।

আবার বসতীতি বসুঃ অর্থাৎ যাঁর নিবাস সর্বত্র এবং যিনি প্রতি বস্তুতে বাস করে সেই বস্তুসত্তাকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেন তিনিই 'বসুদেব'। এখন এই বসুদেব শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় যুক্ত করে 'বাসুদেব' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। মহাভারতে কথিত হয়েছে জগতের সকল বস্তুই তাঁর মধ্যে বসে করে বলে বা তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে 'বসু' এবং দেবগণেরও কারণ বলে দেব। অতএব তাঁর একটি নাম 'বাসুদেব'। আর তিনি সর্বব্যাপক বলে তাঁর নাম

বসনাৎ সর্বভূতানাং বসুত্বাদ্ দেবযোনিতঃ।
বাসুদেবস্ততো বেদ্যো বৃহত্ত্বাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে॥ ৫।৭০।৩

এইরূপ 'বাসুদেব' শব্দ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মেরই বাচক হয়। মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়েই বাসুদেবকে শাশ্বত সনাতন বলেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৭]

বরোদা থেকে প্রকাশিত রামায়ণের সামীক্ষিক সংস্করণের যুদ্ধকাণ্ডের একশো পাঁচ অধ্যায়ে উল্লিখিত তারকা চিহ্নিত কয়েকটি শ্লোকে রামকে সর্বভূতের নিবাসকারী আদিদেব বা বাসুদেব রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮] এই বর্ণনা দেখে

---

৭. ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ
স হি সত্যমৃতং চৈব পবিত্রং পুণ্যমেব চ॥
শাশ্বতং ব্রহ্ম পরমং ধ্রুবং জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যস্য দিব্যানি কর্মাণি কথয়ন্তি মনীষিণঃ॥ ১।১।২৫৬-২৫৭
লোকান্সংহৃত্যকালে ত্বং নিবেশ্যাত্মনি নিশ্চলম্।
কুর্বন্নেকার্ণবং ঘোরং দৃশ্যাদৃশ্যেন বর্ত্মনা।
ত্বয়া সিংহবপুঃ কৃত্বা হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
সর্বভূতানিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে
নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ। পৃ ৭৭৯

বলা যায় যে সম্ভবত রামকে সর্বভূতের নিবাসকারী আদিদেব বা পরব্রহ্ম রূপে স্বীকৃতি রামায়ণের যুগেও দেওয়া হয়েছিল। এবং বাসুদেব শব্দের অর্থটিও এখানে সর্বভূতের নিবাস অর্থেও স্বীকৃত।[৮ক]

শুধুমাত্র রামায়ণেই নয় অন্যান্য অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও বাসুদেবকে পরব্রহ্মের প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয়ারণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণোপনিষদে 'বাসুদেব' নামের উল্লেখ দেখা যায়।[৯] অবশ্য এই অংশটি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা হয়। এটি বিষ্ণু গায়ত্রী নামে পরিচিত। এবং এখানে নারায়ণ, বাসুদেব ও বিষ্ণু অভিন্ন।

গীতাতেও বলা হয়েছে 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'[১০] অর্থাৎ বাসুদেবই সব-কিছু। ইহার দশম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

যশ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ১০।৩৯

হে অর্জুন, যা সর্বভূতের বীজস্বরূপ তাও আমি স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোনো বস্তু নেই যা আমা ব্যতীত সত্তাবান্ হতে পারে। সবই মদাত্মক। উক্ত অধ্যায়েই আবার তিনি বলেছেন

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥[১১]

ইহা দ্বারাও সর্বাত্মক পরব্রহ্মই বাসুদেব শব্দের অভিধেয় বলে বোধগম্য হয়। মহাভারতে বিভিন্ন স্থলে এই মতের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। সেখানে উল্লিখিত হয়েছে—

সর্বেষামাশ্রয়ো বিষ্ণুরৈশ্বরং বিধিমাস্থিতঃ।
সর্বভূতকৃতাবাসো বাসুদেবেতি চোচ্যতে॥[১২]

অন্যত্র

ছাদয়ামি জগদ্বিশ্বং ভূত্বা সূর্য ইবাংশুভিঃ।
সর্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোহ্যহম্॥[১৩]

মহাভারতের আনুশাসনিক পর্বের বিষ্ণু-সহস্র নামের শেষে লিখিত হয়েছে

বাসনাদ্ বাসুদেবস্য বাসিতং ভুবনত্রয়ম্।
সর্বভূতনিবাসোঽসি বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥

৮ক. হরিবংশ পুঃ ভবিষ্যপর্ব ৯০ অধ্যায় ২৭-২৮
৯. নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। — তৈত্তি.আ. ১০।১।৬
১০ ৭।১৯ ১১ ১০।৪১ ১২. ১২।৩৪৭।৯৪ ১৩. ১২।৩৪১।৪১

এবং

যং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা বৈ দ্বিজসত্তমাঃ।
স বাসুদেবো বিজ্ঞেয়পরমাত্মা সনাতনঃ॥[১৪]

মহাভারতের এই সকল শ্লোকে বাসুদেব সকল ভূতের আশ্রয়রূপেই বর্ণিত হয়েছেন। অনেক পুরাণেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—

সর্বানি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষু চ স সর্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ॥[১৫]

আবার

এতৎ সর্বমিদং বিশ্বং জগদেতশ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিশেষঃ শক্তিঃ সমন্বিতম্॥[১৬]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও উল্লিখিত হয়েছে—

বাসুঃ সর্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ॥[১৭]

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়,

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেব পরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥[১৮]

আবার—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্ বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥[১৯]

ইহার নবম স্কন্ধের অন্তর্গত খট্টাঙ্গচরিত নামক নবম অধ্যায়ে বাসুদেবকে পরব্রহ্মরূপেই দেখানো হয়েছে।

যত্তদ্ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্।
ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ॥[২০]

১৪. ৩৩৯।২৫ (কৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম সনাতন তা মহাভারতে কতবার উল্লিখিত হয়েছে তার একটি সূচী দিয়েছেন অধ্যাপক সুখময় সপ্ততীর্থ তাঁর 'মহাভারতের চরিতাবলী' গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠায়)

১৫. ৬।৫।৮০, ১৬. ৬।৭।৬০, এবং ১।২০।১২-৩ প্রভৃতি ১৭. ৮৭ অধ্যায়, ১৮. ১।২।২৮-২৯

১৯. শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১২।১১, ২০. ৯।৯।৫০

গোপালপূর্বতাপন্যুপনিষদেও দেখা যায়—

তত্তো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্।
যত্তৎপদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥[২১]

ব্রহ্মবিন্দূপনিষদেও দেখা যায়—

সর্বভূতাধিবাসং চ যদ্ ভূতেষু বসত্যপি।
সর্বনুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ॥[২২]

বৈয়াকরণগণও 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্' সূত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান্ বাসুদেবকে অর্হণীয় দেবতা পরব্রহ্মের রূপবিশেষ বলে স্বীকার করেছেন।[২৩] মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও মানুষ বাসুদেব ও ভগবান বাসুদেব এই দ্বিবিধ বাসুদেবের কথা বলেছেন।[২৪] এ বিষয়ে অধ্যাপক রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মন্তব্যটিও স্মরণীয় :

'the worship of Vāsudeva as a deified Ksatriya and also as the impersonal supreme being without caste or distinctive personal name had been widely prevalent in the Hindu society long before the ages of Panini and Gautama. the extensively reputed grammarian and the highly authoritative Dharmaśāstra writer respectively of the pre-Buddhistic times'.[২৫]

নবম শতকে ধ্বন্যালোককার রামায়ণে বর্ণিত 'বাসুদেব'কে মহাভারতের যাদববংশীয় বসুদেবের পুত্র থেকে স্বতন্ত্র বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[২৬]

রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে সগরের পুত্রগণ পৃথিবী খনন করতে করতে সনাতন বাসুদেব কপিলকে দেখতে পান। এই বাসুদেব এবং কপিল অভিন্ন।[২৭]

---

২১. ১।৮, ২২. ব্রঃ বি.উ. ৩।২২, ২৩. পাণিনি - ৪।৩।৯৮

২৪. কিমর্থং বাসুদেবশব্দাদ্বুন্ বিধীয়তে ন "গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞ্" (৪।৩।৯৯) ইত্যেব সিদ্ধম্? ন হ্যস্তি বিশেষো বাসুদেবশব্দাদ্বুনো বা বুঞো বা। তদেব রূপং স এব স্বরঃ। ইদং তর্হি প্রয়োজনং বাসুদবশব্দস্য পূর্বনিপাতং বক্ষ্যামীতি। অথ বা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংজ্ঞৈষা তত্র ভবতঃ॥' —৪।৩।৯৮

২৫. Vāsudeva worship as known to Pāṇini. - *Our Heritage.* Vol.XVIII. p 21

২৬. পাণ্ডবাদিচরিতবর্ণাস্যাপি বৈরাগ্যজননতাৎপর্যাদ্ বৈরাগ্যস্য চ ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন মুখ্যতয়া গীতাদিম্ প্রদর্শিতত্বাৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বমেব। পরম্পরয়া বাসুদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেন চাপরিমিতশক্ত্যাস্পদং পরং ব্রহ্ম গীতাদিপ্রদেশান্তরেষু তদভিধানত্বেন লব্ধপ্রসিদ্ধি মাথুরপ্রাদুর্ভাবানুকৃতসকলস্বরূপং বিবক্ষিতং ন তু মাথুরপ্রাদুর্ভাবাংশ এব, সনাতন শব্দবিশেষিতত্বাৎ; রামায়ণাদিষু চানয়া সংজ্ঞয়া ভগবন্মূর্ত্যন্তরে ব্যবহারদর্শনাৎ। আনন্দবর্ধন, ধ্বন্যালোক, ৪র্থ উদ্যোত্।

২৭. তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥ ১।৪০।২৫

বস্তুত সর্বব্যাপী সনাতন ব্রহ্মই বিদেহ থেকে দেহে আবির্ভূত হন। এই দেহধারণের নাম অবতীর্ণ হওয়া। তিনি উৎপন্ন হলেও অবিনশ্বর। সগুণরূপে তিনি দেহধারী আবার নির্গুণরূপে তিনি দেহাতীত। তিনি সনাতন। তিনি চিরকাল ছিলেন এবং থাকবেন। তাঁর দুটি রূপের একটি সনাতন বা সর্বনিবাস অর্থাৎ ক্ষেত্রে তিনি নিত্য। আবার যখন তিনি বিগ্রহবান্ তখন তিনি বসুদেবের পুত্র বাসুদেব। মহাভারতেই এটি ঘোষিত হয়েছে—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশে মানুষেষ্বাসীদ্বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥ ১।৬৭।১৫১

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—

নিত্যানিত্য প্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ॥
যঃ স্থূল সূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্বভূতো ন চ সর্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতোর্নমহস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥ ১।২০।১২-১৩

আমাদের মনে হয় রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের অনেক পূর্ব থেকেই 'বাসুদেব' আদিদেব ও সনাতন বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। মহাভারতে বসুদেবের পুত্ররূপে তাঁরই প্রাদুর্ভাব বলা চলে।[২৮]

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডেও এর ভবিষ্যদ্বাণী দেখা যায়।[২৯] সুতরাং রামায়ণে বর্ণিত 'বাসুদেব' শব্দকে অবলম্বন করে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের অর্বাচীনত্ব যাঁরা প্রমাণ করতে প্রয়াস করেন তাঁরা 'বাসুদেব' শব্দের পরমার্থ অর্থ গ্রহণ করলে উক্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারেন। কারণ রামায়ণে যে যে স্থলে 'বাসুদেব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সকল স্থানেই ঐ শব্দটির পরমাত্মপর অর্থই সংগত।

'বাসুদেব' শব্দের ন্যায় রামায়ণকার-কর্তৃক উদ্ধৃত অপর একটি শব্দ হল 'জনমেজয়'। অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বনগমনে অতিশয় কাতর রাজা দশরথ রানী কৌশল্যার নিকট স্বীয় জীবনের অভিশাপগ্রস্ত এক মর্মান্তিক অতীত ঘটনা বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় পাওয়া যায়— রাজা দশরথ একদা বর্ষাগমে ব্যায়ামের

২৮. 'বাসুদেবের উপাসকগণ সাত্বত নামে অভিহিত হইত।... ঐ সাত্বত-বিধির আশ্রয়ে সঙ্কর্ষণ ও বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা করেন। অপর কথায় বলিলে যাঁহার আগমন সাত্বতগণ বহুদিন পূর্ব হইতে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সঙ্কর্ষণ প্রচার করেন যে তিনি বস্তুত আসিয়াছেন— তিনি কৃষ্ণ বাসুদেবই। কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতে গিয়া ভীষ্ম উহাকে লক্ষ্য করিয়া দুর্যোধনকে বলেন, 'সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।' এইরূপে দেখা যায় ভগবান বাসুদেবের উপাসনা কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাচীন।'
—'ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩

২৯. উৎপস্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্তিবর্ধনঃ।
বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ॥ ৫৩।২০ গ.ঘ.-২১ ক.খ.

উদ্দেশ্যে ধনুক ও বাণসহ সরযূ নদীর তীরে গমন করেন। সেখানে সরযূর জলে কোনো এক মুনিপুত্রের কলসী-পূরণ শব্দকে হাতির জলপান ভ্রমে তাঁকে শব্দভেদী বাণ দ্বারা নিহত করেন। মুনিপুত্রের অন্ধ পিতামাতাকে দশরথ তাঁর এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কথা জানালে তাঁরা উভয়েই মৃত-পুত্রের নিকট যেতে আগ্রহী হন। তাঁদের ইচ্ছানুসারে দশরথ উভয়কেই পুত্রের নিকট নিয়ে এলে মুনি ও মুনিপত্নী মৃত পুত্রকে স্পর্শ করে নানা শুভবাক্যের মাধ্যমে তাঁর সদ্‌গতি কামনা করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গেই অন্ধমুনি আপন পুত্রের উদ্দেশে বলেন—

যাং গতি সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ।
নহুষো ধুন্ধুমারশ্চ প্রাপ্তাস্তাং গচ্ছ পুত্রক॥[৩০]

হে পুত্র! সগর, শিবিপুত্র, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ এবং ধুন্ধুমার যে লোক লাভ করেছেন তুমিও সেই লোক লাভ করো।

উদ্ধৃত শ্লোকটিতে 'জনমেজয়' শব্দটি দেখে অনেকে ইহাকে পাণ্ডববংশধর পরীক্ষিতের পুত্র বলে সিদ্ধান্ত করেন। তাঁদের ধারণা যেহেতু রামায়ণে অর্জুনের প্রপৌত্র 'জনমেজয়' উল্লিখিত হয়েছেন সেহেতু রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী। কারণ ভারতযুদ্ধের অনেক পরে জনমেজয়ের কাল।

এখানে রামায়ণে অন্ধমুনি-কর্তৃক উল্লিখিত এই জনমেজয়ই কি পরীক্ষিতের পুত্র? এই প্রশ্নের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

অন্ধমুনি কয়েকজন দানশীল পুণ্যবান্ রাজর্ষির সঙ্গে জনমেজয়ের নাম উল্লেখ করলেন।

মহাভারতেও বার বার কয়েকজন দানশীল ও পুণ্যশ্লোক প্রাচীন রাজর্ষির সঙ্গে জনমেজয়ের নানা পুণ্যকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শান্তিপর্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের নিকট সচ্চরিত্রের মহত্ত্ব বর্ণনাবসরে বলেছেন— তিনলোকে সাধুজনের অসাধ্য কিছুই নেই। মান্ধাতা একরাত্রি মধ্যে, জনমেজয় তিন দিনে এবং নাভাগ সাত রাত্রে পৃথিবী অধিকার করেছিলেন।[৩১]

ঐ পর্বেই শুকের উদ্দেশ্যে বেদব্যাসোক্ত প্রাচীন ইতিহাস পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়

---

৩০. ২।৫৮।৩৬ (সা. সং)

৩১. শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ॥
একরাত্রেণ মান্ধাতা ত্র্যহেণ জনমেজয়ঃ।
সপ্তরাত্রেণ নাভাগঃ পৃথিবীং প্রতিপেদিরে॥ ১২।১২৪।১৫-১৬

নৃপতিগণের দানের প্রশংসা করে বলেন—

অম্‌বরীষো গবাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতাপবান্।
অর্বুদানি দশৈকং চ সরাষ্ট্রোঽভ্যপতদ্ দিবম্॥
সাবিত্রী কুণ্ডলে দিব্যে শরীরং জনমেজয়ঃ।
ব্রাহ্মণার্থে পরিত্যজ্য জন্মতুর্লোকমুত্তমম্॥ ১২।২৩৪।২৩-২৪

অনুশাসনপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠ সংবাদে পুরুষাকারের প্রশংসাবসরে বলেছেন— মহারাজ জনমেজয় দেবরাজ ইন্দ্রকে পদাঘাতের উদ্যোগ ও ব্রাহ্মণপত্নীদের জীবন নাশ করেছিলেন এবং মহর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞানবশত বালক-হত্যা ও ব্রাহ্মণ-হত্যা পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবুও দৈব তাঁদের দণ্ডবিধান করতে সমর্থ হয়নি।[৩২]

এই পর্বেই যুধিষ্ঠিরের নিকট পিতামহ ভীষ্ম দানের ফল ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

সাবিত্রঃ কুণ্ডলং দিব্যং যানং চ জনমেজয়ঃ।
ব্রাহ্মণায় চ গা দত্ত্বা গতো লোকাননুত্তমান্॥[৩৩]

অর্থাৎ রাজা অম্বরীষ তেজস্বী ব্রাহ্মণকে রাজ্য দান করে স্বর্গলোক লাভ করেন। জনমেজয় ব্রাহ্মণকে দিব্য যান এবং কর্ণ ব্রাহ্মণকে কুণ্ডল দান করাতে উভয়েরই অতি উৎকৃষ্ট গতি হয়।

আবার আদিপর্বে জনমেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন পুরুবংশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আমরা অর্জুনের প্রপৌত্র ছাড়াও জনমেজয় নামে পুরুবংশের পূর্বতন পুরুষ প্রাচীনতর অন্য দু জন জনমেজয় যে ছিলেন তার পরিচয় পাই।

বৈশম্পায়ন বলেছেন কুরুর পাঁচ পুত্র—অবিক্ষিত, ভবিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয়।[৩৪] এই অবিক্ষিতের আবার আট সন্তান। তাঁদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁর নাম পরীক্ষিৎ। এই পরীক্ষিতের আবার সাতটি সন্তান। তাঁরা জনমেজয়,

৩২. শক্রস্যোদ্যম্য চরণং প্রস্থিতো জনমেজয়ঃ।
দ্বিজস্ত্রীণাং বধং কৃত্বা কিং দৈবেন ন বারিতঃ॥ ১৩।৬।৩৬

৩৩. ১৩।১৩৭।৯

৩৪. কুরুক্ষেত্রং স তপসা পুণ্য চক্রে মহাতপাঃ।
অশ্ববন্তমভিষ্যন্তং তথা চৈত্ররথং মুনিম্॥
জনমেজয়ং চ বিখ্যাতং পুত্রাংশ্চাস্যানুশুশ্রুম।
পঞ্চৈতান্ বাহিনী পুত্রান্ ব্যজায়ত মনস্বিনী॥ ১।৯৪।৫০-৫১

কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন নামে পরিচিত হন।[৩৫]

এ ছাড়াও মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে আমরা বার বার জনমেজয়ের নাম দেখতে পাই। তাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও কর্মের অধিকারী। সভাপর্বে ঋষি নারদ যমরাজের সুন্দর সভা বর্ণনাকালে প্রাচীন বহু খ্যাতিমান রাজার সঙ্গে প্রথমে জনমেজয় ও পরে জনমেজয় বংশের আশিজন রাজার কথা আমাদের শুনিয়েছেন।[৩৬]

উদ্যোগপর্বে ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের নিকট দুর্যোধনের দুষ্ট চরিত্রের উদাহরণ-স্বরূপ নীপ বংশীয় এক দুরাত্মা জনমেজয়ের নাম উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

দ্রোণপর্বে ও কর্ণপর্বে আমরা পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী পাঞ্চালবংশীয় জনমেজয়ের উল্লেখ পাই। তাঁকে বার বার বীর ও মহাত্মারূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৮]

শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্মের নিকট পাণ্ডব-প্রধান যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন— পিতামহ, পাপানুষ্ঠান করলে মানুষ কী উপায়ে মুক্তিলাভ করে?

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে পিতামহ ভীষ্ম 'ইন্দ্রোতপারীক্ষিত সংবাদ' নামে এক প্রাচীন ইতিহাস বলতে শুরু করলেন। ভীষ্মের কথিত ইতিহাসে মোহবশত পাপানুষ্ঠানকারী হলেন প্রাচীন পরীক্ষিত-পুত্র জনমেজয়।

এই ইন্দ্রোতপারীক্ষিত উপাখ্যানটি সুপ্রাচীন। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪।১) এবং তার অন্তিমভাগ বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৩।১) মিথিলার জনকরাজসভায় ব্রহ্মবিদ্‌বর্গের বিচার উপলক্ষে এই উপাখ্যানের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট লাহ্যায়নি ভুজ্যু প্রশ্ন করেছেন যে, পরীক্ষিতেরা কোন্

৩৫ এতেষামন্ববায়ে তু খ্যাতাস্তে কর্মজৈর্গুণৈঃ।
জনমেজয়াদয়ঃ সপ্ত তথৈবান্যে মহারথাঃ॥
পরিক্ষিতোঽভবন্ পুত্রাঃ সর্বে ধর্মার্থকোবিদাঃ।
কক্ষসেনোগ্রসেনৌ তু চিত্রসেনশ্চ বীর্যবান্॥
ইন্দ্রসেনঃ সুষেণশ্চ ভীমসেনশ্চ নামতঃ॥ ১।৯৪।৫৩-৫৫ ক.খ.

৩৬. রাজা বৈন্যো বারিসেনঃ পুরুজিজ্জনমেজয়ঃ।
ব্রহ্মদত্তস্ত্রিগর্তশ্চ রাজোপরিচরস্তথা॥ ২।৮।২০
ধৃতরাষ্ট্রাশ্চৈকশতমশীতির্জনমেজয়াঃ ২।৮।২৩ ক.খ.

৩৭. হৈহয়ানাং মুদাবর্তো নীপানাং জনমেজয়ঃ। ৫।৭৪।১৩ ক.খ

৩৮. ৭।১৫৮।৩৯, ১৬৭।২২, ১৮৪।৫, ৮।৪৮।২০, ৪৯।৩৫, ৭৩।১০৪, ৮২।১৬

গতিলাভ করেছেন এই প্রশ্ন তিনি গন্ধর্ব-গৃহীত গান্ধার দেশীয় কোনো বালিকাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেছেন, ঐ কন্যা অবশ্যই বলে থাকবেন যে অশ্বমেধযাজী পরীক্ষিৎ-পুত্রেরা উক্ত যজ্ঞের ফলে স্বর্গত হয়েছেন। বলাবাহুল্য উত্তর পেয়ে প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

এই প্রশ্ন নিয়ে নানা বিদ্বান বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সন্দেহ উপস্থিত করেছেন। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যক। এই সকল বিদ্বানদের অভিমত জনক- সভায় পরীক্ষিৎ পুত্রের নামোল্লেখের দ্বারা প্রমাণ হয় যে শ্রীকৃষ্ণ রামের পূর্বগামী অবতার। 'জনক' একটি রাজবংশের নাম। সে বংশে সকলেই ব্রহ্মবাদী হতেন। বিষ্ণুপুরাণ এই মতের সমর্থন করে। মহাভারতেও দশ-বারো জন জনকের বিবরণ আছে। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার অভিমন্যুর পৌত্র পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় কলিকালের রাজা। অশ্বমেধে তাঁর অধিকার শাস্ত্র স্বীকৃত নয়। রামের অধস্তন বংশধর বৃহদ্বল মহাভারত- যুদ্ধে অভিমন্যু-কর্তৃক নিহত হন। কাজেই উল্লিখিত জনক সীরধ্বজ জনক হতে অবশ্যই ভিন্ন হবেন। মহারাজ কুরুর সমসাময়িক পরীক্ষিৎ নামক রাজার এক পুত্রের নামও জনমেজয়। তিনি শৌনক ইন্দ্রোতের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। পিতামহ ভীষ্ম ইন্দ্রোতপারীক্ষিতীয় উপাখ্যানটিকে 'পুরাণমৃষিসংস্তুতম্' বলেছেন এ কথাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য।[৩৯]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রামায়ণে 'জনমেজয়' শব্দটিকে যাঁরা অর্জুনের প্রপৌত্ররূপে বর্ণনা করে রামায়ণের রচনাকাল মহাভারতযুদ্ধোত্তর কালে বলে স্থির করেন তাঁদের ধারণা কল্পনাপ্রসূত। মহাভারতে ইতস্তত যে একাধিক জনমেজয়ের পরিচয় আমরা পেলাম তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন যুগের ও বংশের।[৪০] রামায়ণে অন্ধমুনি পুত্রের সদ্‌গতি জনমেজয়ের ন্যায় হবার জন্য প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং এই 'জনমেজয়' মহাভারতোক্ত পুণ্যশ্লোক অপর কোনো জনমেজয় হওয়া সম্ভব। অথবা পুরুবংশীয় প্রাচীন রাজা পরীক্ষিতের পুত্র হতে পারেন। তাঁকে অর্জুনের প্রপৌত্র পরীক্ষিতের পুত্ররূপে বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় না। অনেকে আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৪১] উল্লিখিত জনমেজয়কে

৩৯. অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পুরাণমৃষিসংস্তুতম্।
ইন্দ্রোতঃ শৌনকো বিপ্র যদাহ জনমেজয়ম্॥ ১২।১৫০।২

৪০. বিষ্ণুপুরাণেও দুজন জনমেজয়ের কথা স্বীকার করা হয়েছে—
পরীক্ষিতো জনমেজয়-শ্রুতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ। ৪।২০।১

৪১. চতুর্থ পঞ্চিকা. ১৯ অধ্যায়,, খণ্ড ৫

অর্জুনের প্রপৌত্ররূপে কল্পনা করে মহাভারত-যুদ্ধকে ব্রাহ্মণের যুগে স্থান দিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও কোনো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত জনমেজয় ও যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে পিতামহ ভীষ্ম-বর্ণিত 'ইন্দ্রোতপারীক্ষিত সংবাদে' জনমেজয় এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। সুতরাং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বা রামায়ণে জনমেজয়ের উল্লেখ দেখে বাল্মীকি রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তীকালের রচনা এই সিদ্ধান্ত অপ্রামাণিক।

রামায়ণে উল্লিখিত অপর একটি বিতর্কিত শব্দ 'পাঞ্চজন্য'। মহর্ষি অগস্ত্যের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি ভগবান বিষ্ণু রাক্ষসবধের সময় 'পাঞ্চজন্য' নামক শঙ্খ বাজাতে থাকেন।

বিদ্রাব্য শরবর্ষেণ বর্ষং বায়ুরিবোত্থিতম্।
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং প্রদধ্মৌ পুরুষোত্তমঃ॥ ৭।৭।৯

এই শ্লোকে 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খের উল্লেখ দেখে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে মহাভারত-যুদ্ধের কর্ণধার বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহৃত 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ যেহেতু রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে সেহেতু রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা অর্বাচীন।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, 'পাঞ্চজন্য' একটি প্রসিদ্ধ শব্দ। বৈদিককাল থেকেই শব্দটির প্রচলন ছিল। পঞ্চজন সম্পর্কিত বস্তুকে 'পাঞ্চজন্য' নামে অভিহিত করা হয়। বিষ্ণু ভগবান এই 'পাঞ্চজন্য' নামক এক বিশেষ শঙ্খ ধারণ করেন। পরবর্তীকালে বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপ 'পাঞ্চজন্য' ব্যবহার করেছেন বলা যেতে পারে। সুতরাং মহাভারত যুদ্ধে বাসুদেব-ব্যবহৃত শঙ্খই যে রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন এরূপ সিদ্ধান্তও কষ্টকল্পনা মাত্র।

তা ছাড়া এক বিশেষ-জাতীয় শঙ্খকে বর্তমান কালেও 'পাঞ্চজন্য' বলা হয়। এ-জাতীয় শঙ্খ বিহারের দ্বারভাঙ্গাস্থিত চন্দ্রধারী সংগ্রহালয়ে সুরক্ষিত আছে। একটি শঙ্খের ভিতর অপর চারটি শঙ্খ তাতে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। সুতরাং পাঞ্চজন্য শঙ্খ বলতেই যাদব-বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহৃত শঙ্খ বোঝাবে এরূপ কল্পনা করার সংগত কারণ নেই।

কোন কোন গবেষক মহাভারতে বর্ণিত ভীম-কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান প্রভৃতি নৃশংসতা দেখে মহাভারতের কালকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেন। তাঁদের মতে যেহেতু রামায়ণে এই ধরনের নৃশংসতা উপস্থিত নেই সেহেতু রামায়ণের ঘটনা পরবর্তীকালের। কারণ এই ধরনের নৃশংসতা প্রাচীনত্বেরই পরিচায়ক।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য যে, নৃশংসতার বিচারে কালিক ব্যবধান স্থির করা যায় না। কিছুদিন পূর্বেও বাংলা দেশে শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর

পরিবারবর্গের উপর যে ঐতিহাসিক নৃশংসতা সংঘটিত হল তা মহাভারতে বর্ণিত নৃশংসতা অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। প্রবৃত্তির বশেই মানুষ কাজ করে। মানুষের প্রবৃত্তি সকল যুগেই এক। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা আত্মপ্রকাশ করে বলা যেতে পারে। এখানে আরো একটি কথা স্মরণীয় যে, রামায়ণের ভিতর সর্বদাই সূক্ষ্ম ধর্মবোধ ও নীতিবোধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সভ্যতা, স্নিগ্ধ, সরল, সুন্দর ও অনাবিল। রামায়ণের সভ্যতার তুলনায় মহাভারতের সভ্যতা অনেকক্ষেত্রে রাজসিক। তাই রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে নৃশংসতা এসেছে বেশি। তবে স্থানে স্থানে মহাভারতের সমাজ নৃশংসতা ও তার রাজসিক ভাবকে কাটিয়ে সাত্ত্বিকতায় উন্নীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের আচার-আচরণ ও বাগ্‌ব্যবহারের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

অনেক পণ্ডিতের মতে মূল রামায়ণের প্রধান চরিত্র রাম মানুষ। তাঁদের বক্তব্য দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত কোথাও তাঁকে অবতার বলে বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু আদি ও উত্তরকাণ্ডে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দেখা যায়। প্রধানত এই যুক্তির ভিত্তিতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হওয়ার পর বিষ্ণুর উপাসকগণ রামকে অবতারে পরিণত করে এই দুই কাণ্ড রামায়ণে যোগ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য রামের মত একজন আদর্শ পুরুষকে বিষ্ণুর অবতার রূপে অঙ্কিত করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার সাধন করা। আচার্য রামানুজের পরবর্তীকালে ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। সুতরাং এই অংশদুটি রামানুজের আবির্ভাবের পরে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে যোগ করা হয়ে থাকবে।

এই অভিমতের উত্তরে বলা যায় যে সম্পূর্ণ রামায়ণখানি ও তার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক পাঠ যদি আমরা যত্নের সঙ্গে আলোচনা করি তাহলে দেখব সমগ্র রামায়ণের শুধুমাত্র প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডেই নয়, অন্যান্য কাণ্ডেও রামের অনেক অসাধারণত্বের কথা ছাড়াও তাঁকে অবতাররূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে রামের অবতারত্ব-জ্ঞাপক সকল শ্লোকই রামায়ণের সকল সাম্প্রদায়িক পাঠে সমানভাবে দৃষ্ট হয় না। আমরা এখানে সামীক্ষিক সংস্করণে গৃহীত শ্লোকগুলি ছাড়াও তারকা চিহ্নিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করে দেখাব যে রামকে প্রথম ও সপ্তমকাণ্ড ছাড়াও অন্যান্যকাণ্ডেও অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

অযোধ্যাকাণ্ডে রামের জন্ম ও গুণ কীর্তনাবসরে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

> সর্ব এব তু তস্যেষ্টাশ্চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ।
> স্বশরীৰাদ্বিনিবৃত্তাশ্চত্বার ইব ৰাহবঃ।।

তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ॥
স হি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।
অর্থিতো মানুষে লোকে যজ্ঞে বিষ্ণু সনাতনঃ॥ ১।৯-১০

উদ্ধৃত তিনটি শ্লোকের মধ্যে তৃতীয় শ্লোকটি সামীক্ষিক সংস্করণে তারকা চিহ্নিত করে নীচে দেখানো হয়েছে।[৪২]

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আমরা বিলাপরতা অবস্থায় তারার মুখে শুনি—

সুগ্রীবস্য বশং প্রাপ্তো বিধিরেষ ভবত্যহো।
সুগ্রীব এব বিক্রান্তো বীর সাহসিকপ্রিয়॥ ২৩।৪

আর্যশাস্ত্র সংস্করণে শ্লোকটির অর্থ আছে—হে সাহসিকপ্রিয় বীর, রামরূপী বিধাতা সুগ্রীবের বশীভূত হইয়াছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের কী আছে। সুগ্রীবই অতিশয় পরাক্রমশালী তখন সুগ্রীবই রাজ্যে আসীন হইবে। উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রথম পাদটি সামীক্ষিক সংস্করণে তারকা চিহ্নিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়।[৪৩]

যুদ্ধকাণ্ডে রাবণের মাতামহ মাল্যবান্ রাক্ষসরাজ্যে নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখে রাবণকে রামের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য পরামর্শ দেন। রামের অসাধারণত্বের উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন— যিনি সমুদ্রের উপর অদ্ভুত সেতু নির্মাণে সমর্থ হয়েছেন তিনি সামান্য মানুষ নন। আমার মনে হয় স্বয়ং বিষ্ণুই মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং তুমি রামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করো।

বিষ্ণুং মন্যামহে রামং মানুষং দেহমাস্থিতম্।
ন হি মানুষমাত্রোঽসৌ রাঘবো দৃঢ়বিক্রমঃ॥
যেন বদ্ধঃ সমুদ্রস্য স সেতুঃ পরমাদ্ভুতঃ।
কুরুষ্ব নররাজেন সন্ধিং রামেণ রাবণ॥[৪৪] ৬।২৬।৩১-৩২

অন্যত্র রাম-কর্তৃক রাবণ নিহত হলে রাবণ-মহিষী মন্দোদরী বিলাপ করতে থাকেন। তাঁর এই বিলাপের ভাষায় রাম ও সীতা যে সামান্য মানুষ নন তা বার বার প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বিশেষ কয়েকটি শ্লোক উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে যেতে পারে।

ন চৈতৎকর্ম রামস্য শ্রদ্দধামি চমূমুখে।
সর্বতঃ সমুপেতস্য তব তেনাভিমর্শনম্॥

৪২. পৃ. ৫। (গীতা প্রেস সং ২।১।৫-৭)
৪৩. পৃ. ১৩৬।
৪৪. অন্যান্য সংস্করণে 'দেহমাস্থিতম্' এর স্থলে 'রূপমাস্থিতম্' পদ দেখা যায়।

ইন্দ্রিয়াণি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া।
স্মরদ্ভিরিব তদ্বৈরমিন্দ্রিয়ৈরেব নির্জিতঃ॥
অথবা রামরূপেণ বাসবঃ স্বয়মাগতঃ।
মায়াং তব বিনাশায় বিধায়াপ্রতিতর্কিতাম্॥[৪৫]
যদৈব হি জনস্থানে রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
খরস্তব হতো ভ্রাতা তদৈবাসৌ ন মানুষঃ॥ ৬।৯৯।৮-১১

রাবণপত্নী মন্দোদরীর মুখ-নিঃসৃত এই বাক্যগুলি দ্বারা রাম যে সামান্য মানুষ নন তা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। এ ছাড়া এই কাণ্ডেই তারকা চিহ্নিত অবস্থায় বেশ-কিছু সংখ্যক শ্লোকে রাম অবতার রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছেন। যেমন—

ব্যক্তমেষ মহাযোগী পরমাত্মা সনাতনঃ।
অনাদিমধ্যনিধনো মহতঃ পরমো মহান্।
তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
শ্রীবৎসবক্ষা নিত্যশ্রীরজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
মানুষং বপুরাস্থায় বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ। যুদ্ধকাণ্ড, পৃ. ৭৩১, ৩১১৪*

যুদ্ধকাণ্ডের অপর একটি স্থলে সীতা স্বীয় সতীত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। চতুর্দিকে বানর ও রাক্ষসগণ হাহাকার করে উঠল। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ রামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর নানা গুণের বর্ণনা করে সীতা যে পবিত্রা তা বোঝাতে লাগলেন। এই সময় দেবগণের দ্বারা ব্যবহৃত বাক্যে রামের অবতারত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সর্গে দেবগণের ব্যবহৃত বাক্য থেকে কয়েকটি শ্লোক উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দেবগণকে দেখে রাম করজোড়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলে তাঁরা রামের উদ্দেশ্যে বললেন—হে বীর, আপনি ভূতগণের আদিতে ও অবসানে বিরাজ করেন অতএব সব জেনেও এখন প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় বৈদেহীকে কেন উপেক্ষা করেছেন?

অন্তে চাদৌ চ লোকানাং দৃশ্যসে ত্বং পরন্তপ।
উপেক্ষসে চ বৈদেহীং মানুষঃ প্রাকৃতো যথা॥ ৬।১০৫।৮

এই বাক্য শুনে রাম দেবগণের উদ্দেশ্যে বললেন—আমি নিজেকে দশরথের পুত্র রাম নামক মানুষ বলেই অবগত আছি। অতএব আমার প্রকৃত পরিচয় আপনারা প্রকাশ করে বলুন।[৪৬] রামের এই বাক্য শুনে ব্রহ্মা বললেন—

৪৫. অন্যান্য সংস্করণে তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পাদে—'কৃতান্তঃ স্বয়মাগতঃ' এই পদ দৃষ্ট হয়।
৪৬. আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম্।
যোঽহং যস্য যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্ ব্রবীতু মে॥ ৬।১০৫।১০

ভবান্নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধো বিভুঃ।
একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যসপত্নজিৎ॥
অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং চ মধ্যে চান্তে চ রাঘব।
লোকানাং ত্বং পরো ধর্মো বিষ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ॥
শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥ ৬।১০৫।১২-১৪

এই শ্লোকগুলিতে রাম যে সামান্য মানুষ নয় তা স্পষ্ট।

এরূপ কয়েকটি বাক্যের পর ব্রহ্মা রামের উদ্দেশ্যে আবার বললেন, আপনিই পূর্বে ত্রিবিক্রমে ত্রিভুবনকে আক্রমণ করেছিলেন। দুর্ধর্ষ বালীকে বন্ধন করে ইন্দ্রকে দেবতাদের রাজা করেছিলেন। সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনিই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু।[৪৭]

এর পরেই আমরা দেখি দশরথ এসে রামের উদ্দেশ্যে বলছেন—

ইদানীং চ বিজানামি যথা সৌম্য সুরেশ্বরৈঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ বিহিতং পুরুষোত্তমম্॥ ৬।১০৭।১৭

লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বললেন—হে সুদর্শন, এই অরিন্দম্ রামই দেবগণের অন্তরাত্মাস্বরূপ পরম গুহ্য তত্ত্ব। ইনি বেদ-প্রতিপাদিত অব্যক্ত ও অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপ।

এতত্তদুক্তমব্যক্তমক্ষরং ব্রহ্মনির্মিতম্।
দেবানাং হৃদয়ং সৌম্য গুহ্যং রামঃ পরন্তপঃ॥ ৬।১০৭।৩১

ষষ্ঠকাণ্ডের শেষে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক পাঠে রামকে অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সামীক্ষিক সংস্করণে এই সাম্প্রদায়িক পাঠগুলি তারকা চিহ্নিত অবস্থায় দেখানো হয়েছে।[৪৮]

মহাভারতকারও রামকে অবতাররূপে স্বীকার করেছেন। বনপর্বে হনুমান ভীমের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

অথ দাশরথির্বীরো রামো নাম মহাবলঃ।
বিষ্ণুর্মানুষরূপেণ চচার বসুধাতলম্॥ ৩।১৪৭।৩১

---

৪৭. ত্বয়া লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাঃ পুরাণে বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ।
মহেন্দ্রশ্চ কৃতো রাজা বলিং বদ্ধা মহাসুরম্॥
সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্॥ ৬।১০৫।২৪-২৫

৪৮. এরূপ একটি শ্লোক—প্রীয়তে সততং রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
আদিদেবো মহাবাহুর্হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ পৃ. ৮৮০, ৩৭০৩* (১০)

এই পর্বেই লোমশমুনি যুধিষ্ঠিরকে রামতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে দাশরথি রাম ও পরশুরামের কথা বলেন। দাশরথি রাম কীভাবে পরশুরামের তেজ বিনষ্ট করেছিলেন লোমশমুনি তা এখানে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাতে রাম যে স্বয়ং বিষ্ণু, তাই ব্যক্ত হয়েছে।

বিষ্ণুঃ স্বেন শরীরেণ রাবণস্য বধায় বৈ।
পশ্যামস্তমযোধ্যায়াং জাতং দাশরথিং ততঃ॥ ৩।৯৯।৪১

লোমশ-কর্তৃক কথিত এই রাম-মাহাত্ম্যেই আবার দেখা যায়— পরশুরামকে হৃততেজা দেখে পিতৃগণ তাঁকে বললেন— হে বৎস, রাম স্বয়ং বিষ্ণু, তিনি ত্রিভুবনের পূজ্য ও মান্য। তাঁর নিকট বাতুলতা করা তোমার ঠিক হয়নি।

ন বৈ সম্যগিদং পুত্র বিষ্ণুমাসাদ্য বৈ কৃতম্।
স হি পূজ্যশ্চ মান্যশ্চ ত্রিষু লোকেষু সর্বদা॥ ৩।৯৯।৬৭

মহাভারতে বর্ণিত রামোপাখ্যানেও রামকে আমরা অবতার রূপে পাই।[৪৯] শান্তিপর্বেও অন্যান্য অবতারের সঙ্গে দাশরথি রামের উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণ-সাহিত্যেও রামকে অবতার রূপেই গণ্য করা হয়েছে।

পদ্মপুরাণে অগস্ত্য রামের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

ত্বং পুমান্ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কর্তা হর্তাবিতা সাক্ষান্নির্গুণঃ স্বেচ্ছয়া গুণী।[৫০]

রামরহস্যোপনিষদেও রামকে স্বয়ং ভগবান বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ১।৬

পদ্মপুরাণের ন্যায় অন্যান্য অনেক পুরাণে এই মতের সমর্থন মেলে।[৫১] যদিও সকল পুরাণই রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তী। তাই পুরাণের কথা-পুরুষদের দেবত্বে উন্নীত হওয়ার আভাস বেশি লক্ষিত হয়। আমরা মহাকাব্যে দেখি

অপর একটি শ্লোকে—ত্বয়া সংস্থাপিতো দেব বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ।
আত্মানং স্মর দেবেশ যদ্বৃত্তং তৎপুরাতনম্॥ পৃ. ৮০, ২৫৪*

৪৯. তদর্থমবতীর্ণোঽসৌ মন্নিয়োগাচ্চতুর্ভুজঃ।
বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স তৎ কর্ম করিষ্যতি॥ ৩।২৭৬।৫

৫০. পাতাল খণ্ড ৪।৯৯

৫১. হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব ৪১ অঃ. ১২২-১২৩ ; শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১০।১-২ ; ব্র.পু.- ১।৯।৩৫৮ ; অ.পু. ৫।৪

দেবতা অবতার হয়ে এসেছেন কিন্তু পরবর্তী পুরাণ-সাহিত্যে গ্রীক মহাকাব্যের ন্যায় দেবতারা স্বয়ং ভক্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভারতবর্ষের অন্যতম চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দও রামকে অবতার বলে স্বীকার করেছেন।[৫২] সুতরাং দেখা গেল আদি ও উত্তরকাণ্ডে যাঁরা রামকে বিষ্ণুর অবতার বলে রামায়ণকে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপ্রভাবে রচিত বলেন তাঁরা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর "রামায়ণ ও মহাভারত" প্রবন্ধে যজ্ঞে কৌশল্যার স্বহস্তে খড়্গের আঘাতে অশ্বের বলিদানকে প্রাচীন যজ্ঞপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করে রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা বহু প্রাচীন কালের বলে সিদ্ধান্ত নেন।[৫৩] এ কথাও এখানে উল্লেখ্য।

শ্রদ্ধেয় অমলেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ও মহাভারতে বর্ণিত শাম্বের মায়াযুদ্ধে রামায়ণের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন—'শাম্বের অদ্ভুত মায়াযুদ্ধের ভিতরে আমরা রামায়ণের স্পষ্ট ছায়া দেখতে পাই। মায়াযুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতা বধ করেছেন দেখে শ্রীরাম মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। তেমনি শাম্ব মায়া-বসুদেবকে বধ করেছেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।' (পৃ. ৫৫*)

অনেক পণ্ডিত মনে করেন রামায়ণ বুদ্ধ-পরবর্তী যুগের রচনা। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত একটি শ্লোককে ভিত্তি করে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। শ্লোকটি হল—

> যথা হি চৌরঃ (চোরঃ) স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
> তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ॥
> ১০৯।৩৪

---

৫২. 'ভগবান্ বার বার আবির্ভূত হন আমি শুধু এই কথাই প্রচার করি: রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে তিনি ভারতে এসেছেন আবার তিনি আসবেন।' —বাণী ও রচনা- ১০খ. পৃ. ২০৭।

৫৩. 'মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সহধর্ম্মিণীকে স্বহস্তে যজ্ঞের তুরঙ্গকে হত্যা করিতে হয় নাই। অথবা নিহত অশ্ব লইয়া এক রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয় নাই। ....বৃহদারণ্যক উপনিষদাদিতে যে সময়ের কথা বর্ণিত আছে সে সময়ে রমণীগণ পতিসেবার সঙ্গে সঙ্গে পতির হইয়া যজ্ঞীয় পশুবলী প্রভৃতি কার্য্য করিতেন ও যজ্ঞাদি কার্য্যে পতির সাহায্য করিতেন। রামায়ণ রচনার সময়ও ঠিক ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। মহাভারতের সময় পত্নী ত দূরের কথা, স্বয়ং কর্মকর্ত্তাই যজ্ঞীয় পশু নিহত করিতেন না। দ্বিজগণই কর্মীর হইয়া ঐ কার্য্য করিতেন। তখন স্ত্রী জাতি বৈদিক সন্ধ্যা বন্দনার অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন, কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় পতির সহধর্ম্মিণীরূপে পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিতেন। ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিতে কতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল? দুই চারি শত বৎসরে এই পরিবর্ত্তন সংঘটন সম্ভবপর নহে, এই অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও সপ্রমাণ হইতেছে যে, রামায়ণ রচনার বহুকাল পরেই মহাভারত রচিত হইয়াছে।'

উদ্ধৃত শ্লোকটিতে বুদ্ধের যেহেতু উল্লেখ দেখা যায় সেহেতু রামায়ণ শুদ্ধোদন-পুত্র তথাগত বুদ্ধের পরবর্তীকালে, ইহাই তাঁদের অভিমত।

কিন্তু উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত বুদ্ধই যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তথাগত বুদ্ধ হবেন এ-রকম সিদ্ধান্ত করা ভুল। বৌদ্ধমতে গৌতমের পূর্বে বহুকল্পে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে যে-কোনো তত্ত্বদর্শী পুরুষকে বুদ্ধ বা জ্ঞানী বলে অভিহিত করা হত। তাই রামায়ণে উল্লিখিত বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অপর কোনো তত্ত্বদর্শী প্রাচীন পুরুষ হবেন।[৫৪]

তা ছাড়া উপরোক্ত শ্লোকটি রামায়ণের সমস্ত পাঠে উপস্থিত না থাকায় সামীক্ষিক সংস্করণে এটি প্রক্ষিপ্ত বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, এ কথাও বিবেচনীয়। সুতরাং উপরোক্ত শ্লোকে উল্লিখিত 'বুদ্ধ' শব্দের উল্লেখ দেখে রামায়ণ বুদ্ধ প্রভাবে রচিত অথবা বুদ্ধ-পরবর্তীকালের বলে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে দশরথ জাতকের সঙ্গে রাম কাহিনীর মিল দেখে পণ্ডিত এম. ভিন্‌টারনিত্‌জ (M. Winternitz) অনুমান করেছেন যে রামায়ণের মূল কাহিনী দশরথ জাতক থেকে নেওয়া এবং রামায়ণ বৌদ্ধ জাতকের পরবর্তীকালের রচনা। আমাদের দেশীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতও এই মতের সমর্থক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ কল্পনা-ভিত্তিক। কারণ জাতকের উপাখ্যানগুলি বৌদ্ধ জনসাধারণের উপর দৃষ্টি দিয়ে লেখা। এ প্রসঙ্গে দশরথ জাতক, বিধুর পণ্ডিত জাতক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দশরথ জাতকের কাহিনীতে আছে— দশরথ বারাণসীর রাজা। তাঁর প্রধানা রানীর গর্ভে দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাম পণ্ডিত ও কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ এবং এক কন্যা সীতাদেবীর জন্ম হয়। প্রধানা রানীর মৃত্যু হলে দশরথ ষোলো হাজার রানীর মধ্যে একজনকে প্রধানা রানীর মর্যাদা দেন। তাঁর গর্ভে ভরতকুমারের জন্ম হয়। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে ভরতকে একটি বর দান করেন। পরে সাত বছর পরে ভরত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে চাইলে দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে বনে যাবার নির্দেশ দেন। বনে লক্ষ্মণ ও সীতার সংগৃহীত ফলমূলে রামপণ্ডিত জীবন ধারণ করতে থাকেন। দশরথের মৃত্যুর পর অমাত্যগণ ভরতের হাতে রাজ্যভার দিতে না চাইলে ভরত রামকে বন থেকে ফিরিয়ে আনতে কৃতসংকল্প হন। বনে রাম-সীতার অনুপস্থিতি রাম পণ্ডিতের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎ হয়। দশরথের মৃত্যু সংবাদে লক্ষ্মণ ও সীতা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন কিন্তু রামপণ্ডিত নির্বিকার। সংসারে নিরাসক্ত

---

৫৪. 'বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব; সম্ভবতঃ শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাহার পূর্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারা পরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'। পৃ. ৪৩

রামপণ্ডিত ভরতের সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণকে রাজ্যে ফিরে যাবার অনুমতি দেন। রামপণ্ডিতের তৃণনির্মিত পাদুকা সিংহাসনে রেখে অমাত্যগণের সাহায্যে ভরত রাজ্য শাসন করতে থাকেন। শেষে তিন বছর পর রাম বন থেকে ফিরে সীতাকে প্রধানা মহিষীর পদে অধিষ্ঠিত করে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ষোলো হাজার বছর রাজ্য পালন করে রামপণ্ডিত ইহলোক ত্যাগ করেন।[৫৫]

শুধুমাত্র বৌদ্ধজাতকে নয়, রামকথার একাধিক রূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক পাঠে তথা বহির্ভারতের নানা ভাষার রামায়ণে মেলে। অধ্যাপক প্রসাদকুমার মাইতি তাঁর 'রামকথার বিকাশের ধারা' গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। জাতকে বিধুর পণ্ডিতের কথাও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব নামক রাজার অমাত্য বিধুর। তিনি যে ধনঞ্জয়ের আত্মীয় নন, দাসীপুত্র, তাও বর্ণিত হয়েছে। রাজা ধনঞ্জয় ছিলেন দ্যূত-বিশারদ। নাগকন্যাকে বিবাহ করার জন্য বিধুরকে লাভ করার উদ্দেশ্যে পূর্ণক পাশা খেলায় রাজা ধনঞ্জয়কে পরাজিত করে বিধুরকে লাভ করেন। কিন্তু বিধুরের নীতি ও ধর্মবাক্যে মুগ্ধ হয়ে পূর্ণকের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। তিনি আবার রাজা ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে বিধুরকে প্রত্যর্পণ করেন।[৫৬]

উপরোক্ত দুটি উপাখ্যানকে রামায়ণ-মহাভারতের পটভূমিতে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় এগুলি কোথাও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কোথাও বা অজ্ঞান-প্রসূতভাবে প্রাচীনতর মূলকে বিকৃত করা হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতোক্ত অসংখ্য ব্যক্তির নামও জাতকে দৃষ্ট হয়।[৫৭] ধৃতরাষ্ট্র কখনো হস্তিনার রাজা কখনো আবার নাগরাজ। রামায়ণ-মহাভারতের কথা-পুরুষের নামেও জাতকের নামকরণ লক্ষিত হয়।[৫৮] পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত মহাসুতসোম জাতকে নরমাংসভোজী কল্মাষপাদের কথা আছে। নলিনিকা জাতকে ঋষ্যশৃঙ্গের কথা বর্তমান। রামায়ণ মহাভারতের সাক্ষাৎ উল্লেখ বিভিন্ন স্থলে লক্ষ্য করা যায়।[৫৯] কিন্তু এইসকল জাতকের উপাখ্যানে, এমন কি দশরথ জাতকের রামোপাখ্যানেও বাল্মীকি-রামায়ণের ন্যায় কাব্যগত বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। বিধুর পণ্ডিত এখানে বুদ্ধ-বচনের ব্যাখ্যাতা। শিখণ্ডী

৫৫. চতুর্থ খণ্ড

৫৬. ষষ্ঠ খণ্ড

৫৭. চতুর্থ খণ্ডে, বাসুদেব ৫৮, ৬৫, যুধিষ্ঠির ৮৬, ৮৭ দশরথ ৮৭, অণিমাণ্ডব্য-২১; পঞ্চম খণ্ডে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ১৬৩, যুধিষ্ঠির-২৬৭, সহদেব-২৬৭; ষষ্ঠ খণ্ডে, কৃষ্ণ-২৯২, বাসুদেব-২৯২, কার্তবীর্যার্জুন-১৪৫, অন্ধকমুনি-৬৯।

৫৮. প্রথম খণ্ডে, লক্ষ্মণজাতক, কৃষ্ণ জাতক, ভীমসেন জাতক; দ্বিতীয় খণ্ডে, নকুল জাতক, বানব জাতক প্রভৃতি।

৫৯ পঞ্চম খণ্ডে, রামায়ণ ১৬, ৮২, ১২৮; ষষ্ঠ খণ্ডে, মহাভারত ৪১, ৯৩, ২০৮

রাজা ধনঞ্জয়ের স্ত্রী, ধনঞ্জয় দ্যূতাসক্ত। এগুলি সবই বৌদ্ধজনসাধারণের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়া হয়েছে। যেমন জৈন দৃষ্টিতে শলাকাপুরুষ রাম হিংসা করতে পারেন না। তাই জৈন রামায়ণে লক্ষ্মণের হাতে রাবণবধ দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন দৃষ্টিতে দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঐকদেশিক। সার্বত্রিক নয়। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের যতটা তাঁদের উপযোগী ততটাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তার পর নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে সেগুলিকে পরিবর্তন করেছেন।[৬০] অনুকরণ সব সময় যে পূর্ণাঙ্গ হবে এ কথা বলা চলে না। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক শ্লোক জাতকে দেখা যায়। পাশা খেলোয়াড় ধনঞ্জয়ের উপর যুধিষ্ঠিরেরই ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। তা ছাড়া ভারতবর্ষে যদি কোনো প্রবহমান ঐতিহ্য থাকে তবে নিশ্চয়ই তা বৌদ্ধ নয় বৈদিক এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর বাল্মীকি সেই বেদভিত্তিক আর্য ঐতিহ্যেরই বাহক। রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত অধিকাংশ উপাখ্যানই রামায়ণ ও মহাভারত যুগ অপেক্ষা প্রাচীন এবং এই সকল উপাখ্যান তৎকালপ্রচলিত পুরাণ কথকথা থেকে সংগৃহীত। এগুলি বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করা হয়নি। জাতককারগণই রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ থেকে এই সকল বিষয় সংগ্রহ করেছেন। যেমন বাল্মীকীয় রামকথার ইতস্তত ছোট খাটো পরিবর্তন পরবর্তী পুরাণ সাহিত্যে হয়েছে ঠিকই কিন্তু অসাধারণ পরিবর্তন আমরা কোথাও দেখিনি। বৌদ্ধদের মধ্যে বোনদের বিবাহ করার রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল তাই দশরথ জাতকে তা বর্ণিত হয়েছে। এই প্রথা বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র। হিন্দুদের সমাজ-জীবনে এই রীতি প্রবেশ করেনি। হিন্দু সমাজ-জীবনে এই রীতির প্রচলন ছিল বলে অনেক পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে বৌদ্ধায়ন-ধর্মসূত্রের ৪র্থ খণ্ডের দ্বিতীয় প্রশ্নের অন্তর্গত দ্বিতীয় অধ্যায়ভুক্ত একাদশ সূত্রটির উদ্ধৃতি দেন। উক্ত সূত্রে আছে—

> মাতুল পিতৃস্বসা ভগিনী ভাগিনেয়ী স্নুষা
> মাতুলানী সখিবধূরিত্যগম্যাঃ।[৬১]

---

৬০. বিবিধ পুরাণে রাম-কথা আছে। যুগে যুগে বর্ণিত রামকাহিনীতে অনেক খুঁটিনাটি ও দরকারি অংশ বদলানো হয়। কাহিনীটির বিবর্তনের ধারা লক্ষ করলে অনেক তথ্য ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। বহু কাব্য ও নাটক রামায়ণকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। এ ছাড়া ভূশুণ্ডি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রভৃতি নানা রূপকের মাধ্যমেও রামকথা পরিবেশন করা হয়েছে। সংস্কৃত ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাতেও রামায়ণ লেখার কথা সুপ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ সাহিত্যের 'দশরথ জাতক' রামায়ণের একটা বৌদ্ধ সংস্করণ মাত্র।' —বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, পুস্তক সমালোচনা: 'ইতিহাসের রামায়ণ'; মানুষ সমাজ সংস্কৃতি ও আর্থিক জীবন। —আ.বা.প. ২৩।১২।৮৫

পরবর্তী সূত্রটি—

অগম্যানাং গমনে কচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ চান্দ্রায়ণমিতি প্রায়শ্চিত্তিঃ ॥[১১]

এখানে টীকাকার গোবিন্দস্বামীর বক্তব্য—'অমাতিপূর্বং গমন এতদ্ দ্রষ্টব্যম্। যে পুনর্মাতুলস্য দুহিতরং পিতৃষ্বসুশ্চ মন্ত্রেণ সংস্কৃত্য বন্ধুসমক্ষং তস্যামেব পুত্রানুৎপাদয়ন্তি চরন্তি চ ধর্মা তয়া সহ, তেষাং নিষ্কৃতিং দেবাঃ প্রষ্টব্যাঃ ॥'

অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত—অজ্ঞান পূর্বক যাঁরা অগম্যাগমনে প্রবৃত্ত হন তাঁদের নিষ্কৃতির উপায় কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র 'চন্দ্রায়ণ' প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানতঃ বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মাতুলের বা পিতৃষ্বসার কন্যাকে আত্মীয়স্বজনের সমক্ষে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বিবাহ করেন এবং তাঁদের গর্ভে সন্তানাদি উৎপাদন ও ধর্মাচরণ করেন, তাঁদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। 'তেষাং নিষ্কৃতিং দেবাঃ প্রষ্টব্যাঃ।' অর্থাৎ তাঁদের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। এই সিদ্ধান্তই টীকাকার গোবিন্দস্বামী প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, এই ধরনের বিবাহ দক্ষিণ ভারতের সামাজিক দৃষ্টিতে আপত্তিকরই

তাছাড়া আমাদের একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্রের নিয়মগুলি দক্ষিণভারতের সমাজজীবনেই প্রচলিত ছিল। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে সামাজিক রীতি-নীতি ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টি অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল।

রামায়ণ সামগ্রিক দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ-জীবনের চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

সঙ্গতকারণেই ইতিহাস হল ঘটনার প্রতিচ্ছবি। তাই যেটা সমাজে নেই তা ইতিহাসে আসবে না। সুতরাং বৌদ্ধ জাতকের রাম-কাহিনীই বাল্মীকি রামায়ণের উৎস এই মত সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং ভিত্তিহীন। যদি আগাগোড়া কল্পনা-দিয়েই বিষয়টি গড়া বলা হয় তবে কল্পনার ব্যোম-যানের সঙ্গে ইতিহাসের হাঁটা পথের তফাত কী রইল?

আমাদের মতে রামায়ণ মহাকাব্য যে শুধু বৌদ্ধ প্রভাবমুক্ত তাই নয়, এর প্রত্যেকটি কাণ্ডই মহাভারতের পূর্বকালীন।[৬১] এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যথাযথ গ্রন্থভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে।

---

৬১. যুধিষ্ঠিরের সময় তথা মহাভারতের রচনাকালে রামায়ণ গ্রন্থের নাম এবং গ্রন্থের বিষয়বস্তু কাহারও অবিদিত ছিল না। কোন প্রকার কল্পনা না করিয়া মহাভারত বচনের উপর নির্ভর করিয়াই নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা চলে যে, রামায়ণগ্রন্থ মহাভারত রচনার বহু পূর্বে বিরচিত এবং রামের আবির্ভাবের দীর্ঘকাল পরে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব। —সুখময় ভট্টাচার্য, 'রাম আগে না যুধিষ্ঠির আগে'. আ.বা.প., বার্ষিক সংখ্যা-১৩৮০।

রামায়ণের কথা-পুরুষ ছাড়াও মহাভারতে রামায়ণের নামও দৃষ্ট হয়।

আদিপর্বের অন্তর্গত দ্বিতীয়াধ্যায়ে রামায়ণ ও রামোপাখ্যানের কথা দু-বার উল্লিখিত হয়েছে। (৫৬ এবং ২০০)। এ ছাড়া বনপর্বান্তর্গত 'শ্রীহনুমদ্ভীমসেনয়োঃ সংবাদে' ভীম হনুমানের নিকট স্বীয় পরিচয় দানের সময় বলেছেন—

ভ্রাতা মম গুণশ্লাঘ্যো বুদ্ধিসত্ত্ববলান্বিতঃ।
রামায়ণেঽতিবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ বানরপুঙ্গবঃ॥ ৩।১৪৭।১১

হনুমান এবং ভীমের এই কথপোকথনে শুধুমাত্র রামায়ণের নামই উচ্চারিত হয়নি, রামায়ণের কাহিনীকে অতীত বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই পর্বান্তর্গত রামোপাখ্যানটিও অতীতের ঘটনা হিসেবেই মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

মহাভারতের শেষে জনমেজয়ের উদ্দেশ্যে বৈশম্পায়ন বলেছেন,

বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে॥

মহাভারত শ্রবণবিধি ৯৩

এখানে সর্বাগ্রে বেদ, পরে রামায়ণ এবং শেষে মহাভারতের নাম উল্লিখিত হয়েছে! হরিবংশের ভবিষ্যপর্বেও এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় (১৩২।৯৫)।

শুধুমাত্র রামায়ণ গ্রন্থই নয় মহাভারতকার আদিকবি বাল্মীকির নামও তাঁর মহাকাব্যে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন।

সভাপর্বে মহর্ষি নারদ ইন্দ্রের সভাবর্ণনাকালে বিভিন্ন মান্য ব্যক্তির সঙ্গে বাল্মীকির নাম করেন :

সহদেবঃ সুনীথশ্চ বাল্মীকিশ্চ মহাতপাঃ।
শমীকঃ সত্যবাক্ চৈব প্রচেতাঃ সত্যসংগরঃ॥ ৭।১৬

উদ্যোগপর্বেও কয়েকজন গুণবান্ ব্যক্তির নাম দেখা যায় ঃ

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ ভূরিদ্যুম্নো গয়ঃ ক্রথঃ।
শুক্রনারদবাল্মীকা মরুত্তঃ কুশিকো ভৃগুঃ॥ ৮৩।২৭

শান্তিপর্বেও কয়েকজন ঋষির সঙ্গে বাল্মীকি উল্লিখিত হয়েছেন :

অসিতো দেবলস্তাত বাল্মীকিশ্চ মহাতপাঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ গোবিন্দে কথয়ন্ত্যদ্ভুতং মহৎ॥ ২০৭।৪

দ্রোণপর্বে মহাবীর সাত্যকির মুখে আমরা শুনতে পাই

অপি চায়ং পুরাগীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।
হন্তব্যাঃ স্ত্রিয় ইতি যদ্ ব্রবীষি প্লবঙ্গম॥
সর্বকালং মনুষ্যেণ ব্যবসায়বতা সদা।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎ স্যাৎ কর্ত্তব্যমেব তৎ॥ ১৪৩।৬৭-৬৮

এখানে শুধু বাল্মীকির নামই নয়, রামায়ণের ৬।৮১।২৮ সংখ্যক শ্লোকটিও উদ্ধৃত হয়েছে :

ন হন্তব্যাঃ স্ত্রিয়শ্চেতি যদ্ব্রবীষি প্লবঙ্গম্।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎ চ কর্ত্তব্যমেবতৎ॥

শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বলেছেন, রাম চরিতে মহাত্মা ভার্গব রাজার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে পরে ভার্যা ও ধন সঞ্চয় করা উচিত। কারণ রাজা না থাকলে ভার্যা ও ধন রক্ষা করা কঠিন।

শ্লোকশ্চায়ং পুরা গীতো ভার্গবেণ মহাত্মনা।
আখ্যাতে রামচরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত॥
রাজনং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্যা ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্যা কুতো ধনম্॥ ১২।৫৭।৪০-৪১

এখানে ভার্গবকে রামচরিতের রচয়িতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধচরিতেও মহর্ষি বাল্মীকিকে ভার্গব বলা হয়েছে।

মহাভারতোক্ত এই সকল বাল্মীকি-বিষয়ক উদ্ধৃতি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মহাভারত লেখার সময়ই রামায়ণের রচয়িতা বলে বাল্মীকি সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। নতুবা রামায়ণ-রচয়িতা হিসেবে মহাভারতে তিনি বার বার উল্লিখিত হতেন না।

দ্রোণপর্বে যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' বাক্যের দ্বারা দ্রোণবধে সাহায্য করলে অর্জুন তাঁকে তিরস্কার করে বলেন— রামের বালী-বধের মতো তাঁর এই মিথ্যাচার চিরদিন পৃথিবীতে বিরাজ করবে। (১৯৬।৩৫ গ.ঘ. ৩৬ ক.খ.)।

অর্জুনের এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মহাভারত রচনার সময় রামায়ণে বর্ণিত রামের বালী-বধের ঘটনা সকলের নিকটই পরিচিত ছিল। নতুবা অর্জুনের মুখে এটি ঘোষিত হত না। এ বিষয়ে অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—'মহাভারতে অর্জুন রামের বালিবধ ও যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণের দ্বারা দ্রোণ-বধ এই দুটি ঘটনার তুলনা করেছেন। অর্থাৎ ন্যায়ের মাপকাঠিতে দুটিই সমানভাবে গর্হিত। এখানে অন্তত একটা ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে, মহাভারত লেখা শেষ হওয়ার আগেই রামায়ণ সুপ্রচলিত ছিল। মহাভারতের রামোপাখ্যান থেকেও এই তথ্য পাওয়া যায়।'[৬২]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্মযোগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ৩।২০

৬২. বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, 'নরচন্দ্রিমা রাম ও পুরুষোত্তম কৃষ্ণ' দেশ, ১৪ জুন, ১৯৮৬।

শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই জনক রামের শ্বশুর হওয়া সম্ভব। রাম যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতি অপেক্ষা প্রাচীন বলেই রাজর্ষি জনকের কথা শ্রীভগবান উল্লেখ করেছেন। অনুশাসনপর্বের অন্তর্গত চুয়াত্তরতম অধ্যায়ে দানধর্মপ্রকরণে গো-দানের প্রশস্ততা কীর্তন করার সময় পিতামহ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—দান এবং দক্ষিণাদির বিষয়ে এই উপদেশ প্রজাপতি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। ইন্দ্র দশরথের উদ্দেশ্যে এবং দশরথ তাঁর পুত্র রামকে, রাম তাঁর ভাই লক্ষ্মণকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। পরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এই বিদ্যা প্রচলিত হয়েছে এবং আমি আমার উপাধ্যায়ের নিকট এই উপদেশ লাভ করেছি (১১-১৪)। এই পর্বেই সুবর্ণদানের মহিমা কীর্তন করে ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বলেছেন, হে কৌরব্য, এই 'সুবর্ণদান-মাহাত্ম্য' পূর্বে বশিষ্ঠ রামকে বলেছিলেন

এবং রামায় কৌরব্য বশিষ্ঠোঽকথয়ৎপুরা। ৮৬।৩৪

এই পর্বে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে আরো বলেছেন, দশরথপুত্র রাম বহু অর্থ দান করে অক্ষয় লোক লাভ করেছেন এবং কীর্তি স্থাপন করেছেন।

রামো দাশরথিশ্চৈব কৃত্বা যজ্ঞেষু বৈ বসু।
স গতো হ্যক্ষয়াল্লোঁকান্ যস্য লোকে মহদ্ যশঃ॥ ১৩৭।১৪

পিতামহ ভীষ্ম-কর্তৃক বংশানুকীর্তনেও রাজা নৃগ থেকে আরম্ভ করে দশরথের পুত্র রাম পর্যন্ত রঘুবংশের সকল রাজার নামই এসেছে (১৬৫ অধ্যায়)।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলির প্রত্যেকটিই রামায়ণ মহাকাব্যকে প্রাচীনতর বলে মহাভারতকারের স্বীকৃতি স্পষ্ট। সমগ্র মহাভারতে যেখানেই রামায়ণের কথা-পুরুষ, যুদ্ধ, এমন-কি যেখানে প্রত্যক্ষ রামায়ণ ও বাল্মীকির প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেও ঘটনাটি প্রাচীনকালের বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা ছাড়া মহর্ষি বাল্মীকিই ভারতের আদি কবি বলে সর্বজনস্বীকৃত। বিবিধ পুরাণ ছাড়াও মহাকবি কালিদাস (রঘু ১৪।৭০), ধ্বন্যালোককার আনন্দবর্ধন (ধ্বন্যালোক ১।৫) প্রথিত-যশা নাট্যকার ভবভূতি (উত্তর রামচরিত, ২য় অঙ্ক) সুভাষিত-পদ্ধতির রচয়িতা শার্ঙ্গধর, দশরূপককার ধনঞ্জয় (১।৬৮) জানকীহরণ প্রণেতা কুমার দাস (১২।৩৬) প্রভৃতি সকলেই বাল্মীকিকে আদিকবি এবং রামায়ণকে আদিকাব্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেবকে আদি কবি বলা হয় না। একটি প্রাচীন উক্তিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

জাতে জগতি বাল্মীকৌ
কবিরিত্যভিধীয়তে
কবী ইতি ততো
ব্যাসে....।

রামায়ণ-মহাভারতের পৌর্বাপর্য বিষয়ে ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি। ভারতবর্ষে চারটি যুগ স্বীকৃত।[৬৩] ত্রেতা যুগে রামায়ণের মুখ্য পাত্র রাম এবং রামায়ণ মহাকাব্যের কবি বাল্মীকি আবির্ভূত হয়েছিলেন। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে বলা হয় চতুর্বিংশতি যুগ।[৬৪] অনুরূপভাবে মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান বেদব্যাসের আবির্ভাব কাল দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে। মহাভারতেই এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[৬৫] শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে অষ্টাবিংশতিতম যুগ বলে।[৬৬] বৃহদ্ধর্মপুরাণেও রামায়ণ-মহাভারতের পৌবাপর্য বিষয়ে বলা হয়েছে স্বয়ং নারায়ণ যে মহাভারত রচনা করেন তার বীজ রামায়ণ।

ভারতং কৃতবান্ পূর্বং দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
রামায়ণং তস্য বীজং পরাৎপরতরং মতম্॥ ৩০।১১

আবার এই পুরাণেই দেখা যায় রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্বয়ং ব্যাসের স্বীকৃতি।

পঠ রামায়ণং ব্যাস কাব্যবীজং সনাতনম্।
যত্র রামচরিত্রং স্যাৎ তদহং তত্র শক্তিমান॥ ১।৩০।৪৭
অন্যত্র রামায়ণে পাঠিতং মে প্রসন্নোঽস্মি কৃতস্ত্বয়া
করিষ্যামি পুরাণানি মহাভারতমেব চ॥ ১।৩০।৫৫

এ থেকে সরল সিদ্ধান্ত হয় যে রামায়ণ মহাভারত থেকে প্রাচীনতর। ইতস্তত প্রাপ্ত অন্য নিরপেক্ষ দু-চারটি ঘটনার উল্লেখ অথবা শব্দ প্রয়োগের আধারে এই স্থির সিদ্ধান্ত বিপর্যস্ত করার চেষ্টা বার বার হয়েছে এবং হচ্ছে। কল্পিত তথ্য-নির্ভর সিদ্ধান্তগুলি মূল মহাকাব্যদ্বয় এবং অপরাপর প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্তের প্রতিকূল তা আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট হলো। গ্রন্থ ভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনার মাধ্যমে তথাকথিত নব্য সিদ্ধান্তগুলি যে ভিত্তিহীন তা দেখানো হলো। আমাদের

---

৬৩. চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥ বি.পু. ২।৩।১৯

৬৪. চতুর্বিংশে যুগে রামো বশিষ্ঠেন পুরোধসা।
সপ্তমো রাবণস্যার্থে জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ॥ বা.পু ৯৮।৯২
ত্রেতাযুগে চতুর্ব্বিংশে রাবণস্তপসঃ ক্ষয়াৎ।
রামং দাশরথিং প্রাপ্য সগণঃ ক্ষয়মীয়িবান্॥ ৭০।৪৮

৬৫. অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥ ১।২।১৩

৬৬ অষ্টাবিংশতিমে তদ্বদ্বাপরস্যাংশসঙ্ক্ষয়ে।
নষ্টে ধর্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ॥ বা.পু. ৯৮।৯৭

কোন সিদ্ধান্তই কল্পনা বা বল-প্রয়োগের মাধ্যমে স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নয় বরং নিরাধার কল্পনার ভিত্তিতে গড়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গ্রন্থ-নির্ভর ও যুক্তিনিষ্ঠ অভিমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যা ভারতের প্রবহমান ঐতিহ্য বিশ্বাস করে ও মেনে চলে। আমরা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে ঐ সকল নব্য সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করেছি। কল্পিত তথ্য-সম্পৃক্ত এই সিদ্ধান্তগুলি মূল মহাকাব্যদ্বয় এবং অপরাপর ভারতীয় সিদ্ধান্তের প্রতিকূল এ কথা প্রতিপাদনেরও চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত সমাজ-জীবনের পারস্পরিক তুলনা

মানব-সভ্যতা আজ দ্বিতীয় সহস্রাব্দে উপনীত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আশীর্বাদ-পুষ্ট এই সভ্যতা এখন এক উত্তুঙ্গ ঐশ্বর্যের আঙিনায় বিরাজমান।

এখানে আমরা রামায়ণ-মহাভারত বর্ণিত প্রাচীন-ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের প্রতি কিছু আলোকপাত করতে চলেছি। তাই রামায়ণ-মহাভারতে চিত্রিত সামাজিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পূর্বে আমাদের ভাবতে হবে আজকের দিনের ব্যস্ত-বহুল, অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব পুষ্ট সমাজ-জীবনে উক্ত দুই প্রাচীন মহাগ্রন্থে বিধৃত সমাজ-জীবনের আলোচনা কতটা প্রাসঙ্গিক।

বিশ্বের মানব-সভ্যতার ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। প্রথমটি ধনী বা সম্পদশালী শ্রেণী, দ্বিতীয়টি মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীটি হল নিম্নমধ্যবিত্ত বা গরীব শ্রেণী।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ধনী বা সর্বোচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ প্রায়শই সমাজের কোনো পরিস্থিতি তোয়াক্কা না করে নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলে। সর্বদাই সমাজের যা-কিছু ভালো বা উৎকৃষ্ট তা গ্রহণ করার মানসিকতা পোষণ করে। যেন গড্ডলিকা প্রবাহে চলতেই তারা অভ্যস্ত। সমাজের ভালো মন্দ, সুবিধে অসুবিধে কোনো দিকেই তাদের দৃষ্টি থাকে না। নিজেরা ভালো থাকলেই হল, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তাদের বড়ো একটা মাথা-ব্যথা নেই। অবশ্য ব্যতিক্রমও কখনও কখনও দেখা যায়।

পক্ষান্তরে সমাজে বসবাসকারী দ্বিতীয় সম্প্রদায় বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মেধা, মননশীলতা ও নব নব উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী হয়েও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেই ভালোবাসে। অবস্থা বুঝে একটি সুবিধা উৎপাদনকারী দলে ঢুকে পড়াকে তারা নিজেদের জীবনের চরম ও পরম আদর্শ বলে মনে করে। পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে এদের জুড়ি মেলা ভার। ক্রমশ এই শ্রেণীভুক্ত মানুষের নির্ভীকতা, আদর্শ, বিবেচনা-বোধ সামাজিক ও পারিবারিক দায়দায়িত্ব এমন তলানিতে এসে ঠেকেছে যে সমগ্র সমাজদেহ আজ এরজন্য দীর্ণ-জীর্ণ ক্ষতবিক্ষত। এই সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনমন আজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজের তৃতীয়স্তরে বা সর্বশেষ স্তরে বিরাজ করে নিম্নমধ্যবিত্ত বা গরীব মেহনতি মানুষ। সমাজের নানা অসুবিধে, নানা বঞ্চনা, অত্যাচার, অবজ্ঞা, অন্যায়

সহ্য করেও তারা সমাজ-জীবনকে সামনের দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'চিরকাল এরা বহে হাল।' অর্থাৎ কাল সমুদ্রের অথৈ সময় কাটিয়ে কাটিয়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষই সামনের দিকে বয়ে নিয়ে যায় সমাজ-তরী। কোনো সামাজিক শোষণ পীড়ন অবজ্ঞাতেই তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধুমাত্র আর্য সংস্কৃতি-পুষ্ট এশিয়াভুক্ত ভারতীয় সভ্যতা নয়, ইউরোপের গ্রীক, রোমান প্রভৃতি সভ্যতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত তৎকালীন ভারতীয় সমাজের মানবিক আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা, দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃপ্রীতি, প্রভুভক্তি, গুরু শিষ্য সম্পর্ক, পারিবারিক আচার আচরণ, সামাজিক রীতি-নীতি—এ সবই আজকের সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ জানতে চায়। সেই সকল আদর্শে তারা আজও উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন পথের দিশা নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা করে। ভারতীয় এই মহাকাব্যদ্বয়ের নানা কাহিনী শুনে কখনও বা পড়ে নিজেদের সামাজিক জীবনকে চলিষ্ণু রাখার শিক্ষা লাভ করে। তাই তাদের জন্যই আজও রামায়ণ মহাভারতের সমাজজীবনের বিবিধ দিক আলোচনা মনে হয় প্রাসঙ্গিক। আধুনিকতা সমাজ-জীবনের বাহ্যিক বাতাবরণে যত প্রাচুর্যই বহন করে আনুক তার অন্তর দিককে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে উক্ত দুই মহাগ্রন্থে বর্ণিত সমাজ-জীবন চর্চার প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায় নি।

মানুষ যখন সংঘবদ্ধভাবে বাস করে তখনই জন্ম হয় সমাজের। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সমাজ-জীবনে। যে সমাজের মানুষ যত উন্নত মননশীলতা ও সভ্যতার ধারক সেই সমাজ তত উন্নত বলে স্বীকৃত। রামায়ণ মহাভারতের সভ্যতা বেদানুসারী। তবু কালিক ব্যবধানহেতু মহাকাব্যদ্বয়ের সামাজিক আচার আচরণ ও রীতি-নীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

রামায়ণ যদিও সামাজিক মহাকাব্য।[১] তবু রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে ভারতীয় প্রাচীন সমাজজীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে বেশি।[২]

১. 'রামায়ণ কাব্য অপূর্ব সামাজিক কাব্য। উহা যৌথ পরিবারের প্রীতি-সমুদ্রের উচ্ছলিত লীলা দেখাইতেছে, কিন্তু মানবগৃহের ঊর্ধ্বে আশ্বাস ও শান্তির যে জয় দুন্দুভি শ্রুত হইয়া থাকে, তাহারই অভয় ও নিত্য উদ্দীপনাময় রব উহার চরিত্রবর্গকে কার্যে প্রবুদ্ধ করিতেছে।' —দীনেশচন্দ্র সেন, 'রামায়ণী কথা', পৃ. ১৪০

২. 'মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসংগত কিছু বা পরস্পর-বিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা", ইতিহাস।

মহাভারতকার তৎকালীন সমাজ-জীবন সম্বন্ধে ছিলেন অতিশয় সচেতন। তৎকালীন যুগের এমন কোনো রীতি-নীতি নেই যা মহাভারতে স্থান পায়নি।[৩]

পক্ষান্তরে রামায়ণেও বহু সামাজিক আচার-আচরণের তথ্য মেলে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি মূল ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মূল ঘটনা-ব্যূহের বাইরে এসে সমাজ-জীবনের চিত্র অঙ্কন এই মহাকাব্যকারের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেকক্ষেত্রে মহাভারতের দৃষ্টিভঙ্গি রামায়ণ থেকে কিছুটা ভিন্নতর। দুই মহাগ্রন্থই বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিপোষক। তবে মহাভারতে সংসার-ধর্মেরই বেশি প্রশংসা দেখা যায়। রামায়ণেও সংসার-ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।[৪] মহাভারতে দান ও যজ্ঞকারীর মূল্য বেশি দেখানো হয়েছে— যে যজ্ঞ করে না বা যে দান করে না পুত্রের মৃত্যুতে তার শোক করার কোনো সংগত কারণ নেই এরূপ বলা হয়েছে।

রামায়ণের সমাজ-জীবনে কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত। রামায়ণের সমাজে সকলের মূল্যই সমান। সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বারা পুত্রের প্রতি পিতৃস্নেহের হ্রাস-বৃদ্ধির উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় না।

মহাভারতের দৃষ্টিতে সমাজের মঙ্গলের জন্য সন্তানের প্রতি আদর অন্নাভাবক্লিষ্ট স্পার্টায় মাত্র জাতির সেবায় সামর্থ্যযুক্ত শক্তিশালী শিশুদিগকে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণার সঙ্গে তুলনীয়। রামায়ণের সামাজিক আদর্শ সত্য। মহাভারতের সামাজিক আদর্শ ধর্ম। রামায়ণের সামাজিক আচার-আচরণ যেরূপ শাস্ত্রের প্রতি আস্থাশীল মহাভারতের সামাজিক আচার-আচরণ ঠিক ততটা শাস্ত্রানুসারী নয়। নানা শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান ন্যায়-নীতি এই মহাকাব্যের বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ হলেও সমাজের মানুষ তা সব সময় মেনেছে কম।[৫] তাই রামায়ণের সমাজ-জীবন মহাভারতের সমাজ-জীবন অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে

৩. 'বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির এরূপ সুবিস্তৃত চিত্রণ অন্যত্র হয় নাই। কোন একখানা গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ করিতে হইলে তাহা মহাভারত হইতে গ্রহণ করিতে হয়।' —অনন্তলাল ঠাকুর, মহাভারতের শিক্ষা

৪. চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্। ২।১০৬।২২ ক. খ.

৫. 'মহাভারতের সময় যৌথ-পরিবার সংযোগ অপেক্ষা অধিকতররূপে বিয়োগের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল— জ্ঞাতি-বিরোধ মহাভারতের আখ্যানভাগ কণ্টকিত করিয়া রহিয়াছে ; কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধেও যদুবংশের ধ্বংসে এই সপ্রমাণ। এখন স্বভাব ও সমাজ আর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখে নাই. সমাজের অত্যূর্ধ্বে স্বভাবের স্বর্গ ক্রমশঃ সরিয়া পড়িতেছে। শাস্ত্রের ভেঙ্কিতে সমাজের আদর্শের ছাঁচ গড়া হইতেছে।' —রামায়ণী কথা, পৃ. ১৩৯

সরলতর এবং উন্নততর।[৬] মহাকাব্যদ্বয়ের সমাজ-জীবনের পারস্পরিক তুলনায় ক্রমশ তা স্পষ্ট হবে।

বিবাহ

রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই বিবাহ মুখ্য সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত।[৭] ভারতবর্ষে সুদূর অতীত কালে সম্ভবত বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল না। এক নারী বহু পুরুষে এবং এক পুরুষ বহু নারীতে আসক্ত হতে পারত। মহাভারতের একটি উপাখ্যানে দেখা যায় উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু পিতামাতার নিকট বসে আছেন সহসা এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁর মাতার হাত ধরে বললেন, 'চলো আমরা যাই'। শ্বেতকেতু ঐ অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণের আচরণে অসন্তুষ্ট হলে উদ্দালক বললেন— বৎস, স্ত্রীলোক গাভীর মতো অনাবৃতা ও স্বৈরাচারিণী। শ্বেতকেতু পিতার বাক্যে আরও রাগান্বিত হয়ে বললেন—'আমি এই নিয়ম করছি যে যৌন ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষ কেহই স্বৈরাচারী হতে পারবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে ভ্রূণ হত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে।'[৮]

উপাখ্যানটি উভয় মহাকাব্য যুগের পূর্ববর্তী। উপাখ্যানটির মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষ মিলন বিষয়ে একটি অতি প্রাচীন নিয়মের কথাই প্রকাশ করা হয়েছে। মহাকাব্যদ্বয়ের সময় বিবাহ যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিল। গার্হস্থ্য জীবনের যাবতীয় সুখ শান্তি এই সামাজিক বন্ধনের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে মহাভারতে বিভিন্ন প্রকার বিবাহের যেমন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় রামায়ণে সেরূপ মেলে না। মহাভারতে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রকৃতি হিসেবে এগুলির পৃথক পৃথক নামকরণ দেখা যায়। যেমন— বরের বিদ্যা বুদ্ধি বংশ প্রভৃতি জেনে বরকে নিমন্ত্রণ করে কন্যার পিতা যদি কন্যাদান করেন তবে এরূপ বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।[৯]

যজ্ঞবৃত ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করলে সেই বিবাহের নাম হয় দৈব। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে শান্তার বিবাহ দৈব মতে সম্পাদিত হয়েছিল।

কন্যার শুল্ক হিসেবে বরপক্ষের নিকট দুটি গাভি নিয়ে কন্যা দান করলে তাকে আর্ষ বিবাহ বলা হয়।[১০]

৬. 'This seems to indicate that the Mahābhārata belongs to a rulder, more warlike age, while the Rāmāyaṇa shows traces of a more refined civilization.'—M. Winternitz. *A History of Indian Literature*, Vol. 2, Pt. II, p. 445.

৭. 'দান-যজ্ঞ-বিবাহেষু সমাজেষু মহৎসু চ।—রামা. ২।৫৭।১৩ ক. খ.

৮. ১।১২২।১০-২০

৯. শীলবৃত্তে সমাজ্ঞায় বিদ্যাং যোনিং চ কর্ম চ। ১৩।৪৪।৩ ক. খ.

১০. আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্মৃষৈব তৎ। ১৩।৪৫।২০ ক খ.

বরকে ধন-রত্ন দানে সন্তুষ্ট করে কন্যাদান করা হলে তাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।[১১]

কন্যার পিতাকে যদি প্রচুর ধন-রত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট করে অথবা কন্যার পরিবারের ব্যক্তিগণকে প্রলোভিত করে কন্যা গ্রহণ করা হয় তবে তাকে আসুর বিবাহ বলা হয়।[১২]

বর ও কন্যার প্রণয়বশত মিলনকে গান্ধর্ববিবাহ বলে।[১৩]

কন্যার পিতা কন্যা সম্প্রদানে সম্মত না হলেও যদি উদ্ধত বর কন্যাপক্ষের ব্যক্তিগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার ক'রে অসম্মতা কন্যাকে বলপূর্বক গ্রহণ করে তবে সেই বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ বলা হয়।[১৪]

ঘুমন্ত অথবা প্রমত্ত কন্যাকে বলাৎকার করার নাম পৈশাচ বিবাহ।

এখানে উল্লেখ্য যে উক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে কোনো একটি বিবাহ শুদ্ধভাবে সমাজে সব সময় অনুসৃত হত না।

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহে ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে ব্রাহ্ম ও গান্ধর্বমিশ্রিত, রুক্মিণীর বিবাহে রাক্ষসের সঙ্গে গান্ধর্ব নিয়মের মিলন দেখা যায়। সুভদ্রার বিবাহে রাক্ষস ও প্রাজাপত্য বিধানের সংমিশ্রণ দেখা যায়।[১৫] এ প্রসঙ্গে রামায়ণে বর্ণিত সীতার বিবাহরীতি আলোচনা করা যেতে পারে।

সীতার বিবাহ অভিভাবকদের সম্মতি অনুসারেই সংঘটিত হয়েছিল। যদিও জনক সীতাকে বীর্যশুল্কা বলে অভিহিত করেছেন। এই বিবাহে ব্রাহ্ম বিবাহের রীতি অনুসৃত হয়েছে বলা যেতে পারে। তবে জনকের শর্ত ছিল যিনি নিজ বীর্যবলে ধনুতে জ্যা সংযোজন করতে সমর্থ হবেন তিনিই সীতাকে গ্রহণ করবেন। এটি এক ধরনের পণ বা বরকে পরীক্ষা করার উপায় বলা যেতে পারে। রাম জনকের দেয় শৈব ধনুর মধ্যভাগ ভেঙে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জনক রামের হাতে সীতাকে দান করতে সম্মত হলেন এবং বশিষ্ঠের সম্মতি নিয়ে

১১ আবাহ্যমাবহেদেবং যো দদ্যাদনুকূলতঃ
শিষ্টানাং ক্ষত্রিয়াণাং চ ধর্ম এষ সনাতনঃ॥ ১৩।৪৪।৪ গঘ-৫ কখ

১২. ধনেন বহুধা ক্রীত্বা সম্প্রলোভ্য চ বান্ধবান্।
অসুরাণাং নৃপৈতং বৈ ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ॥ ১৩।৪৪।৭

১৩. অভিপ্রেতা চ যা যস্য তস্মৈ দেয়া যুধিষ্ঠির।
গান্ধর্বমিতি তং ধর্মং প্রাহুর্বেদবিদো জনাঃ॥ ১৩।৪৪।৬

১৪. হত্বা ছিত্ত্বা চ শীর্ষাণি রুদতাং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য হরণং তাত রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ১৩।৪৪।৮

১৫. মহাভারতের সমাজ, পৃ ৯

অযোধ্যা থেকে দশরথকে আনতে রথ পাঠানো হল।[১৬] পরে সকলের সমক্ষে উভয়ের বিবাহ সংঘটিত হল।

রামায়ণে বর্ণিত সীতার বিবাহের কিছু অনুষ্ঠানের সঙ্গে মহাভারতে দ্রৌপদী ও উত্তরার বিবাহানুষ্ঠানের কিছু সাদৃশ্য বর্তমান। সীতার পিতা জনকের ন্যায় দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদেরও কন্যাদানের একটি শর্ত ছিল। জনকের শর্ত ছিল যে পুরুষ শৈবধনুতে গুণ যোজনা করতে সমর্থ হবেন তিনিই সীতাকে পত্নী হিসেবে লাভ করবেন। রাম শৈব-ধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন। অনুরূপভাবে দ্রুপদের ঘোষিত শর্ত ছিল, যে পুরুষ সর্বসমক্ষে লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হবেন তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করবেন। অর্জুন এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। পরে মা কুন্তীর আদেশানুসারে পাঁচ ভাই-ই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন।

সীতা এবং দ্রৌপদী উভয়ের বিবাহেই একটি শুভলগ্ন স্থির করা হয়েছিল। সীতার বিবাহের স্থিরীকৃত দিনটি ছিল উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগ নামক প্রজাপতি। এবং এরূপ দিনকেই বিবাহের পক্ষে শুভ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১৭]

মহাভারতেও মহর্ষি বেদব্যাস চাঁদের পুষ্যা নক্ষত্রে গমনের সময়কে শুভদিন বলে বর্ণনা করেছেন এবং এরূপ শুভ লগ্নেই মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে প্রথম দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৮]

সীতার বিবাহ যেমন জনকের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তেমনি দ্রৌপদীর বিবাহ দ্রুপদের গৃহে এবং উত্তরার বিবাহ বিরাটরাজের গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য পাণ্ডবগণ তখন রাজ্যহারা তাই কন্যার বাড়িতে এই বিবাহের আয়োজন করতে হয়েছিল।[১৯] জনকের গৃহে সীতার বিবাহে যেমন দশরথ অযোধ্যা থেকে অন্যান্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে বিবাহানুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন, উত্তরার বিবাহে

১৬. মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্যশুল্কেতি কৌশিক।
সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা॥
১।৬৭।২৩

১৭. উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ॥ ১।৭২।১৩

১৮. অদ্য পৌষং যোগমুপৈতি চন্দ্রমাঃ
পাণিংকৃষ্ণায়াস্ত্বংগৃহাণাদ্য পূর্বম্॥ ১।১৯৭।৫ গ.ঘ.

১৯. মহাভারতের সমাজ, পৃ. ২২.

বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজবংশীয় বহু ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রুপদ প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের একান্ত আপনজন উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীর বিবাহেও দ্রুপদ বরযাত্রীগণের জন্য যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সীতার বিবাহের সময় দেখা যায় রাজা জনক সীতাকে নানা অলংকারে সাজিয়ে যজ্ঞবেদীর সামনে বসান। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ যজ্ঞবেদীতে অগ্নিস্থাপন করে আহুতি দেন। পরে রামকে সীতার, লক্ষ্মণকে উর্মিলার, ভরতকে মাণ্ডবীর এবং শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। পাণিগ্রহণের পর রাম-এবং তিন ভাই নিজ নিজ পত্নীগণের সঙ্গে যজ্ঞবেদী, রাজা জনক ও ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করেন।[২০]

মহাভারতেও দ্রৌপদীকে নানা অলংকারে সাজিয়ে যজ্ঞবেদীর সামনে আনা হয়। সুসজ্জিতা দ্রৌপদীর সম্মুখস্থ যজ্ঞবেদীতে ধৌম প্রভৃতি পুরোহিতগণ অগ্নিস্থাপন করেন। পরে মন্ত্রোচ্চারণ-সহ ওই অগ্নিতে আহুতি দিয়ে যুধিষ্ঠিরাদি-ক্রমে পাঁচ ভাইকে দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করান। পাণিগ্রহণের পর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীসহ অগ্নি প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রক্রিয়াতেই অপর চারভাইও দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন।[২১]

সীতার বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর জনক কন্যাধন হিসেবে এক লক্ষ ধেনু, বহু উৎকৃষ্ট কম্বল, বস্ত্র, হস্তি, অশ্ব, রথ, সৈন্য, দাস, দাসী, নানাপ্রকার মণি-মুক্তা ও অলংকার দান করেন।[২২]

মহাভারতেও দ্রৌপদীর পরিণয় সম্পন্ন হলে রাজা দ্রুপদ পাণ্ডবগণকে বহু ধন, পর্বতের মতো বিশাল একশো হাতি, একশো দাসী, অশ্বযোজিত একশো রথ প্রভৃতি দান করেন।[২৩] মৎস্যরাজ বিরাটও উত্তরার বিবাহের শেষে জামাতা

২০. ১।৭৪।২৫, ২৯-৩৫

২১. ততঃ সমাধায় স বেদপারগো
জুহাব মন্ত্রৈর্জ্বলিতং হুতাশনম্।
যুধিষ্ঠিরং চাপ্যুপনীয় মন্ত্রবি-
ন্নিযোজয়ামাস সহৈব কৃষ্ণয়া॥ ১।১৯৭।১১ ইত্যাদি

২২. অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু।
গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ॥ ১।৭৪।৩ ইত্যাদি

২৩. কৃতে বিবাহে দ্রুপদো ধনং দদৌ
মহারথেভ্যো বহুরূপমুত্তমম্।
শতং রথানাং বরহেমমালিনাং
চতুর্যুজাং হেমখলীনমালিনাম্॥ ১।১৯৭।১৫ ইত্যাদি

অভিমন্যুকে প্রীতিপূর্বক সাত হাজার অশ্ব, দুশো হাতি, প্রভূত ধন, রাজ্য প্রভৃতি দান করেন।[২৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, রাজকন্যাদের বিবাহ বেশ সমারোহের মাধ্যমে উভয় মহাকাব্যের যুগেই অনুষ্ঠিত হত। বিবাহ উপলক্ষে দাস-দাসী, আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হত। ব্রাহ্মণগণকে ধন দানে সন্তুষ্ট করার রীতি ছিল। বিবাহের পূর্বে আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানের উল্লেখ সীতা এবং দ্রৌপদী উভয়ের বিবাহেই দেখা যায়। বিবাহে বরের পিতা ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণের রীতি ছিল। তবে উভয় মহাকাব্যের যুগে গরীব গৃহস্থের বাড়িতে বিবাহ কীভাবে সম্পন্ন হত তার চিত্র মেলে না। উভয় মহাকাব্যের যুগে কন্যাদের বিবাহ যৌবন বয়সেই সম্পন্ন হত।

একপত্নীকতার প্রশংসা : রামায়ণে আমরা দেখি দশরথের তিনটি পত্নী। রাক্ষস সমাজে রাবণও বহুপত্নীক ছিলেন। তবে সমাজে একপত্নীক ব্যক্তিগণের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। মৃত পুত্রের শোকে কাতর অন্ধমুনি নিজের পুত্রের শান্তি একপত্নীব্রত ব্যক্তির ন্যায় কামনা করেছেন।[২৫]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বর্তমানে অনেক গবেষক রামের একপত্নীকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখছেন। এ বিষয়ে এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জে. এল. ব্রকিংটন-এর নাম করা যেতে পারে। তিনি তাঁর *Righteous Rama ; The Evolution of an Epic* নামক পুস্তকে রামের সীতা ব্যতীত একাধিক পত্নীর সমর্থনে নানা যুক্তি দেখিয়েছেন। এখানে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

অযোধ্যাকাণ্ডের ৮ম সর্গে মন্থরা কৈকেয়ীর মন বিষাক্ত করার জন্য বলেছে—

হৃষ্টাঃ খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে॥

২।৮।১২, সা. সং. ২।৮।৫

শ্লোকটির অর্থ— রাম রাজা হলে তোমরা দুঃখ পাবে আর রামের স্ত্রীরা সুখে থাকবে এবং ভরতের স্ত্রীরা দুঃখ পাবে। দ্বিতীয়ত, সীতা অশোকবনে বিলাপরতা অবস্থায়

২৪. বিবাহং কারয়ামাস সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ।
তস্মৈ সপ্ত সহস্রাণি হয়ানাং বাতরংহসাম্।
দ্বে চ নাগশতে মুখ্যে প্রাদাদ্ বহুধনং তদা॥ ৪।৭২।৩৫ গ.ঘ.-৩৬

২৫. ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ।
২।৬৪।৪৩ গ. ঘ

পিতুর্নির্দেশং নিয়মেন কৃত্বা
বনান্নিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ।
স্ত্রিভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ
সংরস্যমে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ। সা. সং. ৫।২৬।১৪

অর্থাৎ আমার মনে হয় রাম যথানিয়মে পিতার আদেশ পালনপূর্বক সার্থক-ব্রত বন থেকে ফিরে নির্ভয়ে রমণীগণের সঙ্গে মিলিত হবেন।

উদ্ধৃত সন্দিগ্ধ শ্লোকদুটিতে আমরা দেখছি উভয়স্থলেই 'স্ত্রী' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন 'স্ত্রী' শব্দটি দুই স্থলে কীরূপ অর্থ ব্যক্ত করছে তা দেখা প্রয়োজন।

সংস্কৃত সাহিত্যে ধর্মপত্নী বোঝাতে যে-সকল স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয় তার একটি নির্দিষ্ট সূচী আছে। 'অমরকোষ' বা নামালিঙ্গানুশাসন নামক সংস্কৃত শব্দের অভিধানে তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে পাওয়া যায়—

স্ত্রী যোষিদ্‌বলা যোষা নারী সীমন্তিনী বধূঃ।
প্রতীপদর্শিনী বামা বনিতা মহিলা তথা॥ মনুষ্যবর্গ-২

অর্থাৎ, স্ত্রী, যোষিৎ, অবলা, যোষা, নারী, সীমন্তিনী, বধূ, প্রতীপদর্শিনী, বামা, বনিতা, মহিলা— এই শব্দগুলি সাধারণভাবে স্ত্রী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

বিবাহিতা পত্নী অর্থে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলিরও একটি সূচীও অমরকোষে দৃষ্ট হয়। যেমন—

পত্নী পাণিগৃহীতী চ দ্বিতীয়া সহধর্মিণী।
ভার্যা জায়া থ পুংভূম্নি দারাঃ। মনুষ্যবর্গ-৫

উপরোক্ত প্রথম উদ্ধৃতিটি দ্বারা মন্থরা কৈকেয়ীকে রামের আসন্ন ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষান্বিতা করার চেষ্টা করেছে বলা যেতে পারে। রাম রাজ্য পেলে রামের শাসনে কুলনারীরা সুখেই থাকবেন, এটিই মন্থরার সন্দেহ।

দ্বিতীয় উদাহরণেও সীতা মনে করছেন রাম অযোধ্যায় ফিরে অন্যান্য স্ত্রীগণের সঙ্গে সুখে কাল-যাপন করবেন। এটি নারী-হৃদয়ের স্বামী-চরিত্র-বিষয়ক একটি সন্দেহ মাত্র। যদি রামের অন্য মহিষী থাকতেন তবে সীতা নিশ্চয়ই তাঁর নামোল্লেখ করতেন।

অধ্যাপক ব্রকিংটনের তৃতীয় দৃষ্টান্তটি যুদ্ধকাণ্ডের একটি সন্দিগ্ধ শ্লোক। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে রাম রাবণ-বধ করে সীতা ও অন্যান্য বানর এবং রাক্ষসগণের সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরেছেন। এ সময় তাঁর অভিষেকের বর্ণনাবসরে মহাকবি

একটি শ্লোকে বলেছেন---

ততো বানরপত্নীনাং (রাঘবপত্নীনাং) সর্বাসামেব শোভনম্।

চকার যত্নাৎকৌশল্যা প্রহৃষ্টা পুত্রবৎসলা॥ সা. সং-৬।১১৬।১৮

অর্থাৎ পুত্রবৎসলা কৌশল্যা হৃষ্টচিত্তে যত্নপূর্বক উত্তম অলংকারসমূহে বানর রমণীগণকে অলংকৃত করলেন।

রামায়ণের কিছু সংস্করণে উপরোক্ত শ্লোকটির প্রথম চরণের 'বানরপত্নীনাং' শব্দটির স্থলে 'রাঘবপত্নীনাং' পাঠ দৃষ্ট হয়। বরোদা থেকে প্রকাশিত রামায়ণের সামীক্ষিক সংস্করণেও 'রাঘবপত্নীনাং' পাঠই গৃহীত হয়েছে। অধ্যাপক ব্রকিংটন তাঁর যুক্তিকে দৃঢ় করার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই 'রাঘবপত্নীনাং' পাঠ গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপকের এই বক্তব্যটি নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষণীয়। সামীক্ষিক সংস্করণোক্ত শ্লোকে 'রাঘবপত্নীনাং' শব্দটি গৃহীত হলেও উক্ত শব্দের স্থলে 'বানরপত্নীনাং' পাঠান্তরও স্বীকার করা হয়েছে। যে-কটি পুঁথিতে ওই শব্দটি পাওয়া গেছে সেগুলি 'পাদটীকা'য় স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া সামীক্ষিক সংস্করণ রামায়ণের প্রকৃতরূপে পৌঁছবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এই সংস্করণে মূল রামায়ণ হিসেবে স্বীকৃত বা গৃহীত প্রত্যেকটি শ্লোকই আদি কবি বাল্মীকি-রামায়ণের শ্লোক এরূপ বলা যায় না। পরন্তু উপরোক্ত শ্লোকে 'বানরপত্নীনাং' পাঠের স্বপক্ষে কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

লঙ্কাকাণ্ডের শেষে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় ফেরার জন্য তৈরি হলেন। রথ প্রস্তুত। এমন সময় সীতা রামের উদ্দেশ্যে বললেন---'প্রভু, আমি সুগ্রীবপত্নীকে দেখতে চাই এবং তার সঙ্গেই অযোধ্যায় যেতে চাই।'

স্বামিন্সুগ্রীবরমণীং দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।

ত্বয়া সহৈব যাস্যামি ত্বযোধ্যাং নগরীং প্রভো॥

সা. সং. পৃ. ৮১৪ ৩৩৯৯*

অন্যত্র সীতা বলছেন--- আমি অন্যান্য সকল বানরপত্নীগণে বেষ্টিতা হয়ে তোমার সঙ্গে অযোধ্যা নগরীতে যেতে ইচ্ছা করি।

অন্যেষাং বানরেন্দ্রাণাং স্ত্রীভিঃ পরিবৃতা হ্যহম্।

গন্তুমিচ্ছে সহাযোধ্যাং রাজধানীং ত্বয়া সহ॥ গীতা প্রে. সং ৬।১২৩।২৫

রাম সীতার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে সীতা বানরপত্নীদের সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় গমন করেন। একটি শ্লোকে তাই দেখা যায়—

রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
সর্বাঃ সমারোপয়ত বানরীস্তু স্বলংকৃতাঃ॥ সা. সং, পৃ. ৮১৪
৩৩৯৭*

এর পর আমরা বানররমণীগণের অযোধ্যায় গমন করার একটি সুন্দর চিত্র পাই (৬।১২৩।৩৫-৩৬)।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রাম সীতার অনুরোধে বানরপত্নীদের রথে চড়িয়ে অযোধ্যায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং কৌশল্যা যত্নের সঙ্গে বানরপত্নীদের আপ্যায়ন করেছিলেন বলা যেতে পারে।

তা ছাড়া রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামের জীবনী নিয়ে যত ভাষায় যত গ্রন্থ এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে সেগুলির ভিতর আমরা সীতা ব্যতীত রামের অপর কোনো পত্নীর কথা পাই না। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডেই দুই স্থলে রামের একমাত্র পত্নী 'সীতা' এ কথা উল্লিখিত হয়েছে।[২৬]

মহাকবি কালিদাসও রামের পত্নী হিসেবে একমাত্র সীতার কথাই উল্লেখ করেছেন। রঘুবংশের চতুর্দশ সর্গের শেষে এবং পঞ্চদশ সর্গের প্রথমেই এটি বর্ণিত হয়েছে।[২৭] ভবভূতিও রামের পত্নী হিসেবে সীতার কথাই আমাদের শুনিয়েছেন। সুতরাং রামের বহুপত্নীকত্বের ধারণা কষ্টকল্পনা মাত্র।

মহাভারতীয় সমাজেও বহু পত্নী গ্রহণের প্রথা চালু থাকলেও একপত্নী গ্রহণই প্রশংসনীয় ছিল। (১২।১৪৪ অঃ)।

অভিভাবকের মতানুসারে বিবাহ ও তার ব্যতিক্রম : রামায়ণে দেখা যায় কন্যার নিজের ইচ্ছে মতো বর নির্ণয়কে ভালো চোখে দেখা হয়নি। বালকাণ্ডে বায়ু কুশনাভ রাজার কন্যাগণকে বিবাহ করতে চাইলে কন্যাগণ পিতার অনুমতি ছাড়া বায়ুর ইচ্ছায় সম্মত হননি। তাঁরা বায়ুকে বলেন— পিতা যাঁর হাতে

২৬ ন সীতায়াঃ পরাং ভার্যাং বব্রে স রঘুনন্দনঃ।
যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ন্যর্থং জানকী কাঞ্চনী ভবৎ॥ সা সং. ৮৯।৪
কাঞ্চনীং মম পত্নীং চ দীক্ষার্হাং যজ্ঞকর্মণি।
অগ্রতো ভরতঃ গচ্ছত্বগ্রে মহামতিঃ॥ সা. সং. ৮২।১৯

২৭. সীতাং হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদন্যাং
তস্যা এব প্রতিকৃতিসখো যৎ ক্রতূনাজহার।
বৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়-প্রাপিণা তেন ভর্তুঃ
সা দুর্বারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে॥ ১৪।৮৭
কৃত-সীতা পরিত্যাগঃ স রত্নাকরমেখলাম্।
বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্॥ ১৫।১

আমাদেরকে সমর্পণ করবেন তিনিই আমাদের স্বামী হবেন।[২৮] কন্যাগণ এখানে স্বয়ম্বরা রীতিকেও নিন্দা করেছেন।[২৯]

আবার বিশ্বামিত্রের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি রাক্ষস সমাজেও কন্যার পিতা কন্যাকে দান করতেন। সুকেতু তাঁর যুবতী কন্যা তাড়কাকে জম্ভপুত্র সুন্দের হাতে দান করেছিলেন।[৩০]

মহাভারতের সমাজেও স্ত্রীলোকগণের ইচ্ছানুসারে পতি নির্বাচনকে ভালো নজরে দেখা হত না। এই পদ্ধতিকে অসুরধর্ম বলা হয়েছে। কন্যাকে বর নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া অভিভাবকদের পক্ষে একান্ত নিন্দনীয় ছিল।[৩১] আদিপর্বের শকুন্তলার বাক্যেও এই মতবাদের সমর্থন মেলে।[৩২] দেবযানী যযাতিকে বিবাহ করতে চাইলে তিনি দেবযানীর উদ্দেশ্যে বলেছেন— তোমার পিতা সম্প্রদান না করলে আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারি না।[৩৩] 'পরাশর-সত্যবতী' সংবাদেও দেখা যায় সত্যবতী নিজেকে পিতার অধীন বলে ঋষি পরাশরের ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করেছিলেন।[৩৪]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে উভয় মহাকাব্যের যুগেই স্ত্রীগণের ইচ্ছানুসারে বর নির্বাচনকে সুনজরে দেখা না হলেও সমাজের মানুষ তা সব সময় মেনে চলেনি। কখনোও কন্যা নিজেই অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়াই বরের নিকট প্রণয় ভিক্ষা করেছে, কখনো আবার প্রণয় নিবেদনে ইচ্ছুক পুরুষ কন্যার অভিভাবকদের মত ছাড়াই এবং কখনো কখনো কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্বীয় অভিলাষ পূরণ করেছে। রামায়ণে আমরা দেখি রাবণ-ভগ্নী শূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের নিকট প্রণয় ভিক্ষা করে। রামের উদ্দেশ্যে সে বলেছে— হে রাম, আমি প্রথম দর্শনেই তাঁদের (রাবণ প্রভৃতির) মতামত না নিয়ে তোমাকে মনে মনে

২৮. পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমং চ সঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি॥ ১।৩২।২২

২৯. মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ং বরমুপাস্মহে॥ ১।৩২।২১

৩০. তাং তু বালাং বিবর্ধন্তীং রূপযৌবনশালিনীম্।
জম্ভপুত্রায় (জম্ভুপুত্রায়) সুন্দায় দদৌ ভার্যাং যশস্বিনীম্॥ ১।২৫।৮

৩১. ১৩।৪৭ অধ্যায়

৩২. পিতা হি মে প্রভুর্নিত্যং দৈবতং পরমং মতম্।
যস্য বা দাস্যতি পিতা স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥ইত্যাদি ৭৩ অধ্যায়, (বিশ্ববাণী ৮৭।৬)

৩৩. অতোঽদত্তাং চ পিত্রা ত্বাং ভদ্রে ন বিবহাম্যহম্॥ ১।৮১।২৬ গ.ঘ.

৩৪. বিদ্ধিমাং ভগবন্ কন্যাং সদা পিতৃবশানুগাম্॥ ১।৬৩।৭৫ গ.ঘ.

পতিত্বে বরণ করে তোমার কাছে এসেছি।[৩৫] আবার বায়ুও কুশধ্বজের কন্যাগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কামনা চরিতার্থ করেন।[৩৬]

মহাভারতেও শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত বলেছেন— তোমার শরীর তোমারই অধীন অতএব পিতার অনুমতি ছাড়াই তুমি আমাকে পতিত্বে গ্রহণ করতে পার।[৩৭]

সত্যবতী-পরাশর সংবাদেও পরাশর সত্যবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে নানাবিধ বরের দ্বারা সম্মত করে স্বীয় কামনা পূরণ করেন।

'কর্ণকুন্তী সংবাদে'ও কুন্তীর নানা আপত্তিজনিত অনুরোধ সত্ত্বেও সূর্য স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করেন।[৩৮]

আবার দেবযানী স্বয়ং যযাতিকে পতিত্বে বরণ করে পরে অনুমোদনের জন্য পিতার নিকট গমন করেন।[৩৯]

বর্ণাশ্রম

রামায়ণ মহাভারত উভয় মহাকাব্যের সমাজ-জীবনই বর্ণাশ্রম নিয়মানুসারে পরিচালিত হত। অধ্যাপক সুখময় সপ্ততীর্থ মহাশয় মহাভারতের সমাজকে বর্ণাশ্রমি-সমাজ বলে অভিহিত করেছেন।[৪০] রামায়ণের সমাজ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এগুলি বর্ণ নামে অভিহিত হত। এইসকল বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ থেকে উৎপন্ন সন্তানরা পিতা-মাতার বর্ণের দ্বারাই পরিচিত হতেন। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যে সন্তান উৎপন্ন হত তারা জাতি সংজ্ঞা লাভ করত।

বর্ণসৃষ্টি প্রসঙ্গে রামায়ণে বলা হয়েছে— মনু মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার জাতিতে বিভক্ত মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করেন। পরম

৩৫. তানহং সমতিক্রান্তা রাম ত্বা পূর্বদর্শনাৎ।
সমুপেতাস্মি ভাবেন ভর্তারং পুরুষোত্তমম্॥
অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী।
চিরায় ভব ভর্তা মে সীতয়া কি করিষ্যসি॥ ২।১৭।২৪-২৫

৩৬. অরত্নিমাত্রাকৃতয়ো ভগ্নগাত্রা ভয়ার্দিতাঃ।
তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।
প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ॥ ১।৩২।২৪

৩৭. আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্তুমর্হসি ধর্মতঃ ॥ ১।৭৩।৭ ঙ.চ

৩৮. ৩।৩০৬ অধ্যায়

৩৯. রাজায়ং নাহুষস্তাত দুর্গমে পাণিমগ্রহীৎ।
নমস্তে দেহি মামস্মৈ লোকে নান্যং পতিং বৃণে॥ ১।৮১।৩০

৪০. মহাভারতের সমাজ, পৃ. ৮৪

পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণগণ, বক্ষঃস্থল থেকে ক্ষত্রিয়গণ, উরুদ্বয় থেকে বৈশ্যগণ এবং পাদদ্বয় থেকে শূদ্রগণ উৎপন্ন হয়েছে। শ্রুতিতে এরূপ আছে।[৪১]

বর্ণসৃষ্টি বিষয়ে মহাভারতের বক্তব্যও প্রায় রামায়ণের অনুরূপ। এখানে ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদদ্বয় থেকে শূদ্র সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়।[৪২]

এখানে উল্লেখ্য যে বর্ণ-বিভাগ সম্বন্ধে এই বিশ্বাসের উৎস বৈদিক সাহিত্য। উভয় মহাকাব্য যুগের সামাজিক জীবনেও এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ব্রাহ্মণগণ হোম, যাগ, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণের প্রজাগণকে রক্ষা করতেন। বৈশ্যগণের কাজ ছিল দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি দেখাশোনা করা, শূদ্রগণের কাজ ছিল উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবা করা।

রামায়ণে দেখা যায় অযোধ্যায় বসবাসকারী সকল বর্ণের প্রতিই সমান সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম ছিল। বর্ণগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষতার বিচারে কোনো ব্যক্তির প্রতিই অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হত না।[৪৩] যে-সকল ব্যক্তি আপন বর্ণের ধর্মানুসারে জীবনযাপন করতেন তাঁরা বিশেষ সম্মান লাভ করতেন। রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে এই ধরনের পুণ্যবান ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান দানে সন্তুষ্ট করে নিমন্ত্রণ করার নির্দেশ দেন কুলগুরু বশিষ্ঠ।[৪৪]

উভয় মহাকাব্যের সমাজেই জন্মদ্বারা বর্ণ স্থির করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ সর্বদাই সম্মানের পাত্র ছিলেন। জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের নিকট গুরুর মতো সম্মান লাভ করতেন।

রামায়ণে বনে যাবার পূর্বে রাম অগস্ত্য, কৌশিক, ত্রিজট প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রচুর ধন রত্ন দান করেন।

অযোধ্যা-রাজকুলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের মর্যাদা ছিল দেবতুল্য।

---

৪১. মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ॥
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
উরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ॥ ৩।১৪।২৯-৩০

৪২. ১২।৭২।৪

৪৩. সর্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসংকৃতাঃ। ১।১৩।১৪ গ. ঘ.

৪৪. নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ॥ ১।১৩।২০

উত্তরকাণ্ডে রাজা নৃগ ব্রাহ্মণকে অবমাননা করার ফলে কৃক্‌কলাস হয়ে গর্তে বসবাস করতে বাধ্য হন।[৪৫] অন্যত্র এক সারমেয় রামের উদ্দেশে বলেছেন, যে দেবতা ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণ করে সে শীঘ্রই অবীচি নামক নরকে পতিত হয়! শুধু তাই নয়, যে নরাধম মনে মনেও দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে, নরক থেকে নরকান্তরে সে পতিত হয়।[৪৬]

ব্রাহ্মণেরা সাধারণত হতেন দাতা, অধ্যয়নশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং দানগ্রহণে সংযত।[৪৭]

মহাভারতেও অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের প্রতিই সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। ব্যাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবের উদ্দেশ্যে বলেছেন— প্রাণিগণ বহুজন্মের সুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করে। অবহেলায় এই দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম নষ্ট করা উচিত নয়। বৈষয়িক ভোগের জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় না। বেদাধ্যয়ন তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম।[৪৮]

এখানে জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণকে অন্য বর্ণের গুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৯] শত বছর বয়স্ক ক্ষত্রিয়ের নিকট দশ বছর বয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক পিতৃতুল্য গুরু এরূপ বলা হয়েছে।[৫০] শুধু তাই নয়, পশুপক্ষী প্রভৃতির জন্ম ভোগ করে প্রাণী প্রথমে চণ্ডাল হয়ে জন্ম নেয়। ক্রমে শুভ কর্মানুষ্ঠানের ফলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং শেষে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম লাভ করে।[৫১] ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বলা হয়েছে ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যদি বালক, গরীব অথবা কৃপণ হয় তথাপি তাঁকে অবমাননা করা উচিত নয়।[৫২] বৃদ্ধ এবং

---

৪৫. ৭।৫৩

৪৬. ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাং চৈব রাঘব।
সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকেঽবীচিসংজ্ঞকে।
মনসাপি হি দেবস্বং ব্রহ্মস্বঞ্চ হরেত্তু যঃ।
নিরয়ান্নিরয়ং চৈব পতত্যেব নরাধমঃ। ৭। প্রক্ষিপ্ত সর্গ (২), ৪৯ গ. ঘ.
৫০-৫১ ক.খ. পৃ. ৬৯৭

৪৭. স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে॥ ১।৬।১৩

৪৮. ১২।৩২১।২২-২৪

৪৯. জন্মনৈব মহাভাগো ব্রাহ্মণো নাম জায়তে। ১৩।৩৫।১ ক.খ

৫০. ক্ষত্রিয়ঃ শতবর্ষী চ দশবর্ষী দ্বিজোত্তমঃ।
পিতাপুত্রৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ তয়োর্হি ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥ ১৩।৮। ২১

৫১. ১৩।২৮ অধ্যায়

৫২ ন হর্তব্যং বিপ্রধনং ক্ষন্তব্যং তেষু নিত্যশঃ।
বালাশ্চ নাবমন্তব্যা দরিদ্রাঃ কৃপণা অপি॥ ১৩।৯। ১৮

বালক সকল ব্রাহ্মণই সম্মানের যোগ্য। মূর্খ অথবা বিদ্বান সকল ব্রাহ্মণই সম্মানের যোগ্য। অসংস্কৃত অগ্নির যেমন মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না ব্রাহ্মণেরও তেমনি কোনো অবস্থাতেই জন্মগত বিশেষত্ব নষ্ট হয় না।[৫৩]

ভারতীয় সনাতন ব্যবস্থা অনুসারে বর্ণ এবং আশ্রম-গত বিভেদ পুরোপুরিভাবে মেনে চলারই কথা। সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল। ত্রেতা যুগে তাতে একপাদ অধর্ম প্রবেশ করে। দ্বাপর যুগে ধর্ম ও অধর্মের পরিমাণ সমান। রামায়ণ ত্রেতা যুগের মহাকাব্য তাই বর্ণাশ্রম ধর্মের কিছু শৈথিল্য লক্ষ করা যায়। তবে শূদ্রের ভয়াবহ তপস্যা তখনও সামাজিক অনুমোদন লাভ করে নি। তাই তৎকালীন যুগের বর্ণাশ্রম ধর্মের নীতি অনুসারে রাম ভয়ংকর পদ্ধতিতে তপস্যারত শূদ্র শম্বুককে বধ করেছেন। আশ্রমগত বিভেদ হেতু ঘৃণা বা উপেক্ষার স্থান তৎকালীন যুগে মানুষের মনে ছিল না। রাম নিষাদরাজ গুহককে বন্ধুত্বে বরণ করতে দ্বিধা করেন নি। গর্গগোত্রীয় ত্রিজট নামক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন নন। মৃত্তিকা খননের দ্বারা লব্ধ কন্দমূল প্রভৃতির দ্বারা তিনি জীবন ধারণ করেন। তিনি রামের নিকট ধনলাভের আশায় উপস্থিত হলে রাম-কর্তৃক উপহসিত হন কিন্তু দান থেকে বঞ্চিত হননি।

উভয় মহাকাব্যে বশিষ্ঠ, দুর্বাসা, অগস্ত্য, ভৃগু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্র মর্যাদা ও আধিপত্য থাকলেও মহাভারতকার গুণব্রাহ্মণের মর্যাদাও দান করেছেন। এখানে সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন— শূদ্রের গুণ যদি ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখা যায় তবে তিনি শূদ্র বলেই অভিহিত হবেন। আর ব্রাহ্মণের গুণ যদি শূদ্রের থাকে তবে তিনি ব্রাহ্মণ। একমাত্র চরিত্রই দ্বিজত্বের কারণ।[৫৪] আবার 'উমা-মহেশ্বর সংবাদে' আমরা মহেশ্বরের মুখে শুনি— যে গৃহস্থ শুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী, দয়ালু, অতিথিপরায়ণ ও নিরহংকার তিনি ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মালেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। আবার যে ব্রাহ্মণ অসৎ, সর্বভুক, নিন্দিতকর্মা তিনি শূদ্রত্ব লাভ করেন।[৫৫]

যক্ষপ্রশ্ন, আজগর পর্ব, 'ধর্মব্যাধ উপাখ্যান' প্রভৃতি স্থলে গুণব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। ব্রাহ্মণবংশে জন্মেও ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করায় অশ্বত্থামা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছিলেন।[৫৬] কৃপাচার্য জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও ক্ষত্রিয় বৃত্তির পোষক হওয়ায় তাঁর সামাজিক মর্যাদা ব্রাহ্মণোচিত ছিল না।

---

৫৩. ১৩।১৫১ অধ্যায়

৫৪. ৩। ১৮০ অধ্যায়

৫৫. ১৩।১৪৩।৪৬-৪৭

৫৬ সোঽস্মি জাতঃ কুলে শ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণানাং সুপূজিতে।
মন্দভাগ্যতয়াস্ম্যেতং ক্ষত্রধর্মমনুষ্ঠিতঃ॥ ১০।৩।২১

পক্ষান্তরে রামায়ণের পরশুরাম অস্ত্রব্যবসায়ী হলেও ব্রাহ্মণোচিত জীবিকা অবলম্বন করায় তাঁকে ভগবানের অবতার এবং ঋষি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

উভয় মহাকাব্যের সমাজে শক্তিশালী ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভের স্পৃহাও ছিল। মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মাধ্যমে সে ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে।

উভয় মহাকাব্যের যুগেই বর্ণাশ্রম ধর্মের লঙ্ঘনে সৃষ্টি হত বিভিন্ন প্রকার সংকর জাতি। যেমন— 'ব্রাহ্মণ্যা ক্ষত্রিয়াৎ সূত'। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় পুরুষের ঔরসে জন্ম হত যে জাতকের সে সূত জাতি হিসেবে সমাজে পরিচিত হত। সূতের কাজ রথ চালানো। ক্ষত্রিয় যেহেতু পিতা তাই যোদ্ধার ধর্ম কিছুটা থাকাই স্বাভাবিক। সূতেরা পুরাণ পাঠ করত। মহাভারতে উগ্রশ্রবা সৌতি সূত জাতির অন্তর্গত। ক্ষত্রিয়েরা সূতের কন্যা বিবাহ করতেন। বিরাটরাজ সুদেষ্ণা সূতের কন্যা। কীচককে সূতপুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু অধিরথ সূত ছিলেন। কর্ণ তাঁর গৃহে পালিত হয়েই সূতপুত্র বলে পরিচিত হন। সঞ্জয়ও মহাভারতে সূত বলে পরিচিত। সঞ্জয় মন্ত্রীর কাজ করেছেন আবার যুদ্ধও করেছেন। তাঁর একটি ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি কখনো ধৃতরাষ্ট্রকে উচিত কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করেছেন।

রামায়ণেও শক, হারীত, কিরাত প্রভৃতি সংকর জাতির উল্লেখ আছে।[৫৭] রথচালক সুমন্ত্র কোন্ জাতির অন্তর্গত ছিল তা আমরা জানতে পারি না। ভরত তাঁর সারথিকে সূত বলে অভিহিত করেছেন (২।৭১।৩১)। তবে রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে সংকরত্ব বেশি তাই জাতও বেশি। মহাভারতের সমাজ-জীবনে তাই জটিলতাও বেশি। রামায়ণের সমাজে ব্রাহ্মণই উত্তম। কিন্তু মহাভারতে বর্ণবহির্ভূত জাতের মধ্যেও বিবিধ গুণের কথা বলা হয়েছে।

নারী

রামায়ণ ও মহাভারতে নারী সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি আমরা পাই তার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় মহাকাব্যেরই সমাজে নারীর স্থান ছিল খুব উচ্চে। তৎকালীন সমাজের পুরুষেরা নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতে কার্পণ্য করতেন না। নারীর জীবনে যেমন পুরুষ ছিল অপরিহার্য তেমনি নারীরা পুরুষের জীবনে পূর্ণাঙ্গতা দান করতেন। নারী-পুরুষের বৈধ মিলনের মাধ্যমে উভয় মহাকাব্যের যুগে গার্হস্থ্য জীবন গড়ে উঠত। তাই গার্হস্থ্য জীবনে নারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। পতিব্রতা নারীকে সমাজের মানুষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন।

---

৫৭. ১।৫৪-৫৫

পতিব্রতা নারীর অসংখ্য গুণগান উভয় মহাকাব্যেই দেখা যায়। ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারী ছাড়া পুরুষের জীবন ছিল অসম্পূর্ণ। যজ্ঞকার্যে ধর্মপত্নীর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। অকৃতদার পুরুষ যজ্ঞের অধিকারী হতে পারতেন না। তবে উভয় মহাকাব্যে নারী সম্বন্ধে কিছু নিন্দনীয় বাক্যাবলীও লক্ষ্য করা যায়। নারীর নানাবিধ দোষাবলীর কথা মহাকাব্যদ্বয়ে লিপিবদ্ধ হলেও সামগ্রিকভাবে নারীকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন আদিকবি বাল্মীকি ও মহর্ষি বেদব্যাস।

এ যুগে সমাজের বহু মানুষ পুত্রই কামনা করতেন। তবে কন্যা সন্তানের জন্মকেও হেয় দৃষ্টিতে দেখা হত না। অবশ্য রামায়ণে কন্যা সন্তান জন্মানোকে পিতার দুঃখের কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৮]

মহাভারতে নানা স্থলে স্ত্রীজাতি প্রসঙ্গে নানা দোষারোপ থাকলেও কন্যা-জন্মকে পিতার ভাবী দুঃখের কারণ বলে কোথাও বর্ণনা করা হয়নি। তবে উভয় মহাকাব্যে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়নি।

রামায়ণে রামের বনগমনের সিদ্ধান্তে শোকসন্তপ্তা কৌশল্যা দশরথের উদ্দেশে বলেছেন— স্ত্রীলোকের প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিগণ, চতুর্থ গতি হয় না।[৫৯]

মহাভারতেও স্ত্রীকে শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন বলা হয়েছে।[৬০]

রামায়ণে গৃহস্থে পত্নীর বিশেষ মর্যাদার কথা পাওয়া যায়। গৃহস্থ ব্যক্তির নিকট পত্নী আত্মস্বরূপ।

আত্মা হি দারা সর্বেষাং দারসংগ্রহবর্তিনাম্। ২।৩৭।২৪ ক.খ.

মহাভারতেও বলা হয়েছে ভার্যাই মানুষের অর্ধেক শরীর, শ্রেষ্ঠ সখা, ধর্ম, অর্থ ও কামের মূল।[৬১] যে পুরুষের ভার্যা সাধ্বী ও পতিব্রতা তিনি ধন্য। ভার্যা পুরুষের সকল কাজের সহায়। পীড়িত পুরুষের নিকট ভার্যার সমান ঔষধ আর কিছুই নেই। যাঁর গৃহে সাধ্বী ও প্রিয়বাদিনী পত্নীর অভাব তাঁর নিকট গৃহ আর অরণ্য সমান।[৬২]

---

৫৮. কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্বেষাং মানকাংক্ষিণাম্।
কন্যা হি দ্বে কুলে নিত্যং সংশয়ে স্থাপ্য তিষ্ঠতি॥ ৭।১২।১১ গ. ঘ., ১২ ক. খ.

৫৯. গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে॥ ২।৬১।২৪

৬০. পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ ১৩।৪৬।১৪

৬১. অর্ধং ভার্যা মনুষ্যস্য ভার্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥ ১।৭৪।৪১

৬২. ১২।১৪৪ অধ্যায়

রামায়ণে পতিব্রতা রমণীর বিবিধ গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। পতিব্রতা স্ত্রীগণ কখনো পতির অবমাননা করেন না। তাঁদের নিকট পতি দেবতাতুল্য। পতিব্রতা নারী মনে করেন পতি অপরিমিত দান করেন।[৬৩] স্বামী নির্গুণ হউন অথবা গুণবান্ হউন ধর্মপরায়ণা স্ত্রীগণের নিকট তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা।[৬৪]

মহাভারতেও বলা হয়েছে যিনি দরিদ্র, ব্যাধিত, পথশ্রমে ক্লান্ত পতিকে পুত্রের মতো আদর যত্ন করেন তিনি যথার্থ ধর্মচারিণী। যিনি কামে, ভোগে, ঐশ্বর্যে, বা সুখে কখনো পতি ভিন্ন অন্যের কথা চিন্তা করেন না তিনিই ধর্মচারিণী। সাধ্বী স্ত্রীরা পুত্র অপেক্ষাও স্বামীকেই বেশি ভালোবাসেন।[৬৫]

সমগ্র রামায়ণে পতিব্রতা ও সাধ্বী নারীর অসংখ্য গুণাবলীর কথা পাওয়া যায়। কৌশল্যা ছিলেন রাজা দশরথের সাধ্বী স্ত্রী। তিনি বনবাসকালে সীতাকে ধর্মচারিণী পতিব্রতা নারীর একাধিক গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সীতা ছিলেন রামের সাধ্বী ও পতিব্রতা পত্নী। সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্যে সীতার পাতিব্রত্যই বিঘোষিত। রাজ্যে অরণ্যে, আকাশমার্গে, রাক্ষসদুর্গে সর্বত্রই সীতা রাম ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষকে চিন্তা করেন নি।

মহাভারতেও বিভিন্ন স্থলে পতিব্রতা রমণীর প্রশংসা করা হয়েছে। অসংখ্য উপাখ্যানের মাধ্যমে সাধ্বী ও পতিব্রতা রমণীর গুণগান করা হয়েছে। মহাভারতে সাবিত্রীর উপাখ্যান এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সতীত্বের পুণ্যফলে তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন।[৬৬]

পতিপরায়ণা দুঃখিতা দময়ন্তীর ক্রোধে লম্পট ব্যাধ ভস্মীভূত হয়েছিল।[৬৭]

আদিপর্বান্তর্গত 'বশিষ্ঠোপাখ্যানে' একজন পতিব্রতার চোখের জল অগ্নিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়।[৬৮]

অপর একটি উপাখ্যানে কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ পতিব্রতা এক রমণীর

৬৩. ২।৩৯।৩০-৩১

৬৪. ভর্ত্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্নির্গুণোঽপি বা।
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্॥ ২।৬২।৮

৬৫. দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকর্শিতম্।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্মভাগিনী।
যা নারী প্রযতা দক্ষা যা নারী পুত্রিণী ভবেৎ।
পতিপ্রিয়া পতিপ্রাণা সা নারী ধর্মভাগিনী॥ ১৩।৪৬।৪৫-৪৬

৬৬. ৩।২৯৬তম অধ্যায়

৬৭. উক্তমাত্রে তু বচনে তথা স মৃগজীবনঃ।
ব্যসুঃ পপাত মেদিন্যামগ্নিদগ্ধ ইব দ্রুমঃ॥ ৩।৬৩।৩৯

৬৮. তস্যাঃ ক্রোধাভিভূতায়া যান্যশ্রূন্যপতন্ ভুবি॥
সোঽগ্নিঃ সমভবদ্দীপ্তস্তং চ দেশং ব্যদীপয়ৎ। ১৮১।১৬ গ.ঘ —১৭ ক খ

অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় লাভ করেছিলেন। পতিশুশ্রূষার জন্য রমণীটি এই অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেন।[৬৯]

উভয় মহাকাব্যে নারী সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশংসা থাকলেও স্ত্রীলোকের নিন্দাও ইতস্তত ধ্বনিত হয়েছে।

রামায়ণে কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামকে বনবাসে প্রেরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে শোকাভিভূত দশরথ কৈকেয়ীর উদ্দেশে বলেছেন— স্ত্রী জাতি অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ও শঠ। তাদেরকে শতবার ধিক্কার।

ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ। ২।১২।১০০ ক.খ.

এ কথা ব'লে তিনি অবশ্য বলেন সকলকে এরূপ বলছি না। কেবলমাত্র ভরতের মাকেই বলছি।[৭০] অসতী স্ত্রী সম্বন্ধে কৌশল্যা সীতাকে বলেছেন পতির দ্বারা সর্বদা সম্মানিত হয়েও যে-সকল স্ত্রীলোক বিপদের সময় পতির আদর করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে সেই-সকল স্ত্রীলোক প্রকৃতই অসতী। এই ধরনের স্ত্রীরা পূর্বে যথেষ্ট সুখভোগ করে বিপদে অল্পমাত্র দুঃখ ভোগ করলেই পতির প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করে ও পতিকে ত্যাগ করে। এরূপ পাপিষ্ঠা স্ত্রীর অন্তরের ভাব জানা যায় না। যেহেতু কোনো বিষয়েই এদের দৃঢ় অনুরাগ হয় না। ক্ষণে ক্ষণে নানা বস্তুতে বিরাগ ও অনুরাগ হয়। পতির বংশ, বিদ্যা, উপকার, অলংকারদান ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহকে অনুমোদন করে না।[৭১]

মহাভারতেও 'নারদপঞ্চচূড়া-সংবাদে' নারদের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চচূড়া নারীর প্রকৃতি বর্ণনাকালে বলেছেন— নারী সকল প্রকার দোষের আধার। তাদের পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি জ্ঞান নেই। মানুষের চরিত্রে যত প্রকার দোষ থাকা সম্ভব তা নারী চরিত্রে বর্তমান।[৭২] মহাভারতে একাধিক স্থলে এরূপ নারীচরিত্রের বিভিন্ন দোষের কথা বলা হয়েছে।

উভয় মহাকাব্যের যুগেই উৎসবাদিতে এবং বিবাহে যৌতুকস্বরূপ সালংকৃতা স্ত্রীলোক দান করা হত। রাজা জনক সীতার বিবাহ অনুষ্ঠানের পর যৌতুকস্বরূপ অনেক সুন্দরী ও আভরণে ভূষিতা দাসী অযোধ্যায় পাঠিয়েছিলেন।[৭৩]

মহাভারতেও এরূপ স্ত্রীলোক দানের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ সোনা প্রভৃতির সঙ্গে স্ত্রীলোকও দান করেন।[৭৪]

---

৬৯. ৩।২০৪তম অধ্যায়

৭০. ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্॥ ২।১২।১০০ গ. ঘ.

৭১. ২।৩৯।২০-২৩

৭২. ১৩।৩৮তম অধ্যায়

৭৩. দদৌ কন্যাশতং তসাং দাসীদাসমনুত্তমম্। ১।৭৪।৫ ক. খ.

৭৪ বৃক্ষস্য যোষিতাশ্চৈব ধর্মরাজঃ পৃথগ্‌ দদৌ॥ ২।৩৩।৫২ গ. ঘ.

উভয় মহাকাব্যেই দেখা যায় নারীদের স্পষ্ট ও সত্যবাক্য বলার স্বাধীনতা ছিল। রামায়ণে সীতা, শূর্পণখা, মন্দোদরী এবং মহাভারতে গান্ধারী, দ্রৌপদী, বিদুলা প্রভৃতি রমণী ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রয়োগ করেছেন। তবে রামায়ণের সীতা অপেক্ষা দ্রৌপদীই এ ব্যাপারে বেশি সচেতন ছিলেন।

বিধবাগণ রাজপুরীতে ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন অতিবাহিত করলেও নারীদের পক্ষে এই অবস্থা বেশ সুখের ছিল না। বালীর মৃত্যুতে তারার এবং রাবণের মৃত্যুতে মন্দোদরীর বিলাপে এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

মহাভারতে সত্যবতী, কুন্তী, উত্তরা এবং দুর্যোধনের পত্নীগণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

উভয় মহাকাব্যের যুগে সহমরণ প্রথার ব্যাপক প্রচলন না থাকলেও এই প্রথার প্রশংসা করা হয়েছে। মহাভারতে পাণ্ডুর পত্নী মাদ্রী, বসুদেব-পত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা পতির সহগমন করেন। রামায়ণে কোনো নারীর সহগমনের কথা পাওয়া যায় না।

রামায়ণের সমাজে কোনো কোনো নারীকে কঠোর তপস্যা করতে দেখা যায়। কোনো এক সময় দশ বছর যাবৎ অনাবৃষ্টি হলে অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া আশ্রমে গঙ্গাকে আনয়ন করেন। তিনি ছিলেন তপস্যারতা। তিনি দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।[৭৫]

অন্যত্র রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে মতঙ্গ বনে তপস্বিনী শবরীর সাক্ষাৎ হয়। তপস্বিনী শবরী যথাবিধানে রাম-লক্ষ্মণকে অতিথি সৎকারযোগ্য দ্রব্য দান করেন। শেষে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে স্বর্গে গমন করেন।[৭৬]

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতা-অন্বেষণকালে বানরগণসহ হনুমান চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিধায়িনী নিয়তাহারা এবং তেজে প্রজ্বলিতা এক তপস্বিনী নারীর সাক্ষাৎ পান।[৭৭] এই তাপসী মেরুসাবর্ণির কন্যা, নাম স্বয়ংপ্রভা।[৭৮]

মহাভারতের সমাজেও আমরা নারীদের কঠোর তপস্যা ও কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করতে দেখি। সুলভা নামে এক যোগিনী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করে মোক্ষবিদ্যা আলোচনা করতেন। একদিন তিনি ধর্মধ্বজ-নামে প্রসিদ্ধ জনক রাজার রাজধানী মিথিলায় ভিক্ষুকীর বেশে প্রবেশ

---

৭৫. দশবর্ষসহস্রানি যথা তপ্তং মহৎ তপঃ।
অনসূয়াব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নির্বর্হিতাঃ॥ ২।১১৭।১১

৭৬. ৩। ৭৪ তম অধ্যায়

৭৭. দদৃশুর্বানরাঃ শূরাঃ স্ত্রিয়ং কাঞ্চিদদূরতঃ।
তাঞ্চ তে দদৃশুস্তত্র চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্॥
তাপসীং নিয়তাহারাং জ্বলন্তীমিব তেজসা। ৫০।৩৯-৪০ ক.খ.

৭৮. দুহিতা মেরুসাবর্ণেরহং তস্যাঃ স্বয়ংপ্রভা॥ ৫১।১৬ গ. ঘ

করেন। রাজা ছিলেন মোক্ষশাস্ত্রে নিষ্ণাত। কিন্তু তিনি মোক্ষশাস্ত্রে সুলভার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করেন। সুলভা রাজাকে নিজের পরিচয় দানের সময় বলেছেন— রাজন্, প্রধান-নামক রাজর্ষির বংশে আমার জন্ম। আমি ব্রহ্মচারিণী। আমার উপযুক্ত স্বামী মিলল না। আমি গুরুগণের নিকট বিদ্যালাভ করেছি এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে একাকিনী ভ্রমণ করছি।[৭৯]

কুরুক্ষেত্রের নিকট সিদ্ধ আশ্রমে শাণ্ডিল্যদুহিতা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি কৌমার-ব্রহ্মচারিণী ছিলেন।[৮০]

শিবা নামে এক ব্রাহ্মণকন্যা সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেন এবং পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। ইনিও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন।[৮১]

অবশ্য মহাভারতের শল্যপর্বের 'সারস্বতোপাখ্যানে' অবিবাহিতা কুণিগর্গ ঋষির কন্যাকে নারদ ঋষি বলেছেন— তুমি অসংস্কৃতা (অবিবাহিতা), কোনো উৎকৃষ্ট লোকে তোমার স্থান নেই।[৮২] এখানে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যেরই নিন্দা প্রকাশ পেয়েছে। তবে উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে নারীর তপস্যার অধিকার উভয় মহাকাব্যের যুগেই প্রচলিত ছিল।

শিক্ষা

রামায়ণে অযোধ্যার প্রজাগণ সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার দ্বারা জানা যায় তৎকালীন সমাজে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রজাই শিক্ষা লাভের অধিকারী ছিলেন। সমাজে শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। সে সময় চতুরাশ্রম প্রথার প্রচলন ছিল। বিদ্যার্থীকে ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করে বিদ্যালাভ করতে হত। অযোধ্যার প্রজাগণ ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, অধ্যয়নশীল। কোনো প্রজাই অল্পশিক্ষিত পরশ্রীকাতর সামর্থ্যহীন এবং অবিদ্বান ছিলেন না। বেদ-বেদাঙ্গে অজ্ঞ, ব্রতহীন, বহুদানশূন্য, দীন, ক্ষিপ্ত ও ব্যথিত কেউ ছিলেন না।[৮৩] এই উক্তি দ্বারা বোঝা যায়

৭৯. ১২। ৩২০তম অধ্যায়

৮০. অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী॥ ইত্যাদি ৯।৫৪।৬-৮

৮১. অত্র সিদ্ধাঃ শিবা নাম ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
অধীত্য সকলান্ বেদাঁল্লেভিরে মোক্ষমক্ষয়ম্॥ ৫।১০৯।১৮ গ. ঘ. ১৯ ক. খ.

৮২. অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে। ৫২। ১২ ক.খ

৮৩. নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
নাষড়ঙ্গবিদত্রাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন॥ ১।৬।১৪-১৫

রামায়ণের সময় ব্রাহ্মণসহ অন্যান্য বর্ণের ব্যক্তিগণও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করতেন। বানর সমাজেও যথেষ্ট শিক্ষার প্রসার ছিল। হনুমান বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী বালী-কর্তৃক রামের উদ্দেশে কথিত বাক্যাবলীর মধ্যেও শিক্ষা ও যুক্তির আভাস মেলে। তারা ছিলেন বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা। বানর সমাজের ন্যায় রাক্ষস সমাজেও শিক্ষার প্রচলন ছিল। রাবণ বেদজ্ঞ ছিলেন, শূর্পণখার রাজনীতির জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের বাক্যাবলীর মধ্যেও যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা ও শিক্ষার আভাস আমরা পাই।

মহাভারতেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রজাগণের মধ্যে শিক্ষার কথা পাওয়া যায়। শূদ্রা গর্ভজাত বিদুর মহাভারতে অন্যতম বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সূত লোমহর্ষণ, সঞ্জয় এবং সৌতিরও যথেষ্ট শিক্ষা ছিল। সৌতি মহাভারত প্রচার করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে মান্য শূদ্রগণ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মান্য শূদ্র অর্থে এখানে বিদ্বান শূদ্রগণকেই বলা হয়েছে।

রামায়ণের সমাজে বেদচর্চার আধিক্য ছিল। রামের অভিষেক প্রসঙ্গে অযোধ্যা বেদধ্বনিতে মুখরিত ছিল (২।৭।৫)। ব্রাহ্মণগণই বেদচর্চায় নিরত থাকতেন। যে ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ না হতেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বিশেষ ছিল না। মহারাজ দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে যে ব্রাহ্মণগণকে সদস্য করা হয়েছিল তাঁরা সকলেই বেদাঙ্গসহ সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। যিনি বেদজ্ঞ ছিলেন না তিনি এই যজ্ঞে সদস্যপদ লাভ করতে পারেননি।[৮৪] রাম স্বয়ং ছিলেন বেদজ্ঞ পুরুষ।[৮৫] তিনি বেদাঙ্গসহ সকল বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সমাবর্তন করেছিলেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ কৃতজ্ঞ এবং অন্যের মনোভাব বুঝতে সমর্থ। নানা শাস্ত্রে এবং বিবিধ ভাষায় লিখিত নাটক প্রভৃতিতে তাঁর শ্রেষ্ঠতা ছিল। সংগীত এবং নানা শিল্পকলায় তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। হস্তী ও অশ্বের শিক্ষা দানে ও আরোহণে তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য ছিলেন (২।১।২১-৩২)।

সুগ্রীবের অমাত্য হনুমানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই রাম তাঁর বাক্যাবলী প্রয়োগে আনন্দিত হয়ে লক্ষ্মণকে বলেছেন— তুমি সুগ্রীবের মন্ত্রী বাগ্মী

৮৪. নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ।
সদস্যাস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলো দ্বিজঃ॥ ১।১৪।২১

৮৫. যস্মিন্ ন চলতে ধর্মো যো ধর্মং নাতিবর্ত্ততে।
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ॥ ৬।২৮।১৯

বানরশ্রেষ্ঠকে সস্নেহে সুমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর দাও। ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন কেহ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করতে পারেন না। ইনি অনেক কথা বলেছেন কিন্তু একটিও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নি। সুতরাং বোধ হচ্ছে ইনি নিশ্চয়ই ব্যাকরণ প্রভৃতি ব্যুৎপাদক পুস্তক বহুবার পাঠ করেছেন।[৮৬]

রামায়ণে বিদ্যাদাতা গুরুকে পিতার মর্যাদা দেওয়া হত। শিষ্যকে পুত্র বলে মনে করা হত।[৮৭] সুতরাং গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল মধুর।

মহারাজ দশরথ পুত্র রামকে বিদ্যালাভের জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে বেদবিদ্যা, সংগীত বিদ্যা এবং বহু দুর্লভ অস্ত্রাদির প্রয়োগে নিপুণ করে তোলেন। রামায়ণে ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি আশ্রমের উল্লেখ দেখা যায়। এই-সকল আশ্রমে শিষ্যগণ গুরুর নিকট বিবিধ বিষয়ে বিদ্যালাভ করতেন। রাম বনবাসকালে একদিন মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখেন মহর্ষি অগ্নিহোত্র শেষ করে বহুশিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত রয়েছেন।[৮৮] সুতরাং আশ্রমগুলি সে সময় শিক্ষাকেন্দ্র রূপে পরিগণিত হত।

রামায়ণের যুগে শিক্ষায় বিদ্যাস্নাত, ব্রতস্নাত ও বিদ্যাব্রতস্নাত— এই তিন প্রকার স্নাতকের উল্লেখ দেখা যায়।[৮৯] উত্তরকাণ্ডে রাম যে-সকল ব্যক্তিকে লব-কুশের রামায়ণ গান শোনার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সকলেরই পাণ্ডিত্য ছিল। কেহ বেদজ্ঞ পণ্ডিত, কেহ পুরাণতত্ত্বজ্ঞ,

৮৬. তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্বাক্যৈঃ স্নেহযুক্তমরিন্দমম্॥
নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥ ৪।৩।২৭-২৯

৮৭. জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্মে চ পথি বর্তিনঃ॥
যবীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ।
পুত্রবত্তে ত্রয়শ্চিন্ত্যা ধর্মশ্চৈবাত্র কারণম্॥ ৪।১৮।১৩-১৪

৮৮. স প্রবিশ্য মহাত্মানমৃষিং শিষ্যগণৈর্বৃতম্॥ ২।৫৪।১১ ক. খ.

৮৯. দেবাসুরমনুষ্যাণাং সর্বাস্ত্রেষু বিশারদঃ।
সম্যগ্‌বিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ॥ ইত্যাদি ২।২।৩৪

বৈয়াকরণ, কেহ সংগীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ, বৈদিক ছন্দে পণ্ডিত, কেহ আবার জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী, কেহ বিভিন্ন ভাষাবিদ্ প্রভৃতি।[৯০]

রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের শিক্ষা বিষয়ে বর্ণনা আরো ব্যাপক। শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলির কথা মহাভারতে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। গুরুভক্তি, শিষ্যের গুণাবলী, গুরুদক্ষিণা, বিদ্যালাভের উপায়, অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়— সবই মহাভারতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মহাভারতের সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই যে শিক্ষাদানের অধিকারী ছিলেন তা নয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মানুষের নিকটও ব্রাহ্মণ নানা শিক্ষা লাভ করতেন। এ বিষয়ে মিথিলাবাসী স্বধর্মপরায়ণ ব্যাধের তপস্বী ব্রাহ্মণ কৌশিকের উদ্দেশে উপদেশ দানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৯১] শান্তিপর্বে আমরা দেখি একজন মুদী উপদেশ দিচ্ছেন এক তপস্বী ব্রাহ্মণকে।[৯২]

ক্ষত্রিয় রাজা জনক অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব পিতার আদেশে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে গুরুত্বে বরণ করেন। রাজা জনকও দ্বিধাহীন চিত্তে শুকদেবকে শিষ্যত্বে বরণ করে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।[৯৩]

মহাভারতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বিষয়ে একাধিক চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান পাওয়া যায়। সে যুগে শিষ্যগণ গুরুগৃহে বসবাস করে বিদ্যালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গুরুর কৃষিকাজে সহায়তা, গোপালন, হোমের কাঠ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতেন। আরুণি, উপমন্যু, উতঙ্ক ও কচের ছাত্রজীবন থেকে আমরা একথা জানতে পারি। গুরুকে সন্তুষ্ট করে তাঁর আশীর্বাদ ও স্নেহ ভালোবাসা লাভ করে তাঁরা ধন্য হতেন। গুরুও অনুগত ছাত্রকে তাঁর সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিতেন। রামায়ণে বশিষ্ঠের রাম-লক্ষ্মণের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা, মহাভারতে অর্জুন তথা পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের স্নেহ ভালোবাসা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উতঙ্ক ও বিপুলের গুরুভক্তিও অনন্যসাধারণ। একলব্যের

৯০. পৌরাণিকাঞ্ছব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্॥
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্বান্ নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ।
পদাক্ষবসমাসজ্ঞাংশ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্॥
কলামাত্রাবিশেষজ্ঞাঞ্জ্যৌতিষে চ পরং গতান্। ইত্যাদি ৭।৯৪।৫-৭
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্যবিশারদান॥

৯১. ৩। ২০৬ তম অধ্যায়

৯২. ১২। ২৬৩ তম অধ্যায়

৯৩. ১২। ৩২৬ তম অধ্যায়

মতো গুরুদক্ষিণার উদাহরণ সংসারে বিরল। কোনো কোনো আচার্য আবার শিষ্যগণকে এমন স্নেহ করতেন যে সমাবর্তনের সময় শিষ্যের হাতে আপন কন্যাকে দান করতেন। মহাভারতে আচার্য উদ্দালক তাঁর শিষ্য কহোড়কে এবং আচার্য গৌতম স্বীয় শিষ্য উতঙ্ককে আপন আপন কন্যা সম্প্রদান করেন।

রামায়ণে যেমন কৌশল্যা, অনসূয়া, বানরজাতির অন্তর্গত তারা, রাক্ষসদের মধ্যে শূর্পণখা, মন্দোদরী প্রভৃতি নারীর বাক্যাবলীতে যথেষ্ট শিক্ষার আভাস মেলে। অনুরূপভাবে মহাভারতেও একাধিক বিদুষী নারীর সন্ধান মেলে। যেমন গৌতমী নামে পরিচিতা এক মহিলার একমাত্র পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হলে মৃত্যুতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ব্যবহৃত বাক্যাবলীতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।[৯৪] মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীও বিদুষী মহিলা ছিলেন। এমন-কি ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণও তাঁর নিকট শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করতেন। জিজ্ঞাসুগণ তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা ও জ্ঞানপিপাসা পরীক্ষা না করে উপদেশ দিতেন না। সকল শাস্ত্রেই তিনি পারদর্শিনী ছিলেন।[৯৫]

ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী ছিলেন বিদুষী, বুদ্ধিমতী ধর্মার্থদর্শিনী এবং ভালোমন্দ বিচারে নিপুণা। মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আমরা একথা জানতে পারি।[৯৬] মহাভারতে তাঁর বিবিধ কার্যাবলী ও ব্যবহৃত বাক্যাবলী দ্বারা তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এ ছাড়া দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, মাধবী প্রভৃতি রমণীও বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন।

বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক উপাখ্যানের মাধ্যমে নানা শিক্ষা ও নীতিকথা প্রচার উভয় মহাকাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত যযাতি উপাখ্যান এবং রাজা নৃগ উপাখ্যানের কথা এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয় মহাকাব্যেই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একাধিক উপাখ্যান সম্পৃক্ত হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অসংখ্য এই ধরনের উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। আধুনিক ভারতবর্ষেও শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় এগুলির উপযোগিতা অপরিহার্য।

মহাভারতেও বিভিন্ন ভাষাবিদের সমাদর ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় বিভিন্ন শাস্ত্রে বিদ্বান ব্যক্তিগণের সঙ্গে বিভিন্ন ভাষাবিদ্‌গণও সম্মানিত হতেন। তাঁরা রাজকোষ থেকে অর্থসাহায্য লাভ করে রাজসভা অলংকৃত [৯৭]

৯৪. ১৩। প্রথম অধ্যায়

৯৫. ১৩। ১৩০ তম অধ্যায়

৯৬. মহাপ্রজ্ঞা বুদ্ধিমতী দেবী ধর্মার্থদর্শিনী।
আগমাপায়তত্ত্বজ্ঞা কশ্চিদেষা ন শোচতি॥ ১৫।২৮।৫

৯৭. নিবাসং রোচয়ন্তি স্ম সর্বভাষাবিদস্তথা॥ ১।২০৬।৩৯ ক.খ.

সমাজে বেদপাঠ দ্বিজাতির নিত্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত হত। অধ্যয়নের নানা প্রকার সুফলের কথাও বিভিন্ন স্থলে কীর্তন করা হয়েছে। বিদ্যাদানের ফলকীর্তনের সময় বলা হয়েছে যিনি উপযুক্ত শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন তিনি পৃথিবী ও গো-দানের পুণ্য লাভ করেন।[৯৮]

রামায়ণ থেকে জানা যায় অযোধ্যা-রাজ্যে বেদের কঠশাখার অধ্যয়নরত উপনয়নের সময় থেকে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরা বেদপাঠ ভিন্ন অন্য কোনো কাজ করতেন না। রাম এরূপ বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে অসংখ্য ধনরত্ন দান করেছিলেন।[৯৯]

মহাভারতেও স্নাতক তিন প্রকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অল্প সময়ে যে-সকল শিষ্য কেবলমাত্র একটি বেদের পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন তাঁদের বলা হত বিদ্যাস্নাতক। যাঁরা গুরুগৃহে অবস্থান করে বারো বছর শুধুই ব্রত পালন করতেন তাঁদের বলা হত ব্রতস্নাতক। আর যে-সকল শিষ্য বিদ্যা এবং ব্রত উভয়েরই শেষ সীমায় যেতেন তাঁরা বিদ্যাব্রতস্নাতক বলে পরিচিত হতেন।[১০০]

রাজধর্ম

রামায়ণ মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই প্রসঙ্গক্রমে রাজধর্মের বিভিন্ন কথা এসেছে। এ বিষয়েও রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের বক্তব্য ব্যাপকতর। মহাভারতের শান্তিপর্বের রাজধর্ম প্রকরণ, সভাপর্বের নারদ-কথিত রাজধর্ম, কণিকের কূটনীতি, আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নাবলী এবং উদ্‌যোগ-পর্বের বিদুরনীতি প্রভৃতি অধ্যায় রাজধর্মের নানা মূল্যবান বক্তব্যে পরিপূর্ণ। রামায়ণেও ইতস্তত রাজধর্মের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পৃক্ত হয়েছে। রাজনীতির প্রাথমিক নিয়ম ও রাজার প্রজাপালনের জন্য অবশ্যপালনীয় যে নিয়ম ও সতর্কতা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে মহাভারতকার রামায়ণ ও মনুর মতবাদেই বিশ্বাসী বলা যেতে পারে। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত রামায়ণে ভরতের উদ্দেশে রাম-কথিত উপদেশাবলীর সঙ্গে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে নারদ-কথিত বক্তব্যগুলির সাদৃশ্য এই অভিমতের সপক্ষেই সাক্ষ্য বহন করে।

---

৯৮. স্বধীতস্যাপি চ ফলং দৃশ্যতেঽমুত্র চেহ চ।
ইহলোকেঽথবা নিত্যং ব্রহ্মলোকে চ মোদতে॥ ১৩।৭৫।১৩
যো ব্রুয়াচ্চাপি শিষ্যায় ধর্ম্যাং ব্রাহ্মীং সরস্বতীম্।
পৃথিবীগোপ্রদানাভ্যাং তুল্যং স ফলমশ্নুতে॥ ১৩।৬৯।৫

৯৯. যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ॥
নিত্যস্বাধ্যায়শীলত্বান্নান্যৎ কুর্বন্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি ২।৩২।১৮ গ.ঘ. —১৯ ক.খ

১০০. আশ্রমাদাশ্রমমেবং শিষ্যো বর্তেত কর্মণা।
বেদব্রতোপবাসেন চতুর্থে চায়ুষো গতে॥ ১২।২৪২।২৮

মহাভারতের স্থানে স্থানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা থাকলেও এই মহাকাব্যটির সমাজ-জীবন রামায়ণের ন্যায় রাজতন্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত হত। রাজাকে উভয় মহাকাব্যেই প্রজাপতির তুল্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাজতান্ত্রিক শাসনে উভয় মহাকাব্যের সমাজ-জীবন পরিচালিত হত বলে রাজা, রাজ্য বা রাজার নৈতিকতা অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ হলে প্রজাগণ সুখে বাস করতে পারবে এ সম্বন্ধে অগণিত কথা উভয় মহাকাব্যে যুক্ত হয়েছে। এখানে এই-সকল বিষয়ে উভয় মহাকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।[১০১]

অরাজক রাজ্যের অবস্থা : রাজ্যে রাজা না থাকলে সমাজে নানারকম দুর্নীতির আবির্ভাব ঘটে। রামায়ণে রাম বনে গমন করলে লক্ষ্মণও তাঁর সঙ্গী হলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তখন অযোধ্যায় অনুপস্থিত। এ অবস্থায় মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের নিকট শীঘ্রই ইক্ষ্বাকুবংশের কোনো ব্যক্তিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁরা অরাজক রাজ্যের নানা অনিষ্টের আশঙ্কা করে বললেন—'রাজ্যে রাজা না থাকলে মেঘ বর্ষণ করে না। বীজ বপন করা হয় না। পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর অধীনে থাকে না।[১০২] সকলে ধনহীন হয়। ভার্যাও গৃহে বাস করে না। অরাজক রাজ্যে এরূপ অতিশয় ভয় উপস্থিত হয়। অরাজক রাজ্যে দৃঢ়ব্রত জিতেন্দ্রিয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না। বহুধনশালী ব্রাহ্মণেরা মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে ঋত্বিকদিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেন না।

অরাজক রাজ্যে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা হয় না। অরাজক রাজ্যে কোনো বস্তুই কারো নিজস্ব হয় না, মানুষেরা মাছের ন্যায় সব সময় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে।[১০৩]

১০১. এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামায়ণে ভরতের প্রতি রামের উপদেশ ও মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উপদেশের সাম্য দেখানোর সময় কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এখানে রামায়ণে উদ্ধৃত এই-সকল রাজনীতি বিষয়ক উপদেশের সঙ্গে মহাভারতে সভাপর্বে নারদ-কথিত উপদেশ ছাড়াও অন্যান্য স্থলে মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণের মিল দেখানো হবে।

১০২. নারাজকে জনপদে বিদ্যুন্মালী মহাস্বনঃ।
অভিবর্ষতি পর্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণা।
নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্যতে।
নারাজকে পিতুঃ পুত্রো ভার্য্যা বা বর্ততে বশে॥ ২।৬৭।৯-১০

১০৩. নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্॥ ২।৬৭।৩১

অরাজক রাজ্য সম্বন্ধে এই ধরনের বহু অশুভ লক্ষণের আশঙ্কার কথা ব্রাহ্মণগণের বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। (২।৬৭।৮-৩২)

মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে অরাজক রাজ্যের অনিয়মের প্রসঙ্গে যে-সকল কথা বলেছেন সেগুলির সঙ্গে রামায়ণোক্ত বাক্যগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

অরাজক রাজ্য সম্বন্ধে পিতামহের বক্তব্য— রাজ্য অরাজক হলে কোনো ব্যক্তিই নির্বিঘ্নে স্ত্রীসম্ভোগ ও ধর্ম উপভোগ করতে পারে না। ওই সময় পাপীরা অন্যের ধন অপহরণ করে আনন্দিত হয়। কিন্তু যখন অপরাপর ব্যক্তিরা তার ধন হরণ করে তখন সে রাজার সাহায্য আশা করে। অতএব অরাজক রাজ্য পাপীদের পক্ষেও সুখাবহ হয় না। ওই সময় দু-জন পাপী একত্র হয়ে এক ব্যক্তির এবং অনেক ব্যক্তি একত্র হয়ে দু-জনের ধন অপহরণ করে। ধনবান ব্যক্তি দুর্বলকে আপনার দাস করে রাখে এবং বল-পূর্বক পরস্ত্রী হরণে প্রবৃত্ত হয়। জলের বিশাল মাছেরা যেমন ক্ষুদ্র মাছগুলিকে খায় বলবান ব্যক্তিগণ সেরূপ দুর্বল ব্যক্তিদিগকে খেতে উদ্যত হয়।[১০৪]

এই পর্বে পিতামহ ভীষ্ম রাজার অভাবে রাজ্যের করুণ অবস্থা আরো বিশদভাবে 'বসুমনা ও বৃহস্পতি সংবাদ' নামক প্রাচীন উপাখ্যানের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন (১২! ৬৮ অধ্যায়)। এখানেও রামায়ণে বশিষ্ঠের উদ্দেশে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য বর্তমান।

রাজ্যাধিকার : রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী। এই সিদ্ধান্তই রামায়ণে একাধিকবার ঘোষিত হয়েছে।

ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বলেছেন, আমি যদি কুলধর্ম থেকেই ভ্রষ্ট হই তবে রাজধর্মের দ্বারা কী হবে? হে নরশ্রেষ্ঠ! আমাদের

১০৪. ন ধনার্থো ন দারার্থস্তেষাং যেষামরাজকম্।
প্রীয়তে হি হরন্ পাপঃ পরবিত্তমরাজকে।
যদাস্য উদ্ধরন্ত্যন্যে তদা রাজানমিচ্ছতি॥
পাপা হ্যপি তদা ক্ষেমং ন লভন্তে কদাচন।
একস্য হি দ্বৌ হরতো দ্বয়োশ্চ বহবোঽপরে॥
অদাসঃ ক্রিয়তে দাসো হ্রিয়ন্তে চ বলাৎ স্ত্রিয়ঃ।
জলে মৎস্যানিবাভক্ষ্যন্ দুর্বলং বলবত্তরাঃ॥
অরাজকাঃ প্রজাঃ পূর্বং বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পরস্পরং ভক্ষয়ন্তো মৎস্যা ইব জলে কৃশান্॥ ১২।৬৭।১২ গ. ঘ.—১৭

পূর্বপুরুষগণের চিরন্তন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকলে কনিষ্ঠ কখনো রাজ্যাধিকারী হয় না।[১০৫]

অন্যত্র শত্রুঘ্নের মুখেও এই মন্তব্যই ঘোষিত হয়েছে। উত্তরকাণ্ডে রাম শত্রুঘ্নকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতে অভিলাষী হলে শত্রুঘ্ন বললেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকতে আমি কীভাবে রাজ্যে অভিষিক্ত হতে পারি ?[১০৬] পরে অবশ্য রামের ইচ্ছানুসারে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হতে সম্মত হন।

ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠের রাজ্যপ্রাপ্তিই কুল-নিয়ম ছিল বলা যেতে পারে।[১০৭] কুলপুরোহিত বশিষ্ঠও রামকে এই কথাই বলেছেন।

ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং রাজা ভবতি পূর্বজঃ।
পূর্বজে নাবরঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে॥ ২।১১০।৩৬

ভরত এই নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ছিলেন বলেই দীর্ঘদিন রামের পাদুকা রাজসিংহাসনে বসিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে রাজকার্য পরিচালনা করে কুলমর্যাদার যথেষ্ট মূল্য দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে জ্যেষ্ঠের রাজ্যপ্রাপ্তির অগ্রাধিকার ইক্ষ্বাকুবংশের কুলাচার হলেও জ্যেষ্ঠ না হয়েও রাজ্যপ্রাপ্তির সমর্থনে বক্তব্য রামায়ণে মেলে। অযোধ্যাকাণ্ডে সুমন্ত্র রামকে বনবাসে রেখে অযোধ্যায় ফিরে এলে রাজা দশরথ তাঁর উদ্দেশে কী বলেছেন জানতে চাইলেন। সুমন্ত্র দশরথ ও কৌশল্যার উদ্দেশে রামের মন্তব্য দশরথের নিকট নিবেদন করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন— কৌশল্যার উদ্দেশে রাম বলেছেন যে, তিনি যেন ভরতের প্রতি রাজার প্রাপ্য ব্যবহার করেন। তিনি যেন রাজধর্ম স্মরণ করেন, জ্যেষ্ঠ না হয়েও রাজা হতে পারে।[১০৮] আমাদের মনে হয় রাম এখানে সাধারণ রাজধর্মের নিয়মের কথাই মাতা কৌশল্যাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মহাভারতে বংশগত রাজ্যাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্বদা রাজ্যাধিকারী হননি। অবশ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিছু-না-কিছু কারণ এই সকল

১০৫. কিং মে ধর্মাদ্ বিহীনস্য রাজধর্মঃ করিষ্যতি।
শাশ্বতোঽয়ং সদা ধর্মঃ স্থিতোঽস্মাসু নরর্ষভ।
জ্যেষ্ঠে পুত্রে স্থিতে রাজা ন কনিয়ান্ ভবেন্নৃপঃ॥ ২।১০২।১ গ.ঘ.-২

১০৬. অধর্মং বিদ্ম কাকুৎস্থ অস্মিন্নর্থে নরেশ্বর।
কথং তিষ্ঠৎসু জ্যেষ্ঠেষু কনীয়ানভিষিচ্যতে॥ ৭।৬৩।২

১০৭. দশরথ কৈকেয়ীর উদ্দেশে বলেছেন—
সততং রাজপুত্রেষু জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে (রাজ্যেঽভিষিচ্যতে)।
রাজ্ঞামেতৎ সমং তৎ স্যাদিক্ষ্বাকূণাং বিশেষতঃ॥ ২।৭৩।২২

১০৮. কুমারে ভরতে বৃত্তির্বর্তিতব্যা চ রাজবৎ।
অপ্যজ্যেষ্ঠা হি রাজানো রাজধর্মমনুস্মর॥ ২।৫৮।২০

ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে যযাতির বংশে পুরু কনিষ্ঠ হয়েও রাজ্যাধিকারী হলেন। অন্য চার জন তাঁর জ্যেষ্ঠ হয়েও রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন পিতার অবাধ্য হওয়ার জন্য।

আবার শান্তনু হলেন পিতার তৃতীয় সন্তান। দেবাপি জ্যেষ্ঠ হয়েও সিংহাসনের অধিকার হারালেন। শান্তনু কৌশলে দেবাপিকে তাঁর প্রাপ্য রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ছোটো ভাই পাণ্ডু রাজসিংহাসনে বসেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অনেকে পাণ্ডবদের রাজ্য পাওয়ার দাবিকে অসংগত বলে ব্যাখ্যা করেন। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁদের যুক্তি হল— ভীষ্ম যেমন স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করেছিলেন দুর্যোধনেরা কিন্তু তেমন স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করতে চাননি। দুর্যোধনরা একশত ভাই-ই ছিলেন রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারী। কারণ তাঁরা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের রক্তের সম্পর্কের পুত্র।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল কুরুবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হবে, কনিষ্ঠ রাজ্যের অধিকারী হবে না— এ নিয়ম বরাবর অনুসৃত হয়নি। পুরু, শান্তনু এবং পাণ্ডু এই তিন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। পুরু বংশের রক্তের কথা যদি তোলা যায় তবে বলতে হবে যে, ধৃতরাষ্ট্রের শরীরেই তো পুরুর রক্ত ছিল না। সুতরাং দুর্যোধনাদির ধমনীতেও পুরুর রক্ত প্রবাহিত হয়নি। তাই এই দৃষ্টিতে দুর্যোধনেরা রাজ্যের অধিকারী আর যুধিষ্ঠিরেরা রাজ্যাধিকারী নন এ কথা উঠতেই পারে না। ধৃতরাষ্ট্র নিজে অভিষিক্ত রাজা ছিলেন না। তিনি পাণ্ডুর প্রতিভূ হয়ে রাজ্য দেখাশোনায় নিযুক্ত ছিলেন মাত্র। পাণ্ডু রাজ্যে ফিরে না আসায় কার্যত তিনি রাজদণ্ডের অধিকারী হন। সুতরাং পাণ্ডুর সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পৈতৃক রাজ্য পাবার চেষ্টা করবেন এতে অন্যায় কোথায় ? আবার দ্রৌপদীর বিবাহ উপলক্ষে পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের ডেকে এনে পৈতৃক রাজ্যের একাংশে অধিষ্ঠিত করেন। পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র-প্রদত্ত সেই অরণ্যভূমিতে ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন করেন এবং আশেপাশের অনেক রাজ্য জয় করে নিজেদের রাজ্যসীমা বাড়িয়ে তোলেন। দ্বিতীয়-দ্যূত-ক্রীড়ার শর্তানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত এবং স্ব-বাহুবলে অর্জিত রাজ্যের অধিকার তেরো বছরের জন্য ত্যাগ করে পাণ্ডবেরা বনবাসী হন। এই তেরো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁদের স্বীয় রাজ্য ফিরে পেতে চাওয়ায় দোষ দেখা যায় না। এমন-কি শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধেও দুর্যোধনেরা পাঁচখানা গ্রামও দিতে অস্বীকার করেন। আবার যদি বলা হয় অর্জুন অজ্ঞাতবাসের কাল অতিক্রম করার পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কারণ তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করে কৌরবদের পরাজিত করে আবার আত্মগোপন করেন। এই যুক্তির বিপক্ষে বলা যায় যে ওই সময় কেউ-ই পাণ্ডবদের চিনতে পারেননি। সুতরাং বৈধতার নিরিখে

পাণ্ডবদের নিজ রাজ্য ফিরে পাবার দাবি কোনো দিক দিয়েই অসংগত বলা চলে না।

রাজাই সমাজের রক্ষক : উভয় মহাকাব্যেই রাজাকে সমাজের রক্ষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম রাজধর্ম প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে একাধিক বার একথা বলেছেন (১২।৬৭-৬৮)। রামায়ণেও রাজা সম্বন্ধে বলা হয়েছে— রাজা পিতা মাতা, রাজাই সকলের হিতকারী। সৎ এবং অসৎ কার্য-নির্ণয়কারী রাজা যদি এই সংসারে না থাকতেন তা হলে এই সংসার অন্ধকারে ঢেকে যেত, সৎ বা অসৎ কিছুই জানা যেত না।[১০৯]

উভয় মহাকাব্যেই রাজা সমাজের রক্ষক হিসেবে স্বীকৃত।

রাজা দেবতাস্বরূপ : রামায়ণে ভরত রামের উদ্দেশে বলেছেন— সাধারণত রাজাকে মানুষ বলেই লোকে ভাবে কিন্তু আমার মতে রাজা দেবতাস্বরূপ। তাঁর কারণ রাজার ধর্মার্থ-সমন্বিত চরিত্র মানুষের মধ্যে কখনো সম্ভব হয় না।[১১০] রাবণও মারীচের উদ্দেশে একথা বলেছেন (৩।৪০।১২)। আবার কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে রাম বালীকে বলেছেন— 'দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে'। (৪।১৮।৪২ গ.ঘ.)।

মহাভারতেও একাধিক স্থানে এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। রাজার চরিত্রে কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন এ বিষয়ে মহাভারতকার ইন্দ্র, বৃহস্পতি, উশনা, মনু প্রভৃতির অভিমত গ্রহণ করেছেন। ভীষ্মের মুখেও রাজা যে ভগবানের বিভূতিস্বরূপ তা ব্যক্ত হয়েছে। বিভূতিযোগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশে বলেছেন নরগণের মধ্যে আমি নরাধিপ। 'নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ'।[১১১] বনপর্বে অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজা বৈন্যের সম্বন্ধে এই কথাই বলা হয়েছে।[১১২]

রাজার সহজাত গুণাবলী : রাজা কতকগুলি সহজাত গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই সহজাত গুণাবলীর প্রসঙ্গে রামায়ণে উক্ত হয়েছে— রাজা নিজ আচরণের দ্বারা যম, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি মহাবলবান দেবগণকে অতিক্রম

১০৯. রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্॥ ২।৬৭।৩৪ গ. ঘ.
অহো তম ইবেদং স্যান্ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন।
রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী॥ ২।৬৭।৩৬

১১০. রাজানং মানুষং প্রাহুর্দেবত্বে সম্মতো মম।
যস্য ধর্মার্থসহিতং বৃত্তমাহুরমানুষম্॥ ২।১০২।৪

১১১. ৬।৩৪।২৭

১১২. রাজা বৈ প্রথিতো ধর্মঃ প্রজানাং পতিরেব চ।
স এব শক্রঃ শুক্রশ্চ স ধাতা চ বৃহস্পতিঃ॥ ১৮৫।২৬

করেন।[১১৩] মনুসংহিতাতেও এর সমর্থন মেলে।[১১৪] মহাভারতকারও এ বিষয়ে একমত।[১১৫]

উভয় মহাকাব্যে নানা স্থলে আদর্শ রাজার অনুসরণীয় অসংখ্য উপদেশের কথা পাওয়া যায়। যে-সকল স্থলে উভয় মহাকাব্যকারের বক্তব্য অভিন্ন সেগুলি যথাসম্ভব দৃষ্টান্তযোগে আলোচনা করা যেতে পারে—

ধর্ম অর্থ ও কামের নিয়মিত ভোগ : ধর্ম অর্থ ও কামের সমষ্টিকে ত্রিবর্গ বলে। আদর্শ রাজার কর্তব্য এই ত্রিবর্গের নিয়মিত সেবা। রামায়ণে রাম ভরতকে এই ত্রিবর্গের নিয়মিত সেবা করার উপদেশ দিয়েছেন (২।১০০।৬৩)। সুগ্রীবের উদ্দেশেও রাম বলেছেন—

ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ কালে যস্তু নিষেবতে॥
বিভজ্য সততং বীর স রাজা হরিসত্তম।
হিত্ব ধর্মং তথার্থং চ কামং যস্তু নিষেবতে॥ ৪।৩৮।২০ গ.ঘ.-২১

আবার কুম্ভকর্ণও রাবণের উদ্দেশে বলেছেন— হে রাক্ষসরাজ, নীতিজ্ঞ পুরুষ ধর্ম অর্থ ও কাম অথবা সমস্ত স্বীয় সময় অনুসারে সেবা করবেন। কিংবা তিনটির বিরোধে ধর্ম-অর্থ, অর্থ-ধর্ম এবং কাম-অর্থ এই ক্রমে যথা সময়ে সেবনীয়। উপযুক্ত সময়ে ধর্ম, অর্থ ও কামের যিনি সেবা করেন তিনি ইহলোকে কখনো দুঃখ পান না।[১১৬]

মহাভারতেও সভাপর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নারদ উপরোক্ত উপদেশই দান করেছেন (৫।১৮-২০)। উদ্‌যোগপর্বেও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন— যিনি যথাসময়ে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন তিনি ইহকালে ও পরকালে তাই প্রাপ্ত হন।[১১৭]

১১৩. যমো বৈশ্রবণঃ শক্রো বরুণশ্চ মহাবলঃ।
বিশিষ্যন্তে নরেন্দ্রেণ বৃত্তেন মহতা ততঃ॥ ২।৬৭।৩৫

১১৪. ৭। ৪-৫

১১৫. ন হি জাত্ববমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥
কুরুতে পঞ্চরূপাণি কালযুক্তানি যঃ সদা।
ভবত্যগ্নিস্তপাঽহদিত্যো মৃত্যুর্বৈশ্রবণো যমঃ॥ ১২।৬৮।৪০-৪১

১১৬. ধর্মমর্থং হি কামং বা সর্বান্ বা রক্ষসাং পতে।
ভজেত পুরুষঃ কালে ত্রীণি দ্বন্দ্বানি বা পুনঃ॥
কালে ধর্মার্থকামান্ যঃ সম্মন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ।
নিষেবেতাত্মবাঁল্লোকে ন স ব্যসনমাপ্নুয়াৎ॥ ৬।৬৩।৯, ১২

১১৭. যো ধর্মমর্থং কামং চ যথাকালং নিষেবতে।
ধর্মার্থকামসংযোগং সোঽমুত্রেহ চ বিন্দতি॥ ৩৭।৫০

আবার শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই উপদেশ দিয়ে বলেছেন— রাজার পর্যায়ক্রমে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা কর্তব্য।[১১৮]

উৎকৃষ্ট ও বিবেচক মন্ত্রী নিয়োগ : রামায়ণে রাম ভরতকে জিজ্ঞেস করেছেন শূর শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসম ব্যক্তিকে মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেছ তো ? (২।১০০।১৫)।

আবার কুম্ভকর্ণ রাবণের উদ্দেশে বলেছেন— রাজা, অর্থতত্ত্বজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবী মন্ত্রিগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করে নিজের মঙ্গল যাতে হয় এমন কাজ করবেন। পশুর মতো বুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রিগণের সঙ্গে বুদ্ধিমান মন্ত্রিগণের সহাবস্থান সম্ভব নয়। কারণ এরূপ পশুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ জানে না, মূর্খতাবশতই কথা বলে। যারা মূর্খতাবশত অহিতকর বাক্যকে হিতরূপে কল্পনা করে সেরূপ কর্মদুষ্টকারিগণকে মন্ত্রণা থেকে বাইরে রাখা রাজার একান্ত কর্তব্য।[১১৯]

মহাভারতেও পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— বিশেষভাবে পরীক্ষা না করে সচিব নিয়োগ করা উচিত নয়। সৎকুলজাত সচিব অবমানিত হলেও রাজ্যের অমঙ্গল চিন্তা করেন না। কিন্তু ক্ষুদ্রকুলজাত সচিব সৎসঙ্গে থাকলেও স্বভাব ত্যাগ করেন না। কখনো আবার সামান্য কারণে শত্রুতা করেন। সুতরাং রাজার বিবেচনা করে কুলীন, শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানবিজ্ঞান-পারগ, সহিষ্ণু, যিনি পবিত্র দেশে জন্মেছেন, কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, লব্ধ-সন্তুষ্ট, প্রভু ও মিত্রের ঐশ্বর্যকামী, দেশকালজ্ঞ, তত্ত্বান্বেষী, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ, ইঙ্গিতাকারজ্ঞ, পৌরজ্ঞানদপ্রিয়, শুচি, অস্তব্ধ, মৃদুভাষী, ধীর সন্ধিবিগ্রহজ্ঞানবান এবং প্রিয়দর্শন ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বে বরণ করা উচিত (১২।১১৮।৪-১৫)।

আবার বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে বলেছেন— সুহৃৎ বা পণ্ডিত হলেই যে সচিব পদের যোগ্য হবে এমন নয়, সুহৃৎ মূর্খ হতে পারেন এবং পণ্ডিত চপলবাক্ হতে পারেন। অতএব পরীক্ষা না করে কোনো ব্যক্তিকে নিজ সচিব পদে নিযুক্ত করবেন না।[১২০]

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি বিষয়ক নানা উপদেশের সঙ্গে

১১৮. ধর্মাশ্চার্থশ্চ কামশ্চ সেবিতব্যোঽথ কালতঃ। ৬৯। ৭০ ক. খ.

১১৯. হিতানুবন্ধমালোক্য কুর্যাৎ কার্যমিহাত্মনঃ।
রাজা সহার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ সচিবৈর্বুদ্ধিজীবিভিঃ॥
অনভিজ্ঞায় শাস্ত্রার্থান্ পুরুষাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
প্রাগল্ভ্যাদ্ বক্তুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিষ্বভ্যন্তরীকৃতাঃ॥ ৬।৬৩।১৩-১৪

১২০. অপণ্ডিতো বাপি সুহৃৎ পণ্ডিতো বাপ্যনাত্মবান্।
নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ কুর্যাৎ সচিবমাত্মনঃ॥ ৫।৩৮।১৯

বলেছেন— শীলবান্ কুলীন বিদ্বান ও ধর্মার্থকুশল ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিত্বে নিয়োগ করা কর্তব্য।[১২১]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল মন্ত্রী-নিয়োগ ব্যাপারে উভয় মহাকাব্যকারের বক্তব্য এক।

কমপক্ষে তিনজন অথবা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করা কর্তব্য : রামায়ণে রাম ভরতকে অন্ততপক্ষে তিনজন অথবা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১২২]

মহাভারতেও এই মতের সমর্থন মেলে।[১২৩] তবে এখানে পাঁচজন বিচক্ষণ মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও পাওয়া যায়।[১২৪]

উপযুক্ত গুপ্তচর নিয়োগ : বিশেষ বিবেচনাপূর্বক রাজ্যে উত্তম গুপ্তচর নিয়োগ করা উভয় মহাকাব্যে রাজার অবশ্যকর্তব্য রূপে স্বীকৃত। রামায়ণে শূর্পণখা রাবণকে কর্কশ বাক্যে তিরস্কার করার সময় বলেছে— তুমি উত্তম রূপে চর নিয়োগ কর না এবং তোমার চিত্তও চঞ্চল, অতএব তুমি আত্মতত্ত্বজ্ঞ দেব, দানব ও গন্ধর্বগণের সঙ্গে বিরোধ করে কীভাবে রাজত্ব করবে? যে-সকল রাজার গুপ্তচর ধনাগার ও রাষ্ট্রনীতি নিজের আয়ত্তে থাকে না সে-সকল রাজা সাধারণের তুল্য। যেহেতু রাজারা দূরের বিষয় গুপ্তচরের দ্বারা দেখেন সেহেতু তাঁদের দূরদর্শী বলা হয়। আমার মনে হচ্ছে যে তুমি উত্তমরূপে চর নিয়োগ করনি এবং তোমার মন্ত্রীরাও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, কেননা জনস্থান ও সেখানে অবস্থিত আত্মীয়গণ যে নিহত হয়েছে তা তুমি জানতে পারনি।[১২৫]

মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বলেছেন— রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করে সর্বদা রাষ্ট্রের বাইরের ও ভিতরের, পুরীর এবং জনপদের খবর

১২১. শীলবদ্ভিঃ কুলীনৈশ্চ বিদ্বদ্ভিশ্চ যুধিষ্ঠির।
মন্ত্রিণশ্চৈব কুর্বীথা দ্বিজান্ বিদ্যাবিশারদান্॥ ১৫।৫। ২০

১২২. মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টং চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা। ২।১০০।৭১ ক. খ.

১২৩. মন্ত্রিণঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ স্যুস্ত্র্যবরা মহদীপ্সবঃ। ১২।৮৩। ৪৭ গ. ঘ.

১২৪. পঞ্চোপধাব্যতীতাংশ্চ কুর্য্যাদ্রাজার্থকারিণঃ। ১২।৮৩।২২

১২৫. আত্মবদ্ভির্বিগৃহ্য ত্বং দেবগন্ধর্বদানবৈঃ।
অযুক্তচারশ্চপলঃ কথং রাজা ভবিষ্যসি॥
যেষাং চারাশ্চ কোশশ্চ নয়শ্চ জয়তাং বর।
অস্বাধীনা নরেন্দ্রাণাং প্রাকৃতৈস্তে জনৈঃ সমাঃ॥
যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান্ সর্বানর্থান্ নরাধিপাঃ।
চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানো দীর্ঘচক্ষুষঃ॥
অযুক্তচারং মন্যে ত্বাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতঃ।
স্বজনঞ্চ জনস্থানং নিহতং নাববুধ্যসে॥ ৩।৩৩।৭, ৯-১১

জানবেন। পরে স্বীয় কর্তব্য স্থির করবেন। মন্ত্র কোষ, দণ্ড— সবই গুপ্তচরের উপর নির্ভর করে। তিনি রাজ্য গ্রাস ও নগরে চর প্রয়োগ করে উদাসীন, শত্রু ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্যালোচনা করবেন এবং সর্বদা মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহ অবলম্বন করবেন। চরই রাজাদের চক্ষুস্বরূপ।[১২৬]

আশ্রমবাসিক পর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশেও এই কথা এসেছে।[১২৭]

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডনীতির প্রয়োগ : রামায়ণে রাম-কর্তৃক বাণবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালী তাঁর উদ্দেশে বলেছেন— হে রাজন্, সাম, দান, ধৈর্য, সত্য, ধর্ম, পরাক্রম, ক্ষমা ও অপরাধীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া সমস্ত রাজার প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ।[১২৮]

অন্যত্র কুম্ভকর্ণও রাবণের উদ্দেশে বলেছেন— যে রাজা ক্ষয় বৃদ্ধি ও স্থানরূপে উপলক্ষিত সাম, দান ও দণ্ড এই তিন প্রকার কাজ পাঁচ প্রকারে প্রয়োগ করেন তিনিই আদর্শ রাজা।[১২৯]

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে রাম বালীর সাম, দান ও অর্থ প্রভৃতির যথাযোগ্য প্রয়োগের কথা বলেছেন (২৫।৯)। সাম, দান ও দণ্ড নীতির প্রয়োগ বিষয়ে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে মহাভারতে ব্যাপক আলোচনা বর্তমান।

পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বলেছেন— আদর্শ রাজার উচিত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারটির যে-কোনো উপায় দ্বারা শত্রুপক্ষকে বশে আনা। একটি উপায় প্রয়োগ করে অকৃতকার্য হলে একাধিক উপায় প্রয়োগ করা কর্তব্য।

১২৬. বাহ্যমাভ্যন্তরং চৈব পৌরজানপদং তথা।
চারৈঃ সুবিদিতং কৃত্বা ততঃ কর্ম প্রযোজয়েৎ॥
চরান্মন্ত্রং চ কোশং চ দণ্ডং চৈব বিশেষতঃ।
অনুতিষ্ঠেৎ স্বয়ং রাজা সর্বং হ্যত্র প্রতিষ্ঠিতম্॥
উদাসীনারিমিত্রাণাং সর্বমেব চিকীর্ষিতম্।
পুরে জনপদে চৈব জ্ঞাতব্যং চারচক্ষুষা॥ ১২।৮৬।১৯-২১

১২৭. বিবিধস্য মহারাজ বিপরীতং বিবর্জয়েঃ।
চারৈর্বিদিত্বা শত্রূংশ্চ যে রাজ্ঞামন্তরৈষিণঃ। ৫। ৩৭

১২৮. সাম দানং ক্ষমা ধর্মঃ সত্যং ধৃতিপরাক্রমৌ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু॥ ৪।১৭।২৯

১২৯. ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্মণাং যঃ প্রপদ্যতে।
সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্ বর্ততে পথি॥ ৬।৬৩।৭
কাজ আরম্ভ করার উপায়, পুরুষ এবং সম্পত্তি, দেশকালের বিভাগ, বিপত্তি দূর করার উপায় কার্যসিদ্ধি— এই পাঁচ প্রকার যোগ।

প্রকৃতপক্ষে যাকে যে উপায় দ্বারা বশীভূত করা সম্ভব তাকে সেই উপায়ে নিজের অনুকূলে আনা উচিত।[১৩০] তিনি আরো বলেছেন— রাজ্যলাভার্থী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায়ে অর্থসিদ্ধ হলে কখনো বিগ্রহে লিপ্ত হবেন না। সাম, দান ও ভেদ দ্বারা যে অর্থলাভ হয় পণ্ডিতগণ তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। এ হল বৃহস্পতির অভিমত।[১৩১]

অন্যত্র পিতামহ ভীষ্ম-কথিত 'ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদে' বৃহস্পতি ইন্দ্রের উদ্দেশে বলেছেন— শত্রুগণের সামর্থ্য যথাযথভাবে জেনে ভেদনীতি, উৎকোচ প্রদান অথবা বিষ প্রয়োগে শত্রুবলকে দুর্বল করা রাজার কর্তব্য।[১৩২] আদিপর্বে কণিকের মুখে ভেদনীতি সম্বন্ধে ধূর্ত শৃগালের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।[১৩৩]

এইভাবে মহাভারতের বিভিন্ন স্থলে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড নীতির ক্রমিক প্রয়োগ আদর্শ রাজার প্রধান কর্তব্য বলে বর্ণিত হয়েছে।

শম, দম, ধর্ম, ধৈর্য প্রভৃতি আদর্শ রাজার গুণাবলী : রামায়ণে রাম-কর্তৃক বাণবিদ্ধ হয়ে বালী আদর্শ রাজার গুণাবলীর কথা রামকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন— শম, দম, ধর্ম, ধৈর্য, ক্ষমা, বল প্রয়োগ, পরাক্রম ও অপরাধী ব্যক্তিকে উচিত দণ্ডদান— এই সকল রাজাদিগের স্বাভাবিক গুণ।[১৩৪]

মহাভারতেও পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজধর্ম কীর্তন প্রসঙ্গে একাধিক বার রাজার এই-সকল গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন।

উতথ্য যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতাকে যে-সকল উপদেশ দান করেছিলেন পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট সেগুলি উভয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন— এই কথোপকথনে উতথ্য যুবনাশ্বের উদ্দেশে এক স্থলে বলেছেন— রাজা সর্বদা সাবধানে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ, ক্ষমা প্রদর্শন, ধৈর্য অবলম্বন, প্রাণীগণের ক্ষমতা পরীক্ষা ও ভালো মন্দ বিচারে যত্নবান হবেন। যে রাজা

১৩০ দানেনান্যং বলেনান্যমন্যং সুনৃতয়া গিরা।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্যেহ ধার্মিকঃ॥ ১২।৭৫।৩১

১৩১. বর্জনীয়ং সদা যুদ্ধং রাজ্যকামেন ধীমতা।
উপায়ৈস্ত্রিভিরাদানমর্থস্যাহ বৃহস্পতিঃ॥
সান্ত্বেন তু প্রদানেন ভেদেন চ নরাধিপ।
যদর্থং শক্নুয়াৎ প্রাপ্তুং তেন তুষ্যেত পণ্ডিতঃ॥ ১২। ৬৯। ২৩-২৪

১৩২. বলানি দূষয়েদস্য জানন্নেব প্রমাণতঃ।
ভেদেনোপপ্রদানেন সংসৃজেদৌষধৈস্তথা॥ ১২।১০৩।১৬ গ. ঘ.—১৭ ক.খ.

১৩৩. ১৩৯তম অধ্যায়

১৩৪. দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্মো ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু॥ ৪।১৭।১৯

প্রজ্ঞাবান ও মহাপরাক্রান্ত এবং যিনি দণ্ডনীতির অনুশীলন করেন তিনিই কেবল রাজ্যভার বহনে সমর্থ।[১৩৫]

ষাড়গুণ্যের আশ্রয় : রামায়ণে রাম ভরতকে ষাড়গুণ্যের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৩৬] অরণ্যকাণ্ডে কবন্ধ রাজার ছয় প্রকার উপায়ের কথা বলেছেন।

রাম ষড়্‌যুক্তয়ো লোকে যাভিঃ সর্বং বিমৃষ্যতে। ৭২। ৮ ক. খ.)।

মহাভারতেও পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বলেছেন— সন্ধি করে নির্ভয়ে যুদ্ধ, শত্রুতা উৎপাদন করা পর্যন্ত অপেক্ষা, শত্রুর ভয় উৎপাদনের জন্য যাত্রার ছল, দ্বৈধী ভাব ও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ এই ছয়টি যাড়গুণ্য বলে স্বীকৃত। এগুলির যথাযথ প্রয়োগ রাজার অবশ্যকর্তব্য।[১৩৭]

অপরাধী প্রজাকে দণ্ডদান : রাজ্যমধ্যে কোনো প্রজা যদি অপরাধ করে তবে রাজার উচিত তাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া। রামায়ণে উক্ত হয়েছে— রাজা যদি অপরাধীকে দণ্ড না দেন তবে তিনি পাপের ফল ভোগ করবেন। প্রজাপতি মনু এই শ্লোক কীর্তন করেছেন। রাজারাও সেইমতো কাজ করে আসছেন (৪।১৮।৩০-৩২)।

মহাভারতেও শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি পিতামহ ভীষ্মের রাজধর্মের উপদেশে একাধিক স্থানে এ কথা ব্যক্ত হয়েছে।

আদর্শ রাজার পরিত্যজনীয় দোষাবলী : শঠতা প্রমত্ততা প্রভৃতি দোষ রাজার ত্যাগ করা কর্তব্য— রামায়ণে রাবণভগ্নী শূর্পণখা লক্ষ্মণ-কর্তৃক কর্তিত নাসাকর্ণ হয়ে রাবণের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে তিরস্কার করে বলেছে— তুমি লুব্ধ ও প্রমত্ত ও পরাধীন বলেই নিজ রাজ্যে যে-সকল উৎপাত হচ্ছে তা জানতে পারছ না। অল্প দাতা, তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রমত্ত, গর্বিত ও শঠ রাজা বিপন্ন হলে প্রজাগণ তাঁকে রক্ষার জন্য যত্ন নেয় না। অত্যন্ত ক্রোধী অভিমানী ও যিনি নিজেকে

১৩৫. অপ্রমাদেন শিক্ষেথাঃ ক্ষমাংবুদ্ধিং ধৃতিং মতিম্।
ভূতানাং চৈব জিজ্ঞাসা সাধ্বসাধু চ সর্বদা॥
ভারো হি সুমহাংস্তাত রাজ্যং নাম সুদুষ্করম্॥
তদ্দণ্ডবিন্নৃপঃ প্রাজ্ঞঃ শূরঃ শক্নোতি রক্ষিতুম্। ১২। ৯১। ৪৬, ৪৮ গ. ঘ.—৪৯ ক. খ.

১৩৬. ইন্দ্রিয়াণাং জয়ংবুদ্ধা যাড়গুণ্যং দৈবমানুষম্। ॥ ২।১০০। ৬৯ ক. খ.

১৩৭. যাড়্‌গুণ্যমিতি যৎ প্রোক্তং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির।
সংধানাসনমিত্যেব যাত্রাসংধানমেব চ॥
বিগৃহ্যাসনমিত্যেব যাত্রাং সম্পরিগৃহ্য চ।
দ্বৈধীভাবস্তথান্যেযাং সংশ্রয়োঽথ পরস্য চ॥ ১২। ৬৯। ৬৭-৬৮

অভিজ্ঞ ভাবেন এবং যাঁকে অন্যে অভিজ্ঞতার কথা বোঝাতে পারে না, সেই রাজার বা কোনো ব্যক্তির বিপদের সময় আত্মীয়ও তাঁকে বিনাশ করে।[১৩৮]

মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখা যায় কালকবৃক্ষীয় ক্ষেমদর্শীর উদ্দেশে বলছেন— মহারাজ, তোমার কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়, অহংকার ত্যাগ করে করজোড়ে শত্রুগণকে নমস্কার করা কর্তব্য।[১৩৯]

মহাভারতের রাজধর্ম প্রকরণে অসংখ্য স্থানে উপরোক্ত বিষয়গুলি রাজার বিশেষ দোষরূপে বিঘোষিত। এ ছাড়া নাস্তিক্য, দীর্ঘসূত্রতা, মন্ত্রণা প্রকাশ, দিবানিদ্রা প্রভৃতি কামজ দশবর্গ, অনবধানতা, একাকী চিন্তাশীলতা প্রভৃতি অসংখ্য রাজদোষ ত্যাগ করা আদর্শ রাজার অবশ্য কর্তব্য বলে উভয় মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের উদ্দেশে দেয় রাজনীতি-বিষয়ক উপদেশাবলী, অরণ্যকাণ্ডে রাবণের উদ্দেশ্যে কথিত ক্ষুব্ধা শূর্পণখার বাক্যাবলী, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মৃত্যু-পথযাত্রী বালীর ব্যথাতুর হৃদয়ে রামের উদ্দেশে স্ফুরিত খেদোক্তি, যুদ্ধকাণ্ডে রাবণের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত কুম্ভকর্ণের উপদেশাবলী প্রভৃতির মধ্যে যে-সকল রাজনীতি বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায় তার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে বাল্মীকি-চিত্রিত বানর ও রাক্ষস সমাজের রাজনৈতিক সচেতনতা আর্য সভ্যতার তুলনায় কোনো অংশে অনুন্নত ছিল না। বানর ও রাক্ষস রাজ্যের কর্ণধারগণ উন্নত রাজধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। রামের উদ্দেশ্যে কথিত বালীর বাক্যাবলীতে সেই সত্যই পরিস্ফুট। তারার মুখে একাধিক বার তাঁর নৈতিক সচেতনতা ও আত্মসম্ভ্রম বোধের প্রকাশ ঘটেছে। হনুমান বালী-পুত্র অঙ্গদের বিবিধ উন্নত রাজধর্মের কথা রামের কাছে ব্যক্ত করেছেন (৪।৫৪)। কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, শূর্পণখা প্রভৃতি সকলেই রাজধর্মজ্ঞ ছিলেন। রাবণও যথেষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। শত্রুপক্ষ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করবে একথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। তাঁর রাজধানী ছিল বিশেষভাবে সুরক্ষিত। যদিও তিনি উন্নত রাজধর্ম লঙ্ঘন করে নিজেরই বিনাশ ডেকে এনেছিলেন।

রামায়ণে বর্ণিত রাজধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মহাভারতোক্ত রাজধর্মের তুলনা

---

১৩৮. ত্বং তু লুব্ধঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাক্ষস।
বিষয়ে স্বে সমুৎপন্নং যদ্ভয়ং নাববুধ্যসে॥
তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্বিতং শঠম্।
ব্যসনে সর্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্॥
অতিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্॥ ৩।৩৩।১৪-১৬

১৩৯. হিত্বা দম্ভং চ কামং চ ক্রোধং হর্ষং ভয়ং তথা।
অপ্যমিত্রাণি সেবস্ব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১২।১০৫।৫

করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উভয় মহাকাব্যের যুগে আদর্শ রাজার অনুসরণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলি মূলত ছিল অভিন্ন। রামায়ণে প্রশ্নচ্ছলে ভরতের উদ্দেশে কথিত রামের রাজনীতি-বিষয়ক উপদেশগুলির প্রত্যেকটির দীর্ঘায়িত ব্যাখ্যা মেলে মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন পর্বের রাজধর্মগুলির মধ্যে। তবে আদিপর্বে কণিক-বর্ণিত কুটিল রাজনীতির প্রসঙ্গ রামায়ণে অনুপস্থিত। আবার পিতামহ ভীষ্ম-কথিত আপৎকালে রাজার কর্তব্য বিষয়ক নীতি যা 'আপদ্ধর্ম' নামে খ্যাত তার প্রসঙ্গও রামায়ণে আসেনি। তবে মহাভারতে মহর্ষি নারদ, প্রাজ্ঞ বিদুর, পিতামহ ভীষ্ম ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র -কথিত আদর্শ রাজনীতির মূল তথ্যগুলি সবই রামের অধিগত ছিল। সমগ্র রামায়ণে রামের প্রশংসাবসরে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে আদিকবি বাল্মীকি এই সত্য ব্যক্ত করেছেন।

আহার ও আহার্য

রামায়ণে খাদ্য হিসেবে যে-সকল দ্রব্যের বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে অন্নকেই প্রধান বলা যেতে পারে। তণ্ডুল সিদ্ধ করে এই অন্ন প্রস্তুত করা হত।

রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে নানা দেশ থেকে আগত অসংখ্য নরনারী প্রচুর অন্নপানাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। সেখানে পর্বতপ্রমাণ অন্ন পাকশাস্ত্রানুসারে রন্ধন করা হয়েছিল। এই সকল খাদ্য এমন রুচিকর হয়েছিল যে, রুগ্ণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও বালকগণ প্রতিদিন ভোজন করলেও ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি তাদের কোনো অরুচি জন্মায় নি।[১৪০]

রামের অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদির মধ্যে আতপ তণ্ডুলের উল্লেখ আছে।[১৪১] আবার ভরত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করলে মুনি সোমদেবকে উৎকৃষ্ট অন্ন, প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য লেহ্য প্রভৃতি বস্তু প্রস্তুত করার জন্য প্রার্থনা করেন।[১৪২] এখানে পশুখাদ্য হিসেবে কচি যব গাছেরও উল্লেখ আছে।[১৪৩] সুতরাং যব শস্যও মানুষ খাদ্য হিসেবে উৎপাদন করত। তবে

১৪০. বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ।
অনিশং ভুঞ্জমানানাং ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে॥
অন্নকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহবঃ পর্বতোপমাঃ।
নানাদেশাদনুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীগণাস্তথা।
অন্নপানৈঃ সুবিহিতাস্তস্মিন্ যজ্ঞে মহাত্মনঃ॥ ১।১৪।১৩-১৬

১৪১. দধ্যক্ষত-ঘৃতং চৈব মোদকান্ হবিষস্তথা। ২।২০।১৭ গ. ঘ.

১৪২. ইহ মে ভগবান্ সোমো বিধত্তামন্নমুত্তমম্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ চোষ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ বিবিধং বহু॥ ২। ৯১।২০

১৪৩. নীলবৈদূর্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন যবসঞ্চয়ান্। ২। ৯১।৭৯ ক. খ.

যবের খাদ্য কীভাবে তৈরি করা হত তার বর্ণনা নেই। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের অভিষেকে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যেও আতপ তণ্ডুলের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪৪] অযোধ্যা নগরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণা (১।৫।১৭) উত্তরকাণ্ডেও শালিধানের কথা আছে (৭।৩৫।২১)।

মহাভারতেও উল্লিখিত বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ব্রীহি (ধান্য) ও যবের স্থানই প্রধান বলা যেতে পারে। অনুশাসন পর্বে বিবিধ খাদ্যের সঙ্গে ধান ও যবের কথা এসেছে।[১৪৫] এই পর্বে মহর্ষি কশ্যপের কণ্ঠেও ব্রীহি এবং যব প্রধান শস্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।[১৪৬]

অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য : রামায়ণে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, মধু, লাজ, (খই) পায়স, গুড়, আদা, জীরে, শর্করা, দুধ, দই, ঘোল, ঘি, মোদক, কৃসর (তিল) মুদ্গ ও তণ্ডুলের মিশ্রণে পাক করা দ্রব্য, মৎস্য ও মাংসের কথা পাওয়া যায়।[১৪৭] আদিকাণ্ডেও শবলা থেকে উৎপন্ন নানা প্রকার খাদ্যের নাম দেখা যায়—

ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্।
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি॥
উষ্ণাঢ্যস্যৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ।
মৃষ্টান্যন্নানি সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ॥ ১।৫৩।২-৩

মহাভারতেও খাদ্যদ্রব্য হিসেবে রামায়ণোক্ত প্রায় সকল দ্রব্যেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এখানে দই, দুধ ও ক্ষীরের উৎকৃষ্টতা ঘোষিত হয়েছে।[১৪৮] রামায়ণোক্ত কৃসরের কথাও মহাভারতে পাওয়া যায় (১৩।১০৪।৪১), (২।৪।১-৩)।

১৪৪. অক্ষতং জাতরূপঞ্চ প্রিয়ঙ্গুং মধুসর্পিষী। ২৬। ২৭ ক. খ.

১৪৫. বরান্ গ্রামান্ ব্রীহিরসং যবাংশ্চ
রত্নং চান্যদ্ দুর্লভং কি দদানি। ৯৩। ৩০ ক খ.

১৪৬. যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। ৯৩। ৪০ ক. খ.

১৪৭. ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ॥ ২। ১৪। ৩৫ গ. ঘ.
লাজান্মাল্যানি শুক্লানি পায়সং কৃসরং তথা॥ ২। ২০। ১৭ গ. ঘ, ১৮ ক. খ.
ঘৃতপিণ্ডোপমান্ স্থূলাংস্তান্ দ্বিজান্ ভক্ষয়িষ্যথঃ।
রোহিতান্বক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব॥ ৩।৭৩।১৪

১৪৮ অমৃতং বৈ গবাং ক্ষীরমিত্যাহ ত্রিদশাধিপঃ। ১৩।৬৬।৪৫
গবাং রসাৎ পরমং নাস্তি কিঞ্চিৎ। ১৩। ৭১। ৫১ ক.খ.

আরণ্যক ফল মূল : রামায়ণে চিত্রকূট পর্বতে জাত নানাবিধ ফল ও পুষ্প বৃক্ষের কথা পাওয়া যায়।[১৪৯]

অরণ্যকাণ্ডে দিব্যরূপধারী কবন্ধ রামের উদ্দেশে বলেছেন, পম্পার পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেশে প্রচুর জাম, পিয়াল, পাকুড়, আম, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ রয়েছে। আপনি সহজেই ওই সকল বৃক্ষের ফল খেতে পারবেন।[১৫০]

এ ছাড়া আমলকী, বিল্ব, কলা, কুল, আঙুর, কন্দ-ফলমূলও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত।

মহাভারতেও ব্রাহ্মণ এবং বনচারী যোগিগণ ও ব্রতধারী ব্যক্তিগণের ফল-মূল ভোজনের রীতি ছিল। বনপর্বে 'ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে' ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি জনৈকা গণিকাকে কিছু পরিপক্ক আরণ্যক ফল দ্বারা অতিথি সৎকার করেছিলেন। এই আরণ্যক ফলগুলি হল ভল্লাতক, আমলকী, করূষক, ঈঙ্গুদ, ধন্বন্, পিপ্পল প্রভৃতি।[১৫১]

অরণ্যের পর্ণকুটীরে অতিথি সৎকারের প্রাথমিক খাদ্যদ্রব্য হিসেবে আরণ্যক ফলের ব্যবহার উভয় মহাকাব্যেই দেখা যায়।

মাছ : রামায়ণে দিব্যরূপধারী কবন্ধ রামের উদ্দেশে বলেছেন— আপনি পম্পার জলে রোহিত, বক্রতুণ্ড এবং নলমীন নামক মাছ অনায়াসে খাদ্য রূপে ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার অনুরক্ত লক্ষ্মণ বাণের দ্বারা দীর্ঘকায় উৎকৃষ্ট অনেক কাঁটাযুক্ত মাছ বধ করে পাখা ও চামড়া ছাড়িয়ে শলাকায় গেঁথে আগুনে পুড়িয়ে আপনাকে দেবেন।[১৫২]

১৪৯. আম্র জম্বুবসনৈর্লোধ্রৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈর্ধবৈঃ। ইত্যাদি ২।৯৪।৮-১০

১৫০. জম্বুপিয়ালপনসা-ন্যগ্রোধপ্লক্ষতিন্দুকাঃ।
অশ্বত্থাঃ কর্ণিকারাশ্চ চূতাশ্চান্যে চ পাদপাঃ॥
ফলান্যমৃতকল্পানি ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যথঃ॥ ইত্যাদি ৩। ৭৩। ২-৬

১৫১. ফলানি পক্কানি দাদানি তেঽহং
ভল্লাতকান্যামলকানি চৈব।
করূষকাণীঙ্গুদধন্বনানি
পিপ্পলানাং কামকারং কুরুষ্ব। ৩। ১১১। ১৩

১৫২. রোহিতান্ বক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব।
পম্পায়ামিষুভির্মৎস্যাংস্তত্র রাম বরান্ হতান্।
নিস্ত্বক্‌পক্ষানয়স্তপ্তানকৃশানৈককণ্টকান্।
তব ভক্ত্যা সমাযুক্তো লক্ষ্মণঃ সম্প্রদাস্যতি।
ভৃশং তান্ খাদতো মৎস্যান্ পম্পায়াঃপুষ্প সঞ্চয়ে॥ ইত্যাদি ৩।৭৩।১৪-১৬

মহাভারতে মান্ধাতার ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে রোহিত মৎস্যদানের কথা পাওয়া যায়।[১৫৩] আঁশহীন মাছ ব্রাহ্মণদের অভক্ষ্য এরূপ বলা হয়েছে।[১৫৪]

মাংস : উভয় মহাকাব্যে মাছের তুলনায় মাংসের উল্লেখই বেশি দেখা যায়। রামায়ণে ছাগ, বরাহ, মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুট, রুরু, (মৃগবিশেষ) গোধা ইত্যাদি প্রাণীর মাংস খাদ্য হিসেবে প্রচলন ছিল।[১৫৫] মুনিদের আশ্রমেও অতিথি সৎকারের জন্য মাংস সংগৃহীত হত। ভরদ্বাজ মুনি ভরতের আতিথেয়তার উদ্দেশ্যে প্রচুর মাংস ভোজনের ব্যবস্থা করেন।[১৫৬]

রামের অনুপস্থিতিতে রাবণ কুটীরদ্বারে এসে উপস্থিত হলে সীতা তাঁর উদ্দেশে বলেছেন— আপনি কিছু সময় অপেক্ষা করুন, আমার স্বামী রুরু, গোধা, বরাহ বধ করে প্রচুর মাংস আনবেন।[১৫৭]

অরণ্যকাণ্ডে কবন্ধ রামকে পক্ষীমাংস ভক্ষণের কথা বলেছেন।[১৫৮] রাক্ষসদের সিংহ, ভল্লুক, মৃগ, পক্ষী, মানুষ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণের কথা পাওয়া যায়।[১৫৯] যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণের অসংখ্য বানর ভক্ষণের কথা আছে।[১৬০] রাক্ষসদের মাংসাশী বলে বর্ণনা করা হয়েছে— 'রাক্ষসা পিশিতাশনাঃ'। (৫।২৬।৩৪ গ. ঘ.)। হনুমান রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে প্রচুর মাংসের আয়োজন লক্ষ্য করেন (৫।১১।১৫-১৮)। দেবতার উদ্দেশেও মাংস নিবেদন করা হত। সীতা গঙ্গা দেবীর উদ্দেশে মাংস মিশ্রিত অন্ন মানত করেন।[১৬১] চিত্রকূট পর্বতে রাম-লক্ষ্মণ কুটীর নির্মাণ করে বাস্তুদেবতার পুজা করেন। রাম বাস্তুদেবতার পূজায় হরিণমাংস সংগ্রহ করার জন্য লক্ষ্মণকে পাঠান। লক্ষ্মণ রামের নির্দেশমতো কৃষ্ণসার মৃগ আগুনে পাক করে রামকে দেন। রাম সেই মাংস বৈশ্বদেবগণ, রুদ্র ও বিষ্ণুসহ বাস্তুদেবতাকে নিবেদন করেন (২।৫৬)।

এখানে শশক, গণ্ডার, শল্লকী, গোধা এবং কূর্ম এই পাঁচটি পঞ্চনখ পশুকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য পঞ্চনখ প্রাণীর মাংস ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অভক্ষ্য।[১৬২]

---

১৫৩. অদদাদ্ রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশাম্পতে। ১২।২৯।৯১ গ. ঘ.

১৫৪. অভক্ষ্যা ব্রাহ্মণৈর্মৎস্যাঃ শল্কৈর্যে বৈ বিবর্জিতাঃ। ১২।৩৬।২২ ক. খ.

১৫৫. ২। ৯০। ৬৭-৭০

১৫৬. মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি॥ ২।৯১।৫২ গ. ঘ.

১৫৭. রুরূন্ গোধান্ বারাহাংশ্চ হত্বাঽঽদায়ামিষং বহু। ৩। ৪৭। ২৩ গ. ঘ.

১৫৮. ১৩-১৫

১৫৯. ৩। ৬৯। ৩১-৩২, ২৩ ক. খ

১৬০. ৬। ৬৭। ৯৬

১৬১. সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ। ২। ৫২। ৮৯ ক. খ

১৬২ পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ॥ ৪।১৭।৩৯

মহাভারতে সকল প্রকার খাদ্যের মধ্যে মাংসই ব্যবহার হত বেশি। ভোজের প্রসঙ্গে সর্বদাই মাংসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিরাটরাজের রাজপুরীতে ভীম পাচকরূপে থাকার সময় নিজের ভাইদের ছল করে মাংসই বেশি পরিমাণে খাওয়াতেন।[১৬৩] ধনী পরিবারে খাদ্যের মধ্যে মাংসই বেশি ব্যবহৃত হত।[১৬৪]

রামায়ণের ন্যায় এখানেও অরণ্যের কুটিরে অতিথি সংকারের জন্য মাংস ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। জয়দ্রথ মন্দ উদ্দেশ্যে বনে দ্রৌপদীর কুটিরে উপস্থিত হলে দ্রৌপদী অতিথি রূপে উপস্থিত জয়দ্রথকে অভ্যর্থনা করে বলেছেন— আমার স্বামীগণ মৃগয়ায় গিয়েছেন তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলে আপনাকে ঐণেয়, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর, গবয়, মৃগ, বরাহ, মহিষ এবং অন্যান্য পশু দেওয়া হবে।[১৬৫]

পক্ষীর মাংসও মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত।[১৬৬] রামায়ণের ন্যায় এখানেও পঞ্চনখযুক্ত প্রাণীর মধ্যে শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার ও কূর্ম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের খাদ্য ছিল।[১৬৭]

এখানে উল্লেখ্য যে মহাভারতের বিভিন্ন স্থলে মাংস ভোজনের কথা উল্লিখিত হলেও মাংস ত্যাগ করে নিরামিষ আহারেরও যথেষ্ট প্রশংসা দেখা যায়। রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় মহাকাব্যের সমাজেই গোবধ পাপজনক বলে নিষিদ্ধ ছিল।

সুরা : রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহের কাছে বিদায় নিয়ে রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা-পার হবার উদ্দেশ্যে নৌকায় উঠলেন। মাঝিগণ গঙ্গার উপর দিয়ে দ্রুতবেগে নৌকা নিয়ে চলল। নৌকা মাঝ নদীতে পৌঁছলে সীতা গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে নানাবিধ খাদ্যের সঙ্গে সুরা মানত করলেন।[১৬৮]

সুতরাং সুরা দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করা হত। রামায়ণে সুরা এবং মদ্য এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬৩. ভীমসেনোঽপি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ। ৪।১৩।৭ ক. খ.

১৬৪. আঢ্যানাং মাংসপরমং মধ্যানাং গোরসোত্তরম্। ৫। ৩৪। ৪৯ ক. খ.

১৬৫. ঐণেয়ান্ পৃষতান্ন্যঙ্কূন্ হরিণান্ শরভান্ শশান্। ইত্যাদি ৩। ২৬৬ অঃ
(গীতা প্রেস সংস্করণে এই অংশটি গৃহীত হয়নি।)

১৬৬. জরায়ুজাণ্ডজাতানি স্বেদজান্যুদ্ভিদানি চ। ১৪। ৮৫-৩৪ ক. খ.

১৬৭. পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ বিশঃ।
যথা শাস্ত্রং প্রমাণং তে মাভক্ষ্যে মানসং কৃথাঃ॥ ১২।১৪১।৭০

১৬৮. সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা॥ ২।৫২।৮৯

ঐশ্বর্যবান ব্যক্তিগণের বাড়িতে সুরা সঞ্চিত থাকত। এবং ঐ সকল ব্যক্তির গৃহে নর্তকীগণও সুরাপান করত। এ ধরনের দৃষ্টান্ত রামায়ণে অনেক পাওয়া যায়। হনুমান অনেক অনুসন্ধানের পর রাবণের গৃহের সন্ধান পেলে সেখানে তিনি বিভিন্ন ভক্ষ্যদ্রব্যের সঙ্গে সুরার গন্ধ আঘ্রাণ করেন।[১৬৯] পরে নানা রত্নে সজ্জিত রাবণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখেন— নানা অলংকারে অলংকৃতা হাজার হাজার সুন্দরী নারী বিচিত্র আসনে অর্ধেক রাত্রির পর সুরা ও নিদ্রায় বশীভূতা হয়ে রয়েছে।[১৭০] এর পর অশোক বনে রাক্ষসীবেষ্টিতা সীতার সন্ধান পেলে তিনি দেখলেন কিছু করালা, ধূম্রকেশী, বিকৃত নয়না প্রভৃতি মদ্য-মাংস-প্রিয়া রাক্ষসী সর্বদা মদ পান করে চলেছে।[১৭১] রাবণেরও মদ্যপানের কথা পাওয়া যায় (৭।৩২।২৯)।

এই সকল বর্ণনায় রাক্ষস সমাজে নারীদের সুরাপানের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র রাক্ষস রমণীরাই যে সুরাপান করত তা নয়। কিষ্কিন্ধার বানর সমাজেও সুরার ব্যবহার দেখা যায়। বালী-বধের কিছুকাল পর সীতা-উদ্ধার বিষয়ে সুগ্রীবের ঔদাসীন্যে রাম চিন্তিত হয়ে লক্ষ্মণকে পাঠান সুগ্রীবকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য। বালী নিজ রাজ্যে লক্ষ্মণের আগমনবার্তায় উদ্‌বিগ্ন চিত্তে তারাকে পাঠালেন লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। মদমত্ত তারা লজ্জাহীনা হয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন হলেন।[১৭২]

রাবণের সুরাপানের কথা ত্রিজটা রাক্ষসীর মুখে শোনা যায়। রাক্ষসীদের উদ্দেশে তার দেখা স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে বলে স্বপ্নে দেখলাম রক্তবস্ত্রধারী মুণ্ডিতমস্তক করবীর মালাধারী পানমত্ত রাবণ আজ পুষ্পক বিমান থেকে মাটিতে পড়ল।[১৭৩]

দেহের বলবৃদ্ধি ও শরীরকে উত্তেজিত করার জন্য কুম্ভকর্ণের সুরাপানের কথা পাওয়া যায়।[১৭৪]

১৬৯. তত্রস্থঃ সর্বতো গন্ধং পানভক্ষ্যান্নসম্ভবম্॥ ৫।৯।১৯ গ. ঘ

১৭০. পরিবৃত্তেঽর্ধরাত্রে তু পাননিদ্রাবশংগতম্। ৫। ৯। ৩৪ ক. খ.

১৭১. করালা ধূম্রকেশিন্যো রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
পিবন্তি সততং পানং সুরামাংসসদাপ্রিয়াঃ॥ ৫। ১৭।১৬

১৭২. সা পানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা
দৃষ্টিপ্রসাদাচ্চ নরেন্দ্রসূনোঃ।
উবাচ তারা প্রণয়প্রগল্‌ভং
বাক্যং মহার্থং পরিসান্ত্বরূপম্॥ ৪।৩৩।৪০

১৭৩. রক্তবাসাঃ পিবন্মত্তঃ করবীরকৃতস্রজঃ।
বিমানাৎ পুষ্পকাদদ্য রাবণঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ॥ ৫।২৭।২৩

১৭৪. পীত্বা ঘটসহস্রে দ্বে গমনায়োপচক্রমে।
ঈষৎ সমুৎকটো মত্তস্তেজোবলসমন্বিতঃ। ৬। ৬০। ৯৩

রামায়ণে বিভিন্ন প্রকার সুরার বর্ণনা আছে। মৈরেয় সুরা, সৌরীক সুরা প্রভৃতি। রামের এবং হনুমানের মধুপানের কথাও পাওয়া যায়। রাক্ষস ও বানর সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সুরা পান করত। যুদ্ধগমনের পূর্বে যোদ্ধারা শারীরিক বল বৃদ্ধির জন্য সুরা ব্যবহার করত।

মহাভারতে ব্যাপক সুরার আয়োজন দেখা যায়। অভিমন্যুর বিবাহ বাসরে প্রচুর সুরা সংগৃহীত হয়েছিল।[১৭৫] উদ্যোগপর্বের এক স্থানে কৃষ্ণ ও অর্জুন ধৃতরাষ্ট্র-কর্তৃক প্রেরিত দূত সঞ্জয়ের সঙ্গে সুরার নেশায় মত্ত হয়ে বাক্যালাপ করেন।[১৭৬]

উৎসবাদিতে সুরা সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। অভিজাত শ্রেণীর রমণীগণ সুরা পান করতেন। মৎস্যরাজের মহিষী সুদেষ্ণা সুরা পান করতেন। তিনি সুরা সংগ্রহের জন্য দ্রৌপদীকে কীচকের ঘরে পাঠান।[১৭৭] গান্ধারীর বাক্য থেকে আমরা উত্তরার সুরা পানের কথা পাই।[১৭৮] আদি পর্বের এক স্থলে সাধারণ রমণীরও সুরা পানের উল্লেখ দেখা যায়।[১৭৯] বলরামের সুরা পানের কথা মহাভারতের একাধিক স্থানে পাওয়া যায়।[১৮০]

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দেহে মত্ততা ও বল সংগ্রহের জন্য যোদ্ধারা সুরা পান করত।

সুরাপান নিন্দনীয় : রামায়ণে রাম ভরতকে রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ দান করার সময় সুরাকে কামজ ব্যসনের অন্তর্ভুক্ত বলে তা ত্যাগ করতে বলেছেন (২।১০০।৬৭)। লক্ষ্মণ তারার উদ্দেশে বলেছেন— যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ লাভ করতে চান, সুরা তাঁর বিঘ্ন ঘটায়। কারণ সুরাপায়ীর ধর্ম অর্থ কাম কিছুই সিদ্ধ হয় না।[১৮১]

আজকের সমাজের ন্যায় অ-প্রকৃতিস্থ সুরাপায়ীর প্রতি রামায়ণের সমাজের মানুষেরও শ্রদ্ধা ছিল না। কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামের বন-গমন ও ভরতের

১৭৫. ভক্ষ্যান্নভোজ্যপানানি প্রভূতান্যভ্যহারয়ন্॥ ৪।৭২।২৮ ক. খ

১৭৬. উভৌ মধ্বাসবক্ষীবাবুভৌ চন্দনরূষিতৌ। ৫। ৫৯। ৫ ক. খ

১৭৭. অপ্রৈষীদ্ রাজপুত্রী মাং সুরাহারীং তবান্তিকম্।
পানমাহর মে ক্ষিপ্রং পিপাসা মেহৃতি চাব্রবীৎ॥ ৪।১৬।৪

১৭৮. লজ্জমানা পুরা চৈনং মাধ্বীকমদমূর্চ্ছিতা। ১১।২০।৭ গ. ঘ

১৭৯. সা পীত্বা মদিরাং মত্তা সপুত্রা মদবিহ্বলা। ১৪৭। ৮ ক. খ

১৮০. ততো হলধরঃ ক্ষীবো রেবতীসহিতঃ প্রভুঃ। ১।২১৮।৭ ক. খ.
বনমালী ততঃ ক্ষীবঃ কৈলাসশিখরোপমঃ। ১।২১৯।২০ ক.খ

১৮১. ন হি ধর্মার্থসিদ্ধ্যর্থং পানমেবং প্রশস্যতে।
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মশ্চ পরিহীয়তে॥ ৪। ৩৩। ৪৬

রাজ্যলাভ-রূপ বর প্রার্থনা করলে দশরথ বলেন— আমি এতদিন তোমার প্রকৃত রূপের পরিচয় পাইনি। আজ তোমাকে অসতী বলতে দ্বিধা নেই। যেমন কোনো ব্যক্তি বিষযুক্ত সুন্দর সুরা পান করার পর শরীরে বিকার উপস্থিত হলে তাকে বিষ বলে বুঝতে পারে, আমার অবস্থাও তাই।[১৮২] তিনি আরও বলেন— যদি পুত্রের পরিবর্তে আমি তোমার প্রীতি সাধন করি তবে আর্যগণ যেমন মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে অনার্য ব'লে নিন্দা করে আমাকেও পথে দেখলে লোকে অনার্য বলবে।[১৮৩]

এখানে ব্রাহ্মণের সুরা পান সামাজিক দৃষ্টিতে যে ভালো ছিল না তাই ব্যক্ত হয়েছে।

মহাভারতের সমাজেও ব্যাপক সুরার ব্যবহার থাকলেও বিভিন্ন স্থলে সুরা পানের নিন্দা দেখা যায়। কর্ণ ও শল্য পরস্পর কলহে লিপ্ত হলে কর্ণ মদ্রদেশের মহিলাদের সুরা পানের নিন্দা করে শল্যকে তিরস্কার করেন।[১৮৪] সুরাই যদুবংশের ধ্বংসের কারণ। একদিন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্য কচকে সুরার সঙ্গে ভক্ষণ করেন। পরে কচ গুরুর নিকট সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করে তাঁর উদর ভেদ করে নির্গত হন। এই ঘটনায় সুরা পানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য তিনি ঘোষণা করেন—'এ জগতে যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ আজ থেকে সুরা পান করবে সে ধর্মহীন ও ব্রাহ্মণ হত্যার পাপে লিপ্ত হয়ে ইহলোক ও পরলোকে নিন্দিত হবে। গুরুসেবাকারী সাধু ব্রাহ্মণগণ দেবগণ ও ক্ষত্রিয় সকলে শুনুন, আমি ব্রাহ্মণ ধর্মের এই নিয়ম জগতে স্থাপন করলাম'। [১৮৫]

এখানে উল্লেখ্য যে বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণগণ অবাধে সোমরস পান করতেন। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগে ব্রাহ্মণগণের সুরা পান ভালো নজরে দেখা হত না। এর ফলস্বরূপ আমরা দেখছি রামায়ণে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণকে অনার্য বলা হয়েছে এবং মহাভারতে নিয়ম করে ব্রাহ্মণের সুবা পান বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধন সামগ্রী

রামায়ণ মহাভারত উভয় মহাকাব্যের যুগেই সমাজের মানুষ নানা প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করত। কার্পাস, পট্ট, রেশম প্রভৃতির তৈরি বস্ত্রের প্রচলন ছিল। সময়

১৮২. ২। ১২। ৭৬

১৮৩. অনার্য ইতি মামার্যাঃ পুত্রবিক্রায়কং ধ্রুবম্।
বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা॥ ২।১২।৭৮

১৮৪. বাসাংস্যুৎসৃজ্য নৃত্যন্তি স্ত্রিয়ো যা মদ্যমোহিতাঃ॥ ৮।৪০।৩৫ গ. ঘ.

১৮৫. যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিংলোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ॥ ১।৭৬।৬৭

বিশেষে মৃগচর্ম ও বল্কলকে পরিধান হিসেবে ব্যবহার করা হত। বস্ত্রের রঙও বিভিন্ন প্রকার হত। মানুষ রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রঙের বস্ত্র ব্যবহার করত। উভয় মহাকাব্যেই রাক্ষসদের নানা ধরনের বস্ত্র পরিধানের কথা পাওয়া যায়। রামায়ণে বানর সমাজেও উত্তম পোশাক ও অলংকার ব্যবহারের কথা মেলে।

শুক্লবস্ত্র উভয় মহাকাব্যেই পবিত্রতা ও শুচিতার দ্যোতক ছিল। রামায়ণে দেখা যায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত অধিকাংশ দ্রব্যই শুক্লবর্ণের ছিল। অভিষেকের সময় শুক্লবস্ত্র পরিধান প্রশস্ত ছিল। ব্রতচারিণী কৌশল্যার শুক্ল-বস্ত্র পরিধান করে দেবতা-তর্পণের কথা পাওয়া যায়।[১৮৬] ত্রিজটা স্বপ্নে রামকে শুক্লবস্ত্র পরিধানকারী ও শুক্লমাল্যধারী দেখে তা শুভ বলে ব্যাখ্যা করে।[১৮৭]

মহাভারতেও শুক্লবস্ত্রকে রামায়ণের সমাজের মতোই শুচি বলে গণ্য করা হত। ব্রাহ্মণগণ সাধারণত শুক্লবস্ত্র পরিধান করতেন, তাঁদের যজ্ঞোপবীতও শুক্লবর্ণের ছিল।[১৮৮]

রক্তবর্ণ বস্ত্র সাধারণ যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হত। রামায়ণে রাবণ যখন সুগ্রীবের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন তখন তাঁর বস্ত্র ছিল রক্তবর্ণ।[১৮৯] আবার ত্রিজটা স্বপ্নে একবার রক্তবস্ত্র-পরিধানকারী মুণ্ডিতমস্তক করবীর পুষ্পমাল্যধারী মত্ত রাবণকে পুষ্পকরথ থেকে পতিত হতে দেখে।[১৯০] আবার কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধানকারী মুণ্ডিতমস্তক গর্দভযুক্ত রথে দেখে।[১৯১] রাবণের উপরোক্ত দুটি অবস্থাকেই ত্রিজটা অশুভ বলে ব্যাখ্যা করেছে। ইন্দ্রজিৎ যখন যজ্ঞভূমিতে হোম করেন তখন রক্তবর্ণের উষ্ণীষধারিণী রমণীগণ সেখানে উপস্থিত ছিল।[১৯২] এই যজ্ঞে ইন্দ্রজিৎ রক্তবস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। অরণ্যকাণ্ডে সীতার পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রের উল্লেখ আছে (৬০।১৩)।

১৮৬. তাং শুক্ল ক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্শিতাম্।
তর্পয়ন্তীং দদর্শাদ্ভির্দেবতাং বরবর্ণিনীম্॥ ২।২০।১৯

১৮৭. শুক্লমাল্যাম্বরধরো লক্ষ্মণেন সমাগতঃ।
স্বপ্নে চাদ্য ময়া দৃষ্টা সীতা শুক্লাম্বরাবৃতা। ৫।২৭।১০ গ. ঘ.—১১ ক. খ.

১৮৮. শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ১৩।১২৭।১৪ ক. খ.

১৮৯. শশলোহিতরাগেণ সংবীতং রক্তবাসমা। ৬। ৪০। ৬ ক. খ.

১৯০. রক্তবাসাঃ পিবন্মত্তঃ করবীরকৃতস্রজঃ।
বিমানাৎ পুষ্পকাদদ্য রাবণঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ॥ ৫।২৭।২৩

১৯১. কৃষ্যমাণঃ স্ত্রিয়া মুণ্ডো দৃষ্টঃ কৃষ্ণাম্বরঃ পুনঃ। ৫। ২৭। ২৪ ক. খ.

১৯২. জুহ্বতশ্চাপি তত্রাগ্নিং রক্তোষ্ণীষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ। ৬। ৮০। ৬ ক. খ

মহাভারতেও যুদ্ধের সময় বীরগণকে রক্তবর্ণ বস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়।[১৯৩] রামায়ণে রাবণ নিহত হলে শোকার্তা মন্দোদরী তাঁর শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করার সময় পরিধেয় বস্ত্রটি পীতবর্ণ বলে উল্লেখ করেন।[১৯৪] উত্তরকাণ্ডে রম্ভার শাড়ি নীল বর্ণের বলে বর্ণিত হয়েছে।[১৯৫] সুন্দরকাণ্ডে সীতার সুবর্ণ বর্ণের বস্ত্রের কথা পাওয়া যায় (২৯।৫)।

মহাভারতে কর্ণের বস্ত্র পীতবর্ণের, অশ্বত্থামা এবং দুর্যোধনের বস্ত্র নীল বর্ণের, দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্যের বস্ত্র শুক্লবর্ণের বলে উল্লিখিত হয়েছে।[১৯৬]

বনচারী, ব্রতধারী এবং সন্ন্যাসীদের পরিধেয় বস্ত্র সাধারণ ব্যক্তির থেকে পৃথক ছিল।

রামায়ণে রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গমন করবেন বলে কৃতসংকল্প হলে শোকার্তা কৌশল্যা বললেন— তুমি যে সময় জটা-বল্কল পরে বন থেকে ফিরে আসবে এখনই সে সময় উপস্থিত হোক।[১৯৭] আবার রাম বনে যাবার পর ভরত অযোধ্যায় সন্ন্যাসীর মতো চৌদ্দ বছর চীর ও মৃগচর্ম পরে কাটিয়েছিলেন।[১৯৮] লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে কুশ এবং চীর পরে বনবাসী হয়েছিলেন (৫।৩৩।২৮)। সীতাও বল্কল ধারণ করেছিলেন। অরণ্যকাণ্ডে তপস্যারতা শবরীরও চীর কৃষ্ণা জিন ও জটাধারণের উল্লেখ আছে (৭৪।৩২)। সীতা হরণ করার সময় রাবণ সন্ন্যাসীর পোশাকে সীতার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পরনে ছিল গেরুয়াবস্ত্র, বাম স্কন্ধে সুন্দর যষ্টি ও কমণ্ডলু, এ সময় তিনি ছত্র শিখা ও পাদুকা ব্যবহার করেছিলেন (৩।৪৬।৩)। লব-কুশের পরনে বল্কল ও মাথায় জটা ছিল (৭।৯৪।১৫)।

১৯৩. রক্তাম্বরধরাঃ সর্বে সর্বে রক্তবিভূষণাঃ॥ ৭।৩৪।১৫ গ. ঘ.

১৯৪. নীলজীমূতশঙ্কাশ পীতাম্বর শুভাঙ্গদ। ৬। ১১১। ৭৯ ক. খ.

১৯৫. নীলং স তোয়মেঘাভং বস্ত্রং সমবগুণ্ঠিতা। ২৬। ১৮

১৯৬. আচার্যশারদ্বতয়োঃ সুশুক্লে
কর্ণস্য পীতং রুচিরং চ বস্ত্রম্।
দ্রৌণেশ্চ রাজ্ঞশ্চ তথৈব নীলে
বস্ত্রে সমাদৎস্ব নরপ্রবীর॥ ৪। ৬৬।১৩

১৯৭. অপীদানীং স কালঃ স্যাদ্বনাৎ প্রত্যাগতং পুনঃ।
যৎ ত্বাং পুত্রক পশ্যেয়ং জটাবল্কলধারিণম্॥ ২।২৪।৩৭

১৯৮. উপবাসকৃশো দীনশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ।
ভ্রাতুরাগমনং শ্রুত্বা তৎপূর্বং হর্ষমাগতঃ॥ ৬।১২৭।১৯

মহাভারতেও গৃহী বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের পৃথক পৃথক বস্ত্র পরিধানের কথা পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারীরা সব সময় পলাশ অথবা বিল্বকাঠের একটি দণ্ড ব্যবহার করতেন। তৃণের দ্বারা তৈরি মেখলা, যজ্ঞোপবীত এবং জটাও তাঁরা ধারণ করতেন।[১৯৯] বানপ্রস্থাবলম্বী ও সন্ন্যাসিগণের চর্ম ও বল্কল ধারণের নিয়ম ছিল। বানপ্রস্থের সময় ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুরের এই পোশাকই ছিল। মহাপ্রস্থানের সময় চার ভাই সহ যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে বল্কল ও অজিন ব্যবহার করতে দেখা যায়। রামায়ণের রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মতো মহাভারতেও অরণ্যচারী পাঁচ ভাই চর্ম ও বল্কল ধারণ করেন।[২০০] রামায়ণে যজ্ঞ করার সময় মেঘনাদ কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম, কমণ্ডলু, শিখা ও ধ্বজ ধারণ করেছিলেন।[২০১] তেমনি মহাভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত যুধিষ্ঠিরের পোশাক ছিল ক্ষৌম বস্ত্র, কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম, হাতে দণ্ড এবং গলায় সোনার মালা।[২০২]

রামায়ণের যুগে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই উষ্ণীষ ব্যবহার করতেন। রাক্ষস সমাজেও উষ্ণীষ ধারণের কথা পাওয়া যায়। রাবণ বিবিধ পোশাকের সঙ্গে উষ্ণীষ বা উত্তরীয় ব্যবহার করতেন। মেঘনাদের যজ্ঞস্থলে লাল উষ্ণীষধারী রমণীগণ উপস্থিত ছিলেন।[২০৩] যুদ্ধকাণ্ডের শেষে সীতাকে রামের নিকট উপস্থিত করা হলে কিছু উষ্ণীষধারী ও বেতদণ্ডধারী ব্যক্তি অন্যান্য পুরুষদিগকে দূরে অপসারিত করতে ব্যস্ত ছিল (৬।১১৪।২১)। রাজ্যাভিষেক কালে বিবিধ মূল্যবান বস্ত্রের সঙ্গে এটি ব্যবহৃত হত।

মহাভারতের সময়ও উষ্ণীষের প্রচলন ছিল। যুদ্ধযাত্রাকালে রাজারা বিবিধ পোশাকের সঙ্গে এটি ব্যবহার করতেন।[২০৪]

১৯৯. ধারয়ীত সদা দণ্ডং বৈল্বং পালাশমেব বা। ১৪।৪৬।৪ গ. ঘ.
মেখলা চ ভবেন্মৌঞ্জী জটী নিত্যোদকস্তথা।
যজ্ঞোপবীতী স্বাধ্যায়ী অলুব্ধো নিয়তব্রতঃ॥ ১৪।৪৬।৬

২০০. চর্মবল্কলসংবাসী সায়ং প্রাতরুপস্পৃশেৎ। ১৪।৪৬।১০ ক. খ.

২০১. ততঃ কৃষ্ণাজিনধরং কমণ্ডলুশিখাধ্বজম্।
দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্॥ ৭। ২৫। ৪

২০২. হেমমালী রুক্মকণ্ঠঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ।
কৃষ্ণাজিনী দণ্ডপাণিঃ ক্ষৌমবাসাঃ স ধর্ম্মজঃ॥ ১৪।৭৩।৪ গঘ, ৫ কখ

২০৩. জুহুতশ্চাপি তত্রাগ্নিং রক্তোষ্ণীষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আজগ্মুস্তত্র সম্ভ্রান্তা রাক্ষস্যো যত্র রাবণি॥ ৬। ৮০।৬ ক. খ.

২০৪. শ্বেতোষ্ণীষং শ্বেতহয়ং শ্বেতবর্মাণমচ্যুতম্।
অপশ্যাম মহারাজ ভীষ্মং চন্দ্রমিবোদিতম্॥ ৬।১৬।২২

রামায়ণের যুগে পুরুষেরা মেয়েদের মতো নানাপ্রকার অলংকার ব্যবহার করতেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, হার, সোনার তৈরি মুকুট প্রভৃতি পুরুষদের ভূষণ ছিল। রাক্ষস বানর সকল সমাজেই এই সকল বিভিন্ন অলংকারের প্রচলন ছিল। রামায়ণের বিভিন্ন স্থলে রাবণের বিবিধ অলংকারাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০৫] প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যে চন্দনের একটি বিশেষ স্থান ছিল। অভিষেক, যুদ্ধযাত্রা, বা বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শ্বেত ও রক্তচন্দন ব্যবহৃত হত বেশি। পুষ্প, পুষ্পমাল্য ও বিভিন্ন প্রকার গন্ধতেলের প্রচলন ছিল। রাক্ষস বানর উভয় সমাজেই এই সকল প্রসাধন সামগ্রীর প্রচলন ছিল। রাম, রাবণ, সুগ্রীব প্রভৃতি সকলকেই উপরোক্ত বিভিন্ন মূল্যবান আভরণে ভূষিত হতে এবং চন্দন, অগুরু ও বিভিন্ন গন্ধতেল ব্যবহার করতে দেখা যায়।[২০৬]

মহাভারতের যুগেও রামায়ণের ন্যায় রাজারা অঙ্গদ, মুকুট, কুণ্ডল, হার প্রভৃতি নানা প্রকার অলংকার ব্যবহার করতেন।[২০৭] প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে চন্দনের ব্যবহারই বেশি ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গাত্রে এটি লেপন করতেন। বীরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মকে মেয়েরা চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী দ্বারা সাজিয়েছিলেন।[২০৮] চন্দন ছাড়া অগুরু ও বিভিন্ন প্রকার গন্ধতেল ও প্রসাধন সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রাজন্যবর্গ প্রচুর গন্ধদ্রব্য উপহার হিসেবে এনেছিলেন। অসংখ্য সোনার কলসী যুধিষ্ঠিরকে দেওয়া হয়েছিল যেগুলির প্রত্যেকটিতে চন্দনের রস ভর্তি ছিল।[২০৯]

রামায়ণের মতো মহাভারতেও পুষ্পের ব্যবহার ব্যাপক ছিল। পুষ্পমাল্যও এই সমাজের প্রিয় প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে স্বীকৃত ছিল। স্নানের পর চন্দন, বেলফুল. নাগকেশর, বকুল প্রভৃতি গন্ধ ও পুষ্পের ব্যবহারের কথা বলা

২০৫. বাহুভির্বদ্ধকেয়ূরৈশ্চন্দনোত্তমরূষিতৈঃ।
ভ্রাজমানাঙ্গদৈর্ভীমৈঃ পঞ্চশীর্ষৈরিবোরগৈঃ॥ ইত্যাদি ৫।৪৯।৮

২০৬. ৭।২৬।১৪-১৮, ৬।৬০।৩৪

২০৭. স দৃষ্ট্বা মৎস্যরাজং চ রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
শূরৈঃ পরিবৃতং যোধৈঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিভিঃ॥৪।৩১।৫ গ. ঘ—৬ ক. খ

২০৮. কন্যাশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ লাজৈর্মাল্যৈশ্চ সর্বশঃ।
অবাকিরঞ্শান্তনবং তত্র গত্বা সহস্রশঃ॥ ৬।১২১।৩

২০৯. চন্দনাগুরুকাষ্ঠানাং ভারান্ কালীয়কস্য চ।
চর্মরত্নসুবর্ণানাং গন্ধানাং চৈব রাশয়ঃ॥২।৫২।১০

হয়েছে।[২১০] এ ছাড়া নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কাজে বিভিন্ন প্রকার পুষ্প ও পুষ্পমাল্য ব্যবহৃত হত।[২১১] এখানে রক্তমাল্য গলায় ধারণ করা উচিত নয়, শুক্লমাল্যই প্রশস্ত বলা হয়েছে।[২১২] সম্ভবত রক্তমাল্য সমাজের মানুষ অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবেই দেখতেন। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ত্রিজটার স্বপ্নের বর্ণনায় রাবণের অমঙ্গলের যে-সকল ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যে-রমণীগণ রাবণকে গর্দভবাহিত রথে চড়িয়ে আকর্ষণ করছিল তাদের গলে লালফুলের মালা ছিল।[২১৩] এখানে উল্লেখ্য যে মহাভারতীয় সমাজের ন্যায় রামায়ণের সমাজেও মানুষ লাল ফুলের মালাকে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে গণ্য করতেন।

রামায়ণে রাম ও লক্ষ্মণের কাকপক্ষ ধারণের কথা পাওয়া যায়। মহাভারতেও কৃষ্ণ ও অভিমন্যুর মাথায় কাকপক্ষ ছিল।[২১৪] প্রাচীনকালে অনেকে মাথায় পাঁচটি শিখা রাখতেন, তাকে কাকপক্ষ বলা হত। আবার অনেক আভিধানিক কাকপক্ষ শব্দের অর্থ করেছেন জুল্‌ফি। অধ্যাপক সুখময় সপ্ততীর্থের মতে জুল্‌ফি অর্থই সঙ্গত।[২১৫]

সমগ্র রামায়ণে স্ত্রীলোকের বিবিধ অলংকারের কথা পাওয়া যায়। সুন্দরকাণ্ডে হনুমান রাবণগৃহের রাক্ষস রমণীদের বিবিধ অলংকারের কথা উল্লেখ করেছেন।[২১৬] স্ত্রীরা নূপুর, কেয়ূর, মণিমুক্তাখচিত হার, বহুমূল্য উত্তরীয়, কুণ্ডল, পুষ্পমালা প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের দ্বারা নিজেদের সাজাতেন। রাক্ষস ও বানর সমাজের নারীরাও এই সকল প্রসাধন ব্যবহার করত। রামায়ণের সমাজে দর্পণ ব্যবহারের কথাও পাওয়া যায় (২।৬৫।৯)।

২১০. প্রিয়ঙ্গুচন্দনাভ্যাং চ বিল্বেন তগরেণ চ।
পৃথগেবানুলিম্পেত কেসরেণ চ বুদ্ধিমান। ১৩।১০৪।৮৭ গ. ঘ. —৮৮ ক. খ.

২১১. সন্নয়েৎ পুষ্টিযুক্তেষু বিবাহেষু রহঃসু চ॥ ১৩।৯৮।৩৩ গ. ঘ.

২১২. রক্তমাল্যং ন ধার্যং স্যাচ্ছুক্লং ধার্যং তু পণ্ডিতৈঃ। ১৩।১০৪।৮৩ ক. খ.

২১৩. ৫।২৭।২৪

২১৪. কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি। ১।১৯।৯ ক. খ.
কাকপক্ষধরো ধন্বী তঞ্চঃ সৌমিত্রিরন্বগাৎ॥ ১।২২।৫ গ. ঘ.
পূর্ণচন্দ্রাভবদনং কাকপক্ষবৃতাক্ষিকম্॥ ৭।৪৮।১৭

২১৫. মহাভারতের সমাজ, পৃঃ ২১৬

২১৬. ৯ম সর্গ

মহাভারতের সমাজেও নারীরা বিবিধ ভূষণে অলংকৃতা হতেন। সোনার মালা, কুণ্ডল, কেয়ূর, শাঁখা, নিষ্ক প্রভৃতি অলংকার হিসেবে রমণীরা ব্যবহার করতেন।[২১৭]

রামায়ণে ছাতা এবং জুতার ব্যবহারও দেখা যায়। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করার জন্য সীতার কুটিরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর পায়ে জুতা ও মাথায় ছাতা ছিল।[২১৮] ভরত রামের পাদুকা অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়ে রাজ-কাজ পরিচালনা করতেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের অভিষেকে সংগৃহীত দ্রব্যের মধ্যে ছাতা ও জুতাও সংগৃহীত হয়েছিল (২৬।২৩)।

মহাভারতেও ছাতা ও জুতার কথা ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। এগুলির উৎপত্তির কথাও বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণগণকে এগুলি দান করারও রীতি ছিল।[২১৯]

এখানে উভয় মহাকাব্যের সমাজ-জীবনে নারী-পুরুষের ব্যবহৃত বস্ত্র, অলংকার ও প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের সাদৃশ্যটি অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। সমাজে অতি দরিদ্র মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিল সে বিষয়ে উভয় মহাকাব্যকারই আমাদের বিশেষ কোনো সংবাদ দেন নি। উপরোক্ত সকল দৃষ্টান্তই অভিজাত সম্প্রদায় প্রসঙ্গে উদ্ধৃত। তবে রামায়ণে ত্রিজট নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রীর নির্দেশে রামের নিকট স্বীয় অর্থাভাবের কথা জানিয়ে ধন প্রার্থনা করেন। এই ব্রাহ্মণের বস্ত্র ছিল জীর্ণ। তিনি কোনো রকমে বস্ত্রে শরীর ঢেকে রামের নিকট গমন করেন।[২২০] এ বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় দরিদ্র ব্যক্তিগণের পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। সম্ভবত উভয় মহাকাব্য যুগেই দরিদ্র ব্যক্তিরা অর্থাভাবে মূল্যবান বস্ত্র ও অলংকারাদি ব্যবহার করতে পারতেন না।

বৃত্তিব্যবস্থা

রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় মহাকাব্যের সমাজ-জীবন সুস্থভাবে পরিচালনা করার জন্য জাতি-বর্ণ ভেদে পৃথক পৃথক কাজের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেকের বর্ণ বা জাতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকায় সকলেই সুস্থভাবে আপন আপন পরিবার প্রতিপালন করতে পারতেন। এক বর্ণের সামাজিক অধিকারে অপর বর্ণ

---

২১৭. কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলংকৃতাঃ।
মহার্হমাল্যাভরণাঃ সুবর্ণশ্চন্দনোক্ষিতাঃ। ৩। ২৩৩। ৪৬ গ. ঘ.—৪৭ ক. খ.

২১৮. ৩। ৪৬। ৩

২১৯. দহ্যমানায় বিপ্রায় যঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ।
স্নাতকায় মহাবাহো সংশিতায় দ্বিজাতয়ে॥ ১৩।৯৬।২০

২২০. স ভার্য্যায়া বচঃ শ্রুত্বা শাটীমাচ্ছাদ্য দুশ্ছদাম্।
স প্রাতিষ্ঠিত পন্থানং যত্র রামনিবেশনম্॥ ২। ৩২। ৩২

হস্তক্ষেপ করতেন না। বৃত্তিব্যবস্থার উদ্ভব হয় আদর্শ মানব সমাজ গঠনের পরিকল্পনা থেকেই। উভয় মহাকাব্যে তাই বার বার কুলোচিত কর্মানুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকলেই আপন আপন কুলোচিত বৃত্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতেন। ফলে সমাজে কোনো প্রকার সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে আপন আপন কর্মদ্বারা পরিবারবর্গকে পোষণ করতে পারেন সে বিষয়ে রাজার দৃষ্টি সজাগ ছিল।

তবে বিপদকালে অনেক সময় কোনো কোনো নাগরিক আপন বর্ণগত বৃত্তি ত্যাগ করে অপর বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতেন। তবে সকল সময় এরূপ কাজ প্রশংসনীয় ছিল না।

শিল্প : ধাতুশিল্প : রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় মহাকাব্যের যুগেই মণি, মুক্তা, সোনা, রূপা প্রভৃতি ধন রত্ন রূপে পরিগণিত হত। তবে উভয় মহাকাব্যের যুগেই সোনার ব্যবহারই বেশি ছিল। সোনা দিয়ে বিবিধ অলংকার তৈরি করা হত।

সোনার থালা, কলস, কমণ্ডলু, প্রভৃতি ধনী পরিবারে ব্যবহৃত হত।[২২১] রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কপিবীরগণ এক বিলমধ্যে প্রবেশ করে সেখানে স্বর্ণ রজত ও কাংস্য-নির্মিত বহুবিধ দ্রব্য দেখেছিলেন (৫০।২৩।৩৪)।

রাজসভামণ্ডপের শোভাবৃদ্ধির জন্য সোনার তৈরি কৃত্রিম বৃক্ষ ষাঁড় প্রভৃতি তৈরি করা হত।[২২২] সোনার ন্যায় উভয় মহাকাব্যের যুগে রূপা দিয়ে নানা প্রকার বাসন তৈরি হত। লঙ্কায় সোনার তৈরি প্রাসাদ-তোরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাসাদস্তম্ভগুলিও মণিমুক্তা-খচিত ছিল।

'কাঞ্চনানি বিচিত্রাণি তোরণানি চ রাক্ষসাম্'॥ ৫।২।৫৪ ক. খ.।

সোনা-রূপার ন্যায় লোহার ব্যবহারও ছিল ব্যাপক। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র লোহা দিযে তৈরি করা হত, গৃহের প্রয়োজনীয় একাধিক বস্তু তৈরি হত লোহা দিয়েই। রামায়ণে কৃষ্ণবর্ণ লোহার আসনের কথাও পাওয়া যায়।[২২৩] উভয় মহাকাব্যের যুগেই মানুষ বিবিধ প্রয়োজনে দা, কুঠার, টংক(পাথর-ছেদক অস্ত্র) প্রভৃতি ব্যবহার করত। এগুলি সাধারণত লোহা দিয়েই তৈরি হত।[২২৪]

---

২২১. শতং চ শাতকুম্ভানাং কুম্ভানামাগ্নিবর্চসাম্। রামা. ২। ৩। ১১ ক খ., ২। ৯০। ৭১ ম. ভা. ২। ৪৯। ১৮, ২। ৫১। ৭ ইত্যাদি

২২২. হিরণ্যশৃঙ্গমৃষভং সমগ্রং ব্যাঘ্রচর্ম চ। রামা. ২। ৩। ১১ গ.ঘ., ম.ভা.৭।১.২

২২৩. অপরান্তসমুদ্ভূতাংস্তথৈব পরশূঙ্কিতান্। ম. ভা. ২। ৫১। ১৮ গ. ঘ.,
পীঠে কার্যপ্তায়মে চৈব নিষণ্ণং কৃষ্ণবাসমম্। ২। ৬৯। ১৪ ক. খ.

২২৪. কেচিৎ কুঠারৈষ্টঙ্কৈশ্চ দাত্রৈশ্ছিন্দন্ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। রামা. ২। ৮০। ৭ গ. ঘ.
কুদ্দালৈস্ত্রেযুকৈশ্চৈব সমুদ্রং যত্নমাস্থিতত। ম. ভা. ৩। ১০৭। ২৩ গ. ঘ.

অস্থি ও চর্মশিল্প : উভয় মহাকাব্যের যুগেই শিল্পীগণ বিভিন্ন প্রাণীর হাড় ও চামড়া দিয়ে নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতেন। কৃষ্ণমৃগের চামড়া দিয়ে তৈরি হত উত্তরীয়। বনচারীরা এবং সন্ন্যাসীরা মৃগচর্ম পরিধান করতেন। সম্ভবত গণ্ডারের চামড়া দিয়েই যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢাল তৈরি হত। বাঘের চামড়াও আসনরূপে ব্যবহার করা হত। পশুর লোম দিয়ে তৈরি হত কম্বল। উভয় মহাকাব্যের যুগেই মানুষ পাদুকার ব্যবহার করত। চামড়া দিয়ে এই পাদুকা তৈরি করা হত। রামের পাদুকাদ্বয় স্বর্ণভূষিত ছিল (২।১১৫।১৪)। সিংহাসনের আচ্ছাদন হিসেবে মৃগচর্মের ব্যবহার করা হত (রামা, ৬।১১।১৬)। চর্মনির্মিত পেটিকার কথাও রামায়ণে পাওয়া যায় (২।৪০।১৫)।

ছত্র ও ব্যজন : উভয় মহাকাব্যের বিভিন্ন স্থলে ছত্র ও ব্যজনের উল্লেখ মেলে। রাজার মস্তকে ছত্র ধরার রীতি উভয় মহাকাব্যের যুগেই প্রচলিত ছিল। ভরত রামের পাদুকা রাজধানীতে আনার পর তার উপর ছত্র ধরার নির্দেশ দেন।[২২৫]

তবে ছত্রের ব্যবহার সম্ভবত ধনী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গরিব জনসাধারণের ছত্র ব্যবহারের কথা উভয় মহাকাব্যেই অনুপস্থিত। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ছত্র ও চর্মপাদুকার উৎপত্তি বিষয়ে একটি উপাখ্যানও পাওয়া যায় (৯৫ তম ও ৯৬ তম অধ্যায়)। মহাভারতে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় সকল যোদ্ধাগণের মাথার উপর শুভ্র ছত্র। হাতি এবং রথের উপরও এরূপ শ্বেত বর্ণের ছত্র শোভা পেত।[২২৬] তালবৃন্তের হাতপাখার কথাও এখানে পাওয়া যায়।[২২৭]

রামায়ণেও বিভিন্ন স্থলে এরূপ শ্বেত ছত্রের ব্যবহার দেখা যায়। ছত্রের বাঁটটি অনেক সময় স্বর্ণ-নির্মিত হত। তালবৃন্তের হাতপাখার উল্লেখও এখানে দেখা যায়।[২২৮]

২২৫. ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমার্য্যপাদাবিমৌ মতৌ। ২।১১৫।১৬

২২৬. শ্বেতচ্ছত্রাণ্য শোভন্ত বারণেযু রথেযু চ। ৬।৫০।৫৮, ২।২৫২।৪৭, ২।৫২।৫ ইত্যাদি।

২২৭. তালবৃন্তান্যুপাদায় পর্য্যবীজন্ত সর্ব্বশঃ॥ ১২।৩৭।৩৬, ৬০।৩২, ১৩।১৬৮।১৫ ইত্যাদি।

২২৮. রাজহংসপ্রতীকাশং ছত্রং পূর্ণ-শশিপ্রভম্।
সৌবর্ণদণ্ডমপরা গৃহীত্বা পৃষ্ঠতো যযৌ। ৫।১৮।১৪, ৬।৭০।১৬ ইত্যাদি
ৰালব্যজনহস্তাশ্চ তালবৃন্তানি চাপরাঃ॥ ৫।১৮।১১

শিবিকা : উভয় মহাকাব্যের যুগেই শিবিকার প্রচলন ছিল। ধনীগৃহস্থের মহিলাগণ শিবিকায় স্থানান্তরে গমন করতেন। মৃতদেহ বহন করার জন্যও শিবিকা ব্যবহৃত হত। মানুষই এই শিবিকা বহন করত। রামায়ণে রাজা দশরথের মৃতদেহ শিবিকায় চড়িয়ে পরিচারকগণই সেটি বহন করেছিল।[২২৯] মহাভারতেও একাধিক স্থলে শিবিকার উল্লেখ দেখা যায়।[২৩০] বাঁশ বা কাঠ দিয়ে এই শিবিকা তৈরি করা হত এরূপ মনে করা যেতে পারে। বর্তমান কালেও মৃতদেহ বহনের জন্য এই ধরনের শিবিকা ব্যবহৃত হয়। তবে মহিলাদের স্থানান্তরে গমনের জন্য ব্যবহৃত শিবিকা এবং মৃতদেহ বহনের শিবিকার মধ্যে সম্ভবত গঠন-স্বাতন্ত্র্য ছিল।

কুশাসন : কুশের ব্যবহার উভয় মহাকাব্যের যুগেই ছিল ব্যাপক। উপবেশনের জন্য কুশ দিয়ে নির্মাণ করা হত আসন। রামায়ণে এই কুশাসনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।[২৩১] কুশের দ্বারা শয্যাও নির্মাণ করা হত। অভিষেকের পূর্বে রাম নিজ হাতে কুশশয্যা নির্মাণ করেছিলেন।[২৩২] মহাভারতেও নানা স্থলে কুশাসনের উল্লেখ দেখা যায়।[২৩৩]

নৌ-শিল্প : রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই নৌ-শিল্পের উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে নিষাদরাজ গুহ ভরতের সঙ্গে আগত ব্যক্তিগণকে গঙ্গা পারের জন্য আপন জাতিগণকে নৌকা সংগ্রহের জন্য আদেশ করলে তারা পাঁচশো নৌকা সংগ্রহ করে। এবং আরও কিছু নৌকা আনীত হয়। ঐ নৌকাগুলির অগ্রভাগ বড়ো বড়ো ঘণ্টা দ্বারা শোভিত ছিল। স্বর্ণ-নির্মিত বিবিধ চিত্র অঙ্কিত ছিল। সেগুলি ছিল মজবুত। পতাকাযুক্ত ও নাবিকযুক্ত। স্বস্তিক নামক একটি অতি উৎকৃষ্ট নৌকা গুহ স্বয়ং নিয়ে এলেন। নৌকাটিতে শুভ্রবর্ণ কম্বল পাতা ছিল। গুহ-আনীত ঐ সুন্দর নৌকাটিতে ব্রাহ্মণ, গুরু, ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণ আরোহণ করেন।[২৩৪]

২২৯. শিবিকায়ামথারোপ্য রাজানং
বাষ্পকণ্ঠা বিমনসস্তমূহুঃ পরিচারকাঃ॥ ২।৭৬।১৪

২৩০. ততঃ কন্যাসহস্রেণ বৃতা শিবিকয়া তদা। ১।৮০।২১ ক.খ., ১২৭।৭, ইত্যাদি
৩।৬৯।২৩ ইত্যাদি।

২৩১. পীঠেষ্বন্যে বৃষীষ্বন্যে ভূমৌ কেচিদুপাবিশন্॥ ৬।১১।২৩ গ. ঘ.

২৩২. ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে॥ ২।৬।৩ গ. ঘ

২৩৩. কৌশ্যাং বৃষ্যামাসস্ব যথোপজোষং। ৩।১১১।১০, ১২।৩৪৩।৪২ ইত্যাদি
কৌশ্যাং বৃস্যাং সমাসীনং চক্ষুর্হীনং নৃপং তদা॥ ২।২৯৫।৪ ক. খ.

২৩৪. তে তথোক্তাঃ সমুত্থায় ত্বরিতা রাজশাসনাৎ।
পঞ্চ নাবাং শতান্যেব সমানিন্যুঃ সমন্ততঃ॥ ২।৮৯।১০ ইত্যাদি

মহাভারতেও জতুগৃহে আগুন লাগলে পাণ্ডবগণ সুড়ঙ্গপথে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। পরে বিদুরের পাঠানো নৌকায় চড়ে তাঁরা গঙ্গার অপর পারে পৌঁছতে সমর্থ হন। এই নৌকাখানি ছিল বাতসহ, যন্ত্র ও পতাকাযুক্ত এবং সুদৃঢ়।[২৩৫] সত্যবতী যমুনায় খেয়ানীর কাজ করতেন।[২৩৬] অর্জুন নিবাতকবচদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সমুদ্রে যান। সমুদ্রে তিনি অসংখ্য মণিমুক্তাপূর্ণ নৌকা দেখতে পান।[২৩৭]

ভেলা : ভেলার ব্যবহার অতি প্রাচীন। রামায়ণে ভেলা নির্মাণের উপকরণ হিসেবে বাঁশ ও তৃণের উল্লেখ আছে। এই ভেলায় নদী পার হওয়া যেত।[২৩৮] মহাভারতে উল্লেখ আছে দীর্ঘতমা ঋষিকে তাঁর পুত্রগণ তাঁদের জননীর আদেশে এক ভেলার সঙ্গে বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন।[২৩৯]

কুন্তীদেবী আপন শিশুপুত্র কর্ণকে মোমদ্বারা তৈরি একটি মঞ্জুষা বা পেটিকায় রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেন।[২৪০] কুন্তীদেবী-ব্যবহৃত এই মঞ্জুষা তৈরির উপকরণ ভেলা তৈরির উপকরণ থেকে স্বতন্ত্র।

রথ : উভয় মহাকাব্যের যুগেই রথের প্রচলন ব্যাপকভাবে ছিল বলা যেতে পারে। যুদ্ধের প্রধান অবলম্বনই ছিল রথ। সাধারণত রাজপরিবারের মধ্যেই রথ ব্যবহৃত হত। রামায়ণে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা রথে আরোহণ করেই বনপথে যাত্রা করেন। ঐ রথটি ছিল স্বর্ণভূষিত। দ্রুতগামী একাধিক অশ্ব ঐ রথটি বহন করেছিল। রথের সারথি ছিলেন সুমন্ত্র।[২৪১] রাবণ সীতাকে হরণ করে গাধাযোজিত রথে চড়িয়ে লঙ্কায় নিয়ে যান। রথটি ছিল দিব্য ও মায়াময়। ভয়ংকর শব্দকারী ও স্বর্ণমণ্ডিত।[২৪২] যুদ্ধের সময় বীরগণ রথে ধ্বজ ব্যবহার

২৩৫. ততো বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
ঊর্মিক্ষমাং দৃঢ়াং কৃত্বা কুন্তীমিদমুবাচ হ॥১।১৪০।৫,১৪৮।১০,১৩,১৪৯।৫ ইত্যাদি।

২৩৬. শুশ্রূষার্থং পিতুর্নাবং বাহয়ন্তীং জলে চ তাম্। ১।৬৩।৬৯ ইত্যাদি।

২৩৭. নাবঃ সহস্রশস্তত্র রত্নপূর্ণা সমন্ততঃ॥ ৩।১৬৯।৩

২৩৮. ২।৮৯।২০

২৩৯. বদ্ধোড়ুপে পরিক্ষিপ্য গঙ্গায়াং সমবাসৃজন্। ১।১০৪।৩৯

২৪০. মঞ্জূষায়াং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ। ৩। ৩০৭। ৬৭ ইত্যাদি

২৪১. সীতাতৃতীযানারূঢ়ান্ দৃষ্ট্বা রথমচোদয়ৎ।
সুমন্ত্রঃ সম্মতানশ্বান্ বায়ুবেগসমাঞ্জবে॥ ২।৪০।১৭

২৪২. স চ মায়াময়ো দিব্যঃ খরযুক্তঃ খরস্বনঃ।
প্রত্যদৃশ্যত হেমাঙ্গো রাবণস্য মহারথঃ॥ ৩।৪৯।১৯

করতেন। ধ্বজ দেখেই বীরের নাম জানা যেত। ইন্দ্রজিতের রথের ধ্বজ ছিল সিংহচিহ্নিত [২৪৩] অনেক রথে ঘণ্টা বাঁধা থাকত। কোনো কোনো বীরকে বৃষের উপর চড়েও যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতে দেখা যায়। রামায়ণে ত্রিশিরা বৃষরাজের উপর চড়ে যুদ্ধে গমন করেন।[২৪৪]

যে-সকল রথে চড়ে বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন সেগুলি থাকত সুসজ্জিত। পতাকাযুক্ত, সুবর্ণ ও নানাবিধ উজ্জ্বল রত্নের দ্বারা শোভিত। রামায়ণের একাধিক স্থলে এই ধরনের সুসজ্জিত রথের বর্ণনা মেলে।

মহাভারতেও এই ধরনের চিত্র-বিচিত্র রথের বর্ণনা একাধিক স্থানে পাওয়া যায়।[২৪৫] এখানেও বীরগণ আপন আপন রথে স্বতন্ত্র ধ্বজ ব্যবহার করতেন। অর্জুন, ভীষ্ম, দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য প্রভৃতি প্রত্যেক বীরের রথে স্বতন্ত্র চিহ্ন ছিল।[২৪৬] উট, খচ্চর এবং গাধা দ্বারা রথ চালানোর কথাও পাওয়া যায়।[২৪৭] তবে সাধারণত দ্রুতগামী ঘোড়াই রথ বহন করত।

স্থাপত্য শিল্প : উভয় মহাকাব্যেই প্রাসাদ ও গৃহের বিবিধ সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আমাদের মুগ্ধ করে। হনুমান রামের নিকট লঙ্কার প্রাসাদের যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন[২৪৮] তার দ্বারা বোঝা যায় যে লঙ্কায় স্থাপত্য-শিল্প ছিল অতিশয় উন্নত। লঙ্কাপুরীর চার দিকে পরিখার বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় ওই সময় পূর্তশিল্পও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। অযোধ্যাও স্থাপত্য-শিল্পে যথেষ্ট উন্নত ছিল। অযোধ্যানগর ছিল বিশাল বিশাল অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। এই নগরকে ইন্দ্রপুরীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[২৪৯] স্থাপত্য-শিল্পে কিষ্কিন্ধ্যাও পিছিয়ে ছিল না। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় দেখেন পাণ্ডুর বর্ণ স্ফটিক মণিখচিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রাসাদটি ইন্দ্রের প্রাসাদের তুল্য। প্রাসাদের শিখরদেশ কৈলাস পর্বতের শিখরদেশের মতো শুভ্রবর্ণ। দেবরাজ-প্রদত্ত শীতল ছায়াযুক্ত কল্পবৃক্ষের দ্বারা শোভিত এবং তপ্তকাঞ্চন-নির্মিত তার তোরণ।[২৫০]

---

২৪৩. ৬। ৫৯। ১৫
২৪৪. ৬। ৫৯। ১৯
২৪৫. ১। ২১৯। ৫, ২। ২৪। ২১
২৪৬. ৪। ৫৫ অঃ
২৪৭. উষ্ট্রাশ্বতরযুক্তানি যানানি চ বহন্তি মাম্। —১৩।১১৮।১৪, ১।১৪৪।৭ ইত্যাদি
২৪৮. ৬। ৩য় সর্গ
২৪৯. ২। ৬। ২৮
২৫০. ৪। ৩৩।১২-১৮

রামায়ণে অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা সর্বত্রই উন্নত স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন মেলে। তবে সাধারণত রাজাদের প্রাসাদ বা গৃহগুলিই এরূপ স্বর্ণ ও বহুমূল্য নানাপ্রকার মণিমুক্তা দ্বারা তৈরি করা হত। সাধারণ নাগরিকের গৃহ এরূপ স্বর্ণময় ছিল না। অযোধ্যায় বিভিন্ন প্রকার শিল্পী বাস করতেন (২।৮০ অধ্যায়)।

মহাভারতেও আমরা যথেষ্ট উন্নত স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় পাই। এখানে আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা তৈরি জতুগৃহটি উন্নত স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন। শণ, ঘৃত প্রভৃতি সহজদাহ্য পদার্থে এটি নির্মিত হয়েছিল।[২৫১] দুর্যোধনের নির্দেশে স্থাপত্য-শিল্পী পুরোচন এই জতুগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। দুর্যোধনের উদ্দেশ্য ছিল এই জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারা। কিন্তু মহামান্য বিদুরের পাঠানো একজন খনক ওই জতুগৃহের মেঝেতে একটি গর্ত প্রস্তুত করেছিলেন। এই গর্ত দিয়েই পাণ্ডবগণ পলায়ন করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার যে বর্ণনা আমরা পাই তাতে মহাভারতে স্থাপত্য-শিল্প কীরূপ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার পূর্ণ পরিচয় মেলে।[২৫২] ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণ খাণ্ডব বনটিকে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন।[২৫৩] কৈলাস পর্বতে দানবরাজ বৃষপর্বার যে মণিময় যজ্ঞমণ্ডপ ময়-দানব নির্মাণ করেছিলেন তা অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।[২৫৪] যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যে-সকল রাজা এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে স্থান দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রাসাদগুলি ছিল শ্বেতপ্রাকারযুক্ত, অগুরু-গন্ধে পরিপূর্ণ, মাল্যভূষিত এবং নানা প্রকার রত্নখচিত।[২৫৫] উল্লিখিত শিল্পগুলি উভয় মহাকাব্যের যুগেই যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এ ছাড়া কাষ্ঠশিল্প, বস্ত্রশিল্প, পূর্তশিল্প প্রভৃতিরও উন্নতি হয়েছিল। শিল্পীগণ মর্যাদার সঙ্গেই রাজ্যে বাস করতেন। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরও বিশেষ সমাদর ছিল।

উভয় মহাকাব্যের সমাজে ব্যাবসা-বাণিজ্যেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল।

২৫১. ১। ১৪৪ অধ্যায়

২৫২. ১। ১৮৪ অধ্যায়

২৫৩. ততস্তে পাণ্ডবাস্তত্র গত্বা কৃষ্ণপুরোগমাঃ।
মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে তদ্ বৈ পরং স্বর্গবদচ্যুতাঃ। ১।২০৬।২৮

২৫৪. ২।৩ অধ্যায়

২৫৫ ২।৩৪।১৮-২৪

পারিবারিক আচার আচরণ

গৃহস্থ মাত্রই পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি একান্ত আপনজন নিয়ে বাস করে। পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই কিছু কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা চিন্তা করেই গৃহস্থকে সময় বিশেষে আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হয়। এইভাবে আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে যে গৃহী সকলকে নিয়ে সংসারে বাস করেন তিনিই সুগৃহস্থ এবং তাঁর ত্যাগই আশ্রমীদের মধ্যে বড়ো ত্যাগ। এই সত্য উভয় মহাকাব্যেই বিধৃত।

পিতামাতার প্রতি আচরণ : রামায়ণে পিতামাতাকে গুরুজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। পিতার সত্যরক্ষার জন্য রামের ত্যাগ সংসারে এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেছে। বিমাতা কৈকেয়ী রামের জীবনে নিদারুণ দুঃখ এনে দিলেও রাম বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন। তিনি বিমাতা বলে কৈকেয়ীর কোনো সম্মান হানি করেননি। শুধু তাই নয়, রাম বনগমনে কৃতসংকল্প এই অশুভ সংবাদে অসন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণ বলেছেন, 'আমি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করব, কারণ তিনি কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত ও আমাদের প্রতি উদাসীন। বার্ধক্যহেতু তিনি শিশুর মতো অন্যায় কাজ করছেন'।[২৫৬] লক্ষ্মণের এই অভিপ্রায়কে রাম অনুমোদন করেননি। তিনি লক্ষ্মণের উদ্দেশে বলেছেন, দেখো লক্ষ্মণ, সংসারে ধর্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্মেতেই সত্যের অধিষ্ঠান। পিতার আদেশ প্রকৃত ধর্মানুমোদিত। প্রতিজ্ঞা করার পর পিতার, মাতার কিংবা ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করা ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির কর্তব্য নয়। আমি পিতার আদেশেই কৈকেয়ীর ইচ্ছানুসারে বনে বাস করতে সম্মত হয়েছি। সুতরাং পিতার আদেশ কোনো প্রকারেই লঙ্ঘন করতে পারি না। তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মবিরোধী অনার্য বুদ্ধি ত্যাগ করো। প্রকৃত ধর্ম আশ্রয় করো এবং উগ্রতা পরিত্যাগ করো। আমার বুদ্ধিকে অনুসরণ করো। (২।২১।৪১-৪৪)

এই প্রসঙ্গেই রাম মাতা কৌশল্যার উদ্দেশে বলেছেন— মাতঃ, আপনি শোক করবেন না। বনবাস শেষে পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করব। আপনার আমার, সীতার, লক্ষ্মণের ও সুমিত্রার অবশ্যই পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য (২।২১।৪৮-৪৯)। অন্যত্র তিনি সীতার উদ্দেশে বলেছেন পিতামাতার অভিপ্রায় অনুসারে চললে স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ কিংবা অন্য কিছুই দুর্লভ হয়

২৫৬. হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্।
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্॥ ২।২১।১৯

না। পিতামাতার সেবাপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তিগণ দেবলোক, গন্ধর্বলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক ও অন্যান্যলোক প্রাপ্ত হন।[২৫৭]

মহাভারতেও বিভিন্ন স্থলে পিতামাতার প্রীতি উৎপাদন ও তাঁদের সুখে রাখা মানুষের প্রধান কর্তব্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গুরুজনদের মধ্যে পিতা-মাতাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে। যে পুত্র পিতামাতার আদেশ যথাসময়ে পালন করে সেই প্রকৃত পুত্র এরূপ বলা হয়েছে (১।৫৮।২৫-৩০)। মহাভারতে পিতা ও মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে মতভেদের অবতারণা করা হলেও সন্তানের নিকট উভয়ের গুরুত্ব সমান এই সিদ্ধান্তকেই স্পষ্ট করা হয়েছে। পিতাকে গার্হপত্য অগ্নি, মাতাকে দক্ষিণ এবং আচার্যকে আহবনীয় অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একাগ্রচিত্তে এই তিন অগ্নির সেবা করলে ইহলোক পরলোক এবং ব্রহ্মলোক জয় করা যায়। মঙ্গলকামী ব্যক্তি সর্বদা এই তিন গুরুজনের সেবায় যত্ন নেন (১২।১০৮ অধ্যায়)।

অন্যত্র বলা হয়েছে পিতার তুষ্টিতে প্রজাপতি তুষ্ট হন, মাতার তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন বসুন্ধরা এবং আচার্য সন্তুষ্ট হলে ব্রহ্ম সন্তুষ্ট হন।[২৫৮] এ ছাড়া বনপর্বান্তর্গত ধর্মব্যাধের উপাখ্যানে আমরা দেখি আন্তরিকতার সঙ্গে পিতামাতার সেবা করে ব্যাধ ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয় চাক্ষুষ করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন।[২৫৯]

শান্তনু-পুত্র দেবব্রতের পিতৃভক্তিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। পিতাকে সন্তুষ্ট করে তাঁরই আশীর্বাদে তিনি মৃত্যুকে পর্যন্ত জয় করতে সমর্থ হন।[২৬০]

চিরকারিকোপাখ্যানেও আমরা দেখি পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য সম্পর্কে নানা উপদেশ দান করা হয়েছে। এখানে পিতাকে নিখিল দেবতার সমষ্টি বলা হয়েছে এবং মাতাকে বলা হয়েছে দেবতা ও মর্ত্যবাসী সকল ভূতের সমষ্টিস্বরূপ। তাই পিতামাতার তুষ্টিতেই নিখিলের তৃপ্তি।[২৬১] পিতা সম্পর্কে

২৫৭. স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যা পুত্রাঃ সুখানি চ।
গুরুবৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্।
দেব-গন্ধর্বগোলোকান্ ব্রহ্মালোকাংস্তথাপরান্।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ॥ ২।৩০।৩৬-৩৭

২৫৮. যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ। ১২।১০৮।২৫-২৬
১৩।৭।২৫-২৬ ইত্যাদি

২৫৯ ২১৩ তম অঃ ও ২১৪ তম অধ্যায়

২৬০. ন তে মৃত্যু প্রর্ভাবতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি। ১।১০০।১০৩

২৬১. ১২। ২৬৫ তম অধ্যায়

বলা হয়েছে— পিতাই ধর্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা, পিতার পরিতৃপ্তিতে সকল দেবতাই পরিতৃপ্ত হন।[২৬২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে উভয় মহাকাব্যের যুগেই পারিবারিক জীবনে পিতা ও মাতার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং গুরুজনেদের মধ্যে উভয়কেই মহাগুরু রূপে স্বীকার করা হয়েছে।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পরস্পর আচার-আচরণ : রামায়ণে রাম দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রামের অনুজ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। সমগ্র মহাকাব্যে আমরা দেখতে পাই রাম আদর্শ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জ্ঞানে, বিদ্যায়, ধৈর্যে, বীরত্বে ও ভালোবাসায় রাম অকৃপণ। সর্বত্রই তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের জন্য যে-কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ভরতের হাতে অযোধ্যার রাজসিংহাসন ছেড়ে বনবাসে যাত্রা করেছেন। তিনি লক্ষ্মণের ছিলেন প্রাণস্বরূপ। কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি এরূপ অনুপম আচরণ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিদানও তিনি পেয়েছেন। কৈকেয়ীর ইচ্ছানুসারে অযোধ্যার রাজসিংহাসন ত্যাগ করে তিনি বনগমন করলেও ভরত জ্যেষ্ঠ-পরিত্যক্ত রাজসিংহাসনে বসেননি। দীর্ঘকাল সন্ন্যাসীর জীবনে অযোধ্যার শাসনকাজ পরিচালনা করে জ্যেষ্ঠের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন। লক্ষ্মণও সারা জীবন রামের পাশে পাশে থেকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। জ্যেষ্ঠের প্রতি এরূপ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত বিরল।

রাক্ষস সমাজেও আমরা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসার বিকাশ দেখতে পাই। কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ এবং শূর্পণখা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। সময় বিশেষে তিনজনই রাজনীতি সম্পর্কে রাবণকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়েছেন। রাবণ ভগিনী শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই সীতাকে হরণ করেন। বিভীষণ নানা উপদেশবাক্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে স্বমতে আনতে অক্ষম হলে তাঁকে ত্যাগ করেন। তিনি রাবণকে পিতৃতুল্য বলে স্বীকার করেছেন—

'জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্মপথে স্থিতঃ'। —৬।১৬।১৯

মহাভারতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে ব্যবহার কীরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে

২৬২. পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে সর্বাঃ প্রীযন্তি দেবতাঃ॥ ১২।১৬৫।২১

অনেক উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে। অনুশাসনপর্বের অন্তর্গত ভীম-যুধিষ্ঠির সংবাদে 'জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বৃত্তি' নামক একটি অধ্যায়ে এ সম্পর্কে নানা কথা বলা হয়েছে (১০৫ অধ্যায়)। পাণ্ডবদের মধ্যে যুধিষ্ঠির ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাই অন্যান্য চার ভাই জ্যেষ্ঠের বাক্যানুসারে চলতেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা কোনো কাজই করতেন না। আবার যুধিষ্ঠিরও সময় বিশেষে কনিষ্ঠদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। কনিষ্ঠ বলে তাঁদের যুক্তিকে কখনো অগ্রাহ্য করেননি। যুধিষ্ঠির যেমন তাঁর চার ভাইকে অকৃত্রিম স্নেহ করতেন তেমনি অন্য চার ভাইও যুধিষ্ঠিরকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। রামায়ণে রামের বনবাসজীবনে লক্ষ্মণ যেমন তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন অনুরূপভাবে যুধিষ্ঠিরের বনবাস জীবনে তাঁর চার ভাই সর্বদাই পাশে থেকে সেবা করেছেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর প্রতি কনিষ্ঠের আচরণ : উভয় মহাকাব্যের সমাজ-জীবনেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে মায়ের মতো সম্মান করার রীতি ছিল। রামায়ণে লক্ষ্মণ বনবাস-জীবনে রাম-সীতার সঙ্গে থাকতেন এবং সীতাকে মায়ের মতো দেখতেন। এই ব্যবহারে তাঁর কখনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতা-অন্বেষণকালে সীতার পরিত্যক্ত কিছু অলংকার রাম লক্ষ্মণকে দেখালে লক্ষ্মণ বললেন—'আমি প্রতিদিন সীতার চরণ বন্দন করতাম, তাই এই দুটি নূপুর মাত্র আমার পরিচিত। কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনতে পারলাম না'।[২৬৩] লক্ষ্মণের এই উক্তিদ্বারা সীতার প্রতি লক্ষ্মণের শ্রদ্ধাই প্রতিফলিত হয়েছে।

মহাভারতেও বনবাস গমনের প্রাক্কালে পাণ্ডবগণ কুন্তীকে বিদুরের তত্ত্বাবধানে রেখে যান। বিদুর কুন্তীকে সম্মানের সঙ্গে দীর্ঘ তেরো বছর আপন গৃহে রাখেন।[২৬৪] এ ছাড়া ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য, মাতুল, পিতামহ, পুত্র, ভার্যা, ভৃত্য প্রভৃতির প্রতি ভালো ব্যবহার করা গৃহস্থ মাত্রেরই কর্তব্য এ কথা উভয় মহাকাব্যেই বলা হয়েছে।

জ্ঞাতিগণের আচরণ : জ্ঞাতিরা সাধারণত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে থাকে। উভয় মহাকাব্যের সমাজে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল। রাবণ বিভীষণকে তিরস্কার

২৬৩. নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে॥
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ। ৬। ২২ গ. ঘ. ২৩ ক. খ.

২৬৪. জ্যেষ্ঠা মাতৃসমা চাপি ভগিনী ভরতর্ষভ। ১৩।১০৫।২০ ইত্যাদি
বিদুরশ্চাপি তামার্ত্তাং কুন্তীমাশ্বাস্য হেতুভিঃ।
প্রাবেশয়দ্ গৃহং ক্ষত্তা স্বযমার্ত্ততবঃ শনৈঃ॥ ২।৭৯।৩১

করার সময় বলেছেন— 'সকল লোকে প্রসিদ্ধ জ্ঞাতিগণের ব্যবহার আমি জানি। জ্ঞাতিগণের বিপদ উপস্থিত হলে জ্ঞাতি সকল সর্বদাই আনন্দিত হয়। শত্রুরূপী জ্ঞাতিগণ মনের ভাব গোপন করে রাখে; তারা ক্রূর ও ভয়াবহ। তারা সংকট উপস্থিত হলে পরস্পর নিত্য আনন্দিত হয়' (৬।১৬।৩-৫) ইত্যাদি।

তিনি বিভীষণকে আরও বলেছেন—অগ্নি, অন্যান্য অস্ত্রসকল এবং অভিশাপ ভয়জনক নয়, ভীষণ স্বার্থপর জ্ঞাতিগণই আমাদের ভয়াবহ।

নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ শাপাঃ ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ॥৬।১৬।৭

মহাভারতেও জ্ঞাতির ভয়াবহতার কথা বলা হয়েছে। পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বলেছেন— জ্ঞাতিগণকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলে জানবে। জ্ঞাতির ন্যায় শ্রীকাতরতা আর কারও মধ্যে থাকে না। নিকটবর্তী সামন্ত রাজা যেমন রাজার ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারেন না তেমনি জ্ঞাতি কখনো জ্ঞাতির সুখ-ঐশ্বর্য সহ্য করতে সক্ষম হয় না। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহ সরল স্বভাব, মৃদু সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ও সত্যবাদী পুরুষের বিনাশ কামনা করে না।

জ্ঞাতিভ্যশ্চৈব ৰুধ্যেযা মৃত্যোরিব ভয়ং সদা।
উপরাজেব রাজর্দ্ধিং জ্ঞাতির্ন সহতে সদা॥

১২।৮০।৩২-৩৩ ইত্যাদি

মহাভারতে বিভিন্ন স্থলে জ্ঞাতিগণের নানাবিধ গুণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য লৌকিক আচার-আচরণ : উভয় মহাকাব্য যুগের সামাজিক মানুষের আচার-আচরণের মধ্যে সাম্য বর্তমান ছিল। অসংখ্য লৌকিক আচার-আচরণ ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। উভয় মহাকাব্যেই যথাযথভাবে এগুলি স্থান পেয়েছে। লৌকিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মহাকাব্যদ্বয়ের কিছু সাদৃশ্য সংক্ষেপে এখানে দেওয়া হচ্ছে।

শপথ বা প্রতিজ্ঞা : উভয় মহাকাব্যের যুগেই মানুষ বিভিন্ন প্রসঙ্গে শপথ করতেন। নিজের বক্তব্য বিষয়কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তদনুসারে নিশ্চিত কাজ করার জন্যই শপথ করার প্রয়োজন হত। রামায়ণে রাজা দশরথ রামের উদ্দেশে বলেছেন—'আমি সত্যের শপথ করে বলছি যে, আমি গুপ্তস্বভাবা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিসমা কৈকেয়ীর দ্বারা বঞ্চিত হয়েছি'।[২৬৫]

রামও পিতা দশরথের উদ্দেশে বলেছেন—'আমি আপনার সামনে সত্য ও

২৬৫. ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র শপে সত্যেন রাঘব।
ছন্নয়া চলিতস্ত্বস্মি স্ত্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া॥ ২।৩৪।৩৬

আমার পুণ্যের দ্বারা শপথ করে বলছি— আমি রাজ্য প্রার্থনা করি না, আমি সুখ চাই না। আমি কেবল আপনাকে সত্যবাদী করতে চাই'।[২৬৬]

যুদ্ধকাণ্ডে রাম বিভীষণের নিকট বলেছেন— আমি লক্ষ্মণাদি তিন ভাই-এর শপথ করে বলছি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে রাবণকে বিনাশ না করে অযোধ্যায় প্রবেশ করব না।

অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্রজনৰান্ধবম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভিস্তৈর্ভ্রাতৃভিঃ শপে॥ ১৯।২১

রামায়ণের বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে নানা প্রসঙ্গে এই ধরনের শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছে। মহাভারতেও বিভিন্ন স্থলে নানা কথা-পুরুষের মুখে ভিন্ন ভিন্ন শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছে (৩।১৫৭।৫৫, ৮।২৪।৩৯) ইত্যাদি।

অভিশাপ : উভয় মহাকাব্যে অভিশাপের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামায়ণে রাজা দশরথ রামকে বনবাসে পাঠিয়ে যে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা পেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন তার কারণ অন্ধমুনির অভিশাপ। এক সময় রাজা দশরথ শিকারে গিয়ে এক মুনি-পুত্রকে বাণাঘাতে ভ্রমবশত হত্যা করেন। মুনি-পুত্রের পিতা মাতা উভয়েই অন্ধ ছিলেন। পুত্রশোকে নিদারুণ কষ্ট পেয়ে অন্ধমুনি দশরথকে বলেছিলেন— তুমি অজ্ঞানবশত আমার পুত্রকে নিহত করেছ তাই সদ্য ভস্মসাৎ না করে আমি তোমাকে দুঃখজনক নিদারুণ অভিশাপ দিচ্ছি। রাজন্ এখন আমি যেমন পুত্র হারিয়ে দুঃখ পাচ্ছি সেরূপ পুত্রশোকেই তোমার মৃত্যু হবে।[২৬৭]

এই অন্ধমুনির অভিশাপই রামায়ণ-কাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলা যেতে পারে। এর ফলেই নিয়তি-পরিচালিত হয়ে দশরথের নিকট কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা এবং রামের বনবাস যাত্রা, সীতাহরণ ও রাবণ বধ প্রভৃতি ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটেছে। রাবণের প্রতি নল-কুবেরের অভিশাপও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য (৭।২৬।৫৪-৫৫)।

মহাভারতেও প্রায় সমস্ত ঘটনার মূলেই কোনো-না-কোনো অভিশাপ

২৬৬. প্রকীর্ণমূর্দ্ধনাঃ সর্বা বিমুক্তাভরণস্রজঃ।
উরাংসি পাণিভির্ঘ্নন্ত্যো ব্যলপন্ করুণং স্ত্রিয়ঃ॥ ১৬।৭।১৭

২৬৭. ত্বয়াপি চ যদজ্ঞানান্নিহতো মে স ৰালকঃ।
তেন ত্বামপি শপ্স্যেঽহং সুদুঃখমতিদারুণম্॥
পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্!
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি॥ ২।৬৪।৫৩-৫৪

বর্তমান। জনমেজয়ের সর্পসত্র পণ্ড, পিতামহ ভীষ্মের জন্ম, বিদুরের জন্ম, পাণ্ডুর মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনার মূল কারণ এক-একটি অভিশাপ। এমন-কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ ঋষি মৈত্রেয়ের দুর্যোধনের প্রতি অভিশাপ। গান্ধারীর অভিশাপে কৃষ্ণকে পর্যন্ত হীন ভাবে ইহলোকে ত্যাগ করতে হয়।

সপত্নীদের প্রতি আচরণ : সপত্নীদের মধ্যে পরস্পর হৃদ্যতা কোনোকালেই ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও এই আচরণের ব্যতিক্রম ঘটেনি। রামায়ণে রাজা দশরথের মৃত্যু হলে শোকাকুলা কৈকেয়ী বলেছেন—'হায়, আমরা বিধবা হয়ে রামহীন অবস্থায় দুষ্টস্বভাবা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকটে কীভাবে বাস করব' ?[২৬৮]

মহাভারতেও কুন্তী ও মাদ্রীর মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল। কুন্তী সন্তানসম্ভবা হলে মাদ্রী নির্জনে তাঁর ঈর্ষাকাতরতা পাণ্ডুর নিকট প্রকাশ করেছেন।[২৬৯]

ঋষি মন্দপালের পত্নীদ্বয় জরিতা ও লপিতার মধ্যে সপত্নীজনিত বিদ্বেষ ছিল। পত্নীদের আচরণে ঋষি কখনও কখনও কষ্ট অনুভব করতেন।[২৭০] বিদুর নীতিতে বলা হয়েছে— যে-সকল মহিলার গৃহে সপত্নী থাকে তাঁদের অতি দুঃখে দিন অতিবাহিত করতে হয়।[২৭১]

ভূতাবেশের প্রবাদ : ভূতের দ্বারা কোনো ব্যক্তি অভিভূত হলে তার কোনো স্বকীয়তা থাকে না, ভূতের ইচ্ছানুসারেই সে চলে এরূপ ধারণা উভয় মহাকাব্যের যুগেই মানুষের মধ্যে বর্তমান ছিল। রামায়ণে কৌশল্যার শোকাকুল অবস্থার বর্ণনাবসরে বলা হয়েছে— কৌশল্যাদেবী ভূতাবেশগ্রস্তার মতো বার বার কম্পিতা দেহে ভূপতিতা হলেন।[২৭২] দশরথও কৈকেয়ীর নিদারুণ বাক্য শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। মূর্ছাভঙ্গের পর স্বীয় অবস্থাকে ভূতাবিষ্টতা হেতু মনের অস্বাভাবিকতা বলে বর্ণনা করেন (২।১২।২)।

মহাভারতেও কথিত হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাগণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অন্য-পরিচালিত হয়ে যুদ্ধ করছিলেন।[২৭৩] রাজা নলের দেহে কলির প্রভাবও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বরদান : রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দেখা যায় মানুষ, দেবতা,

---

২৬৮. কথং বয়ং নিবৎস্যামঃ কৈকয্যা চ বিদূষিতাঃ॥ ইত্যাদি, ২। ৬৬।২১

২৬৯. ন মেঽস্তি ত্বয়ি সন্তাপো বিগুণেঽপি পরন্তপ। ইত্যাদি, ১। ১২৪। ২-৬

২৭০. ১। ২৩৩ তম অধ্যায়।

২৭১. যাং বাত্রিমধিবিন্না স্ত্রী যাং বৈ চাক্ষপরাজিতঃ।
যাঞ্চ ভারাভিতপ্তাঙ্গো দুর্বিবক্তা স্ম তাং বসেৎ॥ ৫। ৩৫। ৩১

২৭২. ততো ভূতোপসৃষ্টেব বেপমানা পুনঃ পুনঃ। ইত্যাদি, ২। ৬০। ১ ক.খ

২৭৩ আবিষ্টা ইব যুধ্যন্তে পাণ্ডবাঃ কুরুভিঃ সহ। ৬। ৪৬। ৩

যক্ষ, রক্ষ সকলেই বরদান করতেন। বরদান সন্তুষ্টিরই প্রকাশ। উভয় মহাকাব্যেই অভিশাপের ন্যায় বর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ভর্ৎসনা : রামায়ণে কৈকেয়ীর ইচ্ছানুসারে রাম স্বেচ্ছায় বনে গমন করতে চাইলে দশরথ অতিশয় শোকাভিভূত হন। সুমন্ত্র এই সময় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করে ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে কৈকেয়ীকে বিবিধ বাক্যে ভর্ৎসনা শুরু করেন (২।২৩৫)। সুগ্রীবও রামের সাহায্যে রাজ্য লাভ করে সীতা উদ্ধার বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েন। তখন লক্ষ্মণ তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করে বিবিধ বাক্যে তাঁকে ভর্ৎসনা শুরু করেন (৪।৩৪)। অন্যত্র রাবণ বিভীষণকে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করলে বিভীষণও রাবণকে বিবিধ বাক্যে ভর্ৎসনা করে সভাস্থল ত্যাগ করেন (৬।১৬)। রাবণ শুক ও সারণকে ভর্ৎসনা পূর্বক রাজসভা থেকে বহিষ্কৃত করেন।[২৭৪]

মহাভারতেও দেখা যায় যখন কোনো ব্যক্তি অপরকে ভর্ৎসনা করছেন তখন তাঁর অন্যায় আচরণগুলি উল্লেখ করে নানাভাবে নিন্দা করছেন। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য দুঃশাসনকে বিবিধ শ্লেষপূর্ণ বাক্যে ভর্ৎসনা করেছেন (৮।১২০ অধ্যায়)।

আত্মহত্যার উপায় : আত্মহত্যার উপায় হিসেবে বিষ খাওয়া, আগুনে প্রবেশ, জলে-ডোবা এবং গলায় দড়ির ফাঁস দেওয়া প্রভৃতি উভয় মহাকাব্য যুগের লোকসমাজে প্রচলন ছিল।[২৭৫]

উপহাস : উভয় মহাকাব্যের সমাজে নানাভাবে উপহাস করার রীতি প্রচলিত ছিল। রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে শূর্পণখা রামকে বিয়ে করতে চাইলে রাম মৃদুহাস্যে শূর্পণখাকে বললেন— আমার স্ত্রী সীতা। তোমার মতো রমণীর সপত্নী থাকা অত্যন্ত দুঃখকর। আমার এই কনিষ্ঠ ভাই সুচরিত্র, শ্রীমান, বীর্যবান, প্রিয়দর্শন ও যুবক। ইহার সঙ্গে কোনো স্ত্রী নেই। তুমি সপত্নীহীনা হয়ে আমার ভাইকে পতিরূপে ভজনা করো (১৮।৩-৫)।

মহাভারতেও দেখা যায় কারও কোনো হাস্যোদ্দীপক আচরণ দেখলে তাকে উপহাস করা হত।[২৭৬]

মৃগয়া : প্রাচীনকাল থেকেই রাজারা মৃগয়ার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করতেন।

---

২৭৪. ভর্ৎসয়ামাস তৌ বীরৌ কথান্তে শুকসারণৌ। ৬। ২৯। ৫

২৭৫. ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং পতেয়মপি চার্ণবে। রামা. ২।১৮।২৯
বিষমগ্নিং জলং রজ্জুমাস্থাস্যে তব কারণাৎ। ম. ভা. ৩। ৫৬। ৪

২৭৬. তত্র মাং প্রহসৎ কৃষ্ণঃ পার্থেন সহ সুস্বরম্।
দ্রৌপদী চ সহ স্ত্রীভির্ব্যথয়ন্তী মনো মম॥ ২। ৫০। ৩০

রামায়ণে রাজা দশরথ যৌবনকালে মৃগয়া করতে গিয়ে অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করে অভিশাপগ্রস্ত হন (২।৬৩)।

মহাভারতেও শান্তনু, পাণ্ডু, কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের মৃগয়ার কথা পাওয়া যায়।[২৭৭]

অক্ষক্রীড়া : রামায়ণে বিভিন্ন স্থলে অক্ষক্রীড়াকে কামজ ব্যসন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আদর্শ রাজার উচিত এটি ত্যাগ করা।

মহাভারতেও অক্ষক্রীড়াকে ভালো নজরে দেখা হয়নি। ভারতযুদ্ধের মূলই অক্ষক্রীড়া। অত্যধিক দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হওয়ার জন্যই যুধিষ্ঠিরকে সর্বস্ব হারাতে হয়েছে। মৃগয়া এবং অক্ষক্রীড়া উভয় মহাকাব্যেই কামজ ব্যসন রূপে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উভয় মহাকাব্যের সমাজে জলকেলি, পান, ভোজন, নৃত্য, গীত প্রভৃতির মাধ্যমে নর-নারী আনন্দে মত্ত থাকতেন।

অভিষেক : রাজ্যের ভার নেওয়ার পূর্বে ভাবী রাজাকে অভিষিক্ত করার নিয়ম উভয় মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়। এটিকে প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত লৌকিক উৎসব বলা যেতে পারে।

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামের অভিষেকের যাবতীয় বস্তু সংগৃহীত হয়েছিল। রামও উপবাসাদি নানা প্রকার নিয়ম পালন করেছিলেন। রাজপ্রাসাদে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু মন্থরার কুপরামর্শে কৈকেয়ী শেষ পর্যন্ত রামের অভিষেক-ক্রিয়া পণ্ড করে দেন। (৫-৭ অধ্যায়)।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের অভিষেকের সময় মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ কুশপূর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃতদ্বারা আহুতি দান করলে গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, হনুমান প্রভৃতি বানর সুগ্রীবকে সুন্দর ও চিত্রিত মাল্যশোভিত প্রাসাদশিখরে অবস্থিত উত্তম আস্তরণে আবৃত স্বর্ণ-সিংহাসনে পূর্বমুখে বসিয়ে চারি দিকে অবস্থিত নদ, নদী ও সাগর থেকে আনীত জলসমূহ স্বর্ণকুম্ভে স্থাপন করেন। তার পর বৃষশৃঙ্গ ও কাঞ্চনময় কলসীদ্বারা মহর্ষিগণ বিহিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে নির্মল সুগন্ধি তীর্থজল দ্বারা তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করেন (২৬।২৮-৩৬)।

মহাভারতেও কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের বিশদ বর্ণনা মেলে। কর্ণের

২৭৭. স কদাচিদ্ বনং রাজনং মৃগয়াং নির্যযৌ পুরাৎ। ১।৯৫।৫৯, ১।১৭৬।২, ১১৮ তম অঃ, ২২১।৬৪ ইত্যাদি

অভিষেকের সময় একটি জলপূর্ণ সুবর্ণ ঘট আনীত হয়েছিল। সেই সুবর্ণ ঘটে খই এবং ফুল ছিটিয়ে কর্ণকে সুবর্ণপীঠে বসানো হয়েছিল। তার পর সেই জল দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তাঁর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন (১।১৩৬। ৩৭-৩৮)।

যুধিষ্ঠিরও অভিষেকের সময় সুবর্ণপীঠে উপবিষ্ট হন। কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, ধৌম প্রভৃতি গুরুজন আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হলে যুধিষ্ঠির প্রথমে সাদা ফুল, স্বস্তিক, ভূমি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করেন। যুধিষ্ঠিরের সামনে অভিষেকের যাবতীয় দ্রব্য আনীত হয়। সুবর্ণ, রজত, তাম্র এবং মৃত্তিকার তৈরি কলসীগুলি জল দ্বারা পূর্ণ করে নিকটে রাখা হয়। খই, মধু, ঘৃত প্রভৃতিও সংগৃহীত হয়। ব্যাঘ্রচর্মের আসনে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে বসানো হলে ধৌম মন্ত্র উচ্চারণ করে আহুতি দেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খের জল দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করলে ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য ভাইগণ ও উপস্থিত প্রজাবৃন্দ তাঁকে অভিষিক্ত করেন। (১২।৪০ অধ্যায়)

মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি : উভয় মহাকাব্যের সামাজিক জীবনে কতকগুলি দ্রব্যকে মঙ্গলসূচক বলে মনে করা হত। এই সকল দ্রব্যগুলি অভিষেক, পূজার্চনা বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সংগৃহীত হত। রামের অভিষেকের জন্য যে- সকল মাঙ্গলিক দ্রব্য আনীত হয়েছিল সেগুলি হল— স্বর্ণনির্মিত জলকুম্ভ, অলংকৃত ভদ্রপীঠ, ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত রথ, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল থেকে আনীত জল, অন্যান্য পবিত্র নদী থেকে আনীত জল, হ্রদ, কূপ, সরোবর, পূর্ববাহিনী, ঊর্ধ্ববাহিনী ও বক্রগামিনী জলপূর্ণা নদী থেকে আনীত জল; সমুদ্রের জল, মধু, দই, ঘি, খই, কুশ, দুধ, আটটি সুন্দরী কন্যা. মদমত্ত হাতি, সুবর্ণ ঘট, চামর, ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি (২। ১৫ অধ্যায়)।

মহাভারতেও চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘি, শঙ্খ, শালগ্রাম প্রভৃতিকে মাঙ্গলিব দ্রব্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে (৫।৪০।১০-১১) ইত্যাদি।

এ ছাড়া রামায়ণোক্ত দ্রব্যগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই মহাভারতের সমাজেও মাঙ্গলিক দ্রব্যরূপে স্বীকৃত ছিল।

অভিবাদন : রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাম পিতা দশরথকে দেখার জন্য সুমন্ত্রের সঙ্গে বিশাল প্রাসাদে আরোহণ করলেন। পিতার নিকট গিয়ে করজোড়ে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং নিজ নাম উচ্চারণ করে চরণ স্পর্শ করলেন। দশরথ

রামকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন।[২৭৮] অন্যত্র কৌশল্যাকে রামের মস্তক আঘ্রাণ করতেও দেখা যায়।[২৭৯]

মহাভারতেও দেখা যায় গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই দেবতা, গুরুজন ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করার রীতি ছিল।[২৮০] অভিবাদন করার সময় আপন নাম উচ্চারণ করার কথাও পাওয়া যায়।[২৮১] গুরুজনের পায়ে হাত ঠেকিয়ে বা মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার নিয়ম ছিল। গুরুজন প্রণত স্নেহভাজন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করতেন না, তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করতেন।[২৮২]

উদ্ধৃত উদাহরণগুলির মাধ্যমে উভয় মহাকাব্য যুগের সামাজিক মানুষের অনুসৃত আচার-আচরণগুলির মধ্যে সাদৃশ্যের দিকটি যথাসম্ভব দেখানো হল। আর এই ধরনের অসংখ্য লৌকিক আচার-আচরণ উভয় মহাকাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে কয়েকটি সাদৃশ্যমূলক উদাহরণ গৃহীত হয়েছে মাত্র।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অশৌচ, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ : রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে-সকল নিয়ম ও আচার-আচরণ বর্ণিত হয়েছে সেগুলিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

রামায়ণে দশরথের প্রাণহীন দেহ যে শয্যায় শোয়ানো হয়েছিল সেটি নানা প্রকার মূল্যবান রত্নে সাজানো হয়েছিল। শোকাকুল পরিচারকগণ সুসজ্জিত শিবিকায় মৃতদেহ তুলে শ্মশানে নিয়ে আসে।[২৮৩] অপরাপর ব্যক্তিগণ সোনা, রূপা ও নানা প্রকার বহুমূল্য বস্ত্র ছড়াতে ছড়াতে মৃতদেহের সম্মুখভাগে গমন করতে থাকে। অন্যেরা চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল, গন্ধযুক্ত কাঠ, দেবদারু এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য চিতায় নিক্ষেপ করতে থাকে।[২৮৪] সাজানো চিতার মধ্যস্থলে রাজার মৃতদেহ স্থাপন করা হয়। ঋত্বিকেরা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।

২৭৮. নাম স্বং শ্রাবয়ন্ রামো ববন্দে চরণৌ পিতুঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ॥ ৩। ৩৩ ইত্যাদি

২৭৯. আনম্য মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পরিসৃজ্য যশস্বিনী। ২। ২৫। ৪০

২৮০. ১। ১১৩। ৪৩, ২০৭। ২১, ২। ২। ৩৪, ৪৯। ৫৩ ইত্যাদি

২৮১ অভ্যবাদয়ত প্রীতঃ শিরসা নাম কীর্ত্তয়ন্। ৩। ১৫৯। ১

২৮২ স তয়া মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রাতঃ পরিমুক্তশ্চ কেশবঃ। ২। ২। ৩ ইত্যাদি

২৮৩. শিবিকায়ামথারোপ্য রাজানং গতচেতনম্।
বাষ্পকণ্ঠা বিমনসস্তমূহুঃ পরিচারকাঃ॥ ২।৭৬।১৪

২৮৪. চন্দনাগুরুনির্যাসান্ সরলং পদ্মকং তথা।
দেবদারূণি চাহৃত্য ক্ষেপয়ন্তি তথাপরে॥ ২।৭৬।১৬

সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সামগান শুরু করেন।[২৮৫] ঋত্বিকগণসহ কৌশল্যা প্রভৃতি কুলনারীগণ শোকসন্তপ্ত চিত্তে জ্বলন্ত চিতা প্রদক্ষিণ করতে থাকেন।[২৮৬]

এইভাবে শোকাকুল চিত্তে দশরথের দাহকর্ম শেষে রাজমহিষীগণসহ মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ সরযূতীরে এসে রাজার আত্মার শান্তির জন্য তর্পণ করেন। তর্পণশেষে অযোধ্যায় ফিরে ভূমিশয্যায় দশ দিন অশৌচ অতিবাহিত ক'রে একাদশ দিনে অশৌচ ত্যাগ এবং দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধকর্ম করেন।[২৮৭]

অরণ্যকাণ্ডে রাম পিতা দশরথেব বন্ধু জটায়ুর মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করেন।[২৮৮] অরণ্যে হলেও রাম পিতৃবন্ধু এই পক্ষিরাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাসম্ভব মর্যাদার সঙ্গেই সমাপন করেন। দাহশেষে মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করে কুশের উপরিভাগে জটায়ুর উদ্দেশে ঐ পিণ্ডদান করন। ব্রাহ্মণগণ মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভের উদ্দেশে যে মন্ত্রপাঠ করেন রামও সেই মন্ত্র জপ করেন (৬৮।৩২-৩৪)। পরে রাম ও লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীর তীরে জটায়ুর উদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করেন।[২৮৯]

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বালীর মৃতদেহ সৎকারের সুন্দর বর্ণনা মেলে (২৫ অধ্যায়)।

লঙ্কাকাণ্ডে (১১১ অধ্যায়) রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিত্রটি মহর্ষি বাল্মীকি-কর্তৃক সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

বিভীষণ রাক্ষসরাজ রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে বিধান অনুসারে রাবণের

২৮৫. গন্ধানুচ্চাবচাংশ্চান্যাংস্তত্র গত্বাথ ভূমিপম্।
তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ॥
তদা হুতাশনং হুত্বা জেপুস্তস্য তদৃত্বিজঃ।
জগুশ্চ তে যথাশাস্ত্রং তত্র সামানি সামগাঃ॥ ২। ৭৬। ১৭-১৮

২৮৬. প্রসব্যং চাপি তং চক্রুর্ঋত্বিজোঽগ্নিচিতং নৃপম্।
স্ত্রিয়শ্চ শোকসন্তপ্তাঃ কৌশল্যাপ্রমুখাস্তদা॥ ২।৭৬।২০

২৮৭ কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্ধং
নৃপাঙ্গনা মন্ত্রিপুরোহিতাশ্চ।
পুবং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনযন্ত দুঃখম্॥ ২।৭৬।২৩

২৮৮. এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্।
দদাহ রামো ধর্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ॥ ৩।৬৮।৩১

২৮৯ ততো গোদাববীং গত্বা নদীং নববরাত্মজৌ।
উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ॥ ৩।৬৮।৩৫

অগ্নিহোত্র সমাপন করেন। তার পর শকট, কাঠের পাত্র, চন্দন, অগুরু, নানা প্রকার গন্ধযুক্ত কাঠ, গন্ধদ্রব্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল অগ্নি প্রভৃতি সংগ্রহ করে মাল্যবানের সঙ্গে মৃতদেহের দাহ আরম্ভ করেন। যে-সকল মাগধগণ স্তুতিপাঠ দ্বারা রাক্ষসরাজকে সন্তুষ্ট করতেন তাঁরা মৃতদেহটিকে ক্ষৌমবস্ত্রের দ্বারা আবৃত করে শিবিকায় তুলেছিলেন। শিবিকাটি বিচিত্র মালা ও পতাকায় সাজানো হয়েছিল। অগ্নিহাতে অধ্বর্য্যুগণ কুলনারীগণসহ দাহক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাক্ষসগণ শোকাকুল চিত্তে রাক্ষসরাজের প্রাণহীন দেহ পবিত্র স্থানে রেখে চন্দন কাঠ ও বিবিধ গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা প্রস্তুত করেছিলেন। মৃতদেহের কাঁধে দই ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব, পা দুটিতে শকট ও মধ্যস্থলে উদূখল রাখা হয়েছিল। অনুরূপভাবে অরণি উত্তরারণি ও অন্যান্য কাঠের পাত্র যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছিল। তার পর শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষিগণ বিধান অনুসারে মেধ্য পশু বধ করে তার চামড়া দ্বারা শবদেহের মুখ ঢেকে দিয়েছিলেন এবং বিভীষণ প্রভৃতি শোকসন্তপ্ত চিত্তে গন্ধ ও মালাদ্বারা শবদেহ অলংকৃত করে উপরে খই ও অন্যান্য নানা প্রকার বস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। পরে বিভীষণ চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন।[২৯০] এবং স্নানশেষে আর্দ্র বস্ত্রেই বিধি অনুসারে তিল ও দর্ভ সহযোগে জলাঞ্জলি দান করেন। তার পর কুলকামিনীদের সান্ত্বনা দেন ও তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে বলেন।[২৯১]

মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম লোকান্তরিত হলে ধর্মপ্রাণে বিদুর এবং যুধিষ্ঠির পবিত্র বস্ত্র ও মালাদ্বারা মৃতদেহ যত্নসহকারে ঢেকে দিলেন। ভীম এবং অর্জুন চামরের দ্বারা বাতাস করতে আরম্ভ করলেন। যুযুৎসু মৃতদেহের উপর ছাতা ধরলেন। নকুল ও সহদেব সেই বীরশ্রেষ্ঠের মাথার উপর উষ্ণীষ পরিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির এবং ধৃতরাষ্ট্র পদতলে উপবেশন করলেন। কুরুকুলের রমণীগণও তালবৃন্তদ্বারা শবদেহে বাতাস করতে আরম্ভ করলেন

২৯০ পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্।
গন্ধৈর্মাল্যৈরলঙ্কৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ॥
বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি।
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তথা॥ ৬।১১১। ১১৮-১১৯

২৯১. স দদৌ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ।
স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ্ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান॥
উদকেন চ সম্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্।
তাঃ স্ত্রিয়োঽনুনয়ামাস সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৬। ১১১। ১২০-১২১

(১৩।১৬৮।১২-১৫)। তার পর নানা রকম গন্ধদ্রব্য ও চন্দনকাঠ প্রভৃতি দিয়ে চিতা প্রস্তুত করা হল। শবদেহের উপর কালীয়ক, কালাগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য স্থাপন করার পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ চিতা প্রদক্ষিণ করতে করতে দাহ শেষ করলেন। সামবেদীয় পণ্ডিতগণ শ্মশানভূমিতে বসে সামগান গেয়ে চললেন (১৩। ১৬৮। ১৫-১৭)।

মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনীতে পাণ্ডু ও মাদ্রীর শবদাহর দৃশ্যটিও বিস্তারিতভাবে চিত্রিত হয়েছে :

শতশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডুর মৃত্যু হলে তাঁর মৃতদেহ দাহ করার সময় জ্বলন্ত চিতায় মাদ্রী প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মহর্ষিগণ উভয়ের ভস্মাবশিষ্ট অস্থি নিয়ে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র সকল বৃত্তান্ত জানার পর উভয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রাজোচিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিদুরকে নির্দেশ দিলেন। নানা প্রকার ফুল গন্ধদ্রব্য দ্বারা শিবিকা সাজানো হল। মালা ও বস্ত্র দিয়ে অস্থিগুলি ঢেকে দেওয়া হল। পরে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণ শিবিকাটি বহন করে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। ছাতা, চামর ও পাখা নিয়ে কয়েকজন শিবিকার সঙ্গে চললেন। গঙ্গাতীরে শিবিকায় ঢাকা শবখণ্ড বার করে গন্ধাদি মাখিয়ে স্নান করানো হল। তার পর গন্ধাদি দিয়ে শ্বেতবর্ণ বস্ত্রে ঢেকে ঘি এবং চন্দনকাঠের দ্বারা দাহ করা হল (১।১২৭ অধ্যায়)।

বসুদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিত্রটিও মহর্ষি বেদব্যাস নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন :

বসুদেবের মৃত্যুর পর দ্বারকার নাগরিকগণ তাঁর শবদেহ শ্মশানে বহন করে আনলেন। দ্বারকার জনগণ শ্মশান পর্যন্ত শবদেহের সঙ্গে গেলেন। যাজক ও বিধবা রমণীগণও শ্মশানে হাজির হলেন। জীবিত অবস্থায় যে স্থানটি তিনি বেশি পছন্দ করতেন সেখানেই তাঁর প্রাণহীন দেহ দাহ করার জন্য চিতা প্রস্তুত করা হল। দেবকী প্রভৃতি চারজন মহিষী সেই চিতায় আরোহণ করেন। চন্দন ও নানা প্রকার গন্ধযুক্ত কাঠ দ্বারা তাঁর দেহ দাহ করা হল (১। ১২৭ অধ্যায়)।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখা গেল উভয় মহাকাব্যের যুগে মানুষের মরদেহ দাহ করার সময় নারীগণও উপস্থিত থাকতেন। বেদগান গাওয়ার রীতি ছিল। শিবিকা বিবিধ গন্ধযুক্ত মূল্যবান দ্রব্যে সাজানো হত। চন্দন কাঠ দ্বারা দাহ করা হত। দাহশেষে স্নান ও তর্পণ করার নিয়ম ছিল। অবশ্য উপরে আলোচিত শবদাহের বর্ণনাগুলিতে অভিজাত পরিবারের দাহ পদ্ধতির কথাই

বলা হয়েছে। সাধারণ নাগরিকগণের দাহকর্ম সম্ভবত এরূপ সমারোহের মাধ্যমে সম্পন্ন হত না।

উভয় মহাকাব্য যুগেই মানুষ আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে অশৌচ পালন করতেন। রামায়ণে দশরথের মৃত্যুর পর ভরত এগারো দিনে অশৌচ মুক্ত হয়েছিলেন (২।৭৭।১)।

মহাভারতে পিতার মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণও অশৌচ পালন করেন ও সেই সময় ভূমিতে শয়ন করেন। মৃত্যুর দিন থেকে আটাশ দিন পর্যন্ত তাঁরা অশৌচ পালন করেন। দাহ করার দিন থেকে এগারো দিনে অশৌচ ত্যাগ ও বারো দিনে শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করেন (১।১২৭।৩২)। সাধারণত ক্ষত্রিয়গণের বারো দিন অশৌচ পালন করার নিয়ম (১।১২৮।৩)। মহাভারত-যুদ্ধে রাজাদের মৃত্যু ঘটলে তাঁদের দাহ করার পর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর পাণ্ডবগণ এবং কুরুবংশের মহিলারা বারো দিনই অশৌচ পালন করেছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনে সুপ্ত বীরগণ নিহত হলে সেদিন থেকে বারো দিন অশৌচ পালন করা হয়েছিল।

শবদাহের ন্যায় তর্পণ ও শ্রাদ্ধের বর্ণনাও উভয় মহাকাব্যে মেলে। হিন্দু জীবনাদর্শে স্বীকৃত চারটি ঋণের মধ্যে পিতৃঋণ অন্যতম। বংশ পরম্পরায় মানুষ যে-সকল আদর্শ ও সৎগুণের অধিকারী তার জন্য এবং স্বীয় শরীর সৃষ্টির জন্য পিতা মাতা ও অন্যান্য পিতৃপুরুষগণের নিকট তাকে ঋণ স্বীকার করতে হয়। এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য সাধারণভাবে দুটি উপায় অনুসৃত হয়। একটি বংশমর্যাদা বৃদ্ধি ও অপরটি শাস্ত্রোক্ত বিধানে পিতৃকর্ম। এই পিতৃকর্মটি দুই প্রকারে সম্পন্ন করা যেতে পারে— প্রথমটি তর্পণ ও দ্বিতীয়টি শ্রাদ্ধ।

তর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধার সঙ্গে পিতৃলোকের উদ্দেশে জলাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধাপূর্বক পিতৃলোকের উদ্দেশে অন্নদানের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রাদ্ধের বিভিন্ন ভেদ বর্তমান। রামায়ণ-মহাভারতে হিন্দু শাস্ত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার শ্রাদ্ধের বিবরণ না পাওয়া গেলেও মৃতের উদ্দেশে দানের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।

রামায়ণে মানুষ, পক্ষী, বানর ও রাক্ষস সকল জাতির মধ্যেই মৃত আত্মীয়-স্বজনের পারলৌকিক শান্তির জন্য তর্পণ রীতির বর্ণনা মেলে।

ভরত অরণ্যবাসী রামকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে পথে পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে দেখে স্বর্গত পিতা দশরথের উদ্দেশে তর্পণ করতে আগ্রহী

হন এবং তা সম্পন্ন করেন।[২৯২]

রাবণের হাতে নিহত জটায়ুর আত্মার শান্তি কামনায় রাম-লক্ষ্মণের মতো তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই সম্পাতিও জটায়ুর মৃত্যু সংবাদ শুনে তর্পণ করতে চান। বানরগণ দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে তাঁর ইচ্ছানুসারে সমুদ্রতীরে নিয়ে যায় এবং তর্পণক্রিয়া শেষ হলে পুনরায় তাঁকে বাসায় নিয়ে আসে।[২৯৩]

বালীর মৃতদেহ দাহ করার পর সুগ্রীব, তারা ও অন্যান্য বানরগণ অঙ্গদকে সামনে রেখে তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন করেন।[২৯৪]

মহাভারতে প্রত্যেক অমাবস্যা তিথিতে বিশেষভাবে তর্পণ করার নিয়মের উল্লেখ দেখা যায়।[২৯৫] কারণ পিতৃগণ অমাবস্যাতে জলাঞ্জলি প্রাপ্তির আশায় থাকেন। দেবগণ জলাঞ্জলি প্রাপ্তির আশা করেন পূর্ণিমাতে।[২৯৬] মহাভারতে পিতৃগণকে প্রতিদিন স্মরণ ও তাঁদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি ও শ্রাদ্ধদান সন্তানের নিত্য কর্তব্যকর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে।[২৯৭]

তীর্থোদকে তর্পণের কথা বনপর্বে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। অর্জুন গঙ্গাদ্বারে ভাগীরথীর পুণ্য জলে তর্পণ করেন।[২৯৮] কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত বীরগণের পত্নীগণ একত্রে তাঁদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের আত্মার শান্তি কামনায় গঙ্গার জলে তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন (১১।২৭। ১-৩)।

এ ছাড়াও মহাভারতের নানা স্থলে ঋষিতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও প্রেত তর্পণের উল্লেখ মেলে।

রামায়ণে দশরথের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনরত্ন দান করা হয়। মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক শান্তির জন্য শ্রাদ্ধে এরূপ দান করা হত (২।৭৭।১-৩)।

২৯২. দাতুঞ্চ তাবদিচ্ছামি স্বর্গতস্য মহীপতেঃ।
ঔর্ধ্বদেহনিমিত্তার্থমবতীর্য্যোদকং নদীম্॥ ২। ৮৩। ২৪

২৯৩. সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বরুণালয়ম্।
প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ॥
ততো নীত্বা তু তং দেশং তীরে নদনদীপতেঃ।
নির্দগ্ধপক্ষং সম্পাতিং বানবাঃ সুমহৌজসঃ॥ ইত্যাদি ৪।৫৮।৩৫-৩৭

২৯৪ ততস্তে সহিতাস্তত্র হ্যঙ্গদংস্থাপ্য চাগ্রতঃ।
সুগ্রীবতারাসহিতাঃ সিষিচুর্বানরা জলম্॥ ৪। ২৫। ৫২

২৯৫. মাসার্দ্ধে কৃষ্ণপক্ষস্য কুর্য্যান্নির্বপণানি বৈ। ইত্যাদি ১৩।৯২।১৯

২৯৬ অমাবস্যাং হি পিতবঃ পৌর্ণমাস্যাং হি দেবতাঃ। ইত্যাদি ১৩। ৯২।১৬

২৯৭. নদীমাসাদ্য কুর্ব্বীত পিতৃণাং পিণ্ডতর্পণম্। ইত্যাদি ১৩।৯২।১৬

২৯৮. ১। ২১৪।১২

মহাভারতেও শ্রাদ্ধের মুখ্য ফল পিতৃপুরুষের পরিতৃপ্তি বলে স্বীকৃত। তবে এর মাধ্যমে শ্রাদ্ধকর্তাও সুসন্তান, সুন্দর স্বাস্থ্য ও প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হন এ কথা অনুশাসনপর্বে বার বার বলা হয়েছে।[২৯৯]

পাণ্ডুর দেহত্যাগের পর পাণ্ডবগণ শাস্ত্রানুসারে তাঁর শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হয়। ভোজন-শেষে তাঁদেরকে নানাবিধ ধনরত্ন দান করা হয় (১।১২৮।১-২)।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর পিতামহ ভীষ্ম শাস্ত্রানুসারে তাঁর শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করেন। ঋত্বিকগণের সাহায্যে তাঁর মহিষীগণও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন।[৩০০]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে মৃত যোদ্ধাগণের আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ শান্তি সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধের শেষে তিনি বহু ব্রাহ্মণকে নানাবিধ ধনরত্ন দান করেন।[৩০১] শুধু তাই নয়, মহাপ্রস্থানের পূর্বেও তিনি তাঁর মামা, বাসুদেব, বলরাম ও অন্যান্য বীরদের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, নারদ, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষিকে নানা বস্তু দান করেছিলেন। অন্যান্য অসংখ্য ব্রাহ্মণও তাঁর দানে তৃপ্ত হন।[৩০২] আজও ভারতীয় সমাজজীবনে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন ও দানের রীতি কম-বেশি অনুসৃত হয়।

দেবতা

রামায়ণে জটায়ু রামের নিকট তেত্রিশ জন মূল দেবতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে— দ্বাদশ সূর্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দুই জন স্বর্গবৈদ্য।[৩০৩] বৃহদারণ্যক উপনিষদে রামায়ণে উল্লিখিত শেষোক্ত দুই স্বর্গ বৈদ্যের স্থলে প্রজাপতি ও ইন্দ্রের নাম দেখা যায়।[৩০৪] অপরাপর দেবগণকে উক্ত দেবগণের বিভূতি বলা হয়েছে। মহাভারতেও দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ বলে

২৯৯. ৫৭। ১২, ৬৩।১৫, ৯২।২০ ইত্যাদি

৩০০. ১। ১০১। ১১, ১। ১০২। ৭২, ৭৩

৩০১. ১২। ৪২ শ অধ্যায়

৩০২. ১৭। ১০-১৪

৩০৩ আদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংসদরিন্দম॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ। ৩। ১৪।১৪ গ. ঘ—১৫ ক. খ.

৩০৪. স হোবাচ মহিমান এবৈষামতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি
কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশাদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা
দ্বাদশাদিত্যাস্তএকত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি॥ ৩।৯।২

উল্লেখ থাকলেও তাঁদের নামোল্লেখ নেই।[৩০৫] তবে টীকাকার নীলকণ্ঠ উপনিষদোক্ত তেত্রিশ জনের নামই উল্লেখ করেছেন।[৩০৬] এ ছাড়া উভয় মহাকাব্যে অগ্নি, বরুণ, বিষ্ণু, যম, সূর্য, স্কন্দ, ব্রহ্মা, শিব, পার্বতী, গঙ্গা, সরস্বতী প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর উল্লেখ মেলে।

কাল : রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় মহাকাব্যে অমোঘশক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন দেবদেবীর কথা থাকলেও 'কালকে' সকল শক্তি ও দেবতার ঊর্ধ্বে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কালকে সকল ভূতের আশ্রয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কালের মধ্যে বিশ্বচরাচরে সব-কিছুই নিহিত। কাল এমন এক শক্তি যা কোনো ভূতের পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

রামায়ণে ভরত কাল সম্পর্কে বলেছেন— কোনো দেবতাই কাল অপেক্ষা অধিক বলশালী নয়।[৩০৭] জটায়ুর মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে রাম বলেছেন— বহুদিন পূর্বে ইনি জন্মেছেন— ইনি অত্যন্ত প্রাচীন। এখন নিহত এবং ভূতলে শায়িত। কালের প্রভাব কেউই অতিক্রম করতে পারে না।[৩০৮]

অন্যত্র কবন্ধ রামের উদ্দেশে বলেছে— মনুষ্যলোকে যা অবশ্যম্ভাবী তা অন্যথা করার শক্তি কারও নেই, কারণ কালকে কেহই অতিক্রম করতে পারে না।[৩০৯]

এইভাবে আদি কবি বাল্মীকি রামায়ণের একাধিক স্থলে কালকে বিশ্বচরাচরের সকল বস্তুর নিয়ন্তা রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

মহাভারতেও ঋষিকবি বেদব্যাসের লেখনীমুখে বার বার এই চরম সত্যেরই প্রকাশ ঘটেছে।

শান্তিপর্বে বলা হয়েছে— কাল আপন শক্তিতে সকল বস্তুকে অভিভূত করে ফেলে। অনন্ত কালের গর্ভে প্রাণিগণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে লীলা করছে। কালই স্রষ্টা। কালই সংহারক। কাল আদি ও অন্তহীন। অগ্নি, প্রজাপতি, ঋতু, মাস, পক্ষ,

৩০৫. ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপলক্ষণা॥ ১।১।৪১
ত্রয়স্ত্রিংশত ইত্যেত দেবাঃ ইত্যাদি। ১।৬৬।৩৭, ৩।২১৩।১৯, ১৩।১৫০।২৪

৩০৬. তে চাষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশাদিত্যাঃ, ইন্দ্রঃ প্রজাপতিশ্চ। ১।১।৪১

৩০৭. ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্। ২।৮৮।১১ ক. খ.

৩০৮. অনেকবার্ষিকো যস্তু চিরকালসমুত্থিতঃ।
সোঽয়মদ্য হতঃ শেতে কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ৩।৬৮।২১

৩০৯ ভবিতব্যং হি তচ্চাপি ন তচ্ছক্যমিহান্যথা।
কর্তুমিক্ষ্বাকুশার্দুল কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ ৩। ৭২। ১৬

দিন, ক্ষণ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ইত্যাদি অখণ্ড কালের উপাধি মাত্র (১২।১২৪।১৯-২০, এবং ২২৪।২৫-৬০)।

ভীষ্মপর্বে বিশ্বরূপদর্শনাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন— কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ। ৩৫।৩২

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একদা শাস্ত্রবিস্মৃত অর্জুনকে নানা সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করেন। মহর্ষির এই সকল বাক্যের মধ্যে কালের অপরিমেয় শক্তির কথা বিঘোষিত হয়েছে। অর্জুনের উদ্দেশে তিনি বলেছেন— জগতে যা-কিছু দেখছ সবই কালমূলক। কাল তার ইচ্ছানুসারে সংহার লীলার অভিনয় করে। আজ যে ব্যক্তি প্রচণ্ড শক্তিশালী বলে পরিচিত কালে তিনি অত্যন্ত দীন ও অবজ্ঞার পাত্রও হতে পারেন। কালের সামর্থ্য বর্ণনার অতীত।[৩১০]

বৈদিকসাহিত্যে কালের যে অপরিমেয় ক্ষমতার কথা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে উভয় মহাকাব্যকারের কণ্ঠেও তার প্রতিধ্বনি মেলে।

ধর্ম

মহাকবি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ মহাকাব্যে প্রায় সর্বত্র ধর্ম অর্থ ও কামের কথা এসেছে। মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই বিষয়গুলিকে কবি শুধুমাত্র উল্লেখই করেননি, সমাজের মানুষ এগুলিকে কীভাবে লাভ করে পূর্ণতা লাভ করতে পারবে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। মহাকাব্যের আদিকাণ্ডে রামায়ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্॥ ১।৩।৮

অনুরূপভাবে মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারতেও বিস্তৃতভাবে এ বিষয়গুলির সমাবেশ ঘটেছে। মহর্ষি কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কারণ ও তার পরিণতি বর্ণনাবসরে বার বার ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের কথা বলেছেন। তাই মহাভারত আমাদের কাছে শুধুমাত্র কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের ইতিহাসই নয়, এটি একাধারে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, ইতিহাস ও কাব্যরূপে পরিচিত। কবি তাঁর কাব্যের প্রশংসা করে বলেছেন—

অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥ ১।২।৩৯০

মানুষের সব কাজই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যে-কোনো একটির নিমিত্ত।

৩১০ কালমূলমিদং সর্ব্বং জগদ্বীজং ধনঞ্জয়।
কাল এব সমাদত্তে পুনরেব যদৃচ্ছয়া। ইত্যাদি ১৬। ৮। ৩৩-৩৬

তাই এগুলি পুরুষার্থ নামে পরিচিত। উভয় মহাকাব্যেই ধর্মকে প্রধান পুরুষার্থ রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্মের মাধ্যমে অন্য তিন পুরুষার্থও লাভ করা যায় এ কথাও বলা হয়েছে।

উভয় মহাকাব্যে ধর্মের স্থান : সাধারণ মানুষের ধর্ম অপেক্ষা অর্থ ও কামের প্রতি আকর্ষণই বেশি। তথাপি রামায়ণ কাব্যে অর্থ ও কাম অপেক্ষা ধর্মাচরণের মূল্যই বেশি দেখা যায়। ধর্মাচরণের মাধ্যমেই মানুষ সব-কিছু লাভ করতে পারে এরূপ বলা হয়েছে।[৩১১]

মহাভারতে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ বলে স্বীকৃত। তথাপি সাধারণ মানুষ যেহেতু ধর্ম, অর্থ ও কামের গণ্ডিতেই বিচরণ করে সেহেতু এই তিনের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের বিচারে ধর্মকেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষ অর্থ ও কাম লাভ করতে পারে।[৩১২] এটি ধর্ম সম্বন্ধে রামায়ণকারের মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে রামায়ণে বলা হয়েছে—

ধারনাদ্ ধর্মমিত্যাহুধর্মেনারঞ্জন প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥
ধারণাদ্ বিদ্বিষাং চৈব ধর্মেনারঞ্জয়ন্ প্রজাঃ।
তস্মাদ্ ধারণমিত্যুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়॥ প্রক্ষিপ্ত সর্গ-৭

ধর্মানুসারে সমগ্র জগৎ ধারণ বা পালন করেন বলে রাজাকে ধর্ম বলা হয়। রাজার শাসন বা পালনাদি কর্মই ধারণ এবং তাই ধর্ম নামে পরিচিত।

মহাভারতেও যা থেকে পার্থিব ও অপার্থিব সকল প্রকার ধনের প্রাপ্তি ঘটে তাকে ধর্ম বলা হয়েছে। আবার যা ধারণ করতে সমর্থ অর্থাৎ লোকস্থিতি যার উপর নির্ভরশীল তাও ধর্ম।

'ধনাৎ স্রবতি ধর্মো হি ধারণাদ্বেতি নিশ্চয়ঃ।' ইত্যাদি ১২।৯।২৭। অন্যত্র দেখা যায়—

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১২।১০৯।১১

সুতরাং ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উভয় মহাকাব্যেই এক।

ধর্মের দুর্জ্ঞেয়ত্ব সম্পর্কেও মহাকাব্যকারের ধারণার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৩১১. ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ॥ ৩।৯।৩০

৩১২ ১২। ১৬৭ তম অধ্যায়, ১২। ২৭০। ২৪-২৭ ইত্যাদি

রামায়ণে রাম সুগ্রীবকে এ প্রসঙ্গে বলেছেন— সাধুব্যক্তিগণের আচরিত ধর্ম অতীব সূক্ষ্ম এবং দুর্জ্ঞেয়। সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মাই কেবল ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ জানেন।[৩১৩]

মহাভারতেও যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন— ধর্ম অতীব দুর্জ্ঞেয়। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। লৌকিক বিচারে কোন্ পথ অবলম্বন করলে ধর্ম হয় তা বলা কঠিন।[৩১৪] তিনিই আবার শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মদেবকে ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন— 'সংসারের সকল মানুষই ধর্ম সম্বন্ধে সন্দিহান, সুতরাং ধর্ম কী এবং কীভাবে ধর্ম লাভ হয় তা বলুন' ?[৩১৫]

সাধারণ মানুষের পক্ষে ধর্মের দুর্জ্ঞেয়ত্ব বুঝে চলা প্রায়ই অসম্ভব হয়। বুঝতে পারে না কোন্ পথে চললে তার যথার্থ মঙ্গল হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মহাজনদের পথ অনুসরণই সাধারণ মানুষের নিকট ধর্ম। এখানে জনসমাজও মহাজন অভিধায় অভিহিত। রামায়ণে দেখা যায়— তাড়কাকে বধ করলে স্ত্রীবধজনিত পাপ স্পর্শ করার কথা ভেবে রাম কালক্ষেপ করতে লাগলেন। তাড়কাবধে রামের বিলম্ব দেখে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে বললেন–– প্রজাগণের হিতের জন্য স্ত্রী হলেও তাড়কাকে বধ করা উচিত। এ বিষয়ে মহর্ষি অতীতে ইন্দ্র-কর্তৃক মন্থরা ও বিষ্ণু-কর্তৃক ভৃগুপত্নী বধের দৃষ্টান্ত দিয়ে রামকে তাড়কা বধে উৎসাহিত করেন। মহর্ষির নির্দেশে রাম জনগণের হিতের জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে তাড়কাকে বধ করেন। বনগমনের পূর্বে কৌশল্যা রামের উদ্দেশে বলেছেন—'বৎস, সাধুগণের আচরিত পথে অবস্থান করো'।[৩১৬] রাবণ রম্ভার প্রতি অসৎ আচরণে উদ্যত হলে রম্ভা তাঁকে বলেন—'রাক্ষসরাজ, আপনি সৎপুরুষের আচরিত ধর্মপথ অবলম্বন করুন'।[৩১৭]

ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের কাছে যক্ষের প্রশ্ন : তা হলে পথ কী ? এ প্রশ্নের উত্তরে

৩১৩. সূক্ষ্মঃ পরমদুর্জ্ঞেয়ঃ সতাং ধর্মঃ প্লবঙ্গম।
হৃদিস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্॥ ৪। ১৮। ১৫

৩১৪ ৩। ৩১২ ১১৭

৩১৫ ইমে বৈ মানবাঃ সর্বে ধর্মং প্রতি বিশঙ্কিতাঃ।
কোঽয়ং ধর্মঃ কুতো ধর্মস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১২।১৫৮।১

৩১৬ বর্তস্ব চ সতাংক্রমে। ২। ২৫। ২ খ. ইত্যাদি

৩১৭ সদ্ভিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষস পুঙ্গব। ইত্যাদি ৩। ২৬। ৩৭

যুধিষ্ঠির বলেছেন— ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা করেন। সাধারণ মানুষের উচিত মহাজনদের আচরিত পথ অবলম্বন করা।[৩১৮]

আবার ধর্ম বিষয়ে বেদবাক্য ও বৃদ্ধানুশাসনকেও প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[৩১৯]

কুলধর্মে অবিচলিত থাকাও উভয় মহাকাব্যের যুগে মানুষের ধর্ম বলে স্বীকৃত ছিল। পিতৃপুরুষগণের আচরিত পথে অবিচলিত থাকাই কুলধর্ম পালন। কুলধর্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করাই ইক্ষ্বাকুকুলের একমাত্র ধর্ম একথা রামায়ণের একাধিক স্থলে লক্ষ্য করা যায়।

বনযাত্রার পূর্বে রাম কৈকেয়ীকে বলেন— আমি আজই বনে গমন করছি। আপনি এরূপ ব্যবস্থা করুন যাতে ভরত রাজ্যশাসন ও পিতার সেবা করে। কারণ এটিই আমাদের সনাতন ধর্ম।[৩২০]

ধর্মাত্মা ভরত রামকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করে বলেন— জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী, এই কুলধর্মানুসারী নিয়ম বিচার করে কাজ করতে হবে।[৩২১]

মহাভারতেও নানা স্থলে পিতামাতার আচরিত পথে অধিষ্ঠিত থাকাই ধর্ম বলে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে প্রত্যেক সজ্জনেরই কুলধর্ম আচরণ করা একান্ত কর্তব্য।[৩২২] মাংস বিক্রেতা ধর্মব্যাধকেও আপন কুলধর্মে অবিচলিত থাকতে দেখা যায় এবং তাতেই তিনি পরম ধার্মিকরূপে মহাকাব্যে পরিগণিত হন।

কুলধর্মের মতোই জাতিধর্মের পালনকে উভয় মহাকাব্যে সম মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখানে জাতিধর্ম বলতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণভেদে আচরণায় ধর্মকেই বোঝানো হয়েছে।

রামায়ণে বিশ্রবা মুনির কথায় কুবের স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে কৈলাস পর্বতে গমন

৩১৮. তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিত গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ৩। ৩১৩। ১১৭

৩১৯. শ্রুতি প্রমাণো ধর্মঃ স্যাদিতিবৃদ্ধানুশাসনম্। ইত্যাদি ৩। ২০৫। ৪১

৩২০. ভরতঃ পালয়েদ্ রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ পিতুর্যথা।
তথা ভবত্যা কর্তব্যং স হি ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ২।১৯।২৬

৩২১. রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্মানুসন্ততম্।
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ যাচনাম্॥ ২।১১২।১০

৩২২. জাতিশ্রেণ্যধিবাসানাং কুলধর্মাংশ্চ সর্বতঃ।
বর্জয়ন্তি চ যে ধর্মং তেষাং ধর্মো ন বিদ্যতে॥ ১২।৩৬।১৯

করলে লঙ্কা শূন্য হয়ে পড়ে। তখন প্রহস্ত রাবণকে বলেন—'আপনি আমাদের নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক স্বধর্ম পালন করুন'।[৩২৩]

রামও কুলোচিত আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ক্ষত্রিয় ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করলেই কীর্তি ও স্বর্গলাভ হয় এরূপ বিশ্বাস করতেন (২।১।১৬)।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই স্বধর্ম পালনেরই নির্দেশ দিয়েছেন।[৩২৪] অন্যত্র বলা হয়েছে—

ব্রাহ্মণেষু চ বৃত্তির্যা পিতৃপৈতামহোচিতা।
তামন্বেহি মহাবাহো ধর্মস্যেতে হি দেশিকাঃ॥ ১৩।১৬২।২৪

স্বধর্ম বলতে এখানে স্ব-কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পিতা মাতা ও গুরুজনদের সেবাও ধর্ম হিসেবে উভয় মহাকাব্যে স্বীকৃত। রামায়ণে বনবাস যাত্রার প্রাক্কালে রাম বলেছেন, পিতামাতার আরাধনায় ধর্ম, অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, তাতেই ত্রিলোক লাভ হয়। তাই ধর্মপথে অবস্থানকারী পিতা আমাকে যেরূপ আদেশ করেছেন আমি তাই করতে চাই এবং এটি আমার কাছে সনাতন ধর্ম।[৩২৫]

রাম বনে যাবার জন্য তৈরি হলে সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বলেছেন— রাম বিপন্নই হোক আর ঐশ্বর্যবানই হোক তোমার একমাত্র আশ্রয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বশবর্তী হওয়া এই সংসারে সজ্জন-সম্মত ধর্ম।[৩২৬]

মহাভারতেও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদের সেবা করা ও অনুগত থাকা মানুষের অন্যতম ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মাতা ও পিতার সেবা দস্যুদেরও প্রধান ধর্ম।[৩২৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে সৎ গুরুর উপদেশ অনুসারে চললে বিপদের ভয় থাকে না। গুরুর উপদেশ ব্যতীত চললে ভুল পথে চলার সম্ভাবনা থাকে, অধর্মকে ধর্ম বলে ভুল হতে পারে। কল্যাণকামী মানুষ আদর্শ গুরুর কথামতো

---

৩২৩. প্রবিশ্য তাং সহাস্মাভিঃ স্বধর্মং তত্র পালয়। ৭।১১।৪৮ গ.ঘ.

৩২৪. স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ॥ ৬। ৪২। ৪৮

৩২৫. স মা পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্মপথে স্থিতঃ।
তথা বর্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ২। ৩০।৩৮

৩২৬. এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ॥ ২। ৪০। ৬

৩২৭. ১২। ৬৫ তম অধ্যায়

চলেন।[৩২৮]

আবার স্ত্রীগণের নিকট স্বামীই একমাত্র ধর্ম ও আশ্রয় এরূপ বলা হয়েছে। সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা স্বামীকে সন্তুষ্ট করা স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম। এ বিষয়ে উভয় মহাকাব্যই একমত।

রামায়ণে রাম দশরথ সম্বন্ধে বলেছেন— জননী কৌশল্যার তিনি পতি, একমাত্র আশ্রয় ও ধর্ম।[৩২৯] অন্যত্র শোকাতুরা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য দশরথ বলেছেন— দেবি, স্বামী নির্গুণ হউন, আর সগুণই হউন, ধর্মপরায়ণা মহিলাদের তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা।[৩৩০]

মহাভারতেও বলা হয়েছে যে-নারী পতিশুশ্রূষা করেন তিনিই যথার্থ ধর্মানুগামিনী। তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকেও পূজিতা হন (১৩।১২৩।২০)।

আবার সত্য ও ক্ষমাকে উভয় মহাকাব্যেই ধর্ম বলা হয়েছে। ক্ষমার ন্যায় যজ্ঞও ধর্মের অন্যতম বিষয় বলে বর্ণিত হয়েছে। রাম ভরত ও লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছেন— রাজসূয় যজ্ঞ ধর্মসেতু, অক্ষয় এবং অবিনাশী। ধর্মের পোষক ও সমস্ত পাপ বিনাশকারী। তোমরা আমার আত্মা, অতএব তোমাদের নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি এই আমার ইচ্ছা। কারণ যজ্ঞেই রাজার শাশ্বত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত (৭।৮৩।৪-৫)।

মহাভারতেও বিভিন্ন স্থলে সত্য, দান, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠানকে ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে (৫।৩৫।৫৬)।

পিতামহ ভীষ্ম মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সুধীজনকে শেষ উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্।

১৩।১৬৭।৪৯

যুদ্ধান্তে জ্ঞাতিবধে অনুতপ্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির আপৎকালে কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই রাজাকে প্রজাগণের যশ ও ধর্ম প্রাপ্তির হেতুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩২৮. যস্য নাস্তি গুরুর্ধর্মে ন চান্যানপি পৃচ্ছতি।
সুখতন্ত্রোঽর্থলাভেষু ন চিরং সুখমশ্নুতে॥ ১২। ৯২।১৮

৩২৯. স হ্যাবয়োস্তাত গুরুর্নিয়োগে
দেব্যাশ্চ ভর্তা স গতিশ্চ ধর্মঃ॥ ২। ২১। ৬০

৩৩০. ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্নির্গুণোঽপি বা।
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্॥ ২।৬২।৮

ভরত রামের নিকট দশরথের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বলেছেন— আমি যদি কুলধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হলাম, তখন রাজধর্মে আমার কী প্রয়োজন ?

কিং মে ধর্মাদ্ বিহীনস্য রাজধর্মঃ করিষ্যতি। ২।১২।১ খ.

মহাভারতেও রাজাকে সব-কিছুরই কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— রাজা কালস্য কারণম্।—৫।১৩২।১৬, ১২।৬৯।৭৯ ইত্যাদি।

অন্যত্র দেখা যায়—

রাজা সদা ধর্মপরঃ শুভাশুভস্য গোপ্তা।
সমীক্ষ্য সুকৃতিনাং দধাতি লোকান্॥
বহুবিধমপি চরতি প্রবিশতি
সুখমনুপগতং নিরবদ্যম॥ ১২।৩২১।২৮

ধর্মের দ্বারা সব-কিছুই লাভ করা সম্ভব। এরূপ সিদ্ধান্তে উভয় মহাকাব্যকারই একমত। তবে মহাভারতে যে আপদ্ধর্মের কথা বলা হয়েছে রামায়ণে তা অনুপস্থিত। তা ছাড়া মহাভারতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আচরণীয় বিবিধ প্রকৃতির ধর্মানুষ্ঠানের যে পূর্ণাঙ্গবর্ণনা মেলে রামায়ণে সেভাবে পাওয়া যায় না। উভয় মহাকাব্যে ধর্ম সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ আপেক্ষিক। অবস্থা, কাল ও পরিস্থিতিভেদে এর প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন। একের দৃষ্টিতে যেটি ধর্ম অন্যের দৃষ্টিতে সেটি অধর্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে মানুষের অন্তর্নিহিত সৎ বৃত্তিগুলির অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল শ্রেণীর প্রাণীর হিতসাধনই যে ধর্ম এ বিষয়ে উভয় মহাকাব্যকারই একমত।

অর্থ

যুগ যুগ ধরে মানুষ অর্থের মাধ্যমেই জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে আসছে। বিশেসত গৃহস্থ মানুষের জীবন অর্থ ব্যতীত অচল।

উভয় মহাকাব্যকারই এ কথা স্বীকার করে অর্থকে একটি বিশিষ্ট স্থান দান করেছেন। উভয় কাব্যেই পুরুষার্থ হিসেবে অর্থের স্থান দ্বিতীয়।

স্বর্ণমৃগের রূপে মুগ্ধ হয়ে রাম লক্ষ্মণের উদ্দেশে বলেন— অর্থাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যে প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত শঙ্কাহীন চিত্তে কাজে প্রবৃত্ত হয়, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ চিন্তানিরত ব্যক্তিগণ তাকেই অর্থ বলেন।[৩৩১]

রামায়ণে গো, অশ্ব, ধন ধান্যকেই অর্থরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সযত্নে এগুলির অর্জন ও রক্ষণের কথা বলা হয়েছে। দশরথের রাজ্য শাসনের প্রশংসা করে অযোধ্যার প্রজাগণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে— সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে কোনো

---

৩৩১. অর্থী যেনার্থকৃত্যেন সংব্রজত্যবিচাবয়ন্।
তমর্থমর্থশাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রাহুরর্থ্যাঃ সুলক্ষণ॥ ৩। ৪৩। ৩৪

গৃহস্থই অল্প সঞ্চয়ী ছিল না। কেহই গো-অশ্ব-ধন-ধান্যহীন ছিল না।

নাল্পসন্নিচয়ঃ কশ্চিদাসীত্তস্মিন্ পুরোত্তমে।
কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোঽগবাশ্ব-ধনধান্যবান্॥ ১।৬।৭

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেছেন— দ্রাবির সিন্ধু প্রভৃতি দেশে যে ধন-ধান্য ছাগ, মেষ প্রভৃতি আছে তা আমারই। তুমি যা ইচ্ছা প্রার্থনা করো।[৩৩২] আবার বলা হয়েছে— অযোধ্যার প্রজাগণ ঐশ্বর্য ও সঞ্চয়ে ইন্দ্র ও কুবেরের তুল্য ছিল।

'ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চান্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ'॥ইত্যাদি ১।৬।৩

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও অর্থের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে এখানেও অর্থ ঐহিক সুখলাভের দ্বিতীয় উপায়। শান্তিপর্বের 'ভৃগু-ভরদ্বাজসংবাদে' এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে। এখানে বিদ্যা, ভূমি, স্বর্ণ, পশু ও ধান্য প্রভৃতিকেই অর্থরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ধনের মধ্যে বিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে।

'ধনানামুত্তমং শ্রুতম্' ৩। ৩১২।৭৪

মহাভারতকার বলেছেন—গৃহীর প্রার্থনা হওয়া উচিত—

অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। ১২।২৯।১২১ ক.খ.

অর্থ সঞ্চয়ের কথা এখানেও পাওয়া যায়। আমরা মহামতি বিদুরের মুখে শুনি— বিপদের জন্যে ধন রক্ষা করা উচিত।

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ। ৫।৩৭।১৮

মনুসংহিতাতেও এই মতের সমর্থন মেলে (৭।২১৩)। সংসারী মানুষ আত্মীয় পরিজন নিয়ে সংসার জীবন অতিবাহিত করেন সুতরাং যে-কোনো ধরনের বিপদ তাঁর পদে পদে। এই আকস্মিক বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে অর্থ সঞ্চয় একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ সঞ্চয়ের একটা সীমা থাকা আবশ্যক। মহাভারতকার বলেছেন— বৈধ জীবন-যাপনের জন্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার বেশি সংগ্রহকারী সকলের ঘৃণার পাত্র। এরূপ ব্যক্তিকে ব্রহ্ম হত্যার পাপ স্পর্শ করে সেজন্য সে বধের যোগ্য।[৩৩৩] তিন বৎসর কাল পারিবারিক প্রয়োজন মেটাবার মতো অর্থ যে ব্যক্তির মজুত থাকে সেই ধনী। এর বেশি অর্থ থাকলে দান করে

---

৩৩২. দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ-মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি-কোসলাঃ॥
তত্র জাতং বহু দ্রব্যং ধন-ধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ্ যৎ ত্বং মনসেচ্ছসি॥ ২।১০।৩৭-৩৮

৩৩৩ অতিবেলং হি যোঽর্থার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
স বধ্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মহেব জুগুপ্সিতঃ॥ ৩। ৩৩। ২৫

নিঃশেষ করাই উচিত।[৩৩৪] ধন সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা মনুর সমাজের অনুসারী বলা যেতে পারে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—

যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে॥
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥ মনু ১১।৬

রামায়ণে কিন্তু অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে কোনো নিয়মের কথা পাওয়া যায় না। অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে মহাভারতকারের এই নির্দেশ নিঃসন্দেহে সামাজিক জীবনের পক্ষে কল্যাণকর। তবে ধনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাই তৎকালীন সমাজের মানুষ এ নির্দেশ কতখানি পালন করেছে তা বলা কঠিন।

উভয় কাব্যেই ধর্মকে অর্থলাভের হেতুরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্মহীন ব্যক্তি কখনো অর্থলাভে সমর্থ হয় না।

রামায়ণে সুগ্রীবের সীতা-অন্বেষণ বিষয়ে ঔদাসীন্যের জন্য লক্ষ্মণ তারার উদ্দেশে বলেছেন— উপকারীর প্রত্যুপকার না করলে ধর্ম লোপ হয় এবং গুণবান মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করলে মহান অর্থ লোপ হয়।[৩৩৫]

সুরাপানেও অর্থের হানি হয় বলা হয়েছে—

পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মশ্চ পরিহীয়তে॥ ৪।৩৩।৪৬

অর্থের যাতে হানি না হয়, সে বিষয়ে উপযুক্ত যত্ন নেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ অর্থনাশে মানুষ অতীব কষ্ট ভোগ করে।

মহাভারতেও অর্থরক্ষার নানা উপায়ের কথা পাওয়া যায়। অতিশয় সরলপ্রকৃতি, অত্যধিক হৃদয়বান, অতি বীর, কঠোর সংকল্পবান এবং প্রজ্ঞাভিমানী মানুষ অর্থ রক্ষা করতে পারে না। ধনদাত্রী লক্ষ্মী এই প্রকার মানুষকে আশ্রয় করতে ভয় পান।[৩৩৬]

কী ধরনের মানুষ মৃত— এ প্রশ্নের উত্তর যক্ষ যুধিষ্ঠিরের কাছে জানতে চাইলে যুধিষ্ঠির বলেছেন—

'মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্'। ৩। ৩১। ৮৪

বিদুলার কাছেও আমরা জেনেছি দারিদ্র্যও যা মৃত্যুও তাই—

৩৩৪. ত্রৈবার্ষিকাদ্ যদা ভক্তাদধিকং স্যাদ্ দ্বিজস্য তু।
যজেত তেন দ্রব্যেণ ন বৃথা সাধয়েদ্ধনম্॥ ১৩।৪৭।২২

৩৩৫. ধর্মলোপো মহাংস্তাবৎ কৃতে হ্যপ্রতিকুর্বতঃ।
অর্থলোপশ্চ মিত্রস্য নাশে গুণবতো মহান্॥ ৪।৩৩।৪৭

৩৩৬. অত্যার্যমতিদাতারমতিশূরমতিব্রতম্।
প্রজ্ঞাভিমানিনঞ্চৈব শ্রীর্ভয়ান্নোপসর্পতি॥ ৫। ৩৯। ৬৩

'দারিদ্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্যায়মরণংহিতৎ'। ৫।১৩৪।১২

রামায়ণে সীতার মৃত্যু সংবাদে রাম অতিশয় শোকাভিভূত হয়ে পড়লে, লক্ষ্মণ রামকে বললেন— আপনি রাজ্য ত্যাগ করেই অনর্থ করেছেন। যার অর্থ আছে তারই বন্ধু আছে, যে ব্যক্তির অর্থ আছে সেই পণ্ডিত, সেই পরাক্রমী, অর্থশালী ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, সৌভাগ্যের অধিকারী ও অধিক গুণবান। অর্থবানের সমস্তই নিজের আয়ত্তে, অনায়াসেই তার ধর্ম ও কামনারূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু অর্থহীন ব্যক্তির কিছুই সিদ্ধ হয় না। অর্থ থেকেই আনন্দ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শম ও দম এ-সকল লাভ করা যায়। সুতরাং অর্থই সব-কিছুর প্রধান উৎস (৬।৮৩।৩৫-৩৯)।

আমরা যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনকেও এভাবে অর্থের প্রশংসা করতে দেখি। অর্জুনের মতে অর্থ ভিন্ন ধর্ম ও কাম লাভ সম্ভব হয় না। অর্থবান ব্যক্তি অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম ও দুর্লভ দ্রব্য আয়ত্ত করতে পারে। অর্থই ধর্ম ও কামের প্রাপক। সৎবংশে জন্মেও অনেক ব্যক্তি ব্রহ্মার মতো অর্থবান ব্যক্তির উপাসনা করে (১২।১৬৭ অধ্যায়)।

নকুল ও সহদেবও অর্জুনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। অবশ্য এঁরা ধর্মের দ্বারা অর্থলাভকেই সংগত বলে ব্যাখ্যা করেন (১২।১৬৭ অধ্যায়)।

রামায়ণে যেমন মানুষের জীবনে অর্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়েছে, তেমনি আবার শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনেই রত থাকা নিন্দনীয় বলা হয়েছে। রাম কৌশল্যা ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে বলেছেন— যে-সকল কাজে শুধুমাত্র অর্থের সম্বন্ধ আছে তা করলে লোকের দ্বেষভাজন হতে হয়।

'দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে'। ২।২১।৫৮ খ.

মহাভারতকারও ধর্ম, অর্থ ও কামের যে-কোনো একটির প্রতি অত্যধিক আসক্তিকে নিন্দা করেছেন। এ বিষয়ে ভীমের সিদ্ধান্ত স্মরণীয় :

ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
যো হ্যেকভক্তঃ স খলু জঘন্যঃ। ১২।১৬৭।৪০

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উভয় মহাকাব্য যুগেরই সামাজিক জীবনে অর্থের গুরুত্ব ছিল সমান। তবে মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধর্মবহির্ভূত পথে উপার্জন উভয় সমাজেই নিন্দনীয় ছিল।

কাম

বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে কামের কোনো লক্ষণের কথা বলেননি। মহাভারতে বেদব্যাস কামকে মানস সংকল্প এবং শাশ্বত বলেছেন। মানুষের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের

সঙ্গে ভোগ্যবস্তুর সংস্পর্শে যে প্রীতি জন্মে তাকেই কাম বলা হয়।[৩৩৭]

যুধিষ্ঠির কামকে সংসারের হেতু বলে ব্যাখ্যা করেছেন :

'কামঃ সংসারহেতুশ্চ' ৩।৩১৩।৯৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কাম ও ক্রোধকে রজোগুণ থেকে উদ্ভূত বলা হয়েছে :

'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ'॥ ৬।২৭।৩৭

শান্তিপর্বে ভৃগুর কাছে আমরা জেনেছি কাম সাধারণত দুই প্রকার। প্রথমটি অভিলষিত বস্তুর উপভোগ, দ্বিতীয়টি স্ত্রী-পুরুষের মিলনজনিত সুখ।

রামায়ণে বর্ণিত কামের প্রকৃতি আলোচনা করলে তার এই দুটি রূপই পাওয়া যায়। তবে দুটি মহাকাব্যেই উভয় প্রকার কাম থেকে মানুষকে সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, দেবতা, ঋষি, মুনি প্রভৃতি এই দ্বিতীয় প্রকার কামের মোহেই জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। উভয় মহাকাব্যেই এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

রামায়ণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকার সময় সহসা মেনকা নাম্নী এক সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হন। সিদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছেও তিনি ব্যর্থ হন। পরে নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে লজ্জিত হন।[৩৩৮]

মহাভারতেও মুনি, ঋষি ও দেবগণের সুখভোগের আশায় কামের দ্বারা বশীভূত হওয়ার কথা পাওয়া যায়। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নারীর সংস্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়েন। কামের এরূপ শক্তি বিবেচনা করেই ঋষি, কবি কামকে মহামোহ বলেছেন।[৩৩৯]

আদিকবি বাল্মীকি কামাসক্ত ব্যক্তির উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করেননি। অযোধ্যার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিনি প্রশংসা করে বলেছেন— অযোধ্যায় কামুক, কুৎসিত ক্রূর প্রকৃতির লোক ছিল না। সেখানে কোনো ব্যক্তিই অবিদ্বান ও নাস্তিক

---

৩৩৭ দ্রব্যার্থস্পর্শসংযোগে যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কামশ্চিত্তসংকল্পঃ শরীরং নাস্য দৃশ্যতে॥ ৩।৩৩।৩০
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে।'
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্মণাং ফলমুত্তমম্॥ ইত্যাদি ৩।৩৩।৩৭

৩৩৮ কামমোহাভিভূতস্য বিঘ্নোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ।
স নিঃশ্বসন্মুনিবরঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ॥ ১। ৬৩। ১২

৩৩৯ অভিষঙ্গস্তু কামেষু মহামোহ ইতি স্মৃতঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো দেবা মুহ্যন্ত্যত্র সুখেপ্সবঃ॥ ১৪।৩৬।৩২

ছিল না।[৩৪০]

দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এর জন্য রাম রাজ্য ছেড়ে বনে যেতে বাধ্য হন। ফলে দশরথ নিদারুণ মানসিক কষ্ট ভোগ করেন। অত্যধিক কামাসক্ত হয়ে অবিবেচকের মতো কাজ করলে যে পরিণতি হয় তা দশরথের অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে বাল্মীকি আমাদের বুঝিয়েছেন।

লক্ষ্মণ রামের বনবাস যাত্রা মেনে নিতে পারেননি। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পিতাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। (২।২১।১৯ ক.খ.)

রামও দশরথের দুঃখে ব্যথিত হয়ে বলেছেন যে ব্যক্তি অর্থ ও ধর্ম ত্যাগ করে কেবল কামের সেবা করে সে শীঘ্রই রাজা দশরথের মতো বিপদে পড়ে।[৩৪১]

মহাভারতেও ধর্ম ও অর্থের কথা না ভেবে যে ব্যক্তি শুধু কামের প্রতিই মনোনিবেশ করে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। স্বরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে— ধর্ম ও অর্থ অর্জন না করে যে ব্যক্তি সর্বদা কাম প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক সে বন্ধুহীন হয়, ধর্ম ও অর্থও সে লাভ করতে সমর্থ হয় না। তার কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না।[৩৪২]

কিন্তু উভয় কাব্যেই সমভাবে কামাসক্ত ব্যক্তির নিন্দা করা হলেও জীবন যে কামরহিত নয় তা উভয় কাব্যকারই স্বীকার করেছেন। তাই উভয় গ্রন্থেই ধর্মাচরণের মাধ্যমে অর্থ ও কাম অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্যক্ বিবেচনা করে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করার কথা বলা হয়েছে। রাম লক্ষ্মণকে বলেছেন— সংসারে পূর্বকৃত ধর্মাচরণের ফলেই ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভ করা সম্ভব।

> ধর্মার্থকামাঃ খলু জীবলোকে
> সমীক্ষিতা ধর্মফলোদয়েষু। ২।২১।৫৭ ক.খ.

মানুষের ধর্ম, অর্থ ও কাম— এ তিনের প্রতিই আসক্তি আছে। এখন এই তিনের মধ্যে কোন্‌টির ভূমিকা মানবজীবনে প্রবলতম এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আমরা রামের সঙ্গে ভীমের বাক্যে মিল লক্ষ্য করি।

বনবাসের প্রথম রাত্রে রাম পিতা দশরথের দুঃখের কথা চিন্তা করে লক্ষ্মণকে

৩৪০. কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান ন চ নাস্তিকঃ॥ ১।৬।৮

৩৪১. অর্থ ধর্মৌ পবিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে।
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা॥ ২।৫৩।১৩

৩৪২. সততং যশ্চ কামার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
মিত্রাণি তস্য নশ্যন্তি ধর্মার্থাভ্যাঞ্চ হীয়তে॥ ৫।৩৪।২৬

বলেছেন— পিতার দুঃখ এবং মতিভ্রম দেখে মনে হচ্ছে ধর্ম ও অর্থ থেকে কামই প্রবল।

'কাম এবার্থ-ধর্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ'। ২।৫৩।৯ খ.

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির বিদুর সহ চার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি ? ভীম এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন— কামই সব-কিছুর মূল। ধর্ম, অর্থ ও কাম সকলের পিছনেই কাম আছে।[৩৪৩]

কিন্তু ধর্ম, অর্থ ও কামের সমানভাবে সেবা করার কথাই উভয় মহাকাব্যে বিঘোষিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত মনুর সমাজব্যবস্থা থেকেই প্রচলিত। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ এ নিয়ম পালনে উপকৃত হবে এ কথা উপলব্ধ হয়েছিল বলেই রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজ জীবন এ ব্যবস্থাকে সজীব রেখেছিল।

মোক্ষ

উভয় মহাকাব্যেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমষ্টিকে চতুবর্গ বলা হয়েছে। মোক্ষই চতুর্বর্গের মধ্যে প্রধান এই সিদ্ধান্তই উভয় মহাকাব্যে স্বীকৃত। সমগ্র মহাভারতের বিভিন্ন স্থলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মুখে মোক্ষের নানা প্রশংসা দেখা যায়। পিতামহ ভীষ্ম, ধর্মবীর যুধিষ্ঠির, মহামতি বিদুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একাধিক স্থানে মোক্ষের জয়গান গেয়েছেন। মহাভারতের চতুর্বর্গ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অমলেশ ভট্টাচার্য তাঁর 'মহাভারতের কথা'য় বলেছেন—'ঐহিক জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মের, মনুষ্যজীবনের সঙ্গে দেবজীবনের যে সম্পর্ক ও সমন্বয়ের সমস্যা তাই মহাভারতের চতুর্বর্গ— ইহজীবনের পূর্ণতার সাধনা।'[৩৪৪] তবে মহাভারতে চতুর্বর্গের প্রত্যেকটির যেমন বিস্তৃত বর্ণনা মেলে রামায়ণে তা মেলে না। এখানে মোক্ষের সমার্থক শব্দরূপে ব্রহ্মালোক শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৪৫] পরলোক ও স্বর্গের কথাও অমরা পাই।[৩৪৬]

এই অধ্যায়ে উভয় মহাকাব্য যুগের সামাজিক জীবনের বিশেষ কতকগুলি রীতিনীতি ও আচার-আচরণের পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে উভয় মহাকাব্যের সম্পর্ক কত নিকটতম তা দেখানো হল। আমাদের অনুল্লিখিত আরও অসংখ্য বিষয়ে উভয় মহাকাব্যের অভিমত অভিন্ন।

৩৪৩. নাকামঃ কাময়ত্যর্থং নাকামো ধর্মমিচ্ছতি।
না কামঃ কামযানোঽস্তি তস্মাৎ কামো বিশিষ্যতে॥ ১১। ১৬৭। ২৯

৩৪৪. পৃ: ৩৩৩

৩৪৫ দেবগন্ধর্বগোলোকান্ ব্রহ্মালোকাংস্তথাপরান্।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ॥ ২। ৩০। ৩৭

৩৪৬. ২।২৮।২১, ২।৫৩।২৬

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় জনজীবনে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব

(ক) সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতে উভয় মহাকাব্য

ভারতীয় জনজীবনে রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যের প্রভাবের কথা আলোচনার পূর্বে আমাদের এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দু সভ্যতার উৎসভূমি বেদ। হিন্দুমতে বেদ অনাদি, অনন্ত ও স্রষ্টা-রহিত। তাই হিন্দুদের সনাতনী বলা হয়। রামায়ণ এবং মহাভারত দুই-ই বৈদিক সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত। দুই-ই ভারতের জাতীয় মহাকাব্য, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ এবং ভারতের পারিবারিক তথা সামাজিক ইতিহাস। বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্বাসে গড়া ভারতীয় সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা ও ধর্মবিশ্বাস উভয় মহাকাব্যে বিধৃত হয়েছে। আজ মানুষের যে আচরণ সামাজিক বিধিরূপে স্বীকৃত ভবিষ্যতে হয়তো তা অসামাজিক বলে বিবেচিত হবে। এই নিয়মেই বৈদিক সভ্যতার অনেক কিছুই মহাকাব্য-যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন বাহ্যিক পরিবর্তন মাত্র। দুই মহাকাব্যের অন্তরে বৈদিক ধর্মের উজ্জ্বল দীপ অনির্বাণ। শিখা যতই দোদুল্যমান হোক।

আদিকবি বাল্মীকি ও মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনীতে তাই অবলীলাক্রমে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, ঋষি ও নৃপতির কথা এসেছে। উভয় মহাকাব্যের কথা-পুরুষগণ সন্তান উৎপাদনে সাহায্য নিয়েছেন বৈদিক দেবগণের। রামায়ণে বৈদিক দেবতা বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন দশরথের চার পুত্ররূপে। হনুমান পবনপুত্ররূপে প্রসিদ্ধ। সূর্যের নিকট তাঁর বেদাদি অধ্যয়নের কথা আছে। রাম তাঁকে বেদজ্ঞ-পুরুষ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[১] মহাভারতের যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি বৈদিক দেবতার ঔরসে উৎপন্ন পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ সন্তান। ভারতযুদ্ধের অন্যতম মুখ্য বীর কর্ণ সূর্যের পুত্র। ভগবান সূর্য আর্যদের গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা। রামায়ণেও রামের আদিত্যহৃদয় পাঠের কথা আছে।

উভয় মহাকাব্যকেই বেদবিদ্যার উন্নায়ক বলা হয়েছে।[২] রামায়ণ ও মহাভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বেদের অভ্রান্ততা ও স্বতঃসিদ্ধতা প্রসিদ্ধ। বেদের

---

১ নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ ৪। ৩। ২৮

২ ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ॥ ম. ভা ১। ১। ২৬৭ ক খ

আদর্শই রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে। মহাভারতে কোনো কোনো স্থলে ভাষা ও ছন্দ বেদানুসারী। বামায়ণে বৈদিক যজ্ঞ অশ্বমেধ এবং মহাভারতে অশ্বমেধ ও রাজসূয়ের বিস্তৃত বর্ণনা মেলে।

সুতরাং রামায়ণ মহাভারত উভয়ই বৈদিক চেতনায় ভাবিত লৌকিক সংস্কৃতে বিরচিত দুখানি হিন্দু জীবন-গাথা। বৈদিক প্রভাবে যেমন দুই মহাগ্রন্থ গড়ে উঠেছে, তেমনি যুগ যুগ ধরে হিন্দু জীবনধারায় গ্রন্থদুটি প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মানুষ উভয় মহাগ্রন্থের বিভিন্ন নীতি ও উপদেশকে প্রামাণিক সত্য বলে স্বীকার করে। ভারতীয় জনজীবনে বিভিন্ন ধারায় উভয় মহাকাব্যের প্রভাব পড়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও গার্হস্থ্য-জীবনের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-কলাপ, নীতি-আদর্শ সকল ক্ষেত্রেই উভয় মহাকাব্যের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের সাহিত্য উভয় মহাকাব্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। উভয় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু উপাখ্যান, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতির অনুকরণে গঠিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তীয় ভাষায় বিভিন্ন কবিকীর্তি। রামায়ণেই এই সত্যের ইঙ্গিত মেলে—

আশ্চর্যমিদমাখ্যানং মুনিনাং সম্প্রকীর্তিতম্।
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্॥

১।৪।২৬ ক.খ.—২৭ ক.খ.

মহাভারতেও উদ্ধৃত হয়েছে—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥ ১।১।২৬

এই বিপুল পৃথিবীতে কতশত মহাত্মা এই ইতিহাস কীর্তন করেছেন, এবং ভবিষ্যৎকালেও অনেকেই কীর্তন করবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিদের ক্ষেত্রে একথা একান্তভাবে সত্য।

সংস্কৃত সাহিত্য : রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তী যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণের রচনায় উভয় গ্রন্থের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩] মহাকাব্য যুগের পরবর্তী বলে স্বীকৃত সকল পুরাণেই এই সত্যের আভাস মেলে। সংস্কৃত ভাষায়

৩ কালিদাস থেকে বৈষ্ণব কবিদের পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিরহের যে বহুলাঙ্গ বিচিত্র প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, তার আদি উৎস নিঃসন্দেহে বাল্মীকি— তিনিও ভার্জিলেরই মতো অনভিপ্রেতভাবে এক চিরায়ত প্রেম-কাব্যের প্রণেতা হয়েছিলেন।
—বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', পৃ ১৪৮

রচিত প্রচলিত অধিকাংশ পুরাণে কোথাও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী কোথাও বা সূর্য এবং চন্দ্রবংশের রাজাদের বিস্তৃত বিবরণ মেলে। 'অদ্ভুত রামায়ণে' রামের জীবনের বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনা বর্তমান। 'অধ্যাত্ম রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে' রামকথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এছাড়া পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (৩৭-৭১ অধ্যায়), অগ্নিপুরাণে (৫-১১ অধ্যায়), শ্রীমদ্ভাগবতে (৯ম স্কন্ধের ১০-১১ অধ্যায়), বায়ুপুরাণে (৮৮ অধ্যায়), মৎস্যপুরাণে (১২ অধ্যায়), কূর্মপুরাণে (২১ অধ্যায়), দেবী ভাগবতে (৩।২৮-৩০ অধ্যায়), বৃহদ্ধর্মপুরাণে (পূর্বখণ্ড ১-৩০ অধ্যায়), কল্কিপুরাণে (৩।৩-৪ অধ্যায়), নৃসিংহপুরাণে (৪৭ অধ্যায়), নারদীয় পুরাণে (৭৯ অধ্যায়), ব্রহ্মপুরাণে (১৫৪ অধ্যায়), লিঙ্গপুরাণে (পূর্বার্ধ ৬৬।৩৫ অধ্যায়), এবং জৈমিনিভারতে (২৫-৩৬ অধ্যায়) রামকথা বর্ণিত হয়েছে।

হরিবংশ পুরাণ মহাভারতের পরিশিষ্ট রূপে স্বীকৃত। রামায়ণের মতো মহাভারতেরও বিভিন্ন কথা-পুরুষ উপাখ্যান বা আখ্যানাংশ বিভিন্ন পুরাণে স্থান পেয়েছে।

কৌটিল্য-কৃত অর্থশাস্ত্রের কাল গবেষকগণ যাই ঠিক করুন-না-কেন গ্রন্থটিতে মহাভারতের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।[৪] মহাকাব্যদ্বয়ের পরবর্তী সকল কবিগণই উভয় মহাগ্রন্থের আধারে স্ব স্ব কাব্যরচনা করে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাই রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্য রচনা করেছেন রামের বংশাবলীকে অবলম্বন করে। 'রঘুবংশ' নামটিও রামায়ণে দৃষ্ট হয়।

'রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ।' ১।৩।৯ গ. ঘ.

সম্ভবত মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব নামটিও রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন।

কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈবচ॥—১।৩৭।৩১ গ. ঘ.

---

৪. The two epics had also become part of the discipline and education of young princes. Kautilya warns them in the section of control of senses (1. 6. 8) not to follow the example of Rāvaṇa and Duryodhana and go to ruin.

'মানাদ্ রাবণঃ পরদারানপ্রযচ্ছন্ দুর্যোধনো রাজ্যাংশ চ'

— *The Rāmāyana in Sanskrit Literature*, pp.3-4.

তাঁর রচিত 'মেঘদূত' নামক অমর দূত কাব্যটি সম্বন্ধে টীকাকার মল্লিনাথ রামায়ণে বর্ণিত সীতার নিকট রামের হনুমানকে দূত করে পাঠানোর ঘটনারই প্রতিচ্ছবি বলে বর্ণনা করেছেন :

'সীতাং প্রতি রামস্য হনুমৎসন্দেসং মনসি নিধায় মেঘসন্দেশং
কবিঃ কৃতবানিত্যাহুঃ'।

মহাভারতেও নল হংসকে দময়ন্তীর কাছে দূত করে পাঠিয়েছেন। মহাকবি ভারবি-রচিত বীররসপ্রধান 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মহাকাব্যের বিষয়বস্তু মহাভারতের বনপর্ব থেকে গৃহীত। মহাকবি ভর্তৃহরি-বিরচিত ভট্টিকাব্যে সূর্যবংশের রাজা দশরথ থেকে আরম্ভ করে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। ভট্টিকাব্যের অনুকরণে সপ্তম শতাব্দীতে ভীম বা ভৌম কবি 'রাবণার্জ্জুনীয়' কাব্য রচনা করেন এবং দশম শতাব্দীতে হলায়ুধ 'কবিরহস্য' কাব্য রচনা করেন। কুমারদাসের 'জানকীহরণ' কাব্যে রাবণ-কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্তই বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মাঘের শিশুপালবধের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাভারতে বর্ণিত চেদিরাজ শিশুপালবধের ঘটনা নিয়েই এই কাব্য রচিত হয়েছে। কবিরাজ এবং ধনঞ্জয় কবি 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামে দুটি স্বতন্ত্র কাব্য রচনা করেন। উভয় কবির বচনায় রামায়ণ, মহাভারতের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় মিশ্র-রচিত 'দশগ্রীববধ মহাকাব্যম্' রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। একাদশ শতাব্দীর কাশ্মীর দেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র রামায়ণ-মঞ্জরী ও ভারতমঞ্জরী নামে রামায়ণ-মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। এই গ্রন্থদুটি থেকে আমরা একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান রামায়ণ-মহাভারতের মূল পাঠ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাই। মহাকবি শ্রীহর্ষের নৈষধীয় কাব্যের বিষয়বস্তু মহাভারতে বর্ণিত নলরাজের কাহিনী। নলোদয় কাব্যেও মহাভারতের নলোপাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে এটি কালিদাস-রচিত। ধনঞ্জয় কবি রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্য অবলম্বনে তাঁর 'দ্বিসন্ধানমহাকাব্য'টি রচনা করেন।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত রচনা নলচম্পূ বা দময়ন্তীকথা এবং একাদশ শতাব্দীর ভোজরাজ-রচিত রামায়ণ চম্পুতে মহাভারত ও রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ প্রভৃতি সংস্কৃত কথা-সাহিত্যে ব্যবহৃত অনেক শ্লোকের সন্ধান মহাকাব্যদ্বয়ে মেলে। এছাড়া অগ্নিবেশ মুনির 'রামায়ণসার' বা 'শতশ্লোকী রামায়ণ' ও 'রামায়ণ রহস্য' শ্রীধর সুরীর 'সারাংশ রামায়ণ' অপ্যয় দীক্ষিতের 'রামায়ণ সার' প্রভৃতি সংস্কৃতে রচনা রামায়ণের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

কাব্যের ন্যায় সংস্কৃত নাটকও আর্য মহাকাব্যদ্বয় দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার ভাস তাঁর প্রতিমা নাটক ও অভিষেক নাটকের

বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মধ্যমব্যায়োগ, দূতঘটোৎকচ কর্ণভার (১ম অঙ্ক), উরুভঙ্গ (১ম অঙ্ক), পঞ্চরাত্রি (৩য় অঙ্ক) ও দূতবাক্য প্রভৃতি নাটকের বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে গৃহীত।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে আমরা মহাকবি কালিদাসের অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাই। এই সংস্কৃত নাটকখানি সমগ্র বিশ্বে অনন্য সৃষ্টি। মহাভারতেও শকুন্তলা উপাখ্যানের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আছে। (১।৭১-৭৪ অধ্যায়) পদ্মপুরাণের শকুন্তলোপাখ্যান ও কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমে ঘনিষ্ঠতা বেশি। তবে উভয়েরই মূল মহাভারত।

প্রথিতযশা নাট্যকার ভবভূতি 'মহাবীরচরিত' নাটকটি রামায়ণ অবলম্বনে রচনা করেন। এই নাটকে রাম-লক্ষ্মণের তাড়কাবধ থেকে আরম্ভ করে বনবাস জীবনের শেষে রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অপর নাটক উত্তররামচরিতও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঘটনার আধারে রচিত। আলংকারিক আনন্দবর্ধন বণিক ও বিশ্বনাথ ভবভূতির 'রামাভ্যুদয়' নামক একটি নাটকের উল্লেখ করেছেন। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকটি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। প্রকাশ্য সভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে লাঞ্ছনা করায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুঃশাসনের রক্তে দ্রৌপদীর বেণী-বন্ধন করে এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। ভীমের প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছিল। মহাভারতের এই ঘটনাটিই উক্ত নাটকের বিষয়বস্তু।

রামায়ণের আধারে মায়ুরাজ 'উদাত্তরাঘব' নামে একটি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে নাট্যকার রামায়ণে বর্ণিত রামের গুপ্তভাবে বালি-বধের ঘটনাটি পরিত্যাগ করেছেন।

মুরারি-রচিত 'অনর্ঘরাঘব' এবং জয়দেব-রচিত 'প্রসন্নরাঘব' নাটক দুটিই রামায়ণেব আধারে রচনা করা হয়েছে। কবি রাজশেখরের 'বালরামায়ণ' এবং 'বালমহাভারত' (অসম্পূর্ণ) নাটকদুটি রামায়ণ ও মহাভারতের আধারে রচিত। একাদশ শতাব্দীতে দামোদর মিশ্রের মহানাটক বা হনুমন্নাটকে রামায়ণের প্রভাব বিদ্যমান। কিংবদন্তি অনুসারে অঞ্জনা-নন্দন হনুমান এই নাটকের রচয়িতা। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত প্রহ্লাদনদেবের 'পার্থপরাক্রম' নাটকটিতে মহাভারতের প্রভাব বিদ্যমান। এ ছাড়া অধ্যাপক ভি. রাঘবন তাঁর *Some Old Lost Rāma plays* নামক গ্রন্থে রামায়ণ অবলম্বনে রচিত অসংখ্য লুপ্ত নাটকের নাম করেছেন যেগুলির পূর্ণাঙ্গ রূপ আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়।

তথাকথিত আধুনিক যুগেও অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় 'পাণ্ডব-বিজয়', 'রুক্মিণীহরণ', 'সুভদ্রাহরণ', 'পরশুরাম চরিত' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন। এগুলির প্রত্যেকটিই মহাভারত অবলম্বনে রচিত।

আধুনিক কালে রামায়ণ-মহাভারত অবলম্বনে পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, অধ্যাপিকা রমা চৌধুরী, কালীপদ তর্কাচার্য প্রমুখ সংস্কৃত কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের কবি ও নাট্যকারগণের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' সমগ্র বিশ্বে একটি দার্শনিক গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর অগণিত ভাষায় এটির অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্বের সকল দার্শনিকই এই গ্রন্থটিকে একটি অনুপম দার্শনিক কাব্য বলে স্বীকার করেন। এটির টীকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের অগ্রগণ্য ও উন্নত-মননশীলতা প্রতিফলিত হয়েছে। গীতার উপর সংস্কৃত ভাষায় রচিত অসংখ্য টীকা সংস্কৃত ভাষার অমূল্য সম্পদ রূপে স্বীকৃত। মহামতি বালগঙ্গাধর তিলকের 'গীতা রহস্য' এবং শ্রীঅরবিন্দের *Essays on the Gītā* প্রসিদ্ধ গ্রন্থদুটিতে মহাভারতোক্ত গীতার বিষয়বস্তুই ব্যাখ্যাচ্ছলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে রামায়ণ-মহাভারতের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি পাশ্চাত্যদেশবাসীর নিকট সীতার পাতিব্রত্যের কথা প্রচার করেছেন। গীতা ছিল তাঁর প্রিয় গ্রন্থ। তাঁর জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি গ্রন্থে গীতার প্রভাব স্পষ্ট। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী গীতায় বর্ণিত নিরাসক্ত কর্মযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গীতা-ভাষ্যের নাম দিয়েছেন 'অনাসক্তিযোগ'। তিনি ভারতবর্ষে 'রামরাজ্য' স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন। সংস্কৃত ছাড়া পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য ভাষাতেও রাম-কথা ও ভারত-কথা রচিত হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মননশীলতা শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে এবং বৈচিত্র্যময় ভারত-সংস্কৃতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য মহাকাব্যদ্বয়ও সংস্কৃতে রচিত। উভয় মহাকাব্যকারের লেখনীতে ভারতবর্ষীয় আর্যের জাতীয় জীবনের নির্ভরযোগ্য স্বরূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে। আঞ্চলিক সংস্কার আচার-আচরণের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের সর্বজনগ্রাহ্য সংস্কৃতিই উভয় মহাকাব্যে বিঘোষিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই উভয় মহাকাব্যের আশ্রয়ে রচিত সংস্কৃত কাব্য-নাটকের প্রভাবও ভারতবাসীর জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছে। সংস্কৃত কবিগণ সহজেই মানুষের হৃদয়ে

স্থান করে নিয়েছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা অমর হয়ে আছেন রাম-কথা ও ভারত-কথা পরিবেশনের মাধ্যমে। তবে সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্যদ্বয়ের বিষয় ও রস অনুভব করা অনেক সময় সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারাই ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে রামায়ণ-মহাভারতের রসাস্বাদ করানো হয়েছে। উভয় মহাকাব্যাশ্রিত কালিদাসাদি-রচিত সংস্কৃত রচনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই অতৃপ্তিবোধ থেকেই জন্ম হয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রামকথা ও ভারত-কথার। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার কবিগণই রামায়ণ- মহাভারতের ভাবানুবাদ রচনা করেছেন। কবিপ্রতিভার সঙ্গে আঞ্চলিক বা প্রান্তীয় আচার-আচরণের সংমিশ্রণে সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। একদিকে বাল্মীকি-ব্যাসের শাশ্বত মানবীয় আকৃতি অন্যদিকে প্রান্তীয় জন-মানসের ধর্মবিশ্বাস ও অনুভূতির উপাদানে গড়া রাম-কথা ও ভারত-কথা অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করেছে ভারতবর্ষের প্রতিটি সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে।

বাংলা : বাংলাভাষার কবি কৃত্তিবাস রচনা করেছেন বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ'। বাঙালির আচার-আচরণ ধর্মবিশ্বাস অনুভূতির সঙ্গে কবি কৃত্তিবাসের প্রতিভা গ্রন্থটিকে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের সামগ্রী করে তুলেছে। রামায়ণের ন্যায় বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে নানা বাংলা 'মহাভারত'। কবি কাশীরাম দাসের বাংলা ভাষায় লেখা 'মহাভারত' বাংলা রামায়ণের মতো বাংলার ঘরে ঘরে আদৃত।*

বাংলার লোক-গাথা, কবিগান যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে উভয় মহাকাব্যের বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উভয় মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে পুতুল নাচ, নৃত্য ও অভিনয় যুগ যুগ ধরে বাংলার মানুষের চিত্তবিনোদনের উপাদানরূপে স্বীকৃত। রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা বাংলার স্বল্পশিক্ষিত বা সাধারণ নরনারীর নিকট আকর্ষণীয় বস্তু। এ প্রসঙ্গে বাংলার পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত ছৌ নৃত্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাধারণ মানুষের মধ্যেই রামায়ণের প্রভাব বেশি। এখনও বাংলাদেশের

* শুধু বাংলার নয়— ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক সাহিত্যেই রামায়ণের অমৃতরসে পুষ্ট হয়েছে। সংস্কৃত কাব্যে কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও ভর্তৃহরির 'ভট্টিকাব্য' বা ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র কথা ছাড়িয়া দিলেও— তামিল, কানাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড়ী সাহিত্যেও রামায়ণের অবদান কম নয়। —প্রবোধচন্দ্র সেন, 'রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি'।

বধূপৃচ্ছা (বাংলাদেশের এক অঞ্চলে প্রচলিত) বিবাহ প্রভৃতিতে যে-সকল লোক-সংগীত গাওয়া হয় তাতে পুত্রকে রাম এবং পুত্রবধূকে সীতারূপে কল্পনা করা হয়।

আধুনিক যুগেও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বরেণ্য কবিগণ রামায়ণ-মহাভারতের আধারে কাব্য, নাট্য-কাব্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন। রামায়ণে বাল্মীকি-ব্যবহৃত কিছু প্রসিদ্ধ শব্দগুচ্ছ আজও ভারতবর্ষের নানা ভাষার কবিগণ ব্যবহার করছেন। যেমন— বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা (২।১০।২৬), 'ছায়েব অনুগতা পতিম্' (২।১০।২৫) প্রভৃতি। বাংলার রূপকথাগুলিতেও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী স্থান পেয়েছে।

হিন্দী : বাংলার ন্যায় হিন্দী সাহিত্যও রামায়ণ-মহাভারতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কবি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' ভারতবর্ষের হিন্দী ভাষাভাষী মানুষের কাছে একটি অমূল্য সম্পদ। 'রামচরিত' নামটি রামায়ণে পাওয়া যায়।

'শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্‌কালে পুরা কৃতম্।' ৭।৭১।১৬ ক.খ.

হিন্দীভাষী মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা রামকে পূর্ণব্রহ্মে পরিণত করেছে। মূল সংস্কৃত ভাষা ও অপভ্রংশ শব্দের সংমিশ্রণে রচিত 'রামচরিতমানস'-এর আদর দেখলে বিস্মিত হতে হয়। হিন্দীভাষী অঞ্চলের মানুষের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাম-কথার ব্যবহার আজও অব্যাহত। কেশবদাসের 'রামচন্দ্রিকা' ও সহজরামের 'রঘুবংশ দীপিকা'র নাম হিন্দী সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া মহারাজ পৃথ্বীরাজের 'দশরাউত', সুরসাগরের নবম স্কন্দ, চন্দ্রের 'রামায়ণ প্রসঙ্গ', বিশ্বনাথ সিংহের 'আনন্দ রঘুনন্দন' ও 'আনন্দরামায়ণ', সেনাপতির 'রামায়ণরসায়ন' প্রভৃতি কাব্যগুলিতে ভক্তিরসের ধারা অক্ষুণ্ণ। এ ছাড়া অসংখ্য হিন্দী কবি রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে মৈথিলী-শরণগুপ্তের সাকেত ও কবি নিরালার 'রাম কী শক্তিপূজা' উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে দূরদর্শনের মাধ্যমে হিন্দী ভাষায় প্রচারিত 'রামায়ণ' সারা ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট অতি আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে উঠেছে। এই রামায়ণের ধারাবাহিকতায় সর্বত্র বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসারে ঘটনাগুলিকে সাজানো হয়নি। তবু এটির কুশী-লবগণের অভিনয়পটুতা ও রামায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের অনেক সময়ই তা ভুলিয়ে রাখতে সাহায্য করে। রাম-কথা ও ভারত-কথার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের কথকরা ধর্ম ও নীতির প্রচার করে এসেছেন। আজও সেই ধারা লুপ্ত হয়নি। দূরদর্শনে প্রচারিত

রামায়ণ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ও স্পনসরশিপ্ থেকে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ভারত সরকারের লাভ হয়েছে ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।[৫] দূরদর্শনের মাধ্যমে ভারত-কথাও দেখানো ভারতবর্ষের জনচিত্তে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে।

হিন্দী সাহিত্যে রামায়ণের ন্যায় মহাভারতের প্রভাবও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুবল সিংহ চৌহান প্রায় চব্বিশ হাজার শ্লোকে হিন্দী ভাষায় একটি 'মহাভারত' রচনা করেন। এটি সরল রচনাভঙ্গির জন্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আগ্রার প্রখ্যাত সাধু এবং অন্ধ গায়ক সুরদাস মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যান অবলম্বনে হিন্দী ভাষায় গান রচনা করেন। ছত্র, গোকুলনাথ, সরণগুপ্ত প্রভৃতি কবি মহাভারত অবলম্বনে নানা রচনার মাধ্যমে হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন। আধুনিক কালে ড. বাসুদেব শরণ অগ্রবাল 'ভারতসাবিত্রী' নামে মহাভারতের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা রচনা আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়নি।

ওড়িয়া সাহিত্য : ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার মতো ওড়িয়া সাহিত্যেও রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব অব্যাহত। সরলদাস ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম কবি। ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বিলঙ্কা রামায়ণ' রচনা করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে অর্জুনদাস 'রাম বিভা' রচনা করেন। এটি ওড়িয়া-ভাষীদের অতিপ্রিয় গীতি-কবিতা। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ঘুমুসুরের রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জ 'রঘুনাথ বিলাস' রচনা করেন। হলধর দাসের অধ্যাত্মরামায়ণের ওড়িয়া সংস্করণ বিশেষ জনপ্রিয়। এ ছাড়া বলরাম দাস, শংকর দাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ, রাজা পীতাম্বর রাজেন্দ্র, সুররামমণি পট্টনায়ক, কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক প্রমুখ কবি ও নাট্যকারগণ রামায়ণ অবলম্বনে নানা কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। ওড়িয়া ভাষায় রামায়ণ অনুবাদের ক্ষেত্রে কৃষ্ণচরণ পট্টনায়কের ও পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বনাথ খুন্টিয়া 'বিচিত্র রামায়ণ' রচনা করেন। কবি মধুসূদন উত্তররামচরিতের অনুবাদ করেন এবং ছোটোদের জন্য 'বালরামায়ণ' রচনা করেন। তাঁর 'রাম বনবাস', 'অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও সীতাবনবাস' সুন্দর সৃষ্টি। গঙ্গাধর মেহার 'তপস্বিনী' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। চিন্তামণি মোহান্তির বিখ্যাত উপন্যাসটির নাম 'রামচন্দ্র'। নীলকণ্ঠ রথের রচিত 'সীতা তরঙ্গিণী' কাব্যটি কলহণ্ডি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে।

সরলদাস ওড়িয়া ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা করেন। কবির লেখনীতে

৫. দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪।১১।৮৭, পৃ ৩

সংস্কৃত মহাকাব্যটির অনেক বিষয়ই পাল্টেছে। আঠারোটি পর্বও এটিতে বর্ণিত হয়নি। ওড়িয়াভাষী মানুষের মধ্যে এটির জনপ্রিয়তা অত্যধিক। বিশ্বম্ভর দাস বিচিত্র মহাভারত রচনা করেন। জনপ্রিয়তার বিচারে সরলদাসের পরেই রাজা কৃষ্ণসিংহের মহাভারতের কথা আসে। ভীম ধীবরের 'ভারতসাবিত্রী'তে সমগ্র মহাভারত কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। এবং তাঁর পদ্যে রচিত 'কপটপাশা' মহাভারতে বর্ণিত পাশা খেলার ঘটনা অবলম্বনে রচিত। গোপীনাথ দাস রচনা করেন 'টীকা মহাভারত'। আধুনিক অনেক রচনাও মহাভারত আখ্যানের আধারে রচিত। রমানাথ রায়ের দুর্যোধনরতা রক্তনদী-সন্তরণ এবং বাণহরণ কাব্য এবং রাধামোহন রাজেন্দ্র দেবের 'পাঞ্চালীপট্টাপহরণ নাটক উল্লেখযোগ্য।

কানাড়া সাহিত্য : অন্যান্য সাহিত্যের মতো কানাড়া সাহিত্যও রামায়ণ মহাভারত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। রামায়ণ অবলম্বনে কানাড়া সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি হল নাগচন্দ্রের বা অভিনব পম্পার রাম-চরিত পুরাণ বা পম্পা রামায়ণ। কুমুদেন্দুর 'কুমুদেন্দু-রামায়ণ' দেবাপ্পা কবির 'রামবিজয় কাব্য', দেবচন্দ্রের 'রামকথাবতার' চন্দ্রসাগর বর্ণীর জৈন রামায়ণ প্রভৃতি কানাড়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রামকথা। নরহরি-রচিত তোরবেয় রামায়ণও রামায়ণ অবলম্বন সুন্দর সাহিত্যকীর্তি। মহীশূরের চামররাজ ওয়াদেয়রের রাজসভায় গদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করা হয়। অনুবাদটির 'চামরাজ্যোক্তিবিলাস' নামকরণ করা হয়। কানাড়া সাহিত্যে রামায়ণ অবলম্বনে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল— শঙ্কর নারায়ণের অধ্যাত্মরামায়ণ, হরিদাসের মূল বালরামায়ণ, বেঙ্কামাত্যের রামাভ্যুদয়, বট্টলেশের বট্টলেশ্বর রামায়ণ ও কবি নারায়ণের উত্তর রামায়ণ, রামপট্টাভিষেকম্, অদ্ভুত রামায়ণ, মুদ্দানার রামাশ্বমেধ প্রভৃতি।

আর্যশাস্ত্রীর 'শেষরামায়ণ', এস. রামচন্দ্র রাওয়ের 'শ্রীরামচরিতম্', এম. কৃষ্ণাপ্পার 'রামচরিত' প্রভৃতি কানাড়া ভাষায় রচিত পদ্য রামায়ণ।

এল. রামস্বামীয়েঙ্গার-এর 'ভারতভক্তিকাব্যম', ডি. ডি. গুণ্ডাপ্পার 'রামপরীক্ষণম্' প্রভৃতি রামকাহিনী অবলম্বনে রচিত।

ড. মস্তি বেঙ্কটেশ আইয়েঙ্গারের 'আদিকবি বাল্মীকি' একটি সমালোচনামূলক রচনা।

কানাড়া সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রামকথাশ্রিত গ্রন্থ কে. পি.

পুট্টাপ্পার জনপ্রিয় বাল্মীকি-রামায়ণ ও শ্রীরামায়ণদর্শনম্। 'জনপ্রিয় বাল্মীকি রামায়ণ' সরল গদ্যে রচিত। 'শ্রীরামায়ণদর্শনম্' গ্রন্থটির জন্য কবি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য অকাদেমি সম্মান পান।

কানাড়া ভাষায় পম্পা (প্রথম) 'বিক্রমার্জ্জুন বিজয়' বা 'পম্পা ভারত' অথবা 'সমস্তভারত' রচনা করেন। মহাভারতের আধারে এই রচনাটি অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কুমার ব্যাস কানাড়া ভাষায় মহাভারতের প্রথম দশ পর্ব রচনা করেন। অপর দুই কানাড়া ভাষায় রচিত মহাভারতের উপর রচনার নাম লক্ষ্মকবিভারত এবং শাম্বভারত যথাক্রমে লক্ষ্মকবি ও শাম্বকবির লেখা। ব্যাধ কবি কনকদাস (ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে) নলচরিত রচনা করেন। লক্ষ্মীশ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের বর্ণনা দিয়ে 'জৈমিনী-ভারত' রচনা করেন। যদিও মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের আধারে এটি রচিত তবু অনেক পার্থক্যই এখানে নজরে পড়ে। 'কৃষ্ণরাজ-বাণীবিলাস' নামে মহাভারতের একটি গদ্য সংস্করণ রচিত হয় কৃষ্ণরাজ ওয়াদেয়ারের (তৃতীয়) ব্যবস্থাপনায়। এ ছাড়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য বহু নাটক ও গাথা মহাভারত অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

গুজরাটী সাহিত্য : কানাড়া সাহিত্যের মতো গুজরাটী সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম। আসাইতই (১৩৭১) প্রথম গুজরাটী ভাষায় 'রামলীলা' নামক সংগীতের গ্রন্থ রচনা করেন। গুজরাটী ভাষায় বাল্মীকি-রামায়ণ অবলম্বনে ১৩৯টি রচনা পাওয়া যায়।[৬] তার মধ্যে ৪২টি বাল্মীকি-রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুবাদ। সীতা, হনুমান, অঙ্গদ, মন্দোদরী প্রভৃতি রামায়ণের কথা-পুরুষ ও নারীগণের চরিত্র এবং মাহাত্ম্যও গুজরাটী ভাষায় রচিত হয়েছে। এ-ছাড়া বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে অসংখ্য সংগীতও এই ভাষায় রচিত হয়েছে।

গুজরাটী ভাষায় সম্ভবত নাকর (Nakara ১৫৫০) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লেখক যিনি মহাভারতের কিছু অংশের অনুবাদ করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে মূলের অনুসরণ করেন নি। গুজরাটী রামায়ণের লেখক প্রেমানন্দ সম্পূর্ণ মহাভারতের গুজরাটী সংস্করণ রচনা করেন। তাঁর দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, নলাখ্যান, দ্রৌপদীহরণ এবং সুভদ্রাহরণ মহাভারতীয় আখ্যান ও উপাখ্যানের আধারে রচিত। গুজরাটী আখ্যানের জনক বলে পরিচিত ভালণ নলাখ্যান ও দুর্বাসাখ্যান রচনা করেন। বল্লভ দুঃশাসনরুধিরপানাখ্যান, কুন্তীপ্রসন্নাখ্যান, যুধিষ্ঠির বৃকোদরাখ্যান প্রভৃতির রচয়িতা। রত্নেশ্বরের শিশুপালবধ, সামলভট্টের 'রাবণ-

৬ 'রামায়ণ-সমীক্ষা—জীবন ও দর্শন', পৃ. ১০

মন্দোদরী সংবাদ' এবং দ্রৌপদী-বস্ত্রহরণ গুজরাটী ভাষায় উল্লেখযোগ্য রচনা। আধুনিক যুগেও ননলাল 'কুরুক্ষেত্র' নামক একটি মহাকাব্য রচনা করেন। লীলাবতী মুন্সীর 'রেখা-চরিত্রে' দ্রৌপদীর চরিত্রটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বতুভাই লালভাই উমার বা দিয়ার 'মৎস্যগন্ধা আনে গাঙ্গেয়' নামক রচনায় কিছু একাঙ্ক নাটক সংগৃহীত হয়েছে।

মারাঠা সাহিত্য : রামায়ণে বর্ণিত তাড়কাবধ, হরধনুভঙ্গ, পুত্রেষ্টি যাগ প্রভৃতি ঘটনাকে অবলম্বন করে এক-একজন মারাঠা কবি তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন। মারাঠীসাহিত্যে অধ্যাত্ম ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম। মুক্তেশ্বর সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, মাধব ও মোরপন্ত সম্পূর্ণ রামায়ণ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস মুদ্‌গল বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড অবলম্বনে মারাঠী ভাষায় রাম-কথা রচনা করেন। ভাবার্থরামায়ণের রচয়িতা একনাথ দার্শনিক ভিত্তিতে রামায়ণের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর পুত্র মাধবস্বামী, বাল্মীকি-রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নিরঞ্জন মাধব 'বালকাণ্ডে'র দার্শনিক দিক অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। বেনাবাই রামায়ণের পাঁচটি কাণ্ড নিয়ে তাঁর রাম-সাহিত্য রচনা করেন। শ্রীধরের 'রামবিজয়' রামের জীবনের কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে রচিত। মোরপন্ত ও বামন লবকুশের বীর্যগাথা অবলম্বনে তাঁদের কাব্য রচনা করেন। এ ছাড়া বিঠ, বেণকাগুন, নাগেশ, বিঠল, বেনাবাই প্রত্যেকেই মারাঠী ভাষায় 'সীতাস্বয়ম্বর' রচনা করেন। 'শতমুখরাবণবধ' নামক গ্রন্থটি অমৃতরাও ওহের রচনা। মারাঠী সাহিত্যে নাট্যকার কিরলোসকরের 'রামবাজ্য বিয়োগ' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সুমন্ত্রের কাব্যটি ভবভূতির উত্তররামচরিতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কবি গিরীশ শূর্পণখার কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। রঙ্গনাথ, মোগরেকার, বাসনপণ্ডিত ও হরিরায় প্রভৃতি কবি যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ অবলম্বন করে তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন।

রামায়ণ-রচয়িতা মুক্তেশ্বর পদ্যে মহাভারতও রচনা করেন। তাঁর রচিত মহাভারতটি মারাঠা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সম্পদ। কবি শ্রীধরের 'পাণ্ডব প্রতাপ'ও মারাঠা সাহিত্যে একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ। মারাঠী ভাষায় ১০৮টি রামায়ণের রচয়িতা মোরপন্তও একটি মহাভারত রচনা করেন। শুভানন্দ মহাভারতের কিছু অংশের সংকলন করেন। রঘুনাথ পণ্ডিতের 'দময়ন্তী স্বয়ম্বর' বা নলোপাখ্যান মারাঠী সাহিত্যে একটি অপূর্ব কাব্যিক রচনা। মুখ্যত এটি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতেরই মারাঠী রূপান্তর।

কবি অনন্তরায়ের 'দুর্বাসাযাত্রা', 'দ্রৌপদীবস্ত্রহরণ' প্রভৃতি মারাঠা সাহিত্যে খুব জনপ্রিয় রচনা। অন্নকিরলোসকরের শকুন্তলা এবং সুভদ্রা, খাদিলকারের 'দ্রৌপদী-পান্ত', প্রতিনিধির 'দ্রৌপদীবস্ত্রহরণ', কাণের 'নলদময়ন্তী' এবং রঘুনাথ পণ্ডিতের 'নলদময়ন্তীস্বয়ম্বর' প্রভৃতি মারাঠা সাহিত্যে মহাভারতাশ্রিত আধুনিকতম রচনা। ছিপলুনকার মারাঠী ভাষায় সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন।

তামিল সাহিত্য : অন্যান্য সাহিত্যেব মতো তামিল সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব দেখা যায়। 'কম্বনরামায়ণ' হল এই সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ। রামকে অবলম্বন করে এই ভাষায় নানা কবিতা রচিত হয়েছে। তামিল সাহিত্যে অন্যান্য রামায়ণ-বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে রামস্বামী আইয়ারের 'রামস্বামীয়ম্' অরুণাচলকবির 'রামনাটকম্' মুথুসামি কবির 'রামনাটকম্', কবি তরঙ্গসামি রেড্ডিয়ারের 'তিরপুগজ', 'রামের থোথিরাম', 'রামায়ণ বিরুথম্', বিষ্ণুপদের 'রামায়ণ-চূড়ামণি', সেকরার 'রামদন্তম্', রামায়ণ করুপ্পোরল, বিভীষিণাউবর কীথাইগল, রামায়ণ কুম্মি প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

বর্তমানে বাল্মীকি-রামায়ণ গদ্যে অনুবাদ করেছেন নটেস শাস্ত্রী, ও সি. আর. শ্রীনিবাস আইয়েঙ্গার। পণ্ডিত কনকরাজ আইয়ার ইল্লানকাইপরনি 'রামায়ণ ত্রিবেণী', 'কম্বন তামিল বাল্মীকিয়ম্', 'কাম্বরূম্' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তামিলদের হরিকথা সম্প্রদায় কর্তৃক নাটক, সংগীত কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে রাম-কথা পরিবেশিত হয়।

পারুণদেবনার তামিল ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেন। এম. ভি. রামানুজাচার্য সমগ্র মহাভারতের গদ্যে অনুবাদ করেন। সুব্রহ্মণ্য ভারতিয়ার রচিত 'পাঞ্চালিয়িন্ শপতম্' রচনাটি মহাভারতের আধারে।

তেলুগু সাহিত্য : তামিল সাহিত্যের ন্যায় তেলুগু সাহিত্যও রামায়ণ-মহাভারতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম তেলুগু ভাষায় বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ হয়। বুদ্ধ রেড্ডি 'রঘুনাথ রামায়ণ' রচনা করেন। তিনি রামায়ণের প্রথম ছটি কাণ্ড অনুবাদ করেন। পরে তাঁর দুই পুত্র কাচ ও বিট্ঠল উত্তর কাণ্ডটি সংযুক্ত করেন। টিক্কানা 'নির্বচনোত্তর রামায়ণ' রচনা করেন। এতে রামায়ণের কেবলমাত্র উত্তর কাণ্ডটি অনূদিত হয়েছে। ভাস্কর রামায়ণের রচয়িতা চারজন কবি যথাক্রমে হুলিক্কি ভাস্কর, আইয়ালার্য, মল্লিকার্জুন ভট্ট ও কুমার রুদ্রদেব। ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক তেলুগু অনুবাদ করেন এরাপ্রেগ্নেড়া। অন্নামাচার্য দ্বিপদছন্দে তেলুগু

রামায়ণ রচনা করেন। আইয়ালরাজু রামভদ্রকবি 'রামাভ্যুদয়' রচনা করেন। তিনি সকলকথাসারসংগ্রহেও সুন্দরভাবে রাম-কাহিনী পরিবেশন করেছেন। রাজকবি কট্ট বরদারাজু দ্বিপদছন্দে 'কট্টবরদারাজু' রামায়ণ রচনা করেন। এই রচনাটিকে বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ বলা যেতে পারে। তেলুগু ভাষায় অন্যান্য রাম-কথা হল— তাঞ্জোরের রাজা রঘুনাথ নায়কের 'রঘুনাথচরিতম্' কুচিমাঞ্চী তিম্মকবির 'অঞ্চতেনুনু রামায়ণম', কর্ণকণ্তি পাপরাজুর 'উত্তররামায়ণম্', ভোগলত্রকোজি ও ছেভরাজহর রেড্ডির দ্বিপদছন্দে 'রামায়ণ', গোপীনাথ রামায়ণ, আন্ধ্রবাল্মীকি-রামায়ণ, ইয়াখা বাল্মীকি মণিকোড়া রামায়ণ, 'সরস্বতী রামায়ণ', 'রামায়ণ কল্পবৃক্ষম্' প্রভৃতি।

কবি নান্নয় তেলুগু ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা করেন (একাদশ শতাব্দী)। তিনি প্রথম দুই পর্ব ও তৃতীয় পর্বের অর্ধেক রচনা করেন। তিক্কন (ত্রয়োদশ শতাব্দী) বাকি ১৫টি পর্বের তেলুগু অনুবাদ করেন। কিন্তু তৃতীয় পর্বটি অসমাপ্ত থাকে। পিল্লালামারি পিনাবীরভাদ্রি জৈমিনি ভারত এবং শৃঙ্গার-শকুন্তলম্ রচনা করেন।

আধুনিক কালেও তিরুপতি শাস্ত্রী, বেঙ্কট শাস্ত্রী প্রভৃতি নাট্যকারগণ তেলুগু ভাষায় সুন্দর সুন্দর নাটক রচনা করেছেন। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রী মহাভারতের তেলুগু অনুবাদ করেন।

মালয়ালম সাহিত্য : তেলুগুর ন্যায় মালয়ালম ভাষায় রচিত বিভিন্ন কবিকীর্তিতে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব প্রত্যক্ষ। চীরাম কবি 'রামচরিথম্' রচনা করেন। এটি খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের বিষয় নিয়েই এটি রচিত। রাম পাণিক্করের 'কন্নশরামায়ণ' একটি উল্লেখযোগ্য রাম-কথা। তামিল ও মালয়ালম্ ভাষার মিশ্রণে রচনা আখ্যাপ্পিল্লে আসনের 'রামকথাপাটু'। পুনম্ নম্পুতিরির 'চম্পূ রামায়ণ' মালয়ালম সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা। এজুত্থাঙ্গনের রামায়ণ মালয়ালম্ সাহিত্যে ও জনজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যান্য রামায়ণ অবলম্বনে রচনাগুলি হল— কোট্টায়াক্কারা থামপুরন্-রচিত 'রামনাট্টম্', কুঞ্চন্ নামপ্রিয়ারের 'সীতাস্বয়ম্বরম্', কেরল বার্মার 'কেরলবার্মা রামায়ণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'প্রতিমানাটকম্', 'অনর্ঘরাঘবম্', 'জানকী পরিণয়ম্', 'প্রসন্নরাঘব' প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রচনাগুলি মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' কম্বনের 'কম্বনরামায়ণ' মালয়ালম ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে অনুবাদ করা হয়েছে।

কেরলবাসীর অভিনয়, কথকতা, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ প্রভৃতির সঙ্গেই রামায়ণের ঘনিষ্ঠতম যোগ রয়েছে। মালয়ালম ভাষায় এজুত্থাম্সন রামায়ণের ন্যায় 'মহাভারত'ও রচনা করেন। তাঁর মহাভারত (মালায়লম ভাষায়) সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই উপযুক্ত। উণণয়ি ওরিয়ারের 'নলচরিতম্' এবং ইরায়ীমমন থাম্পির 'উত্তরাস্বয়ম্বরম্' এবং 'কীচকবধম্' উল্লেখযোগ্য রচনা। আধুনিক কালে কিছু নাটকও মালয়ালম ভাষায় রচিত হয়েছে, যেগুলির আধার মহাভারত। যেমন— থোট্টাকট্টু, ইক্কবামর 'সুভদ্রার্জুনম্', এন পি ছেলাপান নায়ারের 'কর্ণন', মহাকবি উল্লোর-এর 'অম্বা' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

অসমীয়া সাহিত্য : অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য সাহিত্য অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। মাধবকন্দলী প্রথম বাল্মীকি-রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মহামাণিক্যের সময় এটি রচিত হয়। তার পর কামাখ্যার কবি দুর্গার 'গীতি রামায়ণ' রচনা করেন। অনন্তকন্দলী রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বন করে কয়েকটি কাব্য রচনা করেন। শংকরদেব রামায়ণকে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি 'সীতা স্বয়ংবর' নামে একটি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন। অনন্ত ঠাকুর রাম সম্বন্ধে কীর্তন রচনা করেন। এ ছাড়া রঘুনাথ মহান্ত গদ্যে রামায়ণ রচনা করেন। অনন্ত কন্দলীর 'সীতার পাতাল প্রবেশ' ও মাধবদেবের 'রামভাবন'— দুটিই অসমীয়া ভাষায় রামায়ণ অনুসারে লেখা নাটক। রঘুনাথ দাসের 'শত্রুঞ্জয়' নামক কাব্যটি রামায়ণ অনুসারে লেখা। অসমীয়া ভাষায় অদ্ভুত রামায়ণও লেখা হয়েছে। চন্দ্রভারতীর 'মহীরাবণ বধ' কাব্যটিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

রামসরস্বতী কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের অনুরোধে মহাভারতের অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর মহাভারতের আধারে রচনাগুলি হল কুলাচল বধ, বকাসুরবধ এবং ভীমচরিত প্রভৃতি। হরিহর বিপ্রের 'বব্রুবাহনের যুদ্ধ' মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের আধারে রচিত। মাধবদেব 'রাজসূয়যজ্ঞ' রচনা করেন মহাভারতের আখ্যানের আধারে। অনন্দ কন্দলী রচনা করেন 'ভারতসাবিত্রী'। সূর্যখরী দৈবজ্ঞের 'কূর্মাবলিবধ' এবং 'খটাসুর বধ' উভয়ের কাহিনীই মহাভারত থেকে নেওয়া। মহাভারতের আধারে রমাকান্ত চৌধুরী 'অভিমন্যু বধ' কাব্য রচনা করেন। গোপীনাথ পাঠকের দ্রোণ ও পুষ্প পর্বণ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। অনেক নাটকের বিষয়বস্তুও মহাভারত থেকে গৃহীত হয়েছে।

উল্লিখিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাগুলি ছাড়াও মৈথিলী পাঞ্জাবী, নেপালী প্রভৃতি সাহিত্যেও রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরের কিছু পশ্চিমে বাল্মীকির আশ্রম ছিল বলে সাধারণ মানুষের ধারণা। এখন এটি রামতীর্থ বলে পরিচিত। পাঞ্জাবের এই স্থানেই রামের সঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ এবং 'রামায়ণ' রচিত হয়েছিল এরূপ বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে আজও অটুট।

গুরুগোবিন্দ সিং একটি সম্পূর্ণ 'রামায়ণ' রচনা করেন। পাঞ্জাবী সাহিত্যে মহাভারত অবলম্বনেও কাব্য, নাটক, কবিতা প্রভৃতি রচিত হয়েছে। নেপাল ভারতবর্ষের অন্তর্গত না হলেও ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দ্বারা নেপালী সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। নেপালী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ভানুভক্তের 'রামায়ণ' খুব জনপ্রিয়। আশানুরূপভাবে নেপালী সাহিত্য মহাভারত দ্বারাও যথেষ্টভাবে প্রভাবিত।

ভারতবর্ষের সকল সাহিত্যেই এবং লোকসমাজে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন বচন প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হয়। রামায়ণ অবলম্বনে প্রবাদ যেমন—'কালস্য কুটিলা গতি', 'রাবণের চিতা', 'লক্ষ্মণের ফল ধরা', 'রাম না হতে রামায়ণ' প্রভৃতি। মহাভারতের আধারে সৃষ্ট প্রবাদ যেমন—'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে', 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির', 'দাতা কর্ণ' প্রভৃতি। মৈথিল কবি চন্দা 'রামায়ণ' রচনা করেন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলেরই সাহিত্য রামায়ণ-মহাভারত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্টভাবে পুষ্টি ও বিশালতা অর্জন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী কথক- পণ্ডিতগণ রামায়ণ-কথা ও ভারত-কথা জনতার মধ্যে জীবন্ত করে রেখেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না। তাই একমাত্র হাতে-লেখা পুথিই ছিল পণ্ডিতদের রামায়ণ-কথা ও ভারত-কথা প্রচারের মাধ্যম[৭]

---

৭. "But the fact that almost all the important languages of India. Sanskrit, Bengali, Telegu, Mālayālam, Kannāḍa etc. have yielded manuscripts of the Mahābhārata belonging to different periods, shows— that the epic was extremely popular with the masses and its copies were constantly in demand, although only in the mediaevel period."—V P. Dwivedi. 'Mahābhārata and Indian Art', pp 126-27 (*Mahābhārata-Myth and Reality*)

ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পুথি সংরক্ষণ কেন্দ্রে রক্ষিত নানা ভাষায় লেখা রামায়ণ-মহাভারতের পুথিগুলি ভারতের স্থায়ী সম্পদ বলা যেতে পারে। পুথিলেখকগণ অন্যান্য পুথি লেখার সময়ও স্থানে স্থানে রামায়ণ-মহাভারতের শ্লোক উদ্ধার করেছেন। রামায়ণ ও ভারত-কথার পুথিগুলির বিভিন্ন পাঠ ও পাঠান্তর আজ গবেষকগণের নিকট বিশেষ উপাদেয় বস্তু বলা যেতে পারে। উভয় গ্রন্থের সামীক্ষিক সংস্করণ রচনার সময় এগুলির প্রয়োজন পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন ও সেগুলির যথাযথ ব্যবহারও করেছেন। মূল গ্রন্থ ছাড়াও উভয় মহাকাব্যের নানা সংক্ষিপ্ত রূপ বিভিন্ন প্রথিতযশা লেখকের দ্বারা লিখিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই সকল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আজও মেলে। বিভিন্ন পুথিসংরক্ষণ কেন্দ্রের প্রাচীন পুথিগুলির মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার হাতে-আঁকা চিত্রগুলি আজও মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে।

ভারতবর্ষের স্থাপত্যশিল্পীরা বিভিন্ন মন্দিরে ও গুহার প্রাচীরে রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনাবলী খোদাই করে রেখেছেন। নানা প্রাচীন মন্দিরে আজও এগুলির নিদর্শন মেলে। প্রচলিত মতানুসারে ৭০০ বছরের প্রাচীন রাজস্থানের ঝুনঝুনুর সতী মন্দিরে পাথরের দেওয়ালে খোদাই করা রামায়ণ-মহাভারতের চিত্রাবলী এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরেও রাম-কথা ও ভারত-কথার প্রভাব ও প্রচারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সিন্ধু প্রদেশ এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। তবু সিন্ধী সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব বর্তমান। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে দেবানন্দ সিন্ধীভাষায় 'রাম বনবাস' নামক নাটক রচনা করেন। রামায়ণের ন্যায় সিন্ধী সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন কালে ভারত-সংশ্লিষ্ট পূর্বাঞ্চলে এবং ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষের মানুষ ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে পর্যটন করেছে। কোথাও কোথাও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। ফলে ঐ সকল অঞ্চলে রাম-কথা ও ভারত-কথার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। বালিদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা ছাড়া কোথাও বর্তমানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার নেই। যেমন ব্রহ্মে, শ্যামে, কম্বোজে চম্পায় বৌদ্ধ এবং মালয় প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ এখন মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলেও এদের সাহিত্য, নৃত্য, শিল্পকলা লোক-সংস্কৃতি রাম-কথা ও ভারত-কথা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই রাম-কথা প্রচারিত হয়। তার পর আনুমানিক দুশো বছরের মধ্যে সোগদিয়ানা বা চুলিক দেশের এক ভিক্ষু

বাল্মীকি-রামায়ণের মতো রাম-কাহিনীর অনুবাদ করেন। পালি দশরথ জাতকের কাহিনীও চীনদেশে অনূদিত হয়।

শ্যামদেশে ১৩৫০ খৃস্টাব্দে একটি নতুন রাজবংশ স্থাপিত হয় যার রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা (আয়ুথিয়ে)। ১৭৭২ খৃস্টাব্দে যে রাজবংশটি প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের প্রত্যেকের নামের প্রথম অংশ 'রাম'। এদেশে এখনও 'রামরাজ্য' চলছে। শ্যামদেশের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছায়ানাট্য এবং এর জনপ্রিয় বিষয় রামকিয়েন বা রামকীর্তি।

চম্পাদেশে রাজা প্রকাশবর্ম রামায়ণ-রচয়িতা কবি বাল্মীকির পূজার জন্য তাঁর একটি মূর্তি স্থাপন করেন। এই সকল দেশে রামায়ণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ছায়ানৃত্য প্রভৃতিতে ভারত-কথাও ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মধ্য এশিয়ার খোটান, চীনাতুর্কিস্তান, উত্তর সিন্‌কিয়াং অঞ্চলেও রাম-কথা ও ভারত-কথার প্রচলন ছিল। জাপানে রামায়ণ-মহাভারতের প্রচার ব্যাপক। ইউরোপেও রামায়ণ-মহাভারতের ভাষান্তর হয়েছে। জার্মানিতে সংস্কৃত চর্চার সিংহভাগ রামায়ণ ও মহাভারত চর্চা। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে তুর্কমান বিজ্ঞান আকাদেমী থেকে রুশ ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মহাভারতের এই অনুবাদ করেছেন অ্যাকাডেমিশিয়ান বোরিস স্মিরনভ। স্মিরনভের এই বিশাল কাজ সুধীমহলে খুব প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর অনূদিত মহাভারতের বৈজ্ঞানিক, শিল্পগত ও সামাজিক, রাজনৈতিক মূল্য খুব বেশি। ভারত ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শক্তিশালী করার ব্যাপারে এগুলি অনেকখানি সাহায্য করছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে রামায়ণও খুব জনপ্রিয়। তুলসীদাসের রামচরিত-মানসের রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে লন্ডনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বোধ গড়ে তোলার জন্য রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে এবং হচ্ছে।[৮]

৮. About a quarter of a million school children in London are studying the Rāmāyana part of their religious education as to understand Hindu culture imbibe positive values and live in harmony with Indians settled in Britain.—Reports I. T. I *The Statesman*. 1 December, 1987

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. গোল্ডম্যান রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেছেন। তাজিক ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ করেছেন সোভিয়েত কবি বোবো খোজি। এই অনুবাদে তিনি রামায়ণের ফারসি অনুবাদের সাহায্য নিয়েছেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভ্যান বুইটেনান মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এ কাজ সমাপ্ত হয়নি। মেক্সিকো ও ব্রেজিল দেশেও রামায়ণ-মহাভারতের ভাষা ও গঠনশৈলী নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। ফরাসি দেশে মহাভারতের অনুশীলন শুরু হয়েছে। এখানে মহাভারতের আখ্যানভিত্তিক নতুন নাটক খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এইভাবে সমগ্র বিশ্বের নানা দেশে আজ রাম-কথা ও ভারত-কথার প্রচার ও প্রসার দেখা যাচ্ছে। এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশের মানুষ রামায়ণ ও মহাভারতের মধুর কাহিনী তথা আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ও হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশের সাহিত্যেও উভয় মহাকাব্যের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।[৯]

---

৯. 'From the beginning of the nineteenth century there is the start of European scholarly interest, with editions and translations of the original Rāmāyaṇa into English in the first decade and into Italian and French in the middle of that century. By now, the Rāmāyaṇa has taken its place as one of the classics of the world literature.' —J. L. Brokington, *Righteous Rāma : The Evolution of an Epic*, . *p. 306*

(খ) নৈষ্ঠিক হিন্দুর প্রাত্যহিক ও আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে উভয় মহাকাব্য

প্রত্যেক জাতিই একটি আদর্শ সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল থেকে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ওই অস্তিত্বশীল জাতির আপন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সামাজিক নানা ক্রিয়াকলাপে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত কিছু কিছু শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি যুগে যুগে সমাজের মানুষ বংশানুক্রমে লাভ করে। হিন্দুর প্রায় সকল আভ্যুদয়িক আচার-অনুষ্ঠানই বেদানুসৃত। তবে অধিকাংশ মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুরাণ ও মহাকাব্য যুগের বহু আখ্যান ও উপাখ্যানকে সজীব রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সকল আখ্যান-উপাখ্যানকে সজীব রাখার উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ বিশেষ কোনো আদর্শ বা শিক্ষাকে জাতীয় জীবনে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রভাবিত করে বাঁচিয়ে রাখা। এর দ্বারা একদিকে যেমন প্রাচীন আখ্যান উপাখ্যান বা কোনো আদর্শ চরিত্র স্মরণীয় হয়ে থাকত তেমনি সেই আখ্যান উপাখ্যান বা চরিত্রগত শুভাদর্শের আলোকে হিন্দু-জীবনে শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলার বিকাশ ঘটত। হিন্দুর জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত এমন-কি মৃত্যুর পরেও পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপেও রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। তবে নৈষ্ঠিক হিন্দুর প্রাত্যহিক ও নানা অভ্যুদয়িক ক্রিয়াকলাপে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রভাবই বেশি।

রামায়ণের নায়ক রামের নাম হিন্দুর কাছে মঙ্গলের প্রতীক। প্রায় সকল হিন্দুই সকালে সন্ধ্যায় বিপদে আপদে 'রাম' নাম উচ্চারণ করেন বিঘ্ননাশের উদ্দেশ্যে। 'রাম' নাম মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও পরলোকে বিশ্বাসী মুমূর্ষু হিন্দুর কাছে শুভফল লাভের উপায় রূপে স্বীকৃত। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়ে 'রাম' নাম উচ্চারণ করেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হিন্দুর অনেক সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে সমগ্র রামায়ণ পাঠ করার রীতি আছে।

ভারতবর্ষের রক্ষণশীল হিন্দুরা সকালে শয্যা ত্যাগ করার পূর্বে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করেন—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যম্ মহাপাতকনাশনম্॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ॥

শ্লোকটিতে রামায়ণের অহল্যা (মহাভারতেও বর্তমান), তারা, মন্দোদরী, সীতা

এবং মহাভারতের দ্রৌপদী, কুন্তী, নল রাজা এবং কৃষ্ণের নাম মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নৈষ্ঠিক হিন্দুর নিত্যকর্মে রাম-তর্পণের মন্ত্রটি হল—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটিণাং সপ্তদ্বীপনিবাসিণাম্।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

লক্ষ্মণ তর্পণের ক্ষেত্রেও 'ওঁ আব্রহ্মাস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু'। মন্ত্রটি পাঠ করা হয়।

রামায়ণে কৌশল্যা রামের মঙ্গল বা রক্ষার জন্য যে-সকল বাক্য ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি কৌশল্যারক্ষা মন্ত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ।

যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥ ২।২৫।৩২-৩৩

রামনবমী, সীতানবমী প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও রামায়ণের প্রভাব বর্তমান। হিন্দুর ঘরে ঘরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, ঊর্মিলা প্রভৃতির নামানুসারে বালক-বালিকার নামকরণেও রামায়ণের প্রভাব বর্তমান। আত্মীয় ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করলে রামায়ণের কথা-পুরুষ বিভীষণের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়। পক্ষান্তরে মহাভারতের—

ভূমেঃ ক্ষমা চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্ব্বলং প্রাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদম্॥ ২।৭৮।২০

মন্ত্রটি বিদুররক্ষা মন্ত্ররূপে হিন্দুজীবনে পরিচিত। আবার ভারতোক্ত বিনতারক্ষার মন্ত্রটি হল—

পক্ষৌ তে মারুতঃ পাতু চন্দ্রসূর্যৌ চ পৃষ্ঠতঃ॥
শিরশ্চ পাতু বহ্নিস্তে বসবঃ সর্বতস্তনুম্॥ ১।২৮।১৪ ক.খ.-১৫ ক.খ.

যজ্ঞ কর্মে মহাভারত পাঠ করলে দেবতার উদ্দেশে দেয় হবি অক্ষয় হবে এই বিশ্বাসে সমগ্র মহাভারত বা মহাভারতের অংশবিশেষ পাঠ অথবা 'মহাভারত' নাম উচ্চারণ করার বিধান আছে। যে-কোনো শ্রাদ্ধে অন্নোৎসর্গের পর রুচিস্তব পাঠের পূর্বে যে দুটি শ্লোক পাঠ করা হয় তার সঙ্গে "মহাভারতম্" শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করা হয়। পিতৃশ্রাদ্ধে নানাভাবে মহাভারতকে ব্যবহার করা হয়। যেমন—

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥ ১।১।১১০-১১১

মহাভারতের এই শ্লোক দুটি একোদ্দিষ্ট, পার্বণ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পাঠ করা হয়। হরিবংশ পুরাণের ঋষিপুত্রদের সপ্ত জন্মসূচক কয়েকটি মন্ত্রও তাতে অবশ্যপাঠ্য। শ্রাদ্ধে এবং সকল প্রকার গৃহকর্মে হিন্দুরা সমগ্র ভগবদ্গীতাও পাঠ করে থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে গীতা দান করাও পুণ্যকর্ম রূপে গণ্য করা হয়। বৃষোৎসর্গ বা রুদ্রযাগে এখনও মহাভারতের বিরাট পর্ব পাঠ করা হয়। মহাভারতের ভীষ্মস্তবরাজের অন্তর্গত—

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১২।৪৭।৯৫

শ্লোকটি বিষ্ণুপ্রণাম-মন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। নিম্নোক্ত সূর্যপ্রণাম-মন্ত্রটিও মহাভারত থেকে গৃহীত।

নমঃ সবিত্রে জগদেক-চক্ষুষে
জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশ হেতবে।
ত্রয়ী মায়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চিনারায়ণ শঙ্করাত্মনে নমঃ॥ অধ্যায় ১। পৃ. ২২০

মহাভারতের —

পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ।
পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
সর্বাঃ প্রীয়ন্তি দেবতাঃ॥ [illegible]।২১

শ্লোকটি উচ্চারণ করেই হিন্দুগণ পিতাকে প্রণাম করেন। আবার, সাংসারিক সচ্ছলতা ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য প্রার্থনায় ব্যবহৃত মন্ত্র—

অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমন্মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন॥ ১২।২৯।১২১

মহাভারতের রন্তিদেব উপাখ্যানের অন্তর্গত উপরোক্ত শ্লোকটি শ্রাদ্ধের শেষে পাঠ করা হয়।

মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণু-সহস্রনাম শিবসহস্রনাম স্তোত্র শান্তিস্বস্ত্যয়নে পঠিত হয়। সকল প্রকার গৃহ্যযাগে বসুধারা দান ও চেদিরাজ বসুর পূজা অবশ্যকর্তব্য রূপে স্বীকৃত। মহাভারতে চেদিরাজ বসু উপাখ্যানের (৩।৬৩) আধারেই এটি কল্পিত হয়েছে। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে পঠিত—

অঙ্গাদঙ্গাদ্ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥
জীবিতং ত্বদধীনং মে সন্তানমপি চাক্ষয়ম্।
তস্মাৎ ত্বং জীব মে পুত্র সুসুখী শারদাং শতম্॥ ১।৭৪।৬৩-৬৪

শ্লোক দুটি মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যানের (১।৬৯-৭৪) অন্তর্গত।

আজও নিষ্ঠাবান হিন্দু দেবব্রত ভীষ্মকে স্মরণ করে তিলাঞ্জলি দান করেন। হিন্দুগণ নিত্যতর্পণের সঙ্গে ভীষ্মতর্পণ করেন। ভীষ্মের তর্পণ মন্ত্রটি হল—

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতং সলিলং ভীষ্ম বর্মণে॥

ভীষ্মের প্রণাম মন্ত্র—

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অভিবম্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥

মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাই এই তিথিটিকে ভীষ্মাষ্টমী রূপে অনেক হিন্দু স্মরণ করেন। বহু হিন্দু গায়ে তেল মাখার পূর্বে তর্জনীর দ্বারা কিছুটা তেল মাটিতে নিক্ষেপ করেন। উদ্দেশ্য অশ্বত্থামার ক্ষত-শান্তি।

অনেক হিন্দু রাম-গায়ত্রী, লক্ষ্মণ-গায়ত্রী এবং কৃষ্ণ-গায়ত্রী পাঠ করেন।

মহাভারতের সত্যবান-সাবিত্রী উপাখ্যানের (৩।২৯৩-২৯৯) আধারেই সাবিত্রী-ব্রতের প্রচলন হয়েছে। হরিতালিকা চতুর্থী ব্রতের মূলও মহাভারতে নিহিত। হরিতালিকা ব্রতে ব্যবহৃত—

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

শ্লোকটি হরিবংশ (হরিবংশ পর্ব ৩৮।৩৬) থেকে নেওয়া হয়েছে। ভাদ্রমাসের

শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই চতুর্থীর চন্দ্র নষ্ট চন্দ্র বলে পরিচিত। এই চন্দ্রদর্শন নিষিদ্ধ। হঠাৎ বা ভুল করে যদি কেউ এই নষ্ট চন্দ্র দর্শন করে তবে উত্তরমুখী হয়ে এই মন্ত্রটি পাঠ করে শঙ্খস্থ জল পান করলে নষ্টচন্দ্র দর্শন জনিত পাপ দূর হয়। ষোড়শদান, মহান্নদান প্রভৃতি হিন্দুর সকল প্রকার দানের কথাই মহাভারতে দেখা যায়। প্রাচীন ভূমিদানপত্রে মহাভারতের শ্লোক উদ্ধার করার রীতি ছিল। মহাভারতে 'দানধর্ম' অংশে দানের নানাভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। গোদান যে সকল প্রকার দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা মহাভারতে বলা হয়েছে। মানুষকে দানের প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল করতে এই 'দানধর্ম' নামক অংশটির বিশেষ ভূমিকা বর্তমান।

হিন্দুর সমাজে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রগুলি মহাভারতের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল। রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্ব সব বহু স্মৃতি এবং ধর্মশাস্ত্রব্যাখ্যা গ্রন্থে মহাভারতের বাক্য উদাহরণ রূপে গৃহীত হয়েছে। যে ব্যক্তির গৃহে মহাভারত গ্রন্থ থাকে জয় তার হস্তগত এরূপ বলা হয়ে থাকে।

'ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ'। ১৮।৬।৮৯

ভবিষ্য পুরাণোক্ত 'কুক্কুটী' ব্রতকথার বক্তা কৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির। বৈশাখ মাসের অষ্টমী তিথিতে সংযমী থেকে ধন-ধান্য ও বিবিধ ঐশ্বর্য লাভের জন্য নৈষ্ঠিক হিন্দুরা 'সীতা-নবমী' ব্রত পালন করেন। এই ব্রতে সীতার সঙ্গে জনকের পূজাও করা হয়। 'আমলকী দ্বাদশী' হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য ব্রত। এই ব্রতের অন্তর্ভুক্ত ব্রতকথার বক্তা স্বয়ং যুধিষ্ঠির, শ্রোতা এক ব্রাহ্মণ। সাবিত্রী ব্রতকথার বিষয়বস্তু ও মহাভারতের বনপর্ব থেকে গৃহীত। এখানে ঋষি মার্কণ্ডেয় ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। এই সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীই ঋষি অরবিন্দের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাবিত্রী মহাকাব্যে'র বিষয়। যা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সমুজ্জ্বল।

মহাভারতের কথা-পুরুষ কৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দেবব্রত, শান্তনু প্রভৃতির নাম হিন্দুর ঘরে ঘরে। সুতরাং দেখা গেল হিন্দুর জীবনে অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

(গ) ব্যবহারিক জীবনে মহাকাব্যদ্বয়ের শিক্ষা

রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামের জীবনে প্রথমে সাংসারিক কারণে এসেছে অরণ্য যাত্রা। পরে ধর্মপত্নী সীতা-উদ্ধারের জন্য এসেছে যুদ্ধ। আর এই বনবাস ও যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মহাকাব্যের প্রতিটি কথাপুরুষের জীবনে সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা হর্ষ চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে। কথাপুরুষগণের প্রায় প্রত্যেককেই বাস্তব জীবনের বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে নানা কারণে। তবু প্রতিটি ব্যক্তিই আপন আপন স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

অনুরূপভাবে মহাভারতেও একটি রাজ পরিবারের রাজ্যাধিকার জনিত কলহ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে পাণ্ডবদের অরণ্য-জীবনের দুর্ভোগ যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তির ফসল। যুদ্ধের কারণ এখানে ভূমি। মহাভারত যুদ্ধে যোগদান করেছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্যবর্গ। শ্রীকৃষ্ণের বাস্তববুদ্ধির সুকৌশল প্রয়োগেই পাণ্ডবদের জয়লাভ হয়েছে।

সুতরাং উভয় মহাকাব্যের প্রতিটি চরিত্রকেই সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানাপ্রকার বাধা অতিক্রম করে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তাই মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় অনেক শিক্ষা, নীতি, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত বাক্যাবলী মহাকাব্যদ্বয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। এখানে বাস্তবজীবনে অতি প্রয়োজনীয় কিছু বাক্য উভয় মহাকাব্য থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে—

রামায়ণে রাম পিতার সত্যরক্ষার জন্য বনে যাবেন স্থির করেছেন। কিন্তু ভাই লক্ষ্মণ অগ্রজের এই সিদ্ধান্তকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। বনবাস যাত্রার বিরুদ্ধে রামের মনকে প্রস্তুত করার জন্য বলেছেন— যে ব্যক্তি অতিশয় কাতর ও দুর্বল সেই ব্যক্তিই দৈবকে অনুসরণ করে। যাঁরা বীর ও সংসারে পুরুষ বলে গণ্য তাঁরা দৈবের অনুসরণ করেন না।

> বিক্লবো ৰীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
> বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্যুপাসতে॥ ২।২৩।১৬

রামের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেছেন— যিনি নিজ পুরুষকার দ্বারা দৈবের প্রভাব মুক্ত হন তিনি দৈবের জন্য কখনো হতাশ হলেও অবসন্ন হন না।

> দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্ৰৰাধিতুম্।
> ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥ ২।২৩।১৭

রামের উদ্দেশে লক্ষ্মণের এই বক্তব্য সংসারে দৈবনির্ভর মানুষের মনে পুরুষকার উদ্ভাবনের সহায়ক। রাম বনযাত্রার পূর্বে সীতাকে অযোধ্যায় রেখে যাবেন মনস্থির করেন। এই সময় রাম সীতাকে নানা উপদেশের সঙ্গে বলেছেন— সীতা, তুমি ভরতের নিকট আমার গুণগান করবে না, কারণ ঐশ্বর্যযুক্ত ব্যক্তি

অপরের গুণগান পছন্দ করেন না।

ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্।
তস্মান্ন তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম॥ ২।২৬।২৫

মানুষের ব্যবহারিক জীবনে রামের এই বক্তব্য একান্তভাবে সত্য।

অযোধ্যাকাণ্ডে শততম সর্গে ভরতের উদ্দেশে কথিত নীতিসমূহ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্লোকসাম্য আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলি উল্লিখিত হয়েছে।

ভরত রামকে অরণ্যযাত্রা থেকে অযোধ্যায় ফিরে আসাব জন্য অনেক অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রামের উদ্দেশে বলেছেন— যাকে সর্বদা নির্ভর ক'রে অপরলোক জীবন ধারণ করে তার জীবনই সার্থক। যে ব্যক্তি পরোপজীবী হয়ে থাকে তার জীবন দুঃখময় ও বৃথা।

সুজীবং নিত্যশস্তস্য যঃ পরৈরুপজীব্যতে।
রাম তেন তু দুর্জীবং যঃ পরানুজীবতি॥ ২।১০৫।৭

খর-নিধনের পূর্বে রাম নিজের জয়লাভের অনুকূলে প্রাকৃতিক নানা ঘটনা দেখে লক্ষ্মণ ও সীতাকে পর্বতগুহায় পাঠানোর জন্য বলেছেন— বিপদের আশঙ্কা হলে শুভাভিলাষী বিজ্ঞপুরুষ বিপদ আগমনের পূর্বেই তার প্রতিকার করতে যত্নবান হবেন।

অনাগতবিধানং তু কর্তব্যং শুভমিচ্ছতা।
আপদং শঙ্কমানেন (আপদাশঙ্কমানেন) পুরুষেণ বিপশ্চিতা॥
৩।২৪।১১

যুদ্ধের পূর্বে আত্মশ্লাঘায় মত্ত খরের উদ্দেশে রাম বলেছেন— যে লোভ বা মোহবশত পরিণামে কী হবে তা না জেনে পাপ কাজ করে করকাভোজিনী (মেঘ বৃষ্টি শিলা ভক্ষণকারিণী) রক্তপুচ্ছিকার (রক্তচোষা সরীসৃপপ্রাণী) মতো তার বিনাশ লোকে আনন্দিত হয়ে দেখে।

লোভাৎ পাপানি কুর্বাণঃ কামাদ্বা যো ন বুধ্যতে।
হৃষ্টঃ পশ্যতি তস্যান্তং ব্রাহ্মণী করকাদিব॥ ৩।২৯।৫

রাবণের উদ্দেশে কথিত শূর্পণখার বাক্যগুলি বাস্তববাদী রাজনীতিবিদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। (৩।৩৩ অধ্যায়)। অন্যত্র রাক্ষসরাজ রাবণ-কর্তৃক অপহৃত হবার সময় সীতা রাবণের উদ্দেশে বলেছেন— নীতিবিরুদ্ধ কাজের সদ্যই ফললাভ করতে দেখা যায় না। যেরূপ শস্যের পরিপক্কতার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সেরূপ কর্মসমুদয়ের ফল নিষ্পত্তি বিষয়েও তার সহকারী কারণ কালের অপেক্ষা করতে হয়।

ন তু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে॥ ৩।৪৯।২৭

রাম সীতার শোকে অতিশয় কাতর হয়ে পড়লে লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশে বলেন— আপনি প্রিয়জনের বিয়োগ দুঃখ মনে করে প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ ত্যাগ করুন, কারণ অধিক শোক সন্তাপের কারণ দেখুন, অধিক স্নেহ তেল-যুক্ত পলতের মতো স্নেহপোষণকারী ব্যক্তি দগ্ধ হয়।

স্মৃত্বা বিয়োগজং দুঃখং ত্যজ স্নেহং প্রিয়েজনে।
অতিস্নেহপরিষ্বঙ্গাদ্ বর্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে॥ ৪।১।১১৬

আবার দেখুন—

প্রয়োজনীয় বস্তু অপহৃত হলে যদি উহা উদ্ধারের জন্য যত্ন না করা হয় তবে কখনোই তা লাভ করা যায় না। অতএব আপনি সুস্থ হয়ে দীনবুদ্ধি ত্যাগ করুন। উৎসাহই পরম বল, তা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট বল নেই। কেননা উৎসাহসম্পন্ন জীবগণের সংসারে কিছুই দুর্লভ হয় না।

স্বাস্থ্যং ভদ্রং ভজস্বার্য ত্যজ্যতাং কৃপণা মতিঃ।
অর্থো হি নষ্টকার্যার্থৈরযত্নেনাধিগম্যতে॥
উৎসাহো বলবানার্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্॥ ৪।১।১২০-১২১

রামের উদ্দেশে কথিত লক্ষ্মণের বাক্যাবলী সংসারে শোকাক্রান্ত মানুষের পক্ষে একান্ত উপযোগী।

মৃত্যুপথযাত্রী বালীর কিছু বক্তব্যের উত্তরে রাম বলেছেন— যিনি ধর্মপথে অবস্থান করেন তিনি, জ্যেষ্ঠ ভাই ও যিনি বিদ্যাদান করেন এই তিনজনকে পিতার ন্যায় মনে করা উচিত এবং পুত্র, কনিষ্ঠ ভাই, এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন শিষ্য এই তিন জনকে পুত্রের মতো বিবেচনা করা উচিত। এ বিষয়ে ধর্মজ্ঞানই কারণ।

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্মে চ পথি বর্তিনঃ॥
যবীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ।
পুত্রবত্তে ত্রয়শ্চিন্ত্যা ধর্মশ্চৈবাত্র কারণম্॥ ৪।১৮।১৩-১৪

আসন্ন মৃত্যু বালী স্বীয় পুত্রকে নানা উপদেশের সঙ্গে বলেছেন— কারও সঙ্গে অতিপ্রণয় বা অপ্রীতিভাব করবে না কারণ উভয়ই দোষের। সেজন্য মধ্যপথ অবলম্বন করবে।

ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্যঃ কর্তব্যোঽপ্রণয়শ্চ তে।
উভয়ং হি মহাদোষং তস্মাদন্তরদৃগ্ ভব॥ ৪।২২।২৩

বালীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পর শোকার্ত সুগ্রীব, অঙ্গদ ও তারাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য রাম বলেছেন— সাধুদর্শী বিবেকী সমস্তই কালের পরিণাম বলে জানেন। সুখ ও দুঃখ এবং ধর্ম, অর্থ, কাম সমস্তই নিজ নিজ কাজ অনুসারে কালে প্রাপ্ত হন।

কিং তু কালপরীণামো দ্রষ্টব্যঃ সাধু পশ্যতা।
ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ কালক্রমসমাহিতাঃ॥ ৪।২৫।৮

সুগ্রীব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বানররাজ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে চলেছে। একদিন রাম পর্বতের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সীতা-বিরহে কাতর হয়ে পড়লে ভাই লক্ষ্মণ তাঁকে বললেন— হে বীর, আপনি বৃথা ব্যথিত হবেন না এবং শোক করাও আপনার উচিত হচ্ছে না কারণ আপনি জানেন যে, পুরুষ শোকে কাতর হলে তার সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে যায়।

অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
শোচতো হ্যবসীদন্তি সর্বথা বিদিতং হি তে॥৩।২৭।৩৪

রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর সীতা-উদ্ধারের কাজে সুগ্রীবের ঔদাসীন্যে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ তার উদ্দেশে বলেন— উপকারীর প্রত্যুৎপকার না করলে মহান ধর্ম লোপ হয়। গুণবান মিত্রের সঙ্গে মিত্রতা বিনষ্ট করলে মহান অর্থ লোপ হয়।

ধর্মলোপো মহাংস্তাবৎ কৃতে হ্যপ্রতিকুর্বতঃ।
অর্থলোপশ্চ মিত্রস্য নাশে গুণবতো মহান্॥ ৪।৩৩।৪৭

এবং যে বন্ধু সত্যধর্মপরায়ণ এবং বন্ধুর কার্যসাধনরূপ শ্রেষ্ঠ গুণে ভূষিত তিনিই প্রকৃত বন্ধু বলে বিবেচিত হন।

মিত্রং হ্যর্থগুণশ্রেষ্ঠং সত্যধর্মপরায়ণম্।
তদ্দ্বয়ং তু পরিত্যক্তং ন তু ধর্মে ব্যবস্থিতম্॥ ৪।৩৩।৪৮

সাগরের বিশালতা দেখে বানর সেনাগণ বিষণ্ণ হয়ে পড়লে বালী-পুত্র অঙ্গদ তাদের আশ্বাসদানের জন্য বলেছেন— হে কপিগণ, বিষাদে অভিভূত হওয়া ঠিক নয়, কারণ বিষাদ অধিকতর দূষণীয় যেরূপ ক্রুদ্ধ বিষধর সাপ শিশুকে নিহত করে সেইরূপ বিষাদও পুরুষকে নিহত করে।

ন বিষাদে মনঃ কার্য্যং বিষাদো দোষবত্তরঃ।
বিষাদো হন্তি পুরুষং বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ॥ ৪।৬৪।৯

বহু অন্বেষণের পর সীতার সন্ধান না পেয়ে চিন্তাগ্রস্ত হনুমান আত্মহননের আশঙ্কা

করে বলেছেন— প্রাণ বিসর্জন করলে বহু দোষ, জীবিত থাকলে কখনো কল্যাণ পাওয়া যেতে পারে সুতরাং আমি প্রাণ ধারণ করব। জীবিত থাকলে কখনো সুখ সম্ভব হতে পারে।

বিনাশে ৰহবো দোষা জীবন্ প্রাপ্নোতি ভদ্রকম্।
তস্মাৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি ধ্রুবো জীবতি সঙ্গমঃ॥ ৫।১৩।৪৭

সংসারে হতাশ ব্যক্তির পক্ষে হনুমানের এই বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্তটি বিশেষ উপযোগী।

হনুমান লঙ্কায় সীতার খোঁজ পাওয়ার পর চিন্তা করলেন প্রধান কাজ সীতার সন্ধান মিলেছে। এখন আনুষঙ্গিক কাজ হিসেবে বিক্রম প্রকাশে কিছু রাক্ষস নিহত করলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে তারা কিছুটা দুর্বল হতে পারে। তিনি আরও ভাবলেন— যিনি অতি যত্নে অল্পমাত্র কাজের সাধকরূপে সিদ্ধিলাভ করেন তিনি সামগ্রিক কাজের সাধক হতে পারেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি অল্পযত্নে প্রধান কাজ সাধনের (আনুষঙ্গিক কর্তব্য) বহুভাবে বিবেচনা করতে সমর্থ হন তিনিই মুখ্য কাজ সম্পাদনে সমর্থ।

ন হ্যেকঃ সাধকো হেতুঃ স্বল্পস্যাপীহ কর্মণঃ।
যো হ্যর্থং ৰহুধা বেদ স সমর্থোঽর্থসাধনে॥ ৫।৪১।৬

রাবণ সীতাকে হরণ করেছেন জেনে কুম্ভকর্ণ তাঁর উদ্দেশে বলেছেন— যে কাজ উচিত উপায় বিনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যে কাজ লোক ও শাস্ত্রের বিপরীত সেই পাপ কাজ অপবিত্র আভিচারিক যজ্ঞে হুত হবিষ্যের ন্যায় দূষিত হয়।

অনুপায়েন কর্মাণি বিপরীতানি যানি চ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রয়তেষ্বিব॥ ৬।১২।৩১

আবার—

যে ব্যক্তি পূর্বের কাজ পরে করতে থাকে এবং পরের কাজ পূর্বেই করতে অভিলাষী হয়, সেই ব্যক্তি নীতি অনীতি জানে না।

যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্যাণি কর্মণ্যভিচিকীর্ষতি।
পূর্বঞ্চাপরকার্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ॥ ৬।১২।৩২

সীতা-হরণ ও রামের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য বিভীষণ রাবণের কাজের নিন্দা করলে রাবণ বিভীষণের উদ্দেশে বলেছেন— শত্রু এবং ক্রুদ্ধ সাপের সঙ্গেও বাস করবে কিন্তু মিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান শত্রুসেবীর সঙ্গে কখনো বাস করবে না।

বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবসেশ্ছত্রুসেবিনা॥ ৬।১৬।২

রাবণের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বিভীষণ রামের আশ্রয় নিতে এলে রাম বিভীষণের সততা প্রসঙ্গে বানরগণকে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করতে বলেন। এই প্রসঙ্গে বিভীষণ সম্পর্কে অঙ্গদের উক্তি— শঠগণ নিজের ভাব গোপন করে বিচরণ করে এবং ছিদ্র পেলেই প্রহার করে, তখন মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়। অর্থ ও অনর্থ বিচার করে ব্যবহার করা কর্তব্য। গুণ দেখলে গ্রহণ দোষ দেখলে ত্যাগ করা কর্তব্য।

ছাদয়িত্বাঽঽত্মভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ।
প্রহরন্তি চ রন্ধ্রেষু সোঽনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ॥
অর্থানর্থৌ বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং ভজেত হ।
গুণতঃ সংগ্রহং কুর্য্যাদ্ দোষতস্তু বিসর্জয়েৎ॥ ৬।১৭।৪০-৪১

কুম্ভকর্ণ রাবণকে বিভীষণ ও মন্দোদরীর পূর্বোক্ত হিতোপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে রাবণ কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে বলেছেন— যা হয়ে গেছে তা তো গেছেই। তার জন্য বার বার শোক করে লাভ কী ? এখন যা কর্তব্য তা চিন্তা করো।

অস্মিন্ কালে তু যদ্ যুক্তং তদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্।
গতন্তু নানুশোচন্তি গতন্তু গতমেব হি॥ ৬।৬৩।২৫

বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিলে বিভীষণের উদ্দেশে ইন্দ্রজিতের উক্তি হল— গুণবান শত্রু এবং নির্গুণ স্বজন হলেও গুণহীন স্বজনই শ্রেষ্ঠ, কারণ যে শত্রু সে চিরদিন শত্রুই থাকে, কখনো আপন হয় না।

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥ ৬।৮৭।১৫

ইন্দ্রজিতের নানা উপদেশমূলক বাক্যের প্রতিবাদস্বরূপ বিভীষণ-কথিত কতকগুলি বক্তব্যের মধ্যে একটি হল— যার শীল স্বভাব ধর্মভ্রষ্ট, পাপ কাজে যার দৃঢ়নিশ্চয়তা আছে, ঐ রকম পুরুষকে ত্যাগ করে প্রত্যেক প্রাণী যেরূপ সুখ লাভ করে, হাত থেকে বিষধর সাপ ত্যাগ করলে সে রকম সুখ পাওয়া যায়।

ধর্মাৎ প্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ম্।
ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা॥ ৬।৮৭।২১

ভরত বানররাজ সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে বলেছেন— মানুষ উপকার দ্বারা বন্ধু এবং অপকার দ্বারা শত্রু হয়।

সৌহৃদাজ্জায়তে মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্॥ ৬।১২৭।৪৭ গ. ঘ

কুবের রাবণের নানা অন্যায় কাজের অনুমোদন করতে না পেরে বলেছেন— পাপের ফল কেবল দুঃখ এবং তা এই জগতে নিজেকেই ভোগ করতে হয়। সেইহেতু যে মূঢ় পাপ করে সে নিজেকেই হত্যা করে থাকে।

কোনো দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরই (শুভকর্মের অনুষ্ঠান ছাড়া) স্বেচ্ছামাত্র সুবুদ্ধি হয় না। সে যেরূপ কাজ করে সেরূপই ফলভোগ করে।

পাপস্য হি ফলং দুঃখং তদ্ ভোক্তব্যমিহাত্মনা।
তস্মাদাত্মপঘাতার্থং মূঢ়ঃ পাপং করিষ্যতি॥
কস্যচিন্ন হি দুর্বুদ্ধেশ্ছন্দতো জায়তে মতিঃ।
যাদৃশং কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে॥ ৭।১৫।২৫

উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত একাধিক উপাখ্যানে বাস্তব জীবনের অনেক সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। উল্লিখিত প্রতিটি মন্তব্যই মানুষের ব্যবহারিক জীবনেরই অভিজ্ঞতালব্ধ ফল বলা যেতে পারে।

'মহাভারতের নীতি' একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এতে বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি প্রাচীন তথা কণিক, বিদুর প্রভৃতির নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক মত বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে প্রাচীনতর নানা নীতির একত্র সংকলন করেছেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে বললেন— বিদুর, আমি তোমার ধর্মসংগত ও অত্যন্ত মঙ্গলকর বাক্য শুনতে চাই। কারণ রাজর্ষি বংশের মধ্যে একমাত্র তুমিই প্রাজ্ঞ বলে সকলের বিশ্বাস।

শ্রোতুমিচ্ছামি তে ধর্ম্ম্যং পরং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
অস্মিন্ রাজর্ষিবংশে হি ত্বমেকঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ॥ ৫।৩৩।১৫

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে বিদুর তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ এবং অধীত সিদ্ধান্তগুলি একের পর এক ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে নিবেদন করলেন— পণ্ডিত ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বিদুর বলেন— প্রশস্ত কাজ করা, নিন্দিত কাজ না করা, নাস্তিক না হওয়া এবং শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস রাখা— এই কয়টি পণ্ডিতের লক্ষণ।

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্ধধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্॥ ৫।৩৩।১৬

ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, ঔদ্ধত্য ও অহংকার যাঁকে কর্তব্যভ্রষ্ট না করে তাঁকেই পণ্ডিত বলে।

ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীঃ স্তম্ভো মান্যমানিতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥ ৫।৩৩।১৭

শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, আসক্তি, সম্পদ ও বিপদ যাঁর কর্তব্যের বিঘ্ন না করে তাঁকেই পণ্ডিত বলে।

যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥ ৫।৩৩।১৯

যাঁরা সর্ববিষয়গামিনী বুদ্ধি, ধর্ম ও অর্থের অনুসরণ করেন এবং যিনি কাম ত্যাগ করে অর্থ গ্রহণ করেন তিনিই পণ্ডিত।

যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্মার্থাবনুবর্ততে।
কামাদর্থং বৃণীতে যঃ স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥ ৫।৩৩।২০

পণ্ডিত লোকেরা আপন শক্তি অনুসারে কাজ করার ইচ্ছা করেন এবং আপন শক্তি অনুসারেই কাজ করেন, অবজ্ঞা করে কোনো বস্তুই ত্যাগ করেন না।

যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথাশক্তি চ কুর্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ ৫।৩৩।২১

তাড়াতাড়ি বোঝা, বেশি সময় ধরে শোনা, ভালোভাবে বুঝে কাজ আরম্ভ করা; কিন্তু ইচ্ছামাত্রেই নয় এবং কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞাসা না করলে পরের বিষয়ে বাক্যব্যয় না করা— এই কয়টি পণ্ডিতের লক্ষণ।

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাসম্পৃষ্টো ব্যুপযুঙ্‌ক্তে পরার্থে তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য॥
৫।৩৩।২২

যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা অপ্রাপ্য বস্তু পেতে ইচ্ছা করেন না, বিনষ্ট বস্তুর জন্যও শোক করেন না এবং বিপদে অধীর হন না।

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ ৫।৩৩।২৩

হে মহারাজ, পণ্ডিতেরা সৎ কাজে প্রবৃত্ত হন, উন্নতিজনক কাজ করেন এবং হিতকারীর উপরে দোষারোপ করেন না।

আর্যকর্মণি রজ্যন্তে ভূতিকর্মাণি কুর্বতে।
হিতঞ্চ নাভ্যসূয়ন্তি পণ্ডিতা ভরতর্ষভ॥ ৫।৩৩।২৫

যিনি নিজের সম্মানে আনন্দিত হন না, অপমানেও সন্তাপ করেন না, কিন্তু সর্বদাই, গঙ্গার হ্রদের ন্যায় অবিচলিত থাকেন তাঁকেই পণ্ডিত বলে।

ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তৃপ্যতে।
গাঙ্গো হ্রদ ইবাক্ষোভ্যো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥ ৫।৩৩।২৬

যিনি প্রচুর ধন, বিশিষ্ট বিদ্যা ও গুরুতর প্রভুত্ব লাভ করেও অনুদ্ধত অবস্থায় বিচরণ করেন তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়।

অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ।
বিচরত্যসমুন্নদ্ধো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥ ৫।৩৪।৩৬

বিদুরের পণ্ডিতের সম্পর্কে যে-সকল গুণাবলীর কথা, তার সঙ্গে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ মিলে যায়। মূর্খ ব্যক্তিগণের প্রসঙ্গে বিদুরের বক্তব্য হল—যে লোক নিজের কাজ ফেলে অপরের কাজ করে এবং বন্ধুর জন্য যে মিথ্যা কথা বলে তাকে মূর্খ বলে।

স্বমর্থং যঃ পরিত্যজ্য পরার্থমনুতিষ্ঠতি।
মিথ্যা চরতি মিত্রার্থে যশ্চ মূঢ়ঃ স উচ্যতে॥ ৫।৩৩।৩১

যে লোক অলভ্য লাভ করতে চায়, ভক্ত লোকদিগকে ত্যাগ করে এবং বলবানের উপরে বিদ্বেষী হয় তাকে মূর্খ বলে।

অকামান্ কাময়তি যঃ কাময়ানান্ পরিত্যজেৎ।
ৰলবন্তঞ্চ যো দ্বেষ্টি তমাহুর্মূঢ়চেতসম্॥ ৫।৩৩।৩২

নরাধম মূর্খলোকেরাই অনাহূত অবস্থায় প্রবেশ করে, জিজ্ঞাসা না করলেও বহু কথা বলে এবং অবিশ্বস্ত লোকের উপর বিশ্বাস করে।

অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো ৰহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ॥ ৫।৩৩।৩৬

যে লোক নিজে দোষী হয়েও সেই দোষের জন্য পরের নিন্দা করে এবং প্রভু না হয়েও পরের উপরে ক্রুদ্ধ হয় সে লোক অতি মূর্খ।

পরং ক্ষিপতি দোষেণ বর্তমানঃ স্বয়ং তথা।
যশ্চ ক্রুধ্যত্যনীশানঃ স চ মূঢ়তমো নরঃ॥ ৫।৩৩।৩৭

যে নিজের বল না বুঝে আলস্যহেতু ধর্ম ও অর্থশূন্য অলভ্য বস্তু লাভ করার ইচ্ছা করে তাকে এই সংসারে মূর্খ বলা হয়।

আত্মনো ৰলমজ্ঞায় ধর্মার্থপরিবর্জিতম্।
অলভ্যমিচ্ছন্ নৈষ্কর্ম্যান্মূঢ়বুদ্ধিরিহোচ্যতে॥৫।৩৩।৩৮

মূর্খ লোকদিগের প্রকৃতি বলে বিদুর মূল বক্তব্যে অবতীর্ণ হলেন—
কোনো ব্যক্তিকে কটুবাক্য না বলা এবং দুর্জনের সেবা না করা, এই দুটি কাজ করতে করতে মানুষ সংসারে সকলের প্রিয় হয়।

দ্বে কর্মণী নরঃ কুর্ব্বন্নস্মিঁল্লোকে বিরোচতে।
অব্রুবন্ পরুষং কিঞ্চিদসতোঽনর্চয়ংস্তথা॥ ৫।৩৩।৫৪

যে লোক পূর্বে সেবা করত, বর্তমানেও সেবা করছে এবং যে লোক বলে 'আমি আপনার অধীন হলাম'— এই তিনজন শরণাগত ব্যক্তিকে নিজের বিপদের সময়ও ত্যাগ করবে না।

ভক্তঞ্চ ভজমানঞ্চ তবাস্মীতি চ বাদিনম্।
ত্রীনেতাংশ্ছরণং প্রাপ্তান্ বিষমেঽপি ন সন্তজেৎ॥ ৫।৩৩।৬৮

নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা— এই ছয়টি দোষ উন্নতিকামী লোক ত্যাগ করবে।

ষড়্দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥ ৫।৩৩।৭৮

সত্য, দান, অনালস্য, অনসূয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য এই ছয়টি গুণকে মানুষ কখনো ত্যাগ করবে না।

ষড়েব তু গুণাঃ পুংসা ন হাতব্যাঃ কদাচন।
সত্যং দানমনালস্যমনসূয়া ক্ষমা ধৃতিঃ॥ ৫।৩৩।৮১

গোরু, সেবা, কৃষি, ভার্যা, বিদ্যা ও শূদ্র সম্পর্ক— এই ছয়টি মুহূর্তকাল পর্যবেক্ষণ না করলেই বিনষ্ট হয়।

ষড়িমানি বিনশ্যন্তি মুহূর্তমনবেক্ষণাৎ।
গাবঃ সেবা কৃষির্ভার্যা বিদ্যা বৃষলসঙ্গতি॥ ৫।৩৩।৮৬

জরা রূপকে, আশা ধৈর্যকে, মৃত্যু প্রাণকে, অসূয়া ধর্মাচরণকে ক্রোধ সম্পত্তিকে, নীচ সেবা স্বভাবকে, কাম লজ্জাকে এবং অভিমান সকল গুণকে নষ্ট করে।

জরা রূপং হরতি হি ধৈর্য্যমাশা মৃত্যুঃ প্রাণান্ ধর্মচর্যামসূয়া।
ক্রোধঃ শ্রিয়ং শীলমনার্যসেবা হ্রিয়ং কামঃ সর্ব্বমেবাভিমানঃ॥
৫।৩৫।৫০ এবং ৩৭।৮

ক্রোধীর ধন হয় না, নৃশংসের বন্ধু হয় না, ক্রূরের স্ত্রী হয় না, ভোগীর বিদ্যা জন্মে না, কামীর লজ্জা থাকে না, অলসের সম্পত্তি হয় না এবং অব্যবস্থিত-চিত্তের এ সমস্তই হয় না।

ন ক্রোধিনোঽর্থো ন নৃশংসস্য মিত্রং ক্রূরস্য ন স্ত্রী সুখিনো ন বিদ্যা।
ন কামিনো হ্রীরলসস্য ন শ্রীঃ সর্ব্বন্তু ন স্যাদনবস্থিতস্য॥
(বিশ্ববাণী সং) ৫।৩৫।৫৩

যিনি বীর, যিনি কৃতবিদ্য এবং যিনি পালন করতে জানেন এই তিন প্রকার পুরুষই পৃথিবীরূপ লতার ধনরূপ পুষ্প চয়ন করতে পারেন।

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥ ৫।৩৫।৭৪

ধন থাকুক বা না থাকুক, বন্ধুদের সম্মান করবেই। কারণ বন্ধুদের সম্মান না করলে তাদের সারবত্তা বা অসারতা জানা যায় না।

অর্চয়েদেব মিত্রাণি সতি বাসতি বা ধনে।
নানার্থয়ন্ প্রজানাতি মিত্রাণাং সারফল্গুতাম্॥ ৫।৩৬।৪৩

শোকদ্বারা অভীষ্টবস্তু পাওয়া যায় না, শরীরও ক্ষীণ হতে থাকে এবং শত্রুরাও আনন্দিত হয়, শোকে কখনো মন দেওয়া উচিত নয়।

অনবাপ্যঞ্চ শোকেন শরীরংচোপতপ্যতে।
অমিত্রাশ্চ প্রহৃষ্যন্তি মাস্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ॥ ৫।৩৬।৪৫

এ প্রসঙ্গে আমাদের পূর্বোক্ত রামায়ণে সীতা-বিরহে কাতর রামের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণের দেয় উপদেশগুলির কথা মনে পড়ে। কুল রক্ষার জন্য একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রাম রক্ষার জন্য কুল ত্যাগ করবে, দেশ রক্ষার জন্য গ্রাম ত্যাগ করবে এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীই ত্যাগ করবে। আবার— আপদ নিবৃত্তির জন্য ধন রক্ষা করবে, ধন দ্বারাও ভার্যা রক্ষা করবে এবং ধন ও ভার্যা— উভয় দ্বারাই সর্বদা নিজের জীবন রক্ষা করবে।

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥
আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥ ৫।৩৭।১৭-১৮

আবার স্ত্রীপর্বে শতপুত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে বিদুর তাঁকে নানা সান্ত্বনা বাক্যের সঙ্গে বলেছেন— দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখনাশের প্রকৃত ঔষধ। নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করলে তা কখনো লোপ পায় না, কিন্তু বর্ধিত হতে থাকে।

ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ॥
চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ধতে। ২।২৭ গ. ঘ—২৮ ক. খ

উদ্‌যোগ পর্বের বেশ-কিছু স্থান ও স্ত্রী পর্বের একাধিক স্থান অধিকার করে আছে বাস্তবজীবন সম্বন্ধে বিদুরের অভিজ্ঞতা প্রসূত অসংখ্য বাক্য। অজ্ঞ দুর্বিনীত পুত্রগণ ও ছলপরায়ণ শকুনির কুপরামর্শে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সর্বদাই ভুল পথে

চালিত হয়েছেন। পাণ্ডব ও কৌরবকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান বিদুর তাই ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে অগণিত বাস্তবানুগ উপদেশ দান করার সময় বলেছেন— রাজা, আপনার মূর্খ দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির প্রতি আস্থা রাখা বৃথা। কারণ বুদ্ধিসাধ্য কাজই প্রধান।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানস্নেহাতুর হৃদয়ে বিদুরের কোনো উপদেশই ফলপ্রদ হয় নি। রাজা অকপটে বিদুরের সকল বক্তব্যই অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সন্তানস্নেহে তিনি নিজেকে দৈবের হাতে সমর্পণ করেছেন। প্রজ্ঞা ও ধৈর্য মিশ্রিত মানুষের কর্ম যে দৈবকেও কিছুটা হীনবল করে দিতে পারে পুত্র স্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তা বুঝলেও জীবনে কখনও প্রয়োগ করতে পারেন নি এটিই তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় ট্রাজেডি।

বিদুরের পরই আসে প্রজ্ঞাবান পিতামহ ভীষ্মের কথা। যুদ্ধে অর্জুন-নিক্ষিপ্ত বাণে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান, যোদ্ধশ্রেষ্ঠ আসন্ন মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ দূতের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি শরশয্যাশায়ী পিতামহ ভীষ্মের নিকট যাবার জন্য প্রস্তুত। দূতমুখে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ শোনামাত্র ভাইদের সঙ্গে নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন কৃষ্ণ-সমীপে। রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে উপস্থিত হলেন মহাপুরুষের শয্যাপার্শ্বে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নানা ধর্মার্থযুক্ত বাক্য বলতে আরম্ভ করলেন। রচিত হল মহাভারত মহাকাব্যের উৎকৃষ্টতম অংশ শান্তিপর্ব। মৃত্যুপথযাত্রী পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস। মানবজীবনে উপলব্ধ তত্ত্বসমূহ একত্রিত হল শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তায়। সারা সংসার পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে পেল একটি দুর্লভ ও প্রয়োজনীয় দলিল। যার প্রতিটি পাতায় মানবজীবন থেকে আহৃত অনুভূতিগুলিকেই মূর্ত হতে দেখা যায়। মানবের অন্তরে যত প্রকার প্রশ্ন থাকতে পারে তার প্রায় সবই যেন যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় এসেছে। পিতামহ ভীষ্ম নির্বিকার চিত্তে একটির পর একটি প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। প্রয়োজনবোধে প্রাচীন উপাখ্যানের অবতারণা করে তাঁর বক্তব্যবিষয়কে দৃঢ় করেছেন। যুধিষ্ঠির যেন নিখিল মানব সংসারের উপযুক্ত প্রতিনিধি হয়ে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। পিতামহ ভীষ্মের জ্ঞানভাণ্ডারও উন্মুক্ত ছিল শ্রদ্ধাশীল যুধিষ্ঠিরের জন্য। যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন— কীরূপ ব্যবহার করলে ইহলোক ও পরলোকে অনায়াসে সুখলাভ করা সম্ভব হয়। পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—রাগদ্বেষহীন হয়ে ধর্মানুষ্ঠান, লোভশূন্য হয়ে লোকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ, নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে অর্থোপার্জন, ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে কামনা

সিদ্ধি, নির্ভীকভাবে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, আত্মশ্লাঘা না করে বীরত্ব প্রকাশ, সৎপাত্র দেখে দান ও অনৃশংস হয়ে অহংকার প্রকাশ করবে।

চরেদ্‌ ধর্মানকটুকো মুঞ্চেৎ স্নেহং ন চাস্তিকঃ।
অনৃশংসশ্চরেদর্থং চরেৎ কামমনুদ্ধতঃ॥
প্রিয়ং ব্রুয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্যাদবিকত্থনঃ।
দাতা নাপাত্রবর্ষী স্যাৎ প্রগল্ভঃ স্যাদনিষ্ঠুর॥ ১২।৭০।৩-৪

অজ্ঞব্যক্তিকে প্রহার, শত্রুবিনাশ করে অনুতাপ, অকস্মাৎ ক্রোধ প্রকাশ এবং অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা কখনো উচিত নয়।

প্রহরেন্ন ত্ববিজ্ঞায় হত্বা শত্রূন্‌ ন শোচয়েৎ।
ক্রোধং কুর্যান্ন চাকস্মান্মৃদুঃ স্যান্নাপকারিষু॥ ১২।৭০।১১

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো শত্রুর সঙ্গ ত্যাগ করবেন না। সহসা শত্রুকে আক্রমণ না করে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনাশের চেষ্টা করাই তাঁর কর্তব্য।

ন ত্বেবং খলু সংসর্গং রোচয়েদরিভিঃ সহ॥
দীর্ঘকালমপীক্ষেত নিহন্যাদেব শাত্রবান্‌॥
১২।১০৩।১৭ গ.ঘ.—১৮ ক.খ

দুঃখের সময় দুঃখিত হওয়া এবং আনন্দের সময় আনন্দিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ, এর বিপরীত আচরণ শত্রুতার চিহ্ন।

আর্তিরার্তে প্রিয়ে প্রীতিরেতাবন্মিত্রলক্ষণম্‌।
বিপরীতং তু বোদ্ধব্যমরিলক্ষণমেব তৎ॥ ১২।১০৩।৫০

নানা গুণসম্পন্ন একমতালম্বী বীরগণ সমাজে ধর্ম ব্যবহার স্থাপন, সকলের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভাইদের শাসন, বিনয়ীদের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো, চর প্রয়োগ, মন্ত্রণা ও কোষপূরণ ব্যাপারে বিশেষ যত্ন এবং কার্যকালে পুরুষকার ও উৎসাহ সম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করলে শীঘ্র পরিবর্ধিত হতে পারেন।

ধর্মিষ্ঠান্‌ ব্যবহারাংশ্চ স্থাপয়ন্তশ্চ শাস্ত্রতঃ।
যথাবৎ প্রতিপশ্যন্তো বিবর্ধন্তে গণোত্তমাঃ॥
পুত্রান্‌ ভ্রাতৄন্‌ নিগৃহ্নন্তো বিনয়ন্তশ্চ তান্‌ সদা।
বিনীতাংশ্চ প্রগৃহ্নন্তো বিবর্ধন্তে গণোত্তমাঃ॥
চারমন্ত্রবিধানেষু কোশসংনিচয়েষু চ।
নিত্যযুক্তা মহাবাহো বর্ধন্তে সর্বতো গণাঃ॥
প্রাজ্ঞাঞ্শূরান্‌ মহোৎসাহান্‌ কর্মসু স্থিরপৌরুষান্‌।
মানয়ন্তঃ সদা যুক্তা বিবর্ধন্তে গণা নৃপ॥ ১২।১০৭।১৭-২০

গণতন্ত্রের কীভাবে শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে এখানে ভীষ্ম তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

যে যেরূপ ব্যবহার করবে তার সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করাই কর্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী তার সঙ্গে শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু তার সঙ্গে সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসংগত।

যস্মিন্ যথা বর্ততে যো মনুষ্য
স্তস্মিংস্তথা বর্তিতব্যং স ধর্মঃ।
মায়াচারো মায়য়া বাধিতব্যঃ
সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ॥১২।১০৯।৩০

ধৈর্য, দক্ষতা, লোভাদি সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীরের পটুতা, গাম্ভীর্য, শৌর্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্যবেক্ষণ এই আটটি অল্প বা বহু অর্থলাভের কারণ।

ধৃতির্দাক্ষ্যং সংযমো বুদ্ধিরাত্মা
ধৈর্যং শৌর্যং দেশকালাপ্রমাদঃ।
অল্পস্য বা বহুনো বা বিবৃদ্ধৌ
ধনস্যৈতান্যষ্ট সমিন্ধনানি॥১২।১২০।৩৭

বিদ্যা, তপস্যা ও প্রভূত অর্থ প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য কাজ উদ্‌যোগ দ্বারাই লাভ করা যায়। অতএব অধ্যবসায়ই সর্বোৎকৃষ্ট।

বিদ্যা তপো বা বিপুলং ধনং বা
সর্বংহ্যেতদ্ ব্যবসায়েন শক্যম্।
বুদ্ধ্যায়ত্তং তন্নিবসেদ্ দেহবৎসু
তস্মাদ্ বিদ্যাদ্ ব্যবসায়ং প্রভূতম॥১২।১২০।৪৫

অন্যত্র পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন— ধর্মরাজ, যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা ক'রে কাজ করে তাকে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোনো কাজ উপস্থিত হলে নিজের বুদ্ধিবলে সঙ্গে সঙ্গে তার সমাধা করতে পারে তাকে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোনো কাজ উপস্থিত হলে সেটি সমাধানে সত্বর না হয়ে আজ নয় কাল হবে ভেবে আলস্যে কালক্ষেপ করে তাকে দীর্ঘসূত্রী বলা হয়। সংসারে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিই সুখলাভ করতে পারে কিন্তু দীর্ঘসূত্রীকে শীঘ্রই বিনষ্ট হতে হয়। পিতামহ এ-বিষয়ে শকুল-মৎস্য বৃত্তান্ত নামে একটি উপাখ্যানও যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে (১২।১৩৭) বিবৃত করেন। পরবর্তী নীতিগ্রন্থাদিতেও এই উপাখ্যানের সন্ধান মেলে।

অন্যত্র যুধিষ্ঠির যখন পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন— পিতামহ, রাজ্যের প্রজাগণ যখন বিনষ্টপ্রায় ও শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন রাজার কর্তব্য কী ?

মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে 'ভরদ্বাজ-শত্রুঞ্জয় সংবাদ' নামক প্রাচীন উপাখ্যানের অবতারণা করে বললেন— শত্রুগণ নিজেদের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কেবল পরছিদ্রের অনুসন্ধান করে। অতএব কচ্ছপের মতো নিজের অঙ্গগোপন এবং নিজ ছিদ্র ঢাকায় যত্নবান্ হওয়া, সিংহের মতো বিক্রম প্রকাশ, বৃকের মতো প্রচ্ছন্নভাবে থাকা এবং বাণের মতো শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত।

নাত্মচ্ছিদ্রংরিপুর্বিদ্যাদ্ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ॥
বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শরবচ্চ বিনিষ্পতেৎ॥ ১২।১৪০।২৪-২৫

আবার চিরকারীর প্রশংসা করে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বলেছেন— মিত্রবধ ও কাজ ত্যাগ বিশেষ বিবেচনা করে করা উচিত। অনেকদিন বিবেচনার পর যে বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয় তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপ কাজ দীর্ঘকাল বিবেচনা করে করাই উচিত।

চিরেণ মিত্রং বধ্নীয়াচ্চিরেণ চ কৃতং ত্যজেৎ।
চিরেণ হি কৃতং মিত্রং চিরং ধারণমর্হতি॥
রাগে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে পাপে চ কর্মণি।
অপ্রিয়ে চৈব কর্তব্যে চিরকারী প্রশস্যতে॥ ১২।২৬৬।৬৯-৭০

শ্রেয়োলাভ প্রসঙ্গে পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন— উন্নতিকামী ব্যক্তির শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সেবনে অনুরাগ, রাত্রিকালে বিচরণ, দিবানিদ্রা, আলস্য, শঠতা ও অহংকার ত্যাগ করা কর্তব্য।

শব্দরূপরসস্পর্শান্ সহ গন্ধেন কেবলান্।
নাত্যর্থমুপসেবেত শ্রেয়সোঽর্থী কথঞ্চন॥
নক্তচর্যাং দিবাস্বপ্নমালস্যং পৈশুনং মদম্।
অতিযোগমযোগং চ শ্রেয়সোঽর্থী পরিত্যজেৎ॥
১২।২৮৭।২৩-২৪

সমগ্র মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মের অসংখ্য উপাদেশাবলীর মধ্যে এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণরূপে গৃহীত হল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে পিতামহের সকল উপদেশ বা শিক্ষাই রাজার উদ্দেশ্যে। মহাভারতের সমাজ ছিল রাজতান্ত্রিক। তাই রাজার দক্ষতার উপরই নির্ভর করত জনগণের সুখ সমৃদ্ধি। আবার রাজাকেও সিংহাসন বজায় রাখার জন্য গ্রহণ করতে হত উপযুক্ত ব্যবস্থা। পিতামহ ভীষ্মের উপদেশ রাজা এবং প্রজা উভয়েরই স্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত। রাজা শরীরস্থ রিপু দমন করে কীভাবে নিজেকে চালনা করবেন আবার রাজ্যান্তর্গত ও বহির্দেশস্থ শত্রুদের কীভাবে দমন করবেন তার নির্দেশ মেলে এই সকল উপদেশে। রাজধর্মের প্রকৃতি বা কার্যপদ্ধতি যুগ যুগ ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে বহু দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাসনের অধিকার একজনের হাত থেকে এসেছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের হাতে। দেশের সমস্যাও আজ মহাভারত যুগের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। তবু দেশ শাসনের ক্ষেত্রে রাজা বা গণতান্ত্রিক দেশের শাসকমণ্ডলীর নিকট পিতামহ ভীষ্মের উপদেশগুলির প্রয়োজনীয়তা আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। রাজধর্মের সম্যক্ বিকাশে এগুলির প্রয়োজনীয়তা সর্বকালের।

আবার যেহেতু তাঁর উপদেশগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সাফল্যের মন্ত্র নিহিত সেহেতু সাধারণ মানুষের নিকটও এগুলি আদরণীয়। একজন রাজাকে আদর্শ হতে হলে তাঁকে প্রথমে হতে হবে আদর্শ মানুষ। উপদেশগুলিতে এই সত্যই বিঘোষিত। তাই সেগুলি যেমন একজন মানুষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তেমনি রাজার পক্ষেও। আর তা শুধুমাত্র মহাভারতের যুগেই নয়, সকল যুগের সকল সমাজেই।

এর ঠিক উল্টো হল কণিকনীতি। এটি কূটনীতিরই নামান্তর। পাণ্ডবদের সার্বত্রিক উন্নতিতে ঈর্ষালু ধৃতরাষ্ট্র নিজ মন্ত্রী কণিকের নিকট পরামর্শ চাইলে কণিক তাঁকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। —

কোনো কাজ আরম্ভ করে নিঃশেষে তার সমাধা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। কারণ ভালোভাবে তুলে ফেলা হয়নি এমন সামান্য কাঁটাও ব্রণের কারণ হয়ে ওঠে। অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আপৎকালে সংশয়শূন্য চিত্তে যুদ্ধবিক্রম অথবা পলায়ন যা আপনার পক্ষে ভালো হয় তাই করবেন।

নাসম্যক্‌কৃতকারী স্যাদুপক্রম্য কদাচন।
কণ্টকোহ্যপি দুশ্ছিন্ন আস্রাবং জনয়েচ্চিরম্॥
বধমেব প্রশংসন্তি শত্রূণামপকারিণাম্।
সুবিদীর্ণং সুবিক্রান্তং সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্॥ ১।১৩৯।১০

যতক্ষণ পর্যন্ত সময় না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুকে কাঁধে বহন করবেন। তার পর সময় এলে মাটির তৈরি ঘটকে যেমন পাথরের উপর ফেলে চূর্ণ করা যায় সেরূপ অপকারী শত্রুকে বিনাশ করবেন।

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ কালস্য পর্যয়ঃ।
ততঃ প্রত্যাগতে কালে ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবাশ্মনি।
১।১৩৯।২১ গ. ঘ ২২ ক. খ.

হৃদয়ে ক্ষুরধার রেখেও সর্বদা হাসিমুখে ও মিষ্টিবাক্যে বিনীতভাবে সম্ভাষণ করবেন। কিন্তু কখনো ভয়াবহ কাজ করবেন না।

বাচা ভৃশং বিনীতঃ স্যাদ্ধৃদয়েন তথা ক্ষুরঃ।
স্মিতপূর্বাভিভাষী স্যাৎ সৃষ্টো রৌদ্রায় কর্মণে॥ ১।১৩৯।৬৬

যতক্ষণ না ভয় উপস্থিত হয় ততক্ষণ ভয়কে ভয় করবেন কিন্তু ভয় উপস্থিত হলে স্থিরচিত্তে প্রতিকার করার চেষ্টা করবেন।

ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবদ্ ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্তব্যমভীতবৎ॥ ১।১৩৯।৮২

অনাগত কাজকে নিকটেই বিবেচনা করে বুদ্ধিবলে তার অনুসরণ করবেন কিন্তু বুদ্ধিনাশ করে নিজের উদ্দেশ্য সাধনকে কখনো উপেক্ষা বা অনাদর করা উচিত নয়।

অনাগতং হি বুধ্যেত যচ্চ কার্যং পুরঃ স্থিতম্।
ন তু বুদ্ধিক্ষয়াৎ কিঞ্চিদতিক্রামেৎ প্রয়োজনম্॥ ১।১৩৯।৮৪

কণিকের উপদেশগুলির মধ্যে এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে কণিকের দেওয়া উপরোক্ত উপদেশগুলি নিঃসন্দেহে বাস্তবধর্মী। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর বাস্তববাদী মানুষ সচরাচর এই-সকল নীতি প্রায়ই অনুসরণ করে। তবে বিদুর নীতির ন্যায় কণিক নীতিকে আমরা উন্নত মানেব বলতে পারি না। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নীচ রাজনীতিই শিক্ষা দিয়েছেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে যে-সব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যেও কোথাও কোথাও কণিকনীতির অনুরূপ কথা এসেছে। সরল স্বভাব যুধিষ্ঠির তা শুনে রাজনীতিতেই শ্রদ্ধা হারিয়ে বসেন। ভীষ্মদেবের এ সম্পর্কে বক্তব্য হল সুনীতি ও দুর্নীতি উভয়ই জানা দরকার। জীবনে সুনীতির অনুসরণ এবং পরপ্রযুক্ত দুর্নীতির প্রতিরোধের জন্য তার স্বরূপ জানতে দোষ নেই।

(ঘ) ভারতীয় জনজীবনে উভয় মহাকাব্যের চরিত্রগুলির প্রভাব

আদি কবি বাল্মীকি ভারতবর্ষীয় হিন্দুর যৌথ পরিবারের ছবিটিই তাঁর মহাকাব্যে চিত্রিত করেছেন। গৃহাশ্রম ধর্মের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনাই এটিতে ধ্বনিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন—"গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।"[১০] মহাকাব্যকারের লেখনীতে ভারতবর্ষীয় যৌথ পরিবারের এমন কতকগুলি আদর্শ চরিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে যাঁদের প্রেরণায় গড়ে উঠতে পারে পরিবারের শান্তির সৌধ। তুচ্ছতা নীচতার গণ্ডি পেরিয়ে ত্যাগের মহিমায় উন্নীত হতে পারে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি। মানুষ তার সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলনে কতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারে তার উদাহরণ মেলে এই মহাকাব্যে।[১১] এখানে বাল্মীকির কবি-প্রতিভায় ধরা পড়েছে ভারতীয় হিন্দুর আন্তর ও শাশ্বত আকৃতি। যুগ যুগ ধরে সংবেদনশীল হিন্দু মন যা চেয়েছে তা পূর্ণমাত্রায় পেয়েছে বাল্মীকির সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমান প্রভৃতির কাছে। রাম-কাহিনীর জন্মকাল থেকেই এই-সকল চরিত্রের প্রভাবে ভারতীয় জনজীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমানেও ভারতবর্ষের মানুষ রামায়ণ মহাকাব্যের চরিত্রগুলির ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, ভালোবাসা ও বীরত্বের আদর্শে আপন পরিবারের ব্যক্তিদিগকে গড়তে চায়।

রাম : রামায়ণ মহাকাব্যের যে চরিত্রটি ভারতবাসীকে সর্বাপেক্ষা বেশি আকৃষ্ট করে তা হল দশরথ-পুত্র রাম চরিত্র। বাল্মীকি-চিত্রিত রামায়ণের আদর্শ পুরুষ রাম। মহর্ষি নারদ বাল্মীকিকে এই আদর্শ পুরুষেরই চরিত্র বর্ণনা করতে বলেন। মহাকবি যে গুণগুলি একটি মানুষের মধ্যে চেয়েছিলেন তা সবই রামের মধ্যে ছিল।

দেবর্ষি নারদ রাম সম্পর্কে মহাকবি বাল্মীকিকে বলেছেন—

> বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।
> মুনে বক্ষ্যামহং বুদ্ধ্বা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ॥

---

১০ ভূমিকা, 'রামায়ণী কথা'।

১১. 'রামায়ণে ভারতবর্ষের যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অনবদ্য। মানুষের স্নেহ প্রেম, বিরহ-মিলন, স্বার্থ প্রবণতা ও পরার্থে আত্মত্যাগ প্রভৃতি কাব্যখানিতে উজ্জ্বল অক্ষরে বিধৃত এবং বিচিত্র কাব্যরসে জারিত। মানবিকতার গুণেই কাব্যখানি ভারতের চিত্তভূমিতে চিরদিনের জন্য স্থান পাইয়াছে।'

—ভূমিকা, 'রামায়ণের চরিতাবলী'।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। ১।১।৭-৮ ক. খ

বাল্মীকি-বর্ণিত রাম মানুষ। যদিও রাক্ষসকুলের ধ্বংসের জন্য স্বয়ং বিষ্ণুই রামরূপে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সমগ্র রামায়ণে রামের সমস্যাবহুল জীবনের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে তাঁর চরিত্রে ধৈর্য, বীরত্ব, পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, তিতিক্ষা, উদারতা, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সৎগুণের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

তিনি আদর্শ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর বিচারে পিতা সর্বদাই পিতার আসনে অধিষ্ঠিত। পুত্রের নিকট সর্বদাই তিনি শ্রদ্ধেয়। তাঁর আদেশ সর্বদাই শিরোধার্য তা যতই কঠোর বা অবিবেচনা-প্রসূতই হোক-না-কেন। রাজ্য তাঁর কাছে তুচ্ছ। পিতার সত্যরক্ষা হয় না যদি তিনি রাজসিংহাসনে বসেন। বিমাতা কৈকেয়ীর কাছে পিতাকে ছোটো হতে হয়। সত্য এখানে সত্যই। বিমাতা কৈকেয়ীর ইচ্ছা অসংগত কি না অথবা পিতা দশরথের প্রতিজ্ঞা ঠিক হয়েছে কি না তা রামের বিচার্য নয়। তিনি রাজ্য ছেড়ে বনে গেলে পিতার প্রতিশ্রুতির অমর্যাদা হবে না, পিতৃবাক্য সত্যের মর্যাদা পাবে এটাই রামের কাছে বড়ো কথা। রাজ্যত্যাগ বা বনবাস পিতার সত্যরক্ষার বিচারে অনেক হেয়।

তিনি পিতার উদ্দেশ্যে বলেছেন— 'মহারাজ আপনাকে মিথ্যাবাদী সাজিয়ে আমি কোনো কাম্যবস্তু প্রার্থনা করি না। এই অখণ্ড রাজ্য চাই না। এই পৃথিবী চাই না। এমনকী প্রিয়তমা জানকীকেও চাই না। আমি মনে প্রাণে কামনা করি আপনার প্রতিজ্ঞা সফল হোক।' ২।৩৪।৫৭-৫৮

শোকাকুলা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দেবার সময় সুমিত্রা বলেছেন— 'রাম যেহেতু আপনার পুত্র তাই আপনার শোক করা উচিত নয়, এখন সংসারে রামের মতো সৎপথাবলম্বী ব্যক্তি আর কেউ নেই।'

ন হি রামাৎ পরো লোকে বিদ্যতে সৎপথে স্থিতঃ। ২।৪৪।২৬ গ. ঘ

জীবনে আনন্দলগ্নের চৌকাঠে পা ফেলার পূর্ব মুহূর্তেই তিনি স্বেচ্ছায় কণ্টকাকীর্ণ নিদারুণ বনবাস জীবন মেনে নিয়েছেন। তার পর একের পর এক পিতার মৃত্যুসংবাদজনিত শোক, সীতাহরণজনিত বিরহ যন্ত্রণা, রাক্ষসরাজ রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভাবনীয় কষ্ট— সবই এই রাজকুমারের জীবনে এসেছে, আবার সীতা উদ্ধারের পরও অযোধ্যায় ফিরে তাঁর ভাগ্যে শান্তি জোটে নি। প্রজাগণ সীতা চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছে। ফলে প্রজানুরঞ্জন ও বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। শেষে প্রাণের

তুল্য লক্ষ্মণকেও তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে। সর্বদাই তিনি বিসর্জন দিয়েছেন ব্যক্তিসুখ।

কিন্তু এই-সকল জীবন-সমস্যার অকস্মাৎ আবির্ভাবকে তিনি প্রশান্তচিত্তে মেনে নিয়েছেন। বিপুল ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের গুণে একের পর এক সমাধান করেছেন প্রতিটি সমস্যার। নির্বিকার চিত্তে জীবনের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তকেই সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। কখনো কখনো তাঁর মনে হতাশা আসে নি যে তা নয় তবে অধিকাংশ সময়ই তিনি স্বীয় শৌর্যে ও ধৈর্যে কার্য সমাধায় মগ্ন থেকেছেন।

পিতা দশরথের কাছে রাম আদর্শপুত্র। জননী কৌশল্যার তিনি প্রাণস্বরূপ। সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর নিকটেও তিনি আদরণীয়। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের তিনি আদর্শ ভাই। সীতার তিনি আদর্শ স্বামী। প্রজাগণের দৃষ্টিতে তিনি আদর্শ ও প্রজাদরদী শাসক। ব্রাহ্মণগণের বিচারে তিনি উৎকৃষ্ট দাতা। এমন কোনো গুণ নেই যা রাম চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয় নি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন রাম চরিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন— 'বাল্মীকি অঙ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত— এ চিত্র সূচিকাবিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়। এই চরিত্র ছায়া কিম্বা ধূমবিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।'[১২]

জ্যেষ্ঠ ভাই হিসেবে রাম আজও হিন্দুর সংসারে আদর্শস্থানীয়। সকল পিতাব আকাঙ্ক্ষা তাঁর পুত্রটি যেন রামের আদর্শে গঠিত হয়। প্রত্যেক স্ত্রী চান রামের মতো স্বামী। তাঁর প্রজানুরঞ্জনের কথা তো ভারতবাসীর নিকট কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচকরা রাম চরিত্রে অনেক দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। ভবভূতি তাঁর তাড়কাবধ, খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধে বালি-বধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[১৩] অন্যান্যরা তাঁর শূদ্রক-বধ ও সীতা-ত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত অভিযোগগুলির উত্তর রামায়ণেই

---

১২. 'রামায়ণী কথা', পৃ. ৬০

১৩. বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয়চরিতাস্তিষ্ঠন্তু কিং বর্ণ্যতে।
সুন্দস্ত্রীমথনেঽপ্যকুণ্ঠযশসো লোকে মহান্তো হি তে।
যানি স্ত্রীণ্যপরাঙ্মুখান্যপি পদান্যাসন্খরাযোধনে
যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসূনুনিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ॥ উ. বা. চ ৫। ৩৫

দেওয়া আছে। বস্তুত রাম মর্যাদা পুরুষোত্তম ছিলেন। দেশ-কাল-পাত্র সম্পর্কিত রীতিনীতির তিনি অন্যথা করতে পারেন না। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশে ধর্মরক্ষার জন্য তাড়কা বধ। খর-দূষণ যুদ্ধে তীর ধনুর ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য পশ্চাদপসরণ, সামাজিক রীতি লঙ্ঘনকারী বালিকে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য হত্যা, তৎকাল-স্বীকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম লঙ্ঘন এবং সামাজিক মর্যাদাহানির প্রতিকারের জন্য শূদ্রক-বধ এবং সীতা-পরিত্যাগ রামের যশোহানির কারণ হতে পারে না।[১৪] আধুনিক সমালোচকেরা রামের একপত্নী ব্রতের বিরুদ্ধেও প্রমাণ উত্থাপন করেছেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে। মহারাজ দশরথ স্ত্রৈণ এবং অকর্মণ্য ছিলেন, তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা রামের পক্ষে অশোভন এই অভিযোগের উত্তর রামের মুখে নানা ক্ষেত্রে শোনা গেছে। যাঁকে দেশের নৈতিক এবং ধার্মিক নেতা বলা যেতে পারে সেই বশিষ্ঠও রামের যুক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতীয় আদর্শের সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা বিদ্বেষবশত যাঁরা রামচরিত্রকে হেয় বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা ভারতীয় সাহিত্যের নানা শাখায় এবং ভারতীয় জনজীবনে রাম চরিত্রের প্রভাব হয় জানেন না নতুবা জেনেও তা অস্বীকার করেছেন। জাতীয় সংস্কৃতি কোনো ব্যক্তির অঙ্গুলিহেলনে গঠিত অথবা ভিন্ন পথে পরিচালিত হয় না।

বর্তমান ভারতবর্ষের সমাজজীবন নানা প্রকার সমস্যায় ভারাক্রান্ত। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতায় ভুগছে সমাজের অধিকাংশ পরিবার। নৈতিক মূল্যবোধ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে ক্রমশই। গৃহে গৃহে শান্তি নষ্ট হচ্ছে সাংসারিক নানা স্বার্থ সংঘাতে। তাই এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা যদি রামের আদর্শে নাগরিকদের গড়ে তুলতে প্রয়াসী হই বা তাঁর আদর্শকে অনুধাবন করে জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি তা হলে অনেক অশান্তির অবসান ঘটতে পারে।

১৪. 'আলটিমেটাম' না দিয়েই রাম বালীকে আড়াল থেকে বধ করেছেন, দ্বিজাতীর অধিকার রক্ষার জন্য শূদ্রতপস্বী শম্বুককে হত্যা করেছেন--- অতীত কালের অতি প্রাচীন সমাজের এই সব ঘটনার বা কবি কল্পনার নিরপেক্ষ বিচার করতে পারি এমন দেশকালজ্ঞ আমরা নই। আমাদের সৌভাগ্য আধুনিক সংস্কারের পীড়াকর কথা রামায়ণে বেশী নেই, এমন কথাই বেশী আছে যা সর্বকালে উপাদেয় অনবদ্য ও হিতকর।'

—রাজশেখর বসু, ভূমিকা, 'বাল্মীকি রামায়ণ'

ভরত : রামের পরই আসে ভরতের কথা। ভরত রামায়ণ মহাকাব্যের একটি উজ্জ্বলতম চরিত্র। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং এই ভক্তিশ্রদ্ধার মর্যাদা বজায় রাখতে এমন আত্মত্যাগ সম্ভবত আর কোথাও দেখা যায় না। ভারতবাসীর অন্তরে ভরতের ভ্রাতৃভক্তির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। রাজা দশরথ রামের চেয়েও ভরতকে ধার্মিক বলেছেন— 'রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।' রামও ভরতের সততা ও ধর্মশীলতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই তিনি কৌশল্যাকে অযোধ্যায় রেখে বনবাসে যেতে আশঙ্কা করেন নি। ভরতের অনুপস্থিতিতেই কৈকেয়ীর ইচ্ছানুসারে অযোধ্যার রাজবাড়িতে অঘটন ঘটে গেছে। ভরত রামের বনবাসগমন ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এই নির্দোষ রাজকুমারকেই আপনজনের সন্দেহের শিকার হতে হয়েছে। পিতা দশরথ তাঁর ধর্মশীলতার কথা জেনেও মাতুলালয় থেকে তাঁর ফেরার পূর্বেই রামের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে চেয়েছেন। আবার রাম বনবাস জীবনের শেষে অযোধ্যায় ফেরার পথে রাজসিংহাসন বিষয়ে ভরতের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন। বনবাসে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি সীতাকে বলছেন— তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করবে না কারণ ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা অপরের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে না।

ভরতের প্রতি অমূলক এই সন্দেহ আমাদের মনে ব্যথার সঞ্চার করে। তাঁর নির্মল স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ে এরূপ কালিমা লেপনের প্রচেষ্টা আমাদের কাতর করে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই লিখেছেন— 'জগতে নিরপরাধের দণ্ড অনেকবার হইয়াছে কিন্তু ভরতের মত আদর্শ ধার্মিকের প্রতি এরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল'।[১৫]

জ্যেষ্ঠ ভাইকে বনবাসে পাঠিয়ে ভরত রাজসিংহাসনে বসবেন এ কথা তাঁর স্বপ্নের অতীত। মায়ের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি অরণ্যে ছুটেছেন রামকে ফিরিয়ে আনতে। রাম অযোধ্যায় ফিরতে অস্বীকৃত হলে পাদুকা মাথায় করে নন্দীগ্রামে এনে রাজসিংহাসনে বসিয়ে পরিচালনা করেছেন অযোধ্যার রাজকার্য। রাজপরিবারের সমস্ত সুখ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। রাজ্যের কোনো সুখ-সমৃদ্ধির আকর্ষণ তাঁর সংকল্পকে টলাতে পারে নি। অনায়াসলব্ধ রাজ-সিংহাসনের অধিকারী

১৫ 'রামায়ণী কথা', পৃ ৬৩

হয়েও তিনি অক্লেশে তা ত্যাগ করেছেন। তাই গুহক তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন—

ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি॥ ২।৮৫।১২

জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধাই তাঁকে এই কঠোর ব্রতপালনে সহায়তা করেছে।

ভারতবর্ষের মানুষ যুগ যুগ ধরে ভরতের চরিত্র দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করে আসছে। গৃহে গৃহে প্রতিটি ভারতবাসী ভরতের ত্যাগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে। সুদূর অতীতের রামায়ণ কাব্যের ভরতচরিত্র আজও ভারতবাসীর কাছে আদরণীয়।

লক্ষ্মণ : রামায়ণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের জন্য লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে আসীন। স্বেচ্ছায় লক্ষ্মণ রাজ পরিবারের সমস্ত সুখ, ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনবাস জীবনের নিদারুণ কষ্ট হাসিমুখে রামের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। রামের প্রতি পিতা দশরথের অবিচারকে তিনি প্রথমে মেনে নিতে পারেন নি। বনবাস জীবনে জ্যেষ্ঠ ভাই রাম ও মাতৃসমা সীতার প্রীতি ভালোবাসাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। রাম বনবাসজীবনে পত্নী সীতাকে সঙ্গে পেয়েছিলেন। পত্নীর প্রেম সেবা সাহচর্য তাঁর বনবাস জীবনের ক্লান্তি মোচনে অনেক সাহায্য করেছিল। কিন্তু লক্ষ্মণ পত্নী ঊর্মিলাকে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে রেখে জ্যেষ্ঠের অনুগামী হয়েছিলেন। তাই বিরহ ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। তবু রামের সুখে দুঃখে তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। সীতার আদেশ পালনে তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত। ক্লান্তি ছিল না তাঁর রাম-সীতার আদেশ পালনে। তিনি ছিলেন রামের দক্ষিণ বাহু কিংবা বহিশ্চর প্রাণ।

'রামস্য দক্ষিণো ৰাহুর্নিত্যং প্রাণো ৰহিশ্চরঃ' (৩।৩৪।১৪)।

সীতাবিরহে রাম একান্ত কাতর হয়ে পড়লে তিনি রামের শোকাতুর চিত্তে উৎসাহ ও আশার উন্মেষ ঘটান। নিদারুণ দুর্দিনেও তিনি কখনো ভেঙে পড়েন নি। রামকে তিনি সর্বদাই ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। তাঁর কথা অমান্য কবার জন্যই সীতাকে রাবণের হাতে পড়তে হয়েছিল। সর্বদাই তাঁর বক্তব্য ছিল ঋজু। মন ছিল আবিলতামুক্ত। সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের উদাসীনতায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি তারাকে যে-সকল বাক্য বলেছিলেন সেগুলি সবই তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয়বাহী। তাঁর চরিত্রে ব্যথা, বেদনা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা কিছুরই বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না। তবে রামের হিতের জন্য তাঁর কণ্ঠ প্রায়ই

গর্জে উঠত। অন্যথায় তিনি ছিলেন একান্তভাবে অন্তর্মুখী। তিনি ছিলেন প্রকৃত বীর। পত্নীগ্রহণ করলেও তাঁর জীবন ছিল সন্ন্যাসীর মতো। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপত্নীর জন্য এরূপ আত্মত্যাগ বিরল। রবীন্দ্রনাথ রামের চরিত্র অপেক্ষা লক্ষ্মণের চরিত্রকে আরো উজ্জ্বলতর বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তনস্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই।'[১৬] রামের সঙ্গে হাসিমুখে জীবনের সব জ্বালা যন্ত্রণাই তিনি সহ্য করেছেন। রামও তাঁকে এই ভালোবাসার মূল্য দিয়েছেন। তিনি ছিলেন রামের প্রাণস্বরূপ। শেষে তিনি দুর্বাসার অভিশাপে অযোধ্যার প্রজাগণের ধ্বংসের কারণ না হয়ে রামের হাতেই মরতে চেয়েছেন এবং রাম-কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সরযূতীরে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেছেন।

লক্ষ্মণের উচ্ছ্বাস-রহিত ভ্রাতৃভক্তি ভারতবাসীকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দিয়ে আসছে। রামের কথা এলেই এই ভ্রাতৃভক্তের নাম ভারতবাসীর মুখে আপনা থেকেই উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের সকল গৃহের জ্যেষ্ঠভ্রাতাই লক্ষ্মণের মতো সহোদর ভাই আকাঙ্ক্ষা করে। তাঁর কথা মনে রেখেই বলা হয়—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥ ৬।১০১।১৫

যদিও লক্ষ্মণ রামের সহোদর ভাই ছিলেন না তবু একে অন্যকে বৈমাত্রেয় বলে কখনো মনে করেননি।

হনুমান : রামায়ণ মহাকাব্যে প্রভুভক্তির চরম নিদর্শন হনুমানের চরিত্রে প্রতিফলিত। সকল ভারতবাসীই যুগ যুগ ধরে হনুমানের প্রভুভক্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে আসছে। শুধু ভারতবাসীই নয়, সমগ্র সংসারে হনুমানের মতো প্রভুর জন্য নিবেদিতপ্রাণ দাস দুর্লভ। উৎসাহ, তেজ, কর্তব্যজ্ঞান, ধৈর্য, বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি যাবতীয় সৎগুণের সংমিশ্রণে হনুমানের চরিত্র গঠিত। মহাকবি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

তেজো ধৃতির্যশো দাক্ষ্যং সামর্থ্যং বিনয়ো নয়ঃ।
পৌরুষং বিক্রমো বুদ্ধির্যস্মিন্নেতানি নিত্যদা॥ ৬।১২৮।৮২

প্রভু রামের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রভুর কার্য সাধনে নিষ্ঠা হনুমানের

---

১৬. 'ছন্দ' গ্রন্থে, 'গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে।

চরিত্রকে মহনীয় করে তুলেছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই লিখেছেন— 'ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি অনুরাগ সহজে কল্পনা করা যায়— ইঁহারা রামের স্বগণ ; কিন্তু কোথাকার এক বর্বর দেশের অনুর্বর মৃত্তিকায় এই ভক্তিকুসুম অসাধনে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা আশাতীতরূপেই পাইয়া সবিস্ময়ে দর্শন করি।'[১৭] দাস্যভাবের অনন্যসাধারণ প্রকাশ ঘটেছে হনুমান চরিত্রে। প্রভু রামের যে কাজের দায়িত্ব তিনি নিতেন সেটির দার্শনিকের মতো সকল দিক বিবেচনা করে সমাধা করতেন। অথচ তাঁর সকল কাজই ছিল স্বার্থলেশশূন্য। সন্ন্যাসীর মতো সর্বদাই নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে প্রভুর কাজ করে যেতেন। পরবর্তী মহাভারতে নিষ্কাম কর্ম এবং স্থিতপ্রজ্ঞের যে আদর্শ চিত্রিত হয়েছে রামায়ণের হনুমান চরিত্রে তাঁর পূর্বরূপ বিদ্যমান।

সীতা উদ্ধার বিষয়ে রামের প্রধান ভরসাস্থল ছিল হনুমানের বীরত্ব, সাহস, উদ্যম ও বিচক্ষণতা। রামের আশা ব্যর্থ হয় নি। যোগ্য ব্যক্তির উপরই তিনি দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সুগ্রীব অপেক্ষা রামের সন্তুষ্টি সাধনেই হনুমান বেশি যত্নশীল ছিলেন। বেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রসঙ্গে রামায়ণকার বলেছেন—

স সূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং
সসংগ্রহং সিদ্ধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ।
নহ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে
বৈশারদে ছন্দগতৌ তথৈব॥ ৭।৩৬।৪৬

হনুমানের উজ্জ্বল চরিত্রের মাধুর্যে সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্যই যেন পবিত্র হয়ে উঠেছে। যুগ যুগ ধরে হনুমানের এই মহনীয় চরিত্রের দ্বারা ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আসছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে অগণিত মন্দিরে কোথাও রাম-সীতা সহ কোথাও বা একক এই বীর পূজা পেয়ে আসছেন আবহমান কাল ধরে।

সীতা : সীতা চরিত্র মহর্ষি বাল্মীকির এক অনন্য সৃষ্টি। ভারতবর্ষীয় হিন্দু পরিবারের প্রতিটি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত নারী চরিত্রটি যেন মহাকবি বাল্মীকির লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সীতা ত্যাগ, ধৈর্য, পতিপরায়ণতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। জনকগৃহে রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে আবাল্য পালিতা, ইক্ষ্বাকু বংশের অন্যতম

১৭ 'রামায়ণী কথা', পৃ ১২৬

রাজকুমার রামের মহিষী হয়েও তিনি স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে কণ্টকাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে গমন করেছেন। রাম ত্যাগ করেছেন সিংহাসন, কৈকেয়ীর শর্তানুসারে রামেরই বনে যাবার কথা, সীতার নয়। কিন্তু এই স্বার্থলেশশূন্যা স্বামীগতপ্রাণা রমণী স্বেচ্ছায় স্বামী-অনুগামিনী হয়েছেন রঘুবংশের বিপুল রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকেই একের পর এক তাঁর জীবনে দুঃখের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আপন পাতিব্রত্যের গুণে তিনি সহজেই দুঃখসাগর পার হয়েছেন। অরণ্যজীবনের সকল দুঃখকষ্টই তিনি স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। আবার রাবণ-কর্তৃক অপহৃতা হয়ে লঙ্কায় স্বামীর চিন্তাতেই বিভোর থেকেছেন দীর্ঘদিন। স্বপ্নে, জাগ্রতে, বিপদে, আপদে, স্বামী রাম ছাড়া তাঁর অন্য কোনো চিন্তাই ছিল না। দশরথ, কৌশল্যা, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতি রাজবাড়ির সকলের কাছেই তিনি ছিলেন আদরণীয়া। পতিব্রতা ভারতীয় নারীর আদরের সামগ্রী সীতা চরিত্র। ভারতবর্ষের পরিবারে সীতার নাম সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। সীতার এই আদর্শ চরিত্রটি ভারতীয় জনজীবনে শুধুমাত্র প্রভাবই ফেলে নি, প্রতি গৃহে তাঁর মতো বধূই চিরকাল প্রার্থনার বিষয় হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ সীতা সম্বন্ধে বলেছেন—'সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু, চির-বিশ্বস্তা, চির-বিশুদ্ধা পত্নী। তাঁহার সমস্ত দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ বাক্য উচ্চারিত হয় নাই। সীতা কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দেন নাই। 'সীতা ভব' সীতা হও।'[১৮] অন্যান্য নানা সদ্‌গুণের মধ্যে সীতার অসামান্য দৃঢ়তা বিস্ময়াবহ। তিনি সুর-নর বিজয়ী রাবণকে এবং নরোত্তম রামকে হীনপ্রভ করেছেন। আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই তাঁর পাতাল-প্রবেশের প্রেরণা এসেছে এবং অশোকবনের সমস্ত ক্লেশের মধ্যেও তাঁকে সঞ্জীবিত রেখেছে।

কৃষ্ণ : রামায়ণের ন্যায় মহাভারতের কয়েকটি আদর্শ চরিত্র দ্বারা ভারতবর্ষের মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত হয়ে আসছে। রামায়ণের আদর্শ পুরুষ যেমন রাম, মহাভারতের আদর্শ পুরুষ তেমনি দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছেন— 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন— 'জানিয়াছি— ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপ সংস্পর্শ শূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।'[১৯] সমগ্র মহাভারত জুড়েই তাঁর আধিপত্য। দুষ্টের দমন এবং

১৮. 'বাণী-রচনা', ১০ম খণ্ড, পৃ. ২০৭

১৯. 'কৃষ্ণচরিত্র'

শিষ্টের রক্ষার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের অকর্মণ্যতা এবং শকুনি ও দুর্যোধনাদির পাপ অভিসন্ধিতে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষে ধর্মপথানুসারী পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করেন এবং মহাভারত যুদ্ধে অর্জুনের সারথি হন। তিনি সর্বদাই পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে চলেই পাণ্ডবগণ ভারতযুদ্ধে কৌরবদের পরাজিত করতে সমর্থ হন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভারত তথা মানবজাতির কল্যাণার্থ দৈব তথা মনুষ্যোদ্ভাবিত অস্ত্র-শস্ত্রের উৎপাটন করে মনুষ্যজীবনে 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' এই মহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অস্ত্রমদমত্ত ক্ষত্রিয়জাতির উচ্ছেদসাধনে তিনি আত্মীয় অনাত্মীয় ভেদ স্বীকার করেননি। পাণ্ডবেরা এই আদর্শের সহায়ক বলে তিনি তাঁদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের জন্য তাঁর কিছুই অদেয় ছিল না। গণতন্ত্রের উপাসক হয়েও তিনি ব্যবহারিক গণতন্ত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিতে মর্মাহত হন এবং জনকল্যাণমূলক রাজতন্ত্রের আনুকূল্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধরাধাম হতে তাঁর তিরোভাবের পর যুদ্ধোন্মাদ ক্ষত্রিয়দের আস্ফালন অথবা জনগণধ্বংসী অস্ত্রের ঝনঝনানি ভারতবর্ষে বহুকাল শোনা যায় নি। এই দৃষ্টিতে তিনি পৃথিবীর অনেক লোকনায়ককেই দূরদৃষ্টি এবং লোকহিতৈষণাতে অতিক্রম করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন— 'হিন্দুধর্মের সু-উচ্চ ভাবগুলি জনতার কাছে পৌঁছিয়া দিবার চেষ্টা হইতেই পুরাণগুলির উৎপত্তি। ভারতবর্ষে একজন মাত্র এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন— তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি সম্ভবত মানবেতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।'[২০] আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে জেনে অর্জুন মনের দিক থেকে ভেঙে পড়লে শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে যুদ্ধে উদ্যোগী করেন। হতোদ্যম অর্জুনের উদ্দেশ্যে দেয় তাঁর উপদেশাবলীই 'গীতা' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত এই গীতা শুধু ভারতবাসীর জীবনেই নয় সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

তিনি আজও ভারতবাসীর নিকট পূজার পাত্র। ভগবান জ্ঞানে সকল ভারতবাসীর নিকট তিনি যুগ যুগ ধরে পূজা পেয়ে আসছেন। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মানুষ তাঁর পুণ্যগাথা গান ক'রে নিজেদের পাপমুক্ত বলে মনে করে।

২০. 'বাণী রচনা' ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩

ভীষ্ম (দেবব্রত) : পিতামহ ভীষ্মচরিত্রটি মহর্ষি বেদব্যাসের অনন্য সৃষ্টি। তাঁকে মহাভারতের অন্যতম আদর্শ পুরুষ বলা যেতে পারে। শান্তনুর উপযুক্ত পুত্র দেবব্রত বিবাহ করে সংসারী হবার সব গুণই অর্জন করেছেন। বড়ো যোদ্ধা, শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিপরায়ণ, সত্যাশ্রয়ী— সকল দিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। পরিণয়ের বয়সেও তিনি উপনীত। এমন সময় পিতা শান্তনু একদিন এক ধীবর কন্যার রূপে মুগ্ধ হলেন। তাঁর চিত্ত বিচলিত হয়ে পড়ল ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার জন্য। সুযোগ্য পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝে অক্লেশে মৎস্যগন্ধার পিতার শর্তানুসারে রাজসিংহাসন ত্যাগ ও কৌমার্য ব্রতের প্রতিজ্ঞা করলেন। যৌবনে উপনীত দেবব্রত এই কঠোর প্রতিজ্ঞার জন্য সংসারে ভীষ্ম নামে পরিচিত হলেন। দেবব্রতের ত্যাগ রামের রাজ্য ত্যাগের মতো সংসারে উদাহরণস্বরূপ হয়ে রইল।

কিন্তু সংসার না করলেও আমৃত্যু তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের হিত চিন্তা করে এসেছেন। তিনি সারা জীবন শুধু ত্যাগই করে গেছেন। জন্মমাত্রেই তিনি মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। পিতা শান্তনু স্বসুখপরায়ণ। কঠোর হৃদয় গুরু তাঁকে কোনো দিক থেকেই সাহায্য করেন নি। স্নেহ, মায়া, মমতা সব-কিছু থেকেই তিনি আশৈশব বঞ্চিত। কিন্তু নিজের জীবনে তিনি কিছু না পেলেও যে-রাজসিংহাসনের অধিকার তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই রাজবংশের মঙ্গল সাধনে সারা জীবন তিনি তৎপর থেকেছেন। পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষই ভীষ্মের একান্ত ঘনিষ্ঠ। তা সত্ত্বেও ভীষ্ম পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন কেন করেন নি এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ভীষ্মের সব-কিছুই কুরু-কুলের মঙ্গলার্থে নিবেদিত। কিন্তু পাণ্ডবেরা ধার্মিক, তিনিও ধার্মিক। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলে মনে করেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের নায়ক। পক্ষান্তরে দুর্যোধন অধার্মিক পরস্বপহারী। তা হলেও ভীষ্মের পাণ্ডব-পক্ষাবলম্বনে কয়েকটি দুস্তর বাধা ছিল। পাণ্ডবদের অসংখ্য সৎগুণের মধ্যে কুরুকুলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোনো আগ্রহ ছিল না। অথচ এই কুলের সার্বত্রিক কল্যাণ ও মর্যাদা রক্ষা ভীষ্ম চরিত্রের মেরুদণ্ড। তাই কুরুকুলদ্বেষী পাঞ্চাল ও মৎস্যগণের সঙ্গে পাণ্ডবদের ঘনিষ্ঠতা ভীষ্মকে পাণ্ডবদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অনুজ বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য কাশীরাজকন্যাদের অপহরণ এবং সেই সূত্রে অম্বার আত্মাহুতি কাশীরাজ বংশের সঙ্গে ভীষ্মের শত্রুতার কারণ। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে তৎকালীন কাশীরাজ একজন বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারী। বস্তুত পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এবং তাঁদেব কয়েকটি ছেলেকে বাদ দিলে পাণ্ডবপক্ষের অন্য সকল

যোদ্ধাই কুরুকুলের প্রতিপক্ষ। এই অবস্থায় কুলগৌরববোধ সম্পন্ন পিতামহ ভীষ্ম পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে পারেন না। এজন্য শেষ পর্যন্ত অন্যায় পক্ষ আশ্রয় করে তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি অন্য কথা বলেছেন—'বদ্ধোঽস্মি অর্থেন কৌরবৈঃ'। এখানে সরলবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের কাছে তিনি মোটামুটিভাবে নিজের অসমার্থ্যের কথাই ব্যক্ত করেছেন। মনোবৈজ্ঞানিক কারণ বিশ্লেষণ করেননি।

তাঁর অসাধারণ জ্ঞানবত্তা ও যুদ্ধক্ষমতার গাথা সমগ্র মহাভারত ছেয়ে আছে। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই বীর পেয়েছেন অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। মুনি-ঋষিদের নিকটও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। মহাভারতকার বলেছেন—'মহাভারতটা ভীষ্মেরই ইতিহাস।'

তস্যাহং কীর্তয়িষ্যামি শান্তনোরধিকান্ গুণান্॥

যস্যেতিহাসো দ্যুতিমান্ মহাভারতমুচ্যতে॥ ১।৯৯।৪৮ গ.ঘ.—৪৯ গ.ঘ.

বস্তুত আদি থেকে অনুশাসনপর্ব পর্যন্ত এই বীরের কথা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর শরশয্যায় উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধাবান যুধিষ্ঠির যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা ভারতবাসীর নিকট সম্পদ বিশেষ। পিতার জন্য এবং পরে বংশ-মর্যাদার জন্য তাঁর এই ত্যাগ ভারতবর্ষের মানুষের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে।

যুধিষ্ঠির : ভারতবর্ষের জন-মানসে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের এক বিশিষ্ট স্থান বর্তমান। যুধিষ্ঠির চরিত্রটি বেদব্যাসের অনন্য সৃষ্টি। মহাভারতের চরিত্র-শালায় এই চরিত্রটি স্বীয় প্রভায় সমুজ্জ্বল।

কুন্তীর গর্ভে ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। জন্মমুহূর্তেই জাতকের সম্বন্ধে দৈববাণী হয় যে তিনি ভবিষ্যতে বিশিষ্ট ধার্মিক বীর, সত্যবাদী এবং পৃথিবীর সম্রাট হবেন। সংসারে ধর্মপুত্র বলতে সকলেই যুধিষ্ঠিরকে বুঝে থাকেন। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, সত্যবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ।

একদা দ্বৈতবনে মুনি-ঋষি পরিবেষ্টিত হয়ে যুধিষ্ঠির দিন অতিবাহিত করছেন। এক সন্ধ্যায় দ্রৌপদী সহ অন্য চার ভাই মিলিত হয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্য বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন। এমন সময় দ্রৌপদী ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা দ্বারা উত্তেজিত করার চেষ্টা করলে যুধিষ্ঠির শান্ত ও নির্বেদ চিত্তে ক্ষমারই প্রশংসা করে বললেন— সৎপুরুষের যথার্থ ধর্ম ক্ষমা এবং দয়া। আমি তাতেই অবিচল আছি।

এতদাত্মবতাং বৃত্তমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
ক্ষমা চৈবানৃশংসং চ তৎ কর্ত্তাস্ম্যহমঞ্জসা॥ ৩।২৯।৫২

তাঁর দয়া ছিল অপরিসীম। দ্রৌপদী-অপহরণকারী জয়দ্রথ যুধিষ্ঠিরের দয়াতেই প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর চিত্ত ছিল সদাই প্রশান্ত। শ্রদ্ধালু চিত্তের অধিকারী বলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শরশয্যাশায়ী পিতামহ ভীষ্মের নিকট শিষ্যরূপে উপস্থিত করেছিলেন।

যুধিষ্ঠির ছিলেন প্রকৃত বিদ্বান। তাই তিনি বিদ্বানের মর্যাদা দিতে জানতেন। বহু শ্রেষ্ঠ মুনি ঋষিদের নিকট তিনি নানা বিষয়ে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁকে 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা দান করেছিলেন। তিনি এই বিদ্যায় অর্জুনকে দীক্ষিত করেন। মহর্ষি বৃহদশ্বের নিকট কাম্যক বনে 'অক্ষহৃদয়' বিদ্যা লাভ করেছিলেন। হিমালয়ে ভ্রমণের সময় তিনি অজগরের বহু জটিল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। যক্ষরূপী ধর্মের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নানা কঠিন প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানে তিনি তাঁকে খুশি করেছিলেন। ম্লেচ্ছ ভাষায় তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। বারণাবতে যাত্রাকালে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর সকলের সামনে অবোধ্য ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে নানা বিপদ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। বিদুরের এই ভাষা যুধিষ্ঠির ভিন্ন অপর কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় নি। (১।১৪৫ অধ্যায়)

তিনি ছিলেন একান্তভাবে ব্রাহ্মণগণের ভক্ত। ব্রাহ্মণদের তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতেন। বনবাসী হয়েও তিনি প্রত্যেক দিন ব্রাহ্মণগণকে ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত করতেন। অতিথিপরায়ণতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দ্রৌপদী তাঁকে 'প্রিয়াতিথি' বলে অভিহিত করেছেন।

তাঁর হৃদয় ছিল সংবেদনশীল। হিংসা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধ যাতে না ঘটে তার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট মাত্র পাঁচটি গ্রাম চেয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় নি।

কুন্তীর নিকট কর্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই শুনে নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন। ক্ষুব্ধ চিত্তে নারী জাতিকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন—

অতো মনসি যদ্‌গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি॥ ১১।২৭।২৯

ব্যাকুলিত চিত্তে তিনি বলেছিলেন— ক্ষত্রিয়ের আচারকে ধিক্ বল ও পৌরুষকে ধিক্।

তাঁর সত্যবাদিতা ও সরলতাকে কৌরবপক্ষের শকুনি দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ছিল অসাধারণ ধৈর্যগুণ। কঙ্ক নাম ধারণ করে

বিরাটরাজের সভায় আত্মগোপনকালে তাঁর ধৈর্যের পরিচয় আমরা পাই। স্বাভাবিক সত্যতা নিয়ে জন্মানোর ফলে জীবনে পদে পদে ধৈর্যের পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের প্রতি ছিল তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা। তিনি কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ করেন। ভারতযুদ্ধে মৃত ব্যক্তিগণের তিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বদাই সার্থক। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এই চার ভাই-ই শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর আদেশ পালন করেন। কখনো কখনো যুধিষ্ঠিরের কোনো কঠোর আদেশ ও সিদ্ধান্তে দ্রৌপদী সহ চার ভাই-এর মন তাঁর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও শেষে অবনত মস্তকে জ্যেষ্ঠের আদেশকেই শিরোধার্য করে নিতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ যোদ্ধার বাণাঘাতে কখনো কখনো তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেও তিনিই ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদের জয়লাভের অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। তিনি শ্রদ্ধাবনত মস্তকে কৌরবপক্ষের দুই অজেয় যোদ্ধা পিতামহ ভীষ্ম ও অস্ত্রগুরু বীর দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর উপায় জেনে আসেন। এই কাজে তাঁর চরিত্রে শ্রদ্ধা যতখানি প্রকটিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রকটিত হয়েছে কুশলী যোদ্ধার কূট কৌশল।

স্ত্রী দ্রৌপদীর কাছেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট প্রিয়। দ্রৌপদীর গর্ভে তাঁর এক পুত্র হয়, নাম প্রতিবিন্ধ্য। যুধিষ্ঠিরের অপর এক পত্নীর নাম গোবাসন শৈব্যের কন্যা দেবিকা। দেবিকার গর্ভে জাত যুধিষ্ঠিরের পুত্রের নাম যৌধেয়।

যুধিষ্ঠির ছিলেন একান্তভাবে গৃহস্থ। কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অনন্ত পিপাসা। গৃহী জীবনের প্রত্যাবশ্যক কর্তব্যগুলিও তাঁর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। একদিকে সূক্ষ্ম ধর্মবোধ অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ হিসেবে অসংখ্য দায়দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সাধনের দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁর চরিত্রটি অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু যুধিষ্ঠির সম্পর্কে বলেছেন—'ভারতবর্ষীয় প্রতিভার এই এক অদ্ভুত ও অতুলনীয় সৃষ্টি যুধিষ্ঠির ; কর্মকারী কিন্তু কর্মবীর নন, ধর্মাচারী কিন্তু ধর্মবীর নন, অফুরন্তভাবে জ্ঞানান্বেষী হয়েও জ্ঞানগুরু হতে পারলেন না। স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা নিয়েও তপস্যারত হলেন না কখনো—আমাদের অনেক ভাগ্যে কোনো অর্থেই তাঁকে মহাপুরুষ বলা যায় না— তিনি মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ, প্রায় এক সাধারণ গৃহস্থ, যাঁর মুখচ্ছবিতে মানবজীবনের সব দায়িত্বজনিত বেদনার রেখা অঙ্কিত হয়ে আছে এবং সেইজন্যেই যিনি চিরস্মরণীয়'। ('মহাভারতের কথা', পৃ. ১৪৫)

তবে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে বিরাজমান স্বাভাবিক মুমুক্ষারই শেষে জয় ঘোষিত হয়েছে। তিনি ভারতযুদ্ধে আত্মীয়স্বজনকে হারিয়ে মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর অন্তরের সুপ্ত বৈরাগ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। অনন্ত শান্তির আশায় সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি মর্ত্যের মায়া কাটিয়ে স্বর্গারোহণের পথে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু ছলনার আশ্রয়ে দ্রোণ-বধের পাপে তাঁকে নরকও দর্শন করতে হয়েছে। দ্রোণবধে মিথ্যাভাষণের ফলে যে কালিমা তাঁর চরিত্রে অঙ্কিত হয়েছিল সংসার আজও তা মনে রেখেছে। তাঁর চরিত্রের অন্য ত্রুটি ছিল অত্যধিক দ্যূতাসক্তি। তাঁর এই দ্যূতাসক্তিই দ্রৌপদী সহ অন্য চার ভাই-এর জীবনে অনেক দুঃখ এনে দিয়েছে। রামের বনগমনে যেমন পিতার সত্যরক্ষা হয়েছিল জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে তাঁর কাজ সমাজে প্রশংসনীয় হয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের বনগমনের মধ্যে এরূপ কোনো আদর্শ বা ত্যাগ ছিল না। তাঁর এই বনবাস-জীবনের দুঃখ নিছক দ্যূতাসক্তিরই ফল।

কর্ণ : মহাভারতে দানশীলতার জন্য যে চরিত্রটি ভারতবাসীর নিকট শ্রদ্ধেয় তাঁর নাম কর্ণ। কর্ণের দানশীলতার কথা ভারতবাসীর নিকট প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই মহৎ চরিত্রটির করুণ পরিণতি দেখলে কষ্ট পেতে হয়। সাফল্যের সব চাবিকাঠি হাতে থাকলেও নিষ্ফলের তালিকায় তাঁর নাম সর্বাগ্রে। ধৈর্যশীলা কুন্তীর গর্ভে আদিত্যের ঔরসে তাঁর জন্ম। কিন্তু জন্মমাত্রেই এই বীর পরিত্যক্ত মাতৃস্নেহ থেকে। পিতা দেবতা মাতা ধৈর্যশীলা রাজমহিষী হলেও তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সমাজে রহস্যাবৃত থেকেছে। সূতের ঘরে মানুষ হয়ে সূতপুত্র রূপে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছে দেবসুলভ নানা গুণাবলী। কর্ণের নিকট কোনো প্রার্থী কখনো বিমুখ হয় নি। সূর্যের দেওয়া স্বাভাবিক কবচ কুণ্ডলও তিনি ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে সূর্যের বারণ সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় দান করেছেন। এই সহজাত কুণ্ডলই তাঁকে অজেয় করে রাখতে পারত। অর্জুনের প্রাণসংহারের জন্য সুরক্ষিত ইন্দ্রদত্ত শক্তি তিনি দুর্যোধনের মঙ্গলার্থ অন্যত্র ব্যবহার করেছেন। নানা অপমান সহ্য করে তিনি নিজের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। তাঁর গুণের কিছুটা মর্যাদা দিয়েছেন দুর্যোধন। তাই দুর্যোধনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। এমনকী তাঁর জন্য প্রাণত্যাগ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ভারতবাসীর নিকট তিনি 'দানবীর' নামে পরিচিত। এমন দাতা অথচ বীর মহাভারতে আর দ্বিতীয় নেই।

কুন্তী : মহাভারতে ধৈর্যশীলা কুন্তী চরিত্রটির প্রতি চিরদিন ভারতবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে।

কুন্তী যাদবপ্রধান শূরের কন্যা কুন্তিভোজের দ্বারা পালিতা এবং কুরুরাজ পাণ্ডুর সহধর্মিণী। রানী হয়ে আবাল্য জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে নানা পরীক্ষা ও নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে এগিয়ে যেতে হয়েছে। পিতৃহীন পাণ্ডবদের তিনি পিতা-মাতার স্নেহে বড়ো করে তুলেছেন। পাণ্ডবগণ তাঁদের দৃঢ়তা-গুণ মাতা কুন্তীর কাছেই লাভ করেছিলেন। মাতৃহীন নকুল ও সহদেবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও যত্নের কোনো ঘাটতি ছিল না। পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে তিনি উপযুক্ত স্নেহ ও সম্মান দিয়েছেন। পাণ্ডবগণ কুরুরাজ্যের আধিপত্য পাওয়ার পরও তিনি স্বসুখ বিসর্জন দিয়ে রাজগৃহে এবং বনে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা করেছিলেন। ক্ষত্রিয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত পুত্রদের কঠোর কর্তব্যকে জাগ্রত করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু সেই পুত্রেরাই রাজ্যে অধিষ্ঠিত ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন দেখার পরও গৃহত্যাগকেই অবশ্য কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছেন। প্রথম জীবনে বাল-সুলভ চপলতায় যিনি অবাঞ্ছিত জননীতে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছিলেন তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই রমণী সারা জীবন কঠোর ব্রত ধারণ করে কাটিয়েছেন।

কুন্তী চরিত্র সম্পর্কে অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুরের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য— 'কুন্তীর ধৈর্য তাঁহাকে পিতা ও মাতার কর্তব্যপালনে অবিচলিত রাখিয়াছে, দুর্গত পাণ্ডবদের কর্মে উৎসাহিত করিয়াছে। এই ধৈর্যই তাঁহার সামান্য বালচাপল্যের জীবনব্যাপী সুকঠোর প্রায়শ্চিত্ত স্বীকারের একক অবলম্বন।' (অমলেশ ভট্টাচার্য, ভূমিকা, 'মহাভারতের কথা')

গান্ধারী : ধর্মশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজমাতা গান্ধারী চরিত্রটি। তিনি দুর্যোধনাদির জননী হয়েও পাণ্ডবদের প্রতি ছিলেন সমান সহানুভূতিশীলা। আপন ছেলে যখন যুদ্ধ জয়ের পূর্বে তাঁর কাছে আশিস্ চেয়েছেন তিনি বলেছেন— 'ধর্মেরই জয় হবে তবে তুমি বীরগতি লাভ কর।' তিনি সর্বদাই উচিত কথা বলতেন। তাঁর স্বভাবে ছিল দৃঢ়তা। বক্তব্য ছিল ঋজু ও ন্যায়ানুসারী। প্রয়োজনে তিনি স্বামীর অন্যায়েরও প্রতিবাদ করেছেন। পুত্রগণের দুর্বিনীত ব্যবহার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ প্রায়ই গর্জে উঠত।

স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম। অন্ধস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি নিজের চোখ দুটিও কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। স্ত্রীপর্বে স্বীয় পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃশোকে অধীরা হয়েও তিনি উত্তরা, সুভদ্রা, দ্রৌপদীর প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীলা।

তাঁর এই সমদর্শিতার গুণই তাঁকে ভারতবর্ষের মানুষের হৃদয়ে অমর করে রেখেছে।

মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের চরিত্রগুলিরই প্রভাব ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনে অধিক। রাজবাড়ির আত্মকলহকে কেন্দ্র করে মহাভারতের আখ্যান গঠিত হলেও এটির ঘটনাপ্রবাহ রাজনৈতিক আবর্তে আবর্তিত হয়েছে বেশি। কিন্তু রামায়ণের ঘটনাবলী মূলত গার্হস্থ্যের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার কথাই বেশি বলেছে। রাজনৈতিক জীবন অপেক্ষা গার্হস্থ্যজীবন সমাজবদ্ধ মানুষের নিকটে আরো কাছের। তাই গার্হস্থ্য জীবনের আবর্তে আবর্তিত রামায়ণ মহাকাব্যের চরিত্রগুলির প্রভাব ভারতীয় জনজীবনে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

উপসংহার

আমাদের দেশের যে-কোনো সাহিত্যের মূল বৈদিক সাহিত্যে নিহিত আছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ভাবনার সেই মূল আদর্শগুলি রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করেছে। এই সাহিত্যিক পর্যায় পরম্পরার ভিতর রামায়ণ-মহাভারতের স্থান খুব উচ্চে। ইতিহাস এবং পুরাণের সিঁড়ি বেয়েই বেদার্থ-রূপ জ্ঞানরাশির মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। ইতিহাস এবং পুরাণের জ্ঞানরহিত মানুষ অল্পশ্রুত। তাঁরা বেদকে আহত করতে পারেন এ কথা ভগবান বেদব্যাস বলেছেন।[১] এই দিক দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের উপযোগিতা সর্বজনস্বীকৃত। এই দুই মহাগ্রন্থই বৈদিক সংস্কৃতির স-উদাহরণ ব্যাখ্যান উপস্থাপিত করেছে। মহামনীষী ভারতব্যাখ্যাতা নীলকণ্ঠ চতুর্ধর বলেছেন, 'ভারতে সর্ব বেদার্থ'। বস্তুত রামায়ণ-মহাভারত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং অঙ্গ-উপাঙ্গ নিয়ে যে বিশাল বৈদিক সাহিত্য, উভয় মহাগ্রন্থে তার প্রত্যেকের প্রভাব বর্তমান। গ্রন্থদ্বয়ের কোনো স্থলে সরাসরি বৈদিক আদর্শ বা তত্ত্ব আবার কোনো স্থলে বৈদিক রচনাবলী ভাষান্তরিত হয়ে আদিকবি বাল্মীকি ও মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভাষা ও শৈলীগত কাঠিন্য দূর করে সহজ সরল উদাহরণের সাহায্যে বৈদিক চেতনা জনসাধারণের জন্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে। এজন্য রামায়ণ এবং মহাভারত বৈদিক সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে কালিক দৃষ্টিতে বৈদিক সাহিত্য থেকে রামায়ণ-মহাভারতের দূরত্ব বিশাল। মূল ভারতীয় সংস্কৃতি রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। মূলের সঙ্গে যোগ অক্ষুণ্ণ রেখেও জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যে-সমস্ত নতুন ভাবনা-চিন্তার উদ্ভাবন ঘটেছে সেগুলিও স্থান পেয়েছে দুই মহাকাব্যে। কাজেই কেবলমাত্র প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির ব্যাখ্যা গ্রন্থ নয়— বৈদিক সংস্কৃতির পৃষ্ঠভূমিতে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে-সকল নতুন অধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সেগুলিরও সপ্রমাণ বিবরণ উপস্থাপিত করে রামায়ণ-মহাভারত। উপনিষদের কাল থেকে সুনিয়ন্ত্রিত দার্শনিক প্রস্থান সমূহের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে যে-সকল নতুন সংযোজন সংঘটিত হয়েছিল তারও একটি প্রামাণিক চিত্র মহাভারতে বিধৃত হয়েছে। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, কপিলের

১. বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি। ১।১। ২৬৮ ক খ

সাংখ্যশাস্ত্র, অক্ষপাদের ন্যায়শাস্ত্র, কণাদের বৈশেষিক শাস্ত্র, জৈমিনির পূর্বমীমাংসা শাস্ত্র এবং বাদরায়ণের উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রের পৃষ্ঠভূমি যে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাভারত তার দিগ্‌নির্দশন করায়। তাছাড়াও রয়েছে মহাভারতের নারায়ণীয় প্রকরণ, বার্ষ্ণেয় অধ্যাত্মশাস্ত্র এবং পাশুপত মতের বিস্তৃত বিবরণ যা থেকে পরবর্তী ভারতের ঈশ্বরবাদ এবং ভক্তিবাদের জন্ম হয়েছে। বহু দেববাদ থেকে একদেববাদে ভারতীয় চিন্তার এই ক্রমোন্নতির স্বীকৃতিও এই দুই মহাকাব্যে পাওয়া যায়। পরবর্তীযুগে ভারতীয় জনজীবনে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব আমরা পূর্বে দেখে এসেছি। সংসারে এমন একটি গ্রন্থ পাওয়া যাবে না যাতে কোনো জাতির ইতিহাস, আদর্শ এবং সমাজ জীবনের এমন পূর্ণ বিবরণ মেলে। অনুরূপভাবে পরবর্তীকালের ইতিহাস ও জনজীবনকে এমন সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এরূপ অপর গ্রন্থ একখানিও নেই। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বা ইতিহাস গ্রন্থের অভাব সংসারে নেই কিন্তু ভবিষ্যৎ জনজীবনকে উদ্‌বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার মতো এমন সার্থক উদাহরণ আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস বলতে অনেকেই সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু ব্যাপকতর অর্থে রামায়ণ-মহাভারতই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস।[২] উভয় গ্রন্থের আখ্যান এবং উপাখ্যানগুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষের নানা প্রাচীন ঘটনা প্রচ্ছন্ন আছে। মহাকবিদ্বয়ের সমসাময়িক ভারতের নানা ছবি যেমন গ্রন্থদুটিতে মেলে তেমনি আবার এই গ্রন্থদুটিই ভাবী ভারতীয় জনজীবনের আলোকবর্তিকা হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিভিন্ন রসধারায় জনমানস সিঞ্চিত করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তা করবে। মহর্ষি বাল্মীকি পরবর্তী ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে তাই বলেছেন—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণ-কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥ ১।২।৩৫

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডেও রাম হনুমানের উদ্দেশ্যে বলেছেন, যতদিন সংসারযাত্রা নির্বাহ হবে ততদিন আমার কথাও থাকবে।

লোকো হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ॥ ৭।৪০।২২

মহর্ষি বেদব্যাসের কণ্ঠেও এরূপ একাধিক বাক্য ধ্বনিত হয়েছে। যেমন

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥ ১।১।২৬

---

২. হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে। ১।১।২৬৫ গ. ঘ.—২৬৬ ক. খ.

আবার

ইতিহাসপুরাণানামুন্মেষং নির্মিতং চ যৎ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ ত্রিবিধং কালসংজ্ঞিতম্॥ ১।১।৬৩ ইত্যাদি

আদর্শের দিক দিয়ে রামায়ণ মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ স্থাপন করেছে। সে দৃষ্টিতে মহাভারতের শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরংহি কিঞ্চিৎ' এই সত্যই রামায়ণে বিধৃত হয়েছে। তাই মূল আদর্শ বা জীবনের সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে রামায়ণ ও মহাভারত একে অপরের পরিপূরক বলা যায়।

সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ :

আচার্য, রামশর্মা, **বায়ুপুরাণম্**, সংস্কৃতি সংস্থান, ১৯৭০

আচার্য, রামশর্মা, (সম্পা.) **বামন পুরাণম্**, সংস্কৃতি সংস্থান, খাজা কুতুব (বেদনগর) বরেলী, ১৯৭০

কূর্মপুরাণম্, সংস্কৃতি সংস্থান, বরেলী প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০

স্কন্দপুরাণম্, সংস্কৃতি সংস্থান, বরেলী, ১৯৭০

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার, **ভারত-সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ**, সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৮৯

ঘোষ, ঈশানচন্দ্র-অনূদিত **জাতক**, ১-৬ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪-৮৫

চট্টোপাধ্যায়, অশোক, **পুরাণ পরিচয়**, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৭৭

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, **বঙ্কিম রচনাবলী**, খণ্ড ২ (সাহিত্য), পাত্রজ পাবলিকেশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৮৩

জৈন, পান্নালাল (সম্পা.) **পদ্মপুরাণম্**, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, কাশী, ১ম খণ্ড ১৯৫৮; ২য় খণ্ড ১৯৫৯

জৈন, সুরেন্দ্রনাথ, **ধ্বন্যালোক**, মোতীলাল বানারসী দাস, বারাণসী, ১৯৬৩

ঝা. অরণীশা (অনু.) **ব্রহ্মপুরাণম্**, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ, ১৯৭৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, **রবীন্দ্র-রচনাবলী** : খণ্ড ৪, ৫, ৮, ১২। বিশ্বভারতী, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৮০ মুদ্রণ।

তর্করত্ন, পঞ্চানন, **মার্কণ্ডেয় পুরাণম্**, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ৯

তর্করত্ন, পঞ্চানন, **খিল হরিবংশম্**, নুটবিহারী রায়, ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা, ১৩১২

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.), **অগ্নিপুরাণম্**, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, **রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র**, (১ম খণ্ড), শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী অনিলকুমার কাঞ্জিলাল (সম্পা.); বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১ম সং, চৈত্র ১৩৭১

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর (সম্পা.) **রামায়ণ তত্ত্ব**, সাহিত্য পরিষৎ, কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩০৯

দত্ত, স্বস্তিকা, **রামায়ণ সমীক্ষা— জীবন ও দর্শন**, প্রকাশক: জ্যোৎস্না দত্ত, ধনদেবী খান্না রোড, কলিকাতা ৫৪, ১৯৭৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, **পঞ্চোপাসনা**, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১২, ১৯৬০

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, **'ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী'**, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৯২

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, **প্রসঙ্গ রামায়ণ**, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯এ কেদার বসু লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, ১৩৯১

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময় (সম্পা.), **ঋগ্বেদসংহিতা**, প্রথম সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৩

বসু, গিরীন্দ্রশেখর, **পুরাণ প্রবেশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮**

বিদ্যানিধি, গুরুনাথ (সম্পা.), **রঘুবংশম্** (তৃতীয় বৃত্তি), প্রকাশক : জানকীনাথ কাব্যতীর্থ, কলিকাতা ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

বিবেকানন্দ, স্বামী, **স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা**, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৭

বসু বুদ্ধদেব, **মহাভারতের কথা**, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯৭৪

বসু, রাজশেখর, **বাল্মীকি রামায়ণ**, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা ৭৩, ১৩৫৭

শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণম্, গীতা প্রেস, গোরখপুর

বিষ্ণুপুরাণম্, গীতা প্রেস, গোরখপুর, ২য় সংস্করণ, ১৯৯০

বেদব্যাস, মহর্ষি, **শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণম্**, গীতা প্রেস, গোরখপুর

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্, সংস্কৃত সংস্থান, বরেলী ১৯৭৪

ভট্টাচার্য অমলেশ, **মহাভারতের কথা**, আর্যভারতী, ঘোলা, সোদপুর ; ভূমিকা : গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অনন্তলাল ঠাকুর, ১৯৮৫

ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল, **রামায়ণে যুদ্ধবিদ্যা,** ভূমিকা : ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিবমন্দির রোড, কোদালিয়া, চব্বিশ পরগনা, ১৩৯৯

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, **নিয়তিবাদ— উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ**. ক্যাম্প, কলিকাতা, ১৯৯৪

—, **রামায়ণ ও মহাভারত সমানুপাতিক জনপ্রিয়তা,** ক্যাম্প, ২ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

—**প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য,** আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৪

ভট্টাচার্য, সুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, **মহাভারতে চতুর্বর্গ,** কলিকাতা, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা, গ্রন্থমালা : ৮২, কলিকাতা

—**মহাভারতের চরিতাবলী,** প্রকাশ, ১৩৭৩; ২য় সংস্করণ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৯৩

—, **মহাভারতের সমাজ,** বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৬

—, **রামায়ণের চরিতাবলী,** আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭৬, ১৩৯৩

—, **সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ,** অরুণা প্রকাশনী, ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬

ভদ্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, (সম্পা.) **কৃত্তিবাসী রামায়ণ,** ভূমিকা : ড. নীরদবরণ হাজরা, মণ্ডল অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা-৭৩

ভবভূতি, **উত্তররামচরিতম্,** টীকাকার, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ; হেমচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-প্রকাশিত, ৪১, দেব লেন কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, কার্তিক ১৮৭৯

ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, **বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ,** আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, কলিকাতা

মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, প্রথম সংস্করণ কলিকাতা, ১৩৯৮

ভৌমিক, জাহ্নবীচরণ, **সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,** সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮২

মজুমদার, কেদারনাথ, **রামায়ণের সমাজ,** রিসার্চ হাউস, ময়মনসিংহ, ১৩৩৪

মজুমদার, পম্পা, **রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস,** জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ২৯, প্রথম সং ১৯৭২

মৎস্য পুরাণম্, সংস্কৃতি সংস্থান, বরেলী, ১৯৭০

মনুসংহিতা, বসুমতী কার্যালয়, ৩ বিডন স্ট্রীট, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩০৪

মাইতি, প্রসাদকুমার, **রাম কথার বিকাশের ধারা** (১ম, ২য়, ৩য়), কলিকাতা ১৯৯২

মিত্র, রাজ্যেশ্বর, **মহাভারত চিন্তা**, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৯২

মুখোপাধ্যায়, আনন্দময়, **রামায়ণ যুগে ভারত সভ্যতা**, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৪

শ, রামেশ্বর, **সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন**, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা-৯, ১৯৮৩

শর্মা রামশরণ, **প্রাচীন ভারতে শূদ্র**, কে. পি. বাগচি, কলিকাতা, ১৯৮৯

শাস্ত্রী জগদীশ, (সম্পা.) **উপনিষৎ সংগ্রহ ১-২**, মোতিলাল বানারসী দাস, বারাণসী, ১৯৭০

শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, (সম্পা.), **বৃহদ্ধর্মপুরাণম্**, চৌখম্বা অমরভারতী প্রকাশন, ২য় সং, বারাণসী, ১৯৭৪

শাস্ত্রী হরগোবিন্দ (সম্পা.), **অমরকোষঃ** চৌখম্বা, বারাণসী, ২য় সং, ১৯৮২

সরকার, হিমাংশুভূষণ, **দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য**, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭০

সিংহ কালীপ্রসন্ন (অনু.), **মহাভারতম্** (বাংলা অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা

মহাভারতম্, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ২য় সং কলিকাতা, ১৩৮৬

সেন দীনেশচন্দ্র, **রামায়ণী কথা**, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-২৯, সপ্তদশ সংস্করণ

সেন প্রবোধচন্দ্র, **রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি**, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ২য় সং ১৯৬২

সেন, মনোনীত, **রামায়ণ ও মহাভারত : নব সমীক্ষা**, প্রকাশক : অসীমা ভট্টাচার্য, কলিকাতা-৯; পরিবেশক : জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৭

সেন সুকুমার, **রাম কথার প্রাক্ ইতিহাস**, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯, প্রথম সং ১৯৭৭

—, **ভারতকথার গ্রন্থিমোচন,** আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮১

সেনগুপ্ত দেবীপ্রসাদ, **পুরাণ কথা,** বিশ্বকোষ পরিষদ, প্রথম সংস্করণ ২০০৪. ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

স্বামী, শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য, **ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস,** ১ম খণ্ড, প্রাচ্যবাণী মন্দিরের পক্ষে যতীন্দ্র বিশ্বাস চৌধুরী প্রকাশিত, ৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৬৩

হোমার, **হোমার রচনা সমগ্র,** ভূমিকা : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, তুলি কলম, কলিকাতা।

মহাভারত, গীতা প্রেস, গোরখপুর

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ :

বসু, বুদ্ধদেব, ''রামায়ণ'', সাহিত্যচর্চা (পত্রিকা)

বিশ্বাস আশুতোষ, **''বরবুদুর, প্রাম্বানন ও ডিং উপত্যকা'',** উদ্বোধন—৯৯ বর্ষ আষাঢ় ১৪০৪ সংখ্যা।

ভট্টাচার্য, সুখময়, ''রাম আগে না যুধিষ্ঠির আগে'', আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮০

মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, ''নবচন্দ্রমা রাম ও পুরুষোত্তম কৃষ্ণ'', দেশ, ৩১ মে, ১৯৮৬

মুখোপাধ্যায়, শশিভূষণ, ''রামায়ণ ও মহাভারত'', আর্য্যাবর্ত্ত (মাসিকপত্র) বর্ষ ৩, সংখ্যা ২, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

রায়, কালিদাস, ''রামায়ণের রূপান্তর'', উদ্বোধন, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৪, বৈশাখ ১৩৬২

গ্রন্থভুক্ত রচনা :

ঠাকুর, অনন্তলাল, **''মহাভারতের শিক্ষা''**—গোপাল হালদার সম্পাদিত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বঙ্গানুবাদ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি কলিকাতা, মার্চ ১৯৭৪

ইংরেজী গ্রন্থ :

Asian Variations in Rāmāyaṇa : Edited, with an Introduction by K. R Srinivasa Iyengar, Sahitya Akademi, New Delhi, First published 19883, Reprinted 1994

Aṣṭādhyāyi of Pāṇini : Edited with English translation by Srisa Chandra Vasu, Vol 01 and II, Motilal Banarasidass, Delhi, 1962.

Aśvaghoṣa's Buddhacarita or Acts of the Buddha, (in three parts) : E. H. Jhonston, Motilal Banarasidas, New Enlarged Edition, Delhi, 1984. **EPIC India**. C. V Vaidya, Bombay. 1933, **A Socio-Political study, of the Vālmīki Rāmāyaṇa** Ramasraya Sharma-Delhi, 1971, —. J. L. Brokington, Oxford University Press, Delhi, 1984.

The Baudhāyana-Dharmasūtra with Vivaraṇa Commentary by Sri Govinda Svami.. Critical Notes by M. M. A. Chinnaswami Sastri and Dr Umesa Chandra Pandeya, Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi, 1972.

The Cultural Heritage of India : Swami Akunthananda, Secretary, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Calcutta, 2nd Edn., 1962, Reprint 1969.

Das Rāmāyaṇa : Dr. Hermann Jacobi, Trs. from German by Dr. S. N. Ghosal, Oriental Institute, Baroda, 1960.

Dharma Sūtras—A Study in their Origin and Development : Suresh Chandra Banerjee, Punthi Pustak, 130/4B, Cornwallis Street, Calcutta 4, 1962.

Epic Mythology : E. Washburn, Hopkins, Strassburg, 1915 ; Reprint, Delhi, 1974.

Epic Sources in Sanskrit Literature : Juthika Ghosh, Calcutta Sanskrit College, 1963.

The Great Epic of India : Its Character and Origin : E. Washburn Hopkins, New Haven, Yale University Press, MDcccxx, 1920.

Hindu Polytheism : Alain Danic'loa, Pantheon Books, Bollingen Series, New York Edition 1964.

History of Classical Sanskrit Literature : M. Krishnamacharian, Tirumalai—Tiruputi., Devasthanams Press, Madras, 1937.

A History of Indian Literature : M Winternitz, Vol. I, Part II, Calcutta University, 1978

A History of Sanskrit Literature : Alan Davidson Keith. Oxford University Press. Amen House. London. 1920.

An Index to the Names in the Mahābhārata : S. Soren Sen. Motilal Banarasidass. Varanasi. 1st Edn. 1904 ; Reprint. 1963. 1978.

Indian Wisdom : Monier Williams. The Chowkhamba Sanskrit Series Office, Gopal Mandir Lane. Varanasi. India. 1963.

The Kāvya Portions in the Katha Literature : An Analysis. Vol 1. (Panchatantra), Ludwik Sternback, Meherchand Lachhmandas. The Sanskrit Book Dept., 2763. Kucha Chintan. Daryaganj. Delhi 6. Sept. 1961.

Mahābhārata Myth and Reality Differing Views. Edited by S. P. Gupta. K. S. Rāmachandran, Agam Prakashan. Delhi.

The Mahābhārata Book 1, Tr. and Edited by J. A. B.. Van Buitenen. The University of Chicago Press. 1973. 2nd Impression 1975.

The Mahābhārata (Vols. II. III. IV). Critically Edited by V. S. Sukhtankar. Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. 1944.

Mahābhāratam, Gita Press. Gorakhpur.

The Position of Women in Hindu Civilization, (From prehistoric times to the present day), A. S. Altekar. Motilal Banarasidas. P. B. 75. Banaras, 1956.

The Rāmāyaṇa in Greater India, V. Raghavan. Surat. 1975.

The Rāmāyaṇa : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus : A Resume, Suniti Kumar Chatterjee, Prajna. 77/1. M. G. Gandhi Road. Calcutta-9. 29.5.1978.

Rāmāyaṇa in Eastern India Edited by Asit Kumar Banerjee Prajna. Calcutta. 1983.

Rāma in Indian literature art and thought—by P. Banerjee. Delhi. 1986. Sundeep Prakashan.

The Rāmāyaṇa Tradition in Asia, Edited by V. Raghavan, Sahitya Akademi, Madras, 1980.

Rāmakathā (in Hindi), Father Kamil Buleke, Hindi Parishad Prakasana. Dept. of Hindi, Allahabad University. Allahabad.

Righteous Rāma : The Evolution of an Epic, J. L. Bookington. Oxford University Press. 1984.

Śatapatha Brāhmaṇam, Published by Ramswarup Sharma. The Research Institute of Ancient Scientific Studies. 24/7-9. West Patel Nagar. New Delhi. 1967.

Sanskrit Beyond India — S. C. Banerjee. Saraswat Library, Calcutta. 1978.

Sexual Life in Ancient India, Johann Jakob Meyer. Routledge and Kegan Paul. London. 1952.

Sister Maeve Hughes : Ibrin Epic Women East and West. The Asiatic Society. 1. Park Street. Kolkata-16. 1994. Monograph Series No. XXX

Some Old Lost Rāma Plays, V. Raghavan. Annamalai University. 1961.

Studies in Rāmāyaṇa, Dewan Bahadur K. S. Ramaswami Sastri. Department of Education. Baroda State. 1944.

V. S. Sukthankar Memorial Edition, Edited on behalf of the Committee by P. K. Gode. Curator. Bhandarkar Oriental Research Institute. Poona. Published on 1 January. 1944.

Vālmīki and Vyāsa, Sri Aurobindo Centenary. August 15. 1972.

Vālmiki Rāmāyaṇa (Descriptive Index to the Names and Subject of Ramayana). By Ramkumar Roy. The Kashi Sanskrit Series-168. The Chowkhamba Sanskrit Series Office. Varanasi. India, 1965.

The Vālmiki Rāmāyaṇa : Vol 1. Critically Edited by G. M. Bhatt. Published under the Authority of the Maharaja Sayajirao University. Baroda. Oriental Institute. Baroda. 1960.

——. Vol. II. Critically Edited by P. L. Vaidya. 1962.

——. Vol III. Critically Edited by P. C. Divanji. 1963.

——. Vol. IV. Critically Edited by D. R. Mankad. 1965.

——, Vol. V. Critically Edited by G. C. Jhala. 1966.

——, Vol. VI. Critically Edited by P. L. Vaidya. 1971.

——. Vol VII. Critically Edited by Umakant Premanand Shah. 1975.

Yuganta : The End of an Epoch, Irawati Karve. Desmukha Prakashan. Poona. 1969.

Published in English Journals :

"Some Minor Rāmāyaṇa Works in the Medieval Gujarati Literature".

Devdatta S. Joshi in. **Journal of the Oriental Institute,** M. S. University. Baroda. Vol. XLIX. September 1999. No. 1–2

"The Age of Kālidāsa", R. G Sankara Iyer. **Quarterly Journal,** Mythic Society. Bangalore. Vol- VIII. 1917-1918 . October 1917

"The Antochthonus Element in the Mahābhārata". **Journal of the American Oriental Society,** Vol 84. No. 1. Jan–March. 1964. pp. 31–34.

"The Caste System in the Rāmāyaṇa Age" :S. N. Vyas. **Journal of the Oriental Institute,** Volume 3. Baroda. December. 1953.

"Is the Uttara Kānda of Vālmīki Rāmāyaṇa is Historical" : Sadar Rao Bhadur. M V Kibe. **Journal of Indian History,** Vol XX. Part I-III. 1941

"Krishna and the Kuruksetra Battle at end of the Vedic Period" :

Suniti Kumar Chatterjee. **Journal of Asiatic Society of Bengal,** 1950. Letters—Vol. XVI. No 1. pp 73–87

"A Note on the Rākṣasa form of Marriage" : Minoru Hara. **Journal of the American Oriental Society,** 1974. pp. 296–306.

"The Original Rāmāyaṇa" : E. Washburn Hopkins. **Journal of the American Oriental Society.** Ed. Max L. Margolis. W. Norman Brown. Vol. 46. 1926

"The Rāmāyaṇa and its influence upon Ballalasena and Raghunandana" : Bhabatosh Bhattacharya. **J.O.I.B.**, 2. 1953. pp. 18–22.

"The Social and Military Position of the Ruling Caste in Ancient India—As represented by the Sanskrit Epic." : Edward W. Hopkins.

American Oriental Society, Vol 13. New Haven for A O.C., Yale University. MDCCLXXXIX

The Statesman, 1st December, 1987.

"Vālmīki as he reveals himself in his poem. (A Psychological Approach)" : Dr. B. Barua. **Sri Asutosh Mukherjee Silver Jubilee Vols. :** Vol. III. Orientalla, Part 1. Calcutta University. 1922

"Vasudeva Worship as known to Pānini". Part 1 . R. C. Hazara ·

Our Heritage : Bulletin of the Department of Post Graduate Training and Research, Sanskrit College. Calcutta. Vol. XVIII. Jan.–June. 1970

D. C. Sarkar, "The Rāmāyana and the Daśaratha Jātaka : **Journal of the Oriental Institute**. Baroda—26. 1976–77. P. 50–55.

"The authorship of the Rāmāyaṇa : **Journal of the American Oriental Society**. 46. 1926 P. 202–19.

নির্দেশিকা

পৃষ্ঠাঙ্ক